স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জুলাই ২০১৫

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

গবেষক

মোঃ আশিকুর রহমান
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ০২
শিক্ষাবষ- ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক **মোঃ আশিকুর রহমান, "স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। এটি তার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, এ অভিসন্দর্ভটি বা অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা সংস্থা হতে কোন প্রকার ডিগ্রি অর্জন বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমাদানের সুপারিশ করছি।

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
rashidnumani@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান"** শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক রচনা। গবেষণাকর্মটি আমি ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের তত্ত্বাবধায়নে সম্পন্ন করেছি। অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্যকোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে কোন ডিগ্রি অর্জনের বা প্রকাশানার জন্য উপস্থাপন করিনি।

মোঃ আশিকুর রহমান
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ০২
শিক্ষাবর্ষ- ২০১০-১১
যোগদান- ০৬/০৩/২০১১ইং
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে **"স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান"** শীর্ষক আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। অতঃপর পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাঁর সহ শাহাদতবরণকারী পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও তাঁদের পরিবারবর্গকে।

আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাজনে আবদ্ধ হয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ। কর্মব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতায়। এজন্য আমি তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তাঁর দীর্ঘায়ূ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আমার বিভাগের অন্যসব শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আব্দুর রহিম মল্লিক ও মাতা বেগম আমেনা খাতুনের প্রতি। আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহদানে তাঁদের জুঁড়ি নেই। আমার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় কাতর আমার পিতা-মাতা তাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের সবটাই ছাড় দিয়ে গিয়েছেন। মহান আল্লাহর দরবারে আমার পিতার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করছি এবং আমার মাতার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণা কর্মে যারা নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমার শ্রদ্ধেয়া বড় বোন মনোয়ারা খাতুন বিউটি এবং শ্রদ্ধেয় মামা মোঃ আশরাফুল ইসলাম। আমার প্রতি তাদের অকৃত্রিম উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সকল বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহস্পদ এবং ঘনিষ্টজনেরা নানাভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং দুস্প্রাপ্য তথ্যাদি ও শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, সর্বোপরি আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। আল্লাহ সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মোঃ আশিকুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

অনু.	=	অনুবাদ/অনুদিত
আ.	=	আরবি
আ.	=	আলাইহিস্ সালাম
আ.	=	আব্দুল/ আব্দুর
ইং	=	ইংরেজি
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
উঃ	=	উত্তর
খৃ.	=	খৃস্টাব্দ/খৃস্টাব্দে
খ্রী.	=	খ্রীস্টাব্দ/খ্রীস্টাব্দে
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ/খ্রিস্টাব্দে
খৃ.পূ.	=	খৃস্টপূর্ব
জ.	=	জন্ম
ড.	=	ডক্টর (পি.এইচ.ডি)
ডা.	=	ডাক্তার
তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
দ.	=	দক্ষিণ
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
প.	=	পশ্চিম
পুন.	=	পুনরায়
পুন. পুন	=	বারবার
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
বাং	=	বাংলা
বি.দ্র.	=	বিস্তারিত/বিশেষ দ্রষ্টব্য
মৃ.	=	মৃত, মৃত্যু
মাও.	=	মাওলানা
রেজি.	=	রেজিস্টার্ড
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু
রহ.	=	রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
স./সা.	=	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
সম্পা.	=	সম্পাদনা/সম্পাদিত
হি.	=	হিজরী
A.H	=	হিজরী সন
A.D	=	খ্রিস্টাব্দ
P.	=	Page.
Ed.	=	Edition/Editor/Edited
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangal
Ibid	=	(Ibidem) in the same place, from the same source.
Opcit	=	Open Cito.
Vol	=	Volume

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র III
ঘোষণা পত্র IV
কৃতজ্ঞতা স্বীকার V
শব্দ সংকেত VII
সূচিপত্র VIII
ভূমিকা ১-৫

প্রথম অধ্যায় : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনধারা.. (৬-১৯)

প্রাককথা ৬
বঙ্গবন্ধুর পূর্ব-পুরুষ ১০
জন্ম ও শৈশবকাল ১১
শিক্ষা জীবন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১৩
বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনধারা...................... (২০-১৪৫)

ছাত্র রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২০
ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা ও কার্যধারা ৩৩
আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন ৩৭
ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাব ৩৮
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্রত্বের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহার.................. ৪৪
তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভিসি মহোদয় প্রদত্ত মানপত্র............... ৪৬
আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবুর রহমান ৪৭
আওয়ামী মুসলিম লীগের ১২ দফা কর্মসূচী ৫০
স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ৫৩
ভাষা আন্দোলন ও কারাবরণ ৫৭
কারাবরণ ৬২
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধুর কার্যধারা ৬৮
ঐতিহাসিক ২১ দফা ৭০
পাকিস্তান পার্লামেন্টে পূর্ব বাংলার দাবি ও স্বৈরাচারী কার্যাবলীর জন্য কঠোর সমালোচনা.... ৭৩
আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ও বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ৭৫
কারাজীবন : শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯৫৮-১৯৫৯) ৮০
সামরিক সরকারের মামলা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ৮০
ছয়দফা আন্দোলন : প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচন........ ৮৫
আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ মুজিব ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও এর প্রভাব..৯৭
ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান.. ১০৩
১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ও ঘটনা প্রবাহ.................... ১১৫
অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চের ভাষণ.. ১১৯
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য ১২২
Declaration of war o independence.................................... ১২৮
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র... ১৩১
পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বন্দিজীবন ১৩২
Instrument of surrender... ১৩৭
আত্মসমর্পণ দলিল ১৩৮
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিলাভ..১৪০

তৃতীয় অধ্যায় : রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কৃতিত্ব............ (১৪৬-১৮২)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ......................... ১৪৬
রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান..১৫৩
অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব ও অবদান............ ১৬২
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৬২
ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি-১৯৭৫ .... ১৬৩
ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন.. ১৬৪
টঙ্গী বিশ্ব এস্তেমার জন্য জমি বরাদ্দ ১৬৫
জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান... ১৬৬
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান............................. ১৭১
কেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ? ১৭১
উপ-মহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু.. ১৭৭
মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ১৭৭
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৭৭
বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান..................................১৮০

চতুর্থ অধ্যায় : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ড, মামলার রায় ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী.....(১৯৮-২২৪)

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ১৮৩
পনেরই আগস্টের ষড়যন্ত্রকারীরা...১৮৪
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার.. ১৮৯
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলার রায় ১৯০
ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যাকাণ্ড.. ১৯২

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশে ইসলামের আগমন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা .... (২২৫-২৬১)

বাংলাদেশের পরিচিতি.. ১৯৯
ভৌগোলিক অবস্থান.. ১৯৯
সীমানা.. ১৯৯
পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল...২০০
উপকূলীয় অঞ্চল..২০০
নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল ২০০

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা.. ২০১
প্রশাসনিক কাঠামো ২০১
জলবায়ু... ২০১
শিক্ষা... ২০২
নামকরণ.. ২০২
স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২০৩
ইসলামের মৌলিক শিক্ষা.. ২০৫
বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তার ২১০
প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ২১৭
আরবের ভৌগলিক বিবরণ.. ২১৮
কিংবদন্তী ভিত্তিক প্রমাণ ২১৯
ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠন ২২১

ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি....................... (২৩০-২৫২)

বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামের প্রভাব.. ২৩০
স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধু....................................... ২৩৬
মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধু.. ২৪৭
বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ২৫০

সপ্তম অধ্যায় : ইসলামে মাতৃভূমি, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ....(২৫৩-২৭৮)

মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধু অবদান ২৫৩
ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা ও বঙ্গবন্ধুর অবদান....................................... ২৬৩
মাতৃভাষা রক্ষা ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান... ২৬৮

অষ্টম অধ্যায় : স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধু গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ....(২৭৯-৩৩৪)

ইসলাম প্রচার-প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ২৭৯
ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন ২৮১
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ২৮৮
ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর কর্মসূচি ৩০৯
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন করা ৩১৫
মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩১৫
তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য জমি প্রদান ৩১৯
পবিত্র হজ্জব্রত পালনের সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা ৩২৪
বেতার ও টিভিতে কুরআর তিলাওয়াত প্রচার ৩২৪
ও.আই.সি'র অন্তর্ভুক্ত ৩২৫
জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) পালন ৩২৫
ঈদে মিলাদুন্নবী (স.), শব-ই-বরাত, শব-ই-কদর উপলক্ষে সরকারী ছুটি ঘোষণা ৩২৬
মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান ৩২৬
ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধকরণ ৩৩০
রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা...................................... ৩৩১

আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরব বিশ্বও পূর্বসমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ.................... ৩৩১

মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ৩৩১

নবম অধ্যায় : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান ....(৩৩৫-৩৮৪)

বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকতা... ৩৩৫

ইসলামী আদর্শ ও মানবতার বিকাশে বঙ্গবন্ধু... ৩৪১

ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু.. ৩৪৯

ইসলামি মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ৩৫৫

ইসলামী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান ৩৬০

ইসলামে মানবাধিকার ও বঙ্গবন্ধুর চেতনা... ৩৬৬

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা ও ভাষণে ইসলামি চেতনা ৩৬৭

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ইসলামি আদর্শের প্রতিফলন ৩৭১

আইন প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর ইসলামি চেতনার বিকাশ ৩৭৭

দশম অধ্যায় : ধর্মনিরপেক্ষতা, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি ....(৩৮৫-৩৯৮)

ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচিতি ও মূল্যায়ন ৩৮৫

বঙ্গবন্ধু ধর্মীয় চেতনা.. ৩৮৮

সাম্প্রদায়িকতা নয়, মানবতাই মূলশক্তি... ৩৯৩

উপসংহার ৩৯৯

পরিশিষ্ট-১ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ .... (৪০৬-৪৯১)

১. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার-ভাষণ ৪০৭

২. বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশন মারফত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ ৪২২

৩. পাকিস্তানের কারগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ ৪২৮

৪. ঐতিহাসিক ৭জুন ১৯৭২ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ ৪৩১

৫. জাতীয় প্রেসক্লাবে ১৬ জুলাই, ১৯৭২ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ৪৪১

৬. প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৮ অক্টোবর, ১৯৭২ পি.জি. হাসপাতালের রক্ত সংরক্ষণাগার এবং নতুন মহিলা ওয়ার্ডের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ ৪৪৮

৭. ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশনে শোক প্রস্তাব এবং খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণ ৪৫৪

৮. ০৪ নভেম্বর, ১৯৭২ গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে ভাষণ ৪৬৩

৯. জাতীয় দিবস উপলক্ষে ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ ৪৭৬

১০. ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ ৪৮২

পরিশিষ্ট-২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি ৪৯২-৫২৯

গ্রন্থপঞ্জি ৫৩০-৫৪৫

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

এ্যাবস্ট্রাক্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জুলাই ২০১৫

তত্ত্বধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

গবেষক

মোঃ আশিকুর রহমান
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ০২
শিক্ষাবষ- ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

এ্যাবস্ট্রাক্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন মহান রাজনীতিবিদ, বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠসন্তান ইতিহাসের মহানায়ক। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তিনি আমাদের জাতির জনক ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। টুঙ্গিপাড়া গ্রামটি রাজধানী ঢাকা থেকে ১৫২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

বঙ্গবন্ধুর জন্মের সময় বাংলার সার্বিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। সে সময়ে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। আর এটি নিয়ন্ত্রণ করত জমিদার মহাজন শ্রেণির লোকেরা। জমিদার-মহাজন বা শাসক শ্রেণীর অধিকাংশ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আর কৃষক-প্রজা বা শাসিত-শোষিত শ্রেণীর সিংহভাগ ছিল মুসলমান। তবে মুসলমানদের মধ্যে জমিদার শ্রেণীভুক্তও কিছু ছিল। যেমন- ঢাকার নবাব পরিবার, বলিয়াদীর (গাজীপুর জেলা) সিদ্দিকী পরিবার, করটিয়ার (টাঙ্গাইল) পন্নী পরিবার, বগুড়ার নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী পরিবার, কুমিল্লার সৈয়দ হুসাম হায়দার চৌধুরী ও কাজী গোলাম মহিউদ্দীন ফারুকী পরিবার, বরিশালের সৈয়দ মোয়াজ্জেম হুসাইন ও ইসমাইল খান চৌধুরী পরিবার। বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোয় ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আর পশ্চিমের জেলাগুলোয় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থনৈতিক বিভাজন সত্ত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। তবে, বিশেষ করে হিন্দুসমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দুই সম্প্রদায়কে একই সমতলে না এনে বরং দু'য়ের মধ্যে বিভক্তি রেখা টেনে দেয়।

রাজনৈতিক দিক থেকে বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের চূড়ান্ত পর্ব। বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের (১৯০৫-১৯১১) মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ সময়ে ঘটে, যা রাজনৈতিকভাবে হিন্দু ও মুসলমান এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী দূরত্ব সৃষ্টি করে। হিন্দু সমাজের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা স্বদেশী চেতনা পরবর্তীকালেও সক্রিয় থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলমানদের সম্মিলিত খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২) চলছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫), নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) কর্তৃক হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে এদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচন-পরবর্তী শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক-প্রজা-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অপরদিকে, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা শহরে সরকারি স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা, মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ও বৃত্তির সুবিধা ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় ভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হতে থাকে। বিংশ শতাব্দির '৩০ ও '৪০-এর দশকে স্বচ্ছল

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম পরিবারের সন্তানরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করতে থাকে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও, প্রদেশের রাজধানী হিসেবে দেশ বিভাগ পর্যন্ত কলকাতাই ছিল শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, পত্র-পত্রিকা ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ইতিহাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন-শোষণেরই কঠোর ধারাবাহিকতা। এই সত্যকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেই একজন তীক্ষ্ণ রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বঞ্চনামূলক শাসনকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমা সামরিক শাসক শেখ মুজিব ও তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য করে, যার ফলে তাঁকে বছরের পর বছর জেল-জুলুম ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। তাঁর দলের বহু নেতা-কর্মীকেও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বাঙালি বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়ই ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে বাঙালির 'মুক্তিসনদ' ৬-দফা ফর্মুলা পেশ করেন। প্রকৃতই ৬-দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। সর্বস্তরের বাঙালিই ৬-দফা ফর্মুলাকে লুফে নিয়েছিল। কিন্তু আঁৎকে উঠল আইয়ুব খান ও অন্যান্য পশ্চিমা নেতারা। আইয়ুব খান এটাকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ করার ফর্মুলা বলে অভিহিত করেন এবং এ অভিযোগে দেশরক্ষা আইনের অধীনে শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। শেখ মুজিব ও তাঁর দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীদেরকে অসংখ্যবার গ্রেফতার, অত্যাচার, নির্যাতন করেও সরকার ৬-দফার আন্দোলনকে দমন করতে পারেনি বরং আন্দোলন উত্তরোত্তর তীব্র আকার ধারণ করে। বাধ্য হয়ে আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে পর্দার অন্তরালে চলে যান। আন্দোলনের গতিকে মন্থর করার অভিপ্রায়ে ইয়াহিয়া খান লোকসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করেন। এই ৬-দফার ভিত্তিতেই ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমা শাসকদের সব জরিপ রিপোর্টকে ভুল প্রমাণ করে বাঙালিরা এককভাবে আওয়ামী লীগকে গরিষ্ঠসংখ্যক আসনে নির্বাচিত করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার অধিকার প্রদান করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তারা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেয়। গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে বাঙালিদের দমন করবার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ৯ মাসের যুদ্ধে বাঙালিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। পৃথিবীর বুকে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তানি শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। তাঁর অমিত সাহস, অসাধারণ দেশপ্রেম, প্রজ্ঞাপূর্ণ সাংগঠনিক নৈপুণ্য, সর্বোপরি দেশনায়কোচিত হিমাদ্রিতুল্য ব্যক্তিত্ব তাঁকে ক্রমশ পৌঁছে দেয় জাতীয় নেতৃত্বের স্বর্ণ শিখরে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্ন-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, আটষট্টির আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঊনসত্তরের উত্তাল গণআন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ এবং সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ-জাতীয় ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল, অনতিক্রম্য এবং সুদূরপ্রসারী। স্বাধিকারের সংগ্রামকে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে রূপান্তর এবং

Dhaka University Institutional Repository

এর মাধ্যমে একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুর জীবনের অমর কীর্তি। আর এ কারণেই তিনি বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, আত্মমর্যাদা ও জাতীয় গৌরবের প্রতীক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকালে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌত অবকাঠামোগত পদক্ষেপ যেমন ছিলো, তেমনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধের কথা মনে রেখে তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারে বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকরী নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দেশগঠনসহ ইসলামের কল্যাণেও বঙ্গবন্ধুর অবদান অবিস্মরণীয়। বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার-প্রসার কার্যক্রমকে তিনি দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করেন। আজ বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ব্যাপক ও বহুমুখী জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম দেখে অনুধাবন করা যায় যে, তিনি কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সত্যিকারের সফল দেশনায়ক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতাবিরোধী একটি মহল ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করে গণহত্যাসহ দেশবিরোধী অপতৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং পবিত্র ইসলামের ওপর কালিমা লেপন করে ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করে। দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের শান্তি ও কল্যাণের আদর্শ প্রচার নিশ্চিত করার মানসেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া ইসলামের কল্যাণে তিনি আরও বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৬৯ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকার হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, "এই ভূখণ্ডটির নাম হবে বাংলাদেশ।" জনগণের ইচ্ছাই শেষ কথা। ৬-দফা বাংলার কৃষক-শ্রমিক, মজুর, মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ। শোষকদের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬-দফা মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালী জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মনির্ভরতার চাবিকাঠি।

সুতরাং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরার জন্যই উপস্থাপিত **"স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবসৌন্দর্য ও অবয়বকে সুচারুরূপে বিন্যাস করার নিমিত্তে এটাকে মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে-

প্রথম অধ্যায়ে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনধারা" আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর পূর্ব পুরুষদের পরিচিত, জন্ম, শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনধারা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনধারা" তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর ছাত্র-রাজনীতি, ছাত্রলীগের জন্ম, আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন, আওয়ামী লীগ-এর প্রতিষ্ঠা, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, কারাবরণ, ঐতিহাসিক ২১ দফা, ছয়দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চের ভাষণ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে "রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কৃতিত্ব" আলোচনায় তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,

Dhaka University Institutional Repository

ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড, মামলার রায় ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী" বিষয়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা" বিষয়ে আলোচনায় বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা, জনসংখ্যা, শিক্ষা, নামকরণ, স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তার, আরবের ভৌগলিক বিবরণ, কিংবদন্তী ভিত্তিক প্রমাণ, ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি" বিষয়ে। এখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামের প্রভাব, স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "ইসলামে মাতৃভূমি, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা" বিষয়ে।

অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধু গৃহীত পদক্ষেপসমূহ" শিরোনামে। এ অধ্যায়ে ইসলাম প্রচার-প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন করা, তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য জমি প্রদান, পবিত্র হজ্জব্রত পালনের সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা, বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার, ও.আই.সি'র অন্তর্ভুক্তি, জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) পালন, মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান, রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা, আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ, মুসলিম বিশ্বে মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান" বিষয়ে। এখানে ইসলাম, সাম্প্রদায়িকতা ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি, বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী আদর্শ ও মানবতার বিকাশ, ইসলামি মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, ইসলাম বিষয়ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান, বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা ও ভাষণে ইসলামি ভাবধারা, আইন প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর ইসলামি চেতনার বিকাশ ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "ধর্মনিরপেক্ষতা, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি" নামে। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচিতি ও মূল্যায়ন, বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চেতনা, সাম্প্রদায়িকতা নয়, মানবতাই মূলশক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহারসহ দু'টি পরিশিষ্ট ও সহায়ক গ্রন্থবলীর একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

মূলত: বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন প্রকৃত মুসলিম। তাই তিনি প্রকৃত ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আমৃত্যু চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, স্বাধীনতা যুদ্ধ, এ সময়কালে পাকিস্তানী বাহিনী

ও এদেশীয় দোষরদের খুন, ধর্ষণসহ অমানবিক কার্যক্রম অতঃপর ৩০ লক্ষ জীবনের এবং ৩ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। এরপর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ অবদান এ অভিসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়; বরং ধর্মের প্রকৃত অনুসরণ -এ কথাই বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

আমার এ অভিসন্দর্ভে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ধর্মান্ধরা যে অভিযোগ করে তার অসারতা খুঁজে পাওয়া যাবে। খুঁজে পাওয়া যাবে ইসলামের মূল্যবোধে উজ্জিবীত প্রকৃত ইসলামে বিশ্বাসী এক মর্দে মুমিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণা কর্ম জ্ঞানের জগতে এক মূল্যবান সংযোজন হবে। এর দ্বারা জ্ঞানী-গুণী পাঠক যথার্থ অর্থে উপকৃত হবেন। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার ইতিহাসে একটি নতুন ধ্রুব তারার উদয় হবে, যার আলোকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বহুবিধ গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত হবে। অনুপ্রাণিত হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের গবেষকগণ।

আল্লাহ্ আমাকে ও সবাইকে এ অভিসন্দর্ভটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন!

তত্ত্বধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

গবেষক

মোঃ আশিকুর রহমান
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ০২
শিক্ষাবষ- ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন মহান রাজনীতিবিদ, বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠসন্তান ইতিহাসের মহানায়ক। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তিনি আমাদের জাতির জনক ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। টুঙ্গিপাড়া গ্রামটি রাজধানী ঢাকা থেকে ১৫২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

বঙ্গবন্ধুর জন্মের সময় বাংলার সার্বিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। সে সময়ে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। আর এটি নিয়ন্ত্রণ করত জমিদার মহাজন শ্রেণির লোকেরা। জমিদার-মহাজন বা শাসক শ্রেণীর অধিকাংশ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আর কৃষক-প্রজা বা শাসিত-শোষিত শ্রেণীর সিংহভাগ ছিল মুসলমান। তবে মুসলমানদের মধ্যে জমিদার শ্রেণীভুক্তও কিছু ছিল। যেমন- ঢাকার নবাব পরিবার, বলিয়াদীর (গাজীপুর জেলা) সিদ্দিকী পরিবার, করটিয়ার (টাঙ্গাইল) পন্নী পরিবার, বগুড়ার নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী পরিবার, কুমিল্লার সৈয়দ হুসাম হায়দার চৌধুরী ও কাজী গোলাম মহিউদ্দীন ফারুকী পরিবার, বরিশালের সৈয়দ মোয়াজ্জেম হুসাইন ও ইসমাইল খান চৌধুরী পরিবার। বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোয় ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আর পশ্চিমের জেলাগুলোয় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থনৈতিক বিভাজন সত্ত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। তবে, বিশেষ করে হিন্দুসমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দুই সম্প্রদায়কে একই সমতলে না এনে বরং দু'য়ের মধ্যে বিভক্তি রেখা টেনে দেয়।

রাজনৈতিক দিক থেকে বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের চূড়ান্ত পর্ব। বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের (১৯০৫-১৯১১) মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ সময়ে ঘটে, যা রাজনৈতিকভাবে হিন্দু ও মুসলমান এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী দূরত্ব সৃষ্টি করে। হিন্দু সমাজের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা স্বদেশী চেতনা পরবর্তীকালেও সক্রিয় থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলমানদের সম্মিলিত খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২) চলছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫), নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) কর্তৃক হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে এদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচন-পরবর্তী শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক-প্রজা-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অপরদিকে, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা শহরে সরকারি স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা, মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ও বৃত্তির সুবিধা ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় ভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হতে থাকে। বিংশ শতাব্দির '৩০ ও '৪০-এর দশকে স্বচ্ছল মুসলিম পরিবারের সন্তানরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করতে থাকে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও, প্রদেশের রাজধানী হিসেবে দেশ বিভাগ পর্যন্ত কলকাতাই ছিল শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, পত্র-পত্রিকা ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ইতিহাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন-শোষণেরই কঠোর ধারাবাহিকতা। এই সত্যকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেই একজন তীক্ষ্ণ রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বঞ্চনামূলক শাসনকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমা সামরিক শাসক শেখ মুজিব ও তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য করে, যার ফলে তাঁকে বছরের পর বছর জেল-জুলুম ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। তাঁর দলের বহু নেতা-কর্মীকেও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বাঙালি বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়ই ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে বাঙালির 'মুক্তিসনদ' ৬-দফা ফর্মুলা পেশ করেন। প্রকৃতই ৬-দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। সর্বস্তরের বাঙালিই ৬-দফা ফর্মুলাকে লুফে নিয়েছিল। কিন্তু আঁৎকে উঠল আইয়ুব খান ও অন্যান্য পশ্চিমা নেতারা। আইয়ুব খান এটাকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ করার ফর্মুলা বলে অভিহিত করেন এবং এ অভিযোগে দেশরক্ষা আইনের অধীনে শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। শেখ মুজিব ও তাঁর দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীদেরকে অসংখ্যবার গ্রেফতার, অত্যাচার, নির্যাতন করেও সরকার ৬-দফার আন্দোলনকে দমন করতে পারেনি বরং আন্দোলন উত্তরোত্তর তীব্র আকার ধারণ করে। বাধ্য হয়ে আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে পর্দার অন্তরালে চলে যান। আন্দোলনের গতিকে মন্থর করার অভিপ্রায়ে ইয়াহিয়া খান লোকসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করেন। এই ৬-দফার ভিত্তিতেই ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমা শাসকদের সব জরিপ রিপোর্টকে ভুল প্রমাণ করে বাঙালিরা এককভাবে আওয়ামী লীগকে গরিষ্ঠসংখ্যক আসনে নির্বাচিত করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার অধিকার প্রদান করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তারা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেয়। গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে বাঙালিদের দমন করবার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ৯ মাসের যুদ্ধে বাঙালিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। পৃথিবীর বুকে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তানি শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। তাঁর অমিত সাহস, অসাধারণ দেশপ্রেম, প্রজ্ঞাপূর্ণ সাংগঠনিক নৈপুণ্য, সর্বোপরি দেশনায়কোচিত হিমাদ্রিতুল্য ব্যক্তিত্ব তাঁকে ক্রমশ পৌঁছে দেয় জাতীয় নেতৃত্বের স্বর্ণ শিখরে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্ন-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, আটষট্টির আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের উত্তাল গণআন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ এবং সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ-জাতীয় ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল, অনতিক্রম্য এবং সুদূরপ্রসারী। স্বাধিকারের সংগ্রামকে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে রূপান্তর এবং এর মাধ্যমে একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুর জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

অমর কীর্তি। আর এ কারণেই তিনি বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, আত্মমর্যাদা ও জাতীয় গৌরবের প্রতীক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকালে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌত অবকাঠামোগত পদক্ষেপ যেমন ছিলো, তেমনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধের কথা মনে রেখে তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারে বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকরী নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দেশগঠনসহ ইসলামের কল্যাণেও বঙ্গবন্ধুর অবদান অবিস্মরণীয়। বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার-প্রসার কার্যক্রমকে তিনি দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করেন। আজ বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ব্যাপক ও বহুমুখী জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম দেখে অনুধাবন করা যায় যে, তিনি কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সত্যিকারের সফল দেশনায়ক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতাবিরোধী একটি মহল ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করে গণহত্যাসহ দেশবিরোধী অপতৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং পবিত্র ইসলামের ওপর কালিমা লেপন করে ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করে। দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের শান্তি ও কল্যাণের আদর্শ প্রচার নিশ্চিত করার মানসেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া ইসলামের কল্যাণে তিনি আরও বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৬৯ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকার হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, "এই ভূখণ্ডটির নাম হবে বাংলাদেশ।" জনগণের ইচ্ছাই শেষ কথা। ৬-দফা বাংলার কৃষক-শ্রমিক, মজুর, মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ। শোষকদের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬-দফা মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালী জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মনির্ভরতার চাবিকাঠি।

সুতরাং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরার জন্যই উপস্থাপিত **"স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবসৌন্দর্য ও অবয়বকে সুচারুরূপে বিন্যাস করার নিমিত্তে এটাকে মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে-

প্রথম অধ্যায়ে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনধারা" আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর পূর্ব পুরুষদের পরিচিত, জন্ম, শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনধারা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনধারা" তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর ছাত্র-রাজনীতি, ছাত্রলীগের জন্ম, আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন, আওয়ামী লীগ-এর প্রতিষ্ঠা, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, কারাবরণ, ঐতিহাসিক ২১ দফা, ছয়দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চের ভাষণ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে "রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কৃতিত্ব" আলোচনায় তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড, মামলার রায় ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী" বিষয়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা" বিষয়ে আলোচনায় বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা, জনসংখ্যা, শিক্ষা, নামকরণ, স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তার, আরবের ভৌগলিক বিবরণ, কিংবদন্তী ভিত্তিক প্রমাণ, ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি" বিষয়ে। এখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামের প্রভাব, স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "ইসলামে মাতৃভূমি, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা" বিষয়ে।

অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধু গৃহীত পদক্ষেপসমূহ" শিরোনামে। এ অধ্যায়ে ইসলাম প্রচার-প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন করা, তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য জমি প্রদান, পবিত্র হজ্জব্রত পালনের সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা, বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার, ও.আই.সি'র অন্তর্ভুক্তি, জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) পালন, মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান, রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা, আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ, মুসলিম বিশ্বে মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান" বিষয়ে। এখানে ইসলাম, সাম্প্রদায়িকতা ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি, বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী আদর্শ ও মানবতার বিকাশ, ইসলামি মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, ইসলাম বিষয়ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান, বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা ও ভাষণে ইসলামি ভাবধারা, আইন প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর ইসলামি চেতনার বিকাশ ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে- "ধর্মনিরপেক্ষতা, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি" নামে। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচিতি ও মূল্যায়ন, বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চেতনা, সাম্প্রদায়িকতা নয়, মানবতাই মূলশক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে উপসংহারসহ দু'টি পরিশিষ্ট ও সহায়ক গ্রন্থবলীর একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

মূলত: বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন প্রকৃত মুসলিম। তাই তিনি প্রকৃত ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আমৃত্যু চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, স্বাধীনতা যুদ্ধ, এ সময়কালে পাকিস্তানী বাহিনী ও এদেশীয় দোষরদের খুন, ধর্ষণসহ অমানবিক কার্যক্রম অতঃপর ৩০ লক্ষ জীবনের এবং ৩ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। এরপর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ অবদান এ অভিসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়; বরং ধর্মের প্রকৃত অনুসরণ -এ কথাই বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

আমার এ অভিসন্দর্ভে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ধর্মান্ধরা যে অভিযোগ করে তার অসারতা খুঁজে পাওয়া যাবে। খুঁজে পাওয়া যাবে ইসলামের মূল্যবোধে উজ্জিবীত প্রকৃত ইসলামে বিশ্বাসী এক মর্দে মুমিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণা কর্ম জ্ঞানের জগতে এক মূল্যবান সংযোজন হবে। এর দ্বারা জ্ঞানী-গুণী পাঠক যথার্থ অর্থে উপকৃত হবেন। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার ইতিহাসে একটি নতুন ধ্রুব তারার উদয় হবে, যার আলোকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বহুবিধ গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত হবে। অনুপ্রাণিত হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের গবেষকগণ।

আল্লাহ্ আমাকে ও সবাইকে এ অভিসন্দর্ভটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন!

মোঃ আশিকুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনধারা

প্রাককথা

বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইতিহাসে এই জাতি প্রায় ৫ হাজার বছরের ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে গড়ে উঠেছে। শত শত নদ-নদীবেষ্টিত ছিল বাংলাদেশ এবং এখানে বাস করত বিভিন্ন গোত্র বা জাতিগোষ্ঠী। এ জনপদের মানুষের মানস গঠনে এখানকার প্রকৃতি গভীর প্রভাব ফেলেছে। আবহমান বাংলার প্রকৃতি মনোরম ও উদার; কখনও আবার প্রলয়ঙ্করী। গঙ্গা, যমুনা, মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গে মানুষকে সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়েছে।[১]

আমরা ভৌগোলিক, ভাষা ও সাংস্কৃতিক যে জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বলে জানি তা মধ্যযুগের। প্রাচীনকালে বাংলা কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল। বসতি তেমন একটা ছিল না। উর্বর ভূমির কারণে এখানকার বাসিন্দারা কৃষি কাজ করত। জীবিকার জন্য তেমন পরিশ্রম করতে হত না। কারণ, মাছ-ভাত ছিল সহজলভ্য। ফলে এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ভোগলিপ্তা ও কর্মবিমুখতা পেয়ে বসে। তাদের চরিত্রে ইতিবাচক-নেতিবাচক দু ধরারাই সমান বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শত শত বছর ধরে বিদেশী শাসনের ফলে বাঙালিদের স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ মেলেনি। তারা ছিল বঞ্চিত ও দরিদ্র। শাসকদলের লাঠিয়াল বাহিনী ও অনুচর হিসেবে অনেককে কাজ করতে হয়েছে। উন্নত জীবন পরিহার করে তারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করত। উদ্যমহীনতা ও নির্ভরশীলতা তাদের পরিচয়ের আরেকটি দিক।[২]

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শতাব্দির পর শতাব্দিব্যাপী অসংখ্য পরিবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের বাঙালি জাতি সৃষ্টি হয়েছে। নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ও ভাষা বিশ্লেষণ করলে বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

নব্য-প্রস্তর যুগে বাংলাদেশে জনবসতির যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, আদিম অধিবাসীরা বন্য অবস্থা বা শিকারী জীবন ছেড়ে কৃষিজীবন শুরু করে। কৃষিজীবনের আগে এদেশের আদিম অধিবাসী ছিল নিগ্রোপ্রতিম নামে এক জাতি এবং তারা অস্ট্রিকদের সাথে বিলীন হয়ে গেছে।[৩] নৃ-তত্ত্ববিদদের মতে, নিগ্রোদের পর বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতি বা অস্ট্রিকরা।[৪] তারা অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ। প্রাগৈতিহাসিককালে তারা ইন্দোচীন হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। নিষাদ জাতি তাদের একটি শাখা। কোল, ভীল, সাঁওতাল, ভেড্ডিড প্রভৃতি অস্ট্রিকদের বংশধর। তারা অস্ট্রিক ভাষায় কথা বলত। অস্ট্রিকরা কৃষি

---

১. নীহার রঞ্জন রায়, *বাংঙ্গালীর ইতিহাস*, কলিকাতা : মুক্তধারা, ১৯৪৭, পৃ. ২৫

২. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বাংলাদেশ গড়লো যারা*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ. ১০

৩. গোলাম হুসাইন সলীম (অনু. আকবর উদ্দীন), *বাঙলাদেশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪, পৃ. ৩৮

৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কাজ জানত। তারাই এদেশে কৃষি কাজের প্রচলন করে। অস্ট্রিকরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে এদেশে আগমন করে।[৫]

তাদের পর মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড়গণ বাংলাদেশে আসে। অস্ট্রিক ও মোঙ্গলীয়দের পরে বাংলাদেশে আলপাইন জনগোষ্ঠী পামির মালভূমি অঞ্চল থেকে এখানে আগমন করে। তাদের সাথে অস্ট্রিক-মোঙ্গলীয়দের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে।[৬] আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে দ্রাবিড় জাতির একটি অংশ বঙ্গে আশ্রয় নেয়। তাদের সাথে অস্ট্রিক ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্যরা বঙ্গে আগমন করে।[৭] প্রাচীনকাল থেকে ধীরে ধীরে আর্যরা বাঙালি সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ করে। ফলে এক সমন্বিত জনপদ, ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তার রক্তে অস্ট্রিক, মোঙ্গলীয়, দ্রাবিড়, আর্য, তুর্কী, পাঠান, মোগল, ইরানী বিচিত্র রক্ত স্রোতধারার মত মিলিত হল। এ সমন্বিত জনগোষ্ঠীর নাম বাঙালি। আর্যদের বেদ, ব্রাহ্মণদের ধর্ম ও পূর্বতন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান মিলেমিশে এক নতুন ব্রাহ্মণ ধর্ম সৃষ্টি হল।[৮] আর্য জাতির পরে তুর্কী, আফগানী, ইরানী, ইরাকী ও আরবীয় মুসলমানদের প্রভাব বাঙালিদের ওপর দীর্ঘ সাত'শ বছর ধরে বয়ে যায়। মিশ্রণের ধারা এখনও প্রবহমান।

জনগোষ্ঠী বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া যায় বাংলা ভাষা বিশ্লেষণ করলে তার সমর্থন মেলে। বাঙালিদের জীবনে অস্ট্রিকদের প্রভাব বেশি। কৃষিকাজ মূলত অস্ট্রিকদের অবদান। ধান, চাল, কুড়ি, গম প্রভৃতি অস্ট্রিক শব্দ। অস্ট্রিকদের পরে আর্যদের প্রভাব বেশি। তাদের সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনধারার নিদর্শন বাংলা ভাষা ও জাতীয় জীবনে প্রবহমান।[৯] তেরো শতকে মুসলমানদের আগমনের ফলে বাঙালি জীবনে এক বিপ্লব দেখা দেয়। অধিকাংশ বাঙালি ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা সেদিন ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নিপীড়িত। তাই নতুন ধর্ম ও নতুন শাসককে তারা সাদরে গ্রহণ করে। বাঙালি সমাজ জীবনে ইসলামের প্রভাব সর্বত্র। মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান বাঙালিদের এক উন্নত জীবনের সন্ধান দেয়।[১০] ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারায় হিন্দু ও মুসলমানদের দ্বন্দ্ব ও মিলনে বাঙালি সমাজ বিস্তৃতি লাভ করে।

প্রাচীনকাল থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুম্মা, তাম্রলিপ্ত, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল।[১১] এ জনপদগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও পৃথক ছিল। বিভিন্ন

---

৫. বিস্তারিত দ্র: সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০, পৃ. ২১-২৩

৬. কে. এম রাইছ উদ্দীন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৭

৭. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) প্রাচীন যুগ*, কলিকাতা : জেনারেল, ১৯৮১, পৃ. ১৯

৮. কে. এম রাইছ উদ্দীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৯. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

১০. এ.এফ.এম আব্দুল জলিল, *পাঁচ হাজার বছরের বাঙালা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭, পৃ. ১৩

১১. ড. নগেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী, *বঙ্গভাষা ও বঙ্গবাহিত্য ক্রমবিকাশ (প্রথম খণ্ড)* কলিকাতা : বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ১৩৪৪ বাং, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা ছিল। তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন শিথিল ছিল।[১২] এক জনপদের সাথে অন্য জনপদের যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথে ছিল ভাষার অন্তরায়। যেহেতু তাদের কোন একক ভাষা ছিল না। ভাষা হল সামাজিক বন্ধন। ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের বিনিময় চলতে থাকে এবং সপ্তম শতকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়।[১৩] বাংলা ভাষা সৃষ্টিতে বাঙ্গাল জাতি উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং মনে হয় তাদের ভাষার সাথে অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষা মিলে যায়। এ মিশ্রিত ভাষায় বাঙ্গালদের ভাষার প্রাধান্য ছিল। তাই ভাষার নাম হয় বাংলা ভাষা।[১৪]

বর্তমান বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার গোড়াপত্তন পাল আমলে হয়েছে। এ যুগে প্রথম বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ ও সমন্বয় ঘটেছে। পালরাজাদের রাজধানী ছিল গৌড় এবং উত্তর ভারত নিয়ে তাদের ব্যস্ত থাকতে হত। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের দিকে তারা দৃষ্টি দিতে পারেননি। পাল বংশের পরে সেনবংশ ১০৯৮ সাল থেকে ১২০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজত্ব করে। তাদের সময় বাংলাদেশ রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, বাগড়ি ও নাব্য মণ্ডল-এ ৫টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল।[১৫] সেনদের রাজভাষা ছিল সংস্কৃত। সেনদের আমলে বাঙালিদের ওপর সংস্কৃত ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে। এ সময় বাংলা ভাষার চর্চা ব্যাহত হয়। বাংলা ছিল বঙ্গ জাতির ভাষা। বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষা বাংলা পরিত্যাগ করে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করেনি।

প্রাচীনকালের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, হাজার বছরের আবর্তন-বিবর্তনে আদিম কৌম বা গোত্র চেতনা পরিত্যাগ করে বাঙালি জাতি গঠনের সংগ্রাম চলে আসছে। আরো দেখা যায় সমাজ একান্তভাবে ভাগ্যনির্ভর, ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন, সমাজ দেহে বীরপুরুষের অভাব, বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তির অভাব।[১৬]

পলাশী যুদ্ধের পর বাঙালি জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সমাজ ছিল পশ্চাৎমুখী। পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে প্রবেশ করেনি। এ সময় রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার করে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন।[১৭] রাজা রামমোহন রায়, উইলিয়াম কেরি, মাশম্যান প্রমুখ বাংলায় অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রসার লাভ করে।[১৮] ইউরোপে ১৫ শতকে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হলে বাংলায় ১৮ শতকের শেষভাগে

---

১২. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ১৫

১৩. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

১৪. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০, পৃ. ২৪

১৫. মিনহাজ-ই-সিরাজ (অনু আ.কা.মা জাকারিয়া), *তাবকাত-ই-নাছিবি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩, পৃ. ২১

১৬. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

১৭. *Social Welfare in India*, 'Planning Commission of India Govt. of India', New Delhi : 1988, P. 4

১৮. Sankar Ghose, '*The Renaissance of Militant Nationalism in India.*' Calcutta : Allied Publishers, 1969, P. 16

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হয়। মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের ফলে কলকাতাকে কেন্দ্র করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে রেনেসাঁ বা জাগরণ সৃষ্টি হয়। এ জাগরণ থেকে বাংলার মুসলমান ও নমশূদ্র সমাজ দূরে ছিল। মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের সামাজিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ, স্যার আমির আলী এগিয়ে আসেন।[১৯] হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল। তাই তারা চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যেও পিছিয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িতকা সৃষ্টি হতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে সুবিধাবাদী শ্রেণী তাদের সামাজিক অধঃপতনের জন্য ইংরেজ ও হিন্দুদের দায়ি করতে থাকে। কিন্তু তাদের সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কোন শক্তিশালী নেতৃত্ব ছিল না।

বাংলাদেশে বাস করেও তারা ছিল বিদেশী। বাংলাকে তারা নিজেদের ভাষা হিসেবে না দেখে আরবি-ফারসি-উর্দুর প্রতি তাদের অস্বাভাবিক প্রীতি ছিল। পশ্চাৎমুখী নেতৃত্বের জন্য তারা পিছিয়ে পড়ে। ১৮৮৫ সালে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গ, আসাম এবং পশ্চিম বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের সৃষ্টি করে।[২০] ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। সশস্ত্র অনুশীলন ও যুগান্তর দল গঠিত হয়। বাংলার দামাল ছেলেরা সশস্ত্র যুদ্ধ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এগিয়ে আসে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, সূর্যসেন প্রমুখ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। শত শত বিপ্লবী ইংরেজ সরকারের নিপীড়নের শিকার হয়। বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাদের অবদান চিরস্মরণীয়।[২১]

মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইনসভায় পৃথক নির্বাচনপ্রথা চালু হয়। ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলন এবং ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের কর্মসূচির মধ্যে কৃষক-শ্রমিকদের দাবি ছিল উপেক্ষিত। আবুল কাশেম ফজলুল হক নিপীড়িত কৃষক সমাজের মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালে প্রজা আন্দোলন শুরু করেন।[২২] তাঁর আহ্বানে বাংলার কৃষক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৪০ সালে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন। পরে মুসলিম লীগ তাঁর প্রস্তাবকে পরিবর্তন করে পাকিস্তান দাবি করে। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস মহাত্মা

---

১৯. Gover B.L and Grover S.A, *New look at Modern India History*, New Delhi : S. Chand and Co. Ltd., 1993, P. 367

২০. আতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, খ.২, কলিকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃ. ৩৭৩

২১. অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব*, ঢাকা : বই বিতান, ১৯৮৫, পৃ. ১০৮

২২. মিজানুর রহমান শেলী (সম্পা), *ছোটদের ফজলুল হক*, ঢাকা : সাহিত্য মালা, ১৯৮৪, পৃ. ২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি দেখলেন মুসলিম লীগের পাকিস্তান এবং কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের অধীনে বাংলার ভবিষ্যত রক্ষিত হবে না। তাই তিনি স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার দাবি করেন।[২৩] ইংরেজ সরকার স্বাধীন বাংলার দাবি উপেক্ষা করে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই বাঙালিদের ওপর নিপীড়ন শুরু হল। প্রথমে বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ আসে। বাঙালিরা শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের ২১ দফা আন্দোলন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরিশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের বাঙালি জাতি সশস্ত্র যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

বঙ্গবন্ধুর পূর্ব পুরুষ

বৃহত্তর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশ বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক পরিবার। শেখবংশ ইসলাম প্রচার, সমাজ উন্নয়ন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের শেখ পরিবারের গর্বিত সন্তান।

প্রায় চার শ' বছর পূর্বে ইসলাম প্রচারের জন্য শেখবংশের আদিপুরুষ শেখ আউয়াল ইরাক থেকে চট্টগ্রাম আসেন। সম্ভবত তিনি হযরত বায়িজিদ বোস্তামীর শিষ্যদের সাথে চট্টগ্রাম এসেছিলেন।[২৪] শেখ আউয়াল ইরাকের রাজধানী বাগদাদের হাসনাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[২৫] শেখ আউয়াল চট্টগ্রামে কয়েক বছর ধর্ম প্রচারের পর সোনারগাও -এ আগমন করেন এবং স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করে সোনারগাঁওয়ে বসতি স্থাপন করেন। শেখ আউয়ালের পুত্র শেখ জহিরুদ্দিন ধর্ম প্রচারের সাথে জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা শুরু করেন। তিনি কলকাতায় ব্যবসা করতেন। ব্যবসা উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল।[২৬]

শেখ জহিরুদ্দিন ফরিদপুরের কান্দিরপাড়ের খন্দকার পরিবারে বিয়ে করেন। তিনি কান্দিরপাড়ে কিছুদিন বসবাস করলেও ব্যবসার কারণে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। শেখ জহিরুদ্দিনের পুত্র জান মাহমুদ ওরফে তেকড়ি ব্যবসা উপলক্ষে পূর্ববাংলায়

---

২৩. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০, পৃ. ২৮

২৪. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০১২, পৃ. ৩৬-৩৯

২৫. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

২৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আসেন এবং পাটগাতিতে ব্যবসা করতেন। তিনি টুঙ্গিপাড়ার বাইগার নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। তেকড়ির পুত্র শেখ বোরহানউদ্দিন টুঙ্গিপাড়ার কাজী পরিবারে বিয়ে করেন। এই শেখ পরিবার কলকাতা থেকে রাজমিস্ত্রী, ইট, সুরকি এনে ১৮৫৪ সালে টুঙ্গিপাড়ায় পাকা ভবন নির্মাণ করে।[২৭] বাড়িতে কয়েকটি পাকা ভবন ছিল। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী দু'টো পাকা ভবনসহ অনেক ঘর ধ্বংস করে ফেলে।

শেখ বোরহানউদ্দিনের শেখ আকরাম, শেখ তাজ মাহমুদ, শেখ কুদরত উল্লাহ ওরফে কদু শেখ নামে ৩ পুত্র ছিল। শেখ কুদরত উল্লাহর তিন পুত্র শেখ আবদুল মজিদ, শেখ আবদুল হামিদ ও শেখ আবদুর রশীদ। শেখ আবদুল হামিদের পুত্র শেখ লুৎফর রহমান। শেখ লুৎফর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পিতা। শেখ লুৎফর রহমানের ৪ বোন ছিল। তাঁদের ফরিদপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে হয়। শেখ লুৎফর রহমান ম্যাট্রিক পাস করে মুন্সেফ কোর্টে সেরেস্তাদারের চাকরি গ্রহণ করেন।[২৮]

জন্ম ও শৈশবকাল

শেখ আবদুল মজিদের কন্যা সায়েরা খাতুনকে বিয়ে করেন তার চাচাতো ভাই শেখ লুৎফর রহমান। শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের চার কন্যা ফাতেমা বেগম, আছিয়া বেগম, আমেনা বেগম হেলেন, খোদেজা বেগম লিলি এবং দু'পুত্র শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ নাসের। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বাংলা ১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র মঙ্গলবার রাত ৮ ঘটিকায় টুঙ্গিপাড়ার শেখ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।[২৯] পিতা-মাতা তাঁকে আদর করে খোকন বলে ডাকতেন। নানা শেখ আব্দুল মজিদ খোকনের নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিপছিপে, শ্যামলা, সুশ্রী ও লম্বা ছিলেন। পিতা-মাতা ছিলেন আদর্শবান ও ধার্মিক। তাঁরা খোকনকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের বাল্যকাল টুঙ্গিপাড়া গ্রামেই কাটে। টুঙ্গিপাড়া প্রথমে কোটালীপাড়া ও পরে গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছিল। স্বাধীনতার পর টুঙ্গিপাড়াকে পৃথক থানা ঘোষণা করা হয়। টুঙ্গিপাড়া গ্রামেই শেখ মুজিবুর রহমান শৈশবে রূপসী বাংলাকে দেখেছেন। তিনি আবহমান বাংলার আলো-বাতাসে লালিত ও বর্ধিত হয়েছেন। তিনি শাশ্বত গ্রামীণ সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ছেলেবেলা থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রামের মাটি আর মানুষ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। শৈশব থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনে তিনি জমিদার, তালুকদার ও মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ ও প্রজা পীড়ন দেখেছেন। শিশুকালে তিনি চঞ্চল ও অন্যায়ের প্রতি আপোষহীন ছিলেন। সমাজ ও পরিবেশ তাঁকে বাল্যকাল থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। তাই পরবর্তী জীবনে তিনি কোন শক্তির কাছে, সে যত বড়ই হোক আত্মসমর্পণ করেননি।[৩০]

---

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

২৯. শেখ হাসিনা, (সম্পা. পার্থ ঘোষ), *শেখ মুজিব আমার পিতা*, কলকাতা : সাহিত্যম, ১৯৯৯, পৃ. ২৮

৩০. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবুর রহমান পিতা-মাতার প্রথম পুত্র। তাই পরিবারে তাঁর আদর ছিল বেশি। তিনি ছিলেন স্বল্পভোজী, নিরামিষভোজী। বেতাগা, ডুমুর, কাঁচা কলা ও মাছ ভালবাসতেন। কৈ, শিং, চিংড়ি ছিল তাঁর প্রিয় মাছ। খাওয়া-দাওয়ার চাইতে খেলা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন বেশি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার শৈশবকাল সম্পর্কে বলেছেন-

> বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। সে গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। বাইগার নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতি নদীতে। এই মধুমতি নদীর অসংখ্য শাখা নদীর একটি নদী বাইগার। দু'পাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালী গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে, পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে।
>
> প্রায় দু'শ বছর পূর্বে মধুমতি নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনসবতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চরে জেগে ওঠে আরও অনেক গ্রাম। সেই দু'শ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এসে এই নদী বিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। তারা অনাবাদী জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এই গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াতব্যবস্থা প্রথমে শুধু নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টীমার ঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রী এনে দালান বাড়ি তৈরি করেন। যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোই জালিয়ে দেয়। এই দালানকোঠায় বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে আর আশেপাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার আব্বার নানা শেখ আবদুল মজিদ আমার আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্রসন্তান আমার আব্বা; আর তাই আমার দাদির বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, "মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে জগৎ জোড়া খ্যাতি হবে।"
>
> আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে। মাছরাঙা কিভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে। কোথায় দোয়েল পাখির বাসা। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে করে মাঠেঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তাঁর ভাল লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথা মতো যা বলতেন তাই করত। আবার এগুলো দেখাশোনার ভার দিতেন ছোট বোন হেলেনের ওপর। এই পোষা পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এ জন্য ছোট বোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে খাল মধুমতি ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড় কাছারি ঘর। আর এই কাছারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের থাকার ঘর

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের কাছে আমার আব্বা আরবী, বাংলা, ইংরেজি ও অংক শিখতেন।

আমাদের পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূর। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকায় করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। আর একরত্তি ছেলে চোখের মণি, গোটাবংশের আদরের দুলাল, তার এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট! সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোর বেলা কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদি সব সময়েই ব্যস্ত থাকতেন কিভাবে তাঁর খোকার শরীর ভাল করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন গ্রামবাসীদের কাছে ছিলেন 'মিয়া ভাই' বলে পরিচিত। গ্রামের সহজ সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন শরীর সুস্থ করে তুলতে। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সব সময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্টবেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদির আফসোসেরও সীমা ছিল না যে কেন তার খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুশ-নুদুশ হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সব্জিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ, ভাত, কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুপু ও এক চাচা ছিলেন। এই চার বোনের মধ্যে দুই বোন বড় ছিলেন। ছোট্ট ভাইটির যাতে কোন কষ্ট না হয় এজন্য সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড় দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট, কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদার বা দাদির বোনদের ছেলেমেয়ে, বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃহারা তাদেরকে দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতেরো/আঠারো জন ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে বড় হয়ে ওঠে।[৩১]

শিক্ষা জীবন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাজীবন বাড়িতেই শুরু হয়। তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত সাখাওয়াতুল্লাহ। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়ার গিমাডাঙ্গা ও টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। গিমাডাঙ্গা বিদ্যালয়ে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন।[৩২] গোপালগঞ্জে তাঁর বাসভবন ছিল। ১৯২৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ সীতানাথ একাডেমীতে ভর্তি হন। শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ হতে মাদারীপুর দেওয়ানী আদালতে বদলী হন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে মাদানীপুর নিয়ে যান এবং ১৯৩৪ সালে মাদারীপুর ইসলামিয়া হাই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। মাদারীপুরে থাকাকালে শেখ মুজিবুর রহমান বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন এবং চোখে ছানি

৩১. শেখ হাসিনা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-৩৮

৩২. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। চোখের অসুখের জন্য তিন বছর তাঁকে পড়া বন্ধ রাখতে হয়। ১৯৩৫ সালে শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জে বদলি হন। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন।[৩৩] এ সময় তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন হামিদ মাস্টার। তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং অনেক বছর বন্দী ছিলেন। শেখ মুজিব হামিদ মাস্টারের নিকট বিপ্লবীদের কথা শুনেছেন; ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী শুনে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত হন।[৩৪] ১৯৩৭ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। স্কুলটি খৃস্টানদের দ্বারা পরিচালিত হত। জাতিভেদ প্রথার জন্য তখন মিশন স্কুলে ভর্তি ও সামনের বেঞ্চে বসা মুসলমান ছাত্রদের জন্য কঠিন ব্যাপার ছিল। শেখ মুজিব ছোটবেলা থেকে ভীষণ জেদী ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ছিলেন। তিনি জেদ করে মিশন স্কুলে ভর্তি হন ও সামনের বেঞ্চে বসেন। মাস্টার ছিলেন শ্রী গিরিশ বাবু। হেডমাস্টার তাঁকে খুব ভালবাসতেন। ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল ও ভলিবল। তিনি ছিলেন ডানপিটে। ভয় তার ছিল না। ছাত্ররা স্কুলে তাঁকে মুজিব ভাই বলে ডাকত। স্কুলে পড়া অবস্থায় তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে।[৩৫]

মিশন স্কুলে থাকাকালে তার জীবনে কয়েকটি ঘটনা ঘটে। যেমন- টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবার প্রভাবশালী, তাদের না জানিয়ে এখানকার কয়েক ব্যক্তি পাটগাতি বাজারে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। এলাকার তরুণদের নিয়ে সভাস্থলে যায়। শেখ পরিবারের নেতা ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট শেখ আব্দুর রশিদকে সমালোচনা করছে। শেখ মুজিব সোজা মঞ্চে উঠে বলেন- যে সভায় গুরুজনদের গালি দেয়া হয়, সে সভায় থাকা যায় না। তিনি দলকে সভা ত্যাগ করতে বলেন। সকলে হৈ চৈ করে সভা ত্যাগ করে। সভা ভেঙ্গে যায়। পরে শেখ পরিবারের উদ্যোগেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৬]

১৯৪০ সাল। শেখ মুজিবুর রহমান নবম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিলাস বাবু। স্কুলের মাঠে ছাত্রদের সভা হবে। তখন গোপালগঞ্জে রাজনৈতিক নেতা ছিলেন খন্দকার শামসুদ্দীন আহমদ এমএলএ ও তাঁর জামাতা অহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়া। অহিদুজ্জামানের পিতা আবদুল কাদের মোক্তার ছাত্রসভা হতে দেবেন না। তিনি এসডিও-কে দিয়ে সভা বন্ধ করান। ছাত্ররা মসজিদের কাছে সভা করে। শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন। এ সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতে কোর্ট থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন।[৩৭]

আর একবার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম গোপালগঞ্জে জনসভা করেন। তখন একটি গোলযোগের অভিযোগে আবদুল কাদের মোক্তারের বিরোধিতার

---

৩৩. *প্রাগুক্ত*

৩৪. *প্রাগুক্ত*

৩৫. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *ইসলাম প্রচার ও প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০, পৃ. ৭

৩৬. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১৪

৩৭. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *বঙ্গবন্ধু মেখ মুজিব*, ঢাকা : ভূমিকা, ২০১০, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

ফলে শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। কয়েক সপ্তাহ কারাগারে কাটিয়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন। স্কুল জীবনে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ওয়ান্ডারার্স ফুটবল টিমে খেলতেন। একজন খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর দলীয় ছবি আছে। তিনি গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি স্কুলে ছাত্র ও পাড়া-প্রতিবেশী ছেলেদের নিয়ে ব্রতচারী নাচ-গান করতেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো-

"ও আমার বাংলাদেশের মাটি
তোমায় রাখব পরিপাটি"[৩৮]

স্কুল জীবনে শেখ মুজিবুর রহমান একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠেন। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটিরও সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৯]

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৩৯ সালে অষ্টম ও ১৯৪০ সলে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। গোপালগঞ্জ শহরের রসরঞ্জন সেনগুপ্ত শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাইভেট শিক্ষক ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাড়ি গিয়ে পড়তেন। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ম্যাট্রিক পাস করেন। একদিকে বেশি বয়সে স্কুলে ভর্তি, অন্যদিকে বেরিবেরি রোগে ৩ বছর পড়া বন্ধ থাকায় তিনি ২২ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করেন।[৪০]

জীবনের উন্নতি ও সফলতার জন্য যেমন শিক্ষা প্রয়োজন তেমনি শারীরিক সুস্থ্যতা ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলা ধূলাও প্রয়োজন। একটি বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জন করতে গেলে বিফলতার সম্ভাবনাই বেশি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন শিক্ষা ও খেলা ধূলার ব্যাপক সমন্বয় সাধিত হয়ে ছিল। শেখ হাসিনার ভাষায়-

> আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতি নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন। আব্বা যখন খেলতেন তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। এখনও আমি যখন ঐ সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যারা আব্বার ছোটবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে এই খেলার ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।[৪১]

হৃদয়ের উদারতা ও বিশালতা ছিল- বঙ্গবন্ধুর অন্যতম প্রধান গুণ। সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় তিনি ছিলেন অসাধারণ। তিনি নজির পাওয়া যায় শেখ হাসিনার ভাষায়। তিনি বলেন, তিনি

---

৩৮. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৪০. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৪১. শেখ হাসিনা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গীর থেকে পড়াশোনা করতো। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসতো। আর সারা দিন অভুক্ত অবস্থায় অনেক দূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংকপাড়ায়, আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো। কারণ আর কিছুই নয়। কোন ছেলে গরীব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোধ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি নিজের পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।

দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো, তখন দাদি আমগাছের নিচে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে, রাস্তার ওপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তাঁর খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে পরনের পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। কি ব্যাপার? এক গরীব ছেলেকে তার শতছিন্ন কাপড় দেখে সব দিয়ে এসেছেন।

আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতে তখন কোনদিনই বকাঝকা করতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরও অনেক নজির রয়েছে।[৪২] তিনি আরও বলেন-

> "স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং বহুবছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসত, আমার দাদি মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। এমনিতে আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। ছেলের কোন কাজে কখনও তাঁরা বাধা দিতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার বাবার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ যখনই সেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন।
>
> আব্বার একজন স্কুল মাস্টার ছোট্ট একটা সংগঠন গড়ে তোলে এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল যোগাড় করে গরীব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। সেখানেই কোন অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি প্রথম সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও গ্রেফতার হয়ে কয়েক দিন জেলে থাকেন।"[৪৩]

গরীব-দুঃখী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন সহমর্মী, সমব্যথী ও সহানুভূতিশীল ছিলেন- তেমনি অধিকার সচেতনতা তাকে জীবনের উচ্চতায় নিয়ে যায়। শেখ

---

৪২. শেখ হাসিনা, *প্রাগুক্ত*

৪৩. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

হাসিনা বলেন, "কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জ সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুলে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করবার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।"[৪৪]

২২ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করার পর বঙ্গবন্ধু ষোলমাত্রার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে তিনি বিএ পাশ করেন। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। বিভিন্ন আন্দোলনে সংযুক্ত হওয়ার কারণে তাকে কারাবরণ করতে হয়। এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।

১৯৪৭ সালে তিনি বিএ পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হবার সময় যখন দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেজো ফুপু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুপুর কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে হয়তো দু'দিন বা তিন দিন কিছু না খেয়ে কাজ করে গেছেন। মাঝে মাঝে যখন ফুপুর খোঁজ-খবর নিতে যেতেন তখন ফুপু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোন দিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনও পিছপা হননি।

পাকিস্তান হবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েকদিন পর মুক্তি পান। এই সময় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার কথা ঘোষণা দেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুবই ছোট্ট আর আমার ছোট ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি।

একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দী ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনও দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি, "আব্বা আব্বা বলে" ।[৪৫]

---

৪৪. শেখ হাসিনা, *প্রাগুক্ত*

৪৫. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার নিকট আত্মীয় বেগম ফজিলাতুন্নেছা কে বিয়ে করেন যখন তার বয়স সবে মাত্র দশ বছর আর তার স্ত্রীর বয়স তিন বছর। এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা বলেছেন-

আব্বার যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তার দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন/চার বছরের বড়। আত্মীয়ের মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে (গার্জিয়ান) মুরুব্বী করে দেন। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একই সঙ্গে তাঁর ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মানুষ হন।[৪৬]

ফজিলাতুন্নেসাকে পরিবারের সবাই আদর করে 'রেণু' বলে ডাকত। বঙ্গবন্ধুর শ্বশুর শেখ জহুরুল হক যশোর কো-অপারেটিভ বিভাগে অডিটরের চাকরি করতেন। সাত বছর বয়সে শিশু ফজিলাতুন্নেসা মা-বাবাকে অকালে হারিয়ে এতিম হন। তখন থেকেই শেখ মুজিবের মা সায়েরা বেগম শিশু ফজিলাতুন্নেসাকে লালন-পালন করতে থাকেন।

১৯৩৮ সালে শেখ মুজিবের আঠার বছর বয়সে বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। তাঁর আমৃত্যু সাথী স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসার বয়স তখন খুবই কম ছিল, তখনকার দিনে এ ধরণের বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল, যা অপ্রত্যাশিত তেমন কিছু নয়।

শেখ ফজিলাতুন্নেসারা শুধু দু'বোন ছিলেন। তার বড়বোন জিন্নাতুন্নেসারও পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয় শেখ মুহাম্মদ মুসার সাথে। তখন শেখ মুসার বয়স তের বছর। জিন্নাতুন্নেসার ছেলে শেখ শহীদুল ইসলাম ছাত্রলীগ নেতা ও এরশাদ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। শেখ মুজিবের বড় বোন ফাতেমা বেগমের বিয়ে হয় দত্তপাড়ার নুরুদ্দীন চৌধুরীর সাথে। নুরুদ্দীন চৌধুরীর ছেলে ইলিয়াছ চৌধুরী সাংসদ ও সাংবাদিক ছিলেন। তিনি খালাতো বোন শেখ ফজলুল হক মনি ও শেখ সেলিমের বোনকে বিয়ে করেন। ইলিয়াছ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তার ছেলে নূর-ই-আলম চৌধুরী বাবার নির্বাচনী এলাকা থেকে কয়েকবার সাংসদ নির্বাচিত হন। বর্তমান ২০০৯ সালের সংসদের তিনি সদস্য। শেখ মুজিবের মেজ বোনের বিয়ে হয তাদেরই পরিবারের শেখ নুরুল হকের সাথে। শেখ নুরুল হকের তিন ছেলে শেখ ফজলুল হক মনি, শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও শেখ মারুফ। শেখ ফজলুল হক মনি আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা, যুদ্ধকালীন মুজিব বাহিনীর অন্যতম প্রধান সংগঠক ষাটের দশকের তুখোড় ছাত্রনেতা এবং পরবর্তীতে সাংবাদিকও ছিলেন। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে নরপিশাচরা তাঁকে এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণিসহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঢাকা থেকে বর্তমান সংসদ ২০০৯ এর নির্বাচিত ব্যরিস্টার ফজলে নুর তাপস তাঁরই ছেলে। শেখ ফজলুল করিম সেলিম বিগত আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভার মন্ত্রি ও

৪৬ . সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে সংসদ সদস্য। তাঁদের ভগ্নিপতি প্রয়াত নাজিউর রহমান মঞ্জু (প্রাক্তন মন্ত্রী ও মেয়র)-এর ছেলে ভাগিনা আন্দালিব রহমান পার্থও ভোলা থেকে নির্বাচিত বর্তমান সংসদ সদস্য।

শেখ মুজিবের ছোট বোন আমেনা বেগমের বিয়ে হয় তৎকালীন ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানীর বিশ্বস্থ সহচর বরিশালবাসী এডভোকেট আব্দুর রব সেরনিয়াবতের সঙ্গে। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট তাঁকে পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্যসহ নরপিশাচরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। তিনি পরবর্তী জীবনে আওয়ামী লীগের সাংসদ ও বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তার ছেলে আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ ১৯৯৬ সালে পার্লামেন্টে চি হুইফ ছিলেন। শেখ ফজলুল হক মণির স্ত্রী আরজু মনি সেরনিয়াবতের কন্যা ছিলেন। সাংসদ ব্যরিস্টার ফজলে নুর তাপস তাঁর নাতি। শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে ছোট বোন খদিজা বেগম লিপির বিয়ে হয় কাশিয়ানা থানার পারুলিয়া গ্রামের সহুদ হোসেনের সাথে। তিনি সরকারি আমলা ছিলেন। বাংলাদেশে সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধর দ্বিতীয় ছেলে শেখ জামালের সাথে তাঁর কন্যা রোজির বিয়ে হয়। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সাথে তার কন্যাও নিহত হন।

শেখ মুজিবের ছোট ভাই শেখ আবু নাসের বাল্যকালে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে এক পা খোঁড়া হয়ে যান। তিনি খুলনায় ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন। ঢাকায় বেড়াতে এসে বঙ্গবন্ধুর বাসায় অবস্থানকালীন সময়ে ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট নির্মমভাবে নিহত হন। তার ছেলে শেখ হেলাল বাগেরহাট থেকে পূর্বে এবং বর্তমানে সাংসদ নির্বাচিত হন।

বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম কন্যাসন্তান শেখ হাসিনা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাস করেন। ১৯৬৭ সালে রংপুরের পীরগঞ্জের পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে তার বিয়ে হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়া বর্তমানে প্রয়াত। শেখ হাসিনা বাংলাদেশ পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় নেত্রী ছাড়াও দু'বার (১৯৯৬, ২০০৯) বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। বাঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের তৎকালীন সেরা অ্যথলেট সুলতানাকে বিয়ে করেন। বঙ্গবন্ধুর মেজ ছেলে শেখ জামাল লন্ডনের সেন্টহাস্ট রাজকীয় সামরিক কলেজ থেকে পাস করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি ফুফাতো বোন রোজী হোসেনকে বিয়ে করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তারা দু'ভাই মুক্তিবাহিনীতে ছিলেন। শেখ কামাল মক্তিযুদ্ধের সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর পি.এস ছিলেন। ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু ধানমণ্ডির বাসভবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে নির্মমভাবে নিহত হন। নরপিশাচ হায়েনার দল বঙ্গবন্ধুর ছোট্ট ছেলে শিশু রাসেলকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। বেগম ফজিলাতুন্নেচা মুজিব, গৃহবধু সুলতানা কামাল ও রোজী জামালও এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পাননি। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এ সময়ে দেশের বাইরে, জার্মানিতে ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে থাকায় এ নৃশংস হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যান।[৪৭]

৪৭. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনধারা

ছাত্র রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪২ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাংলার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামিয়া কলেজ ছিল মুসলিম রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্র। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের উপমহাদেশের রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ভারতীয় নেতাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন। নেতাজীকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে অনুসরণ করতেন।[১]

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের বিকাশ পর্বের সূচনা হয় ১৯৪২ সালে মুসলিম লীগের আন্দোলনের সময়। আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক ১৯৪২ সালে মুসলিম লীগের বিরোধিতা ও অপপ্রচারের ফলে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল মুসলিম লীগের খাজা নাযিমউদ্দিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এ মন্ত্রিসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইংরেজদের পোড়ামাটি নীতির ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং না খেয়ে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে।[২] ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষকালে তিনি কলকাতায় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা করেছেন। তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবের কাজ করার সুযোগ হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় টাঙ্গাইলের আরপি সাহার সাথে সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরপি সাহা ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং তা জনসেবায় ব্যয় করেন। শেখ মুজিব ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিপাড়ায় এসে জনগণের সেবা করেছেন।[৩] তিনি নিজের বাড়ির গোলার ধান ও চাল স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেন। তিনি ফুড কমিটি গঠন ও ধর্মগোলা করে ক্ষুধার্ত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

১৯৪৩ সালে শেখ মুজিব কলকাতায় বাংলার মানুষের অসহায় অবস্থা ও ইংরেজ শাসকদের নির্যাতন শাসন শোষণ দেখেছেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ বাঙালিদের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। শিল্পী জয়নুল আবেদিন ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাঙালি জাতি কত অসহায় তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বৃটিশ শাসনামলে।

---

১. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০, পৃ. ৪৪

২. *প্রাগুক্ত*

৩. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেসের বৃটিশবিরোধী আন্দোলন ও নেতাজী সুভাষ বসুর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শেখ মুজিবকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। তিনি গান্ধীর নিকট শিখেছেন অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন এবং সুভাষ বসুর নিকট থেকে প্রয়োজন হলে সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র অবস্থায় মুসলিম লীগের এক যুবনেতা ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক। মুসলিম লীগের প্রধান কার্যালয় ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কলকাতার ৩ নম্বর ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেনের পূর্বের বাড়িতে। এ বাড়িতে শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে থেকে তিনি বাংলার নেতৃবৃন্দের সাথে একত্রে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করেন। বয়সে তরুণ হলেও তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ছিল সুদৃঢ় ও সময়োচিত।[৪]

১৯৪৫ সালে খাজা নাযিমউদ্দিনের মন্ত্রিসভার পতন হলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করে মুসলিম লীগ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একজন প্রতিভাবান সংগঠক ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি বাংলার গ্রামে-গঞ্জে শক্তিশালী করেন। কিন্তু এত করেও তিনি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি খুঁজছিলেন একজন সাহসী রাজনৈতিক যুব সংগঠক; তার প্রতিভা আছে, অথচ তাঁর সাথে কাজ করবে আমরণ। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অনেককে পরীক্ষা করেছেন। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী হয়ে ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডে বাস করতেন। এ বাড়িটি ছিল বাংলার রাজনীতির কেন্দ্র। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব করে যে, যারা মন্ত্রী আছেন তারা দলের কোন পদে থাকতে পারবেন না। মুসলিম লীগের নির্দেশে মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন। সম্পাদক পদে খাজা নাযিমউদ্দিন গ্রুপের প্রার্থী হলেন শ্রমিক নেতা ডাঃ এম.এ. মালেক। শেখ মুজিবসহ যুবকদের প্রার্থী ছিলেন আবুল হাশিম। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিমকে সমর্থন দেন। ১৯৪৩ সালের ৭ নভেম্বর আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। আবুল হাশিম মুসলিম লীগের বামপন্থী দলের নেতা ছিলেন।[৫] তিনি ইসলাম ও মার্কসবাদে সুপণ্ডিত ছিলেন। মওলানা সোবহান ছিলেন আবুল হাশিম ও মওলানা ভাসানীর ধর্মীয় গুরু।

১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হলে মুসলিম লীগ বামপন্থী ও ডানপন্থী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বামপন্থী দলের নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং ডানপন্থী দলের নেতৃত্ব দিতেন খাজা নাযিমউদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন ও ফজলুর রহমান।[৬] জমিদার

---

৪. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *ইসলাম প্রচার-প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০, পৃ. ৯

৫. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : ভূমিকা, ২০১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৬. বামপন্থী যুবনেতাদের মধ্যে ছিলেন বরিশালের নূরুদ্দিন আহমদ, সালেহ আহমদ, আবেদুর রহমান চৌধুরী, শমসের আলী, খুলনার সবুর খান, মুহাম্মদ ইকরামুল হক, শেখ আব্দুল আজিজ, যশোরের আব্দুল হাই, মোশাররফ খান, ঢাকার কামরুদ্দিন আহমদ, টাঙ্গাইলের শামসুল হক, রাজশাহীর আবুল হাসনাত মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, আতাউর রহমান, ফরিদপুরের শেখ মুজিবুর রহমান, বগুড়ায় বিএম ইলিয়াস, রংপুরের আবুল হোসেন, পাবনার মুহাম্মদ আব্দুর রফিক

Dhaka University Institutional Repository

ও অভিজাত পরিবারগুলো সোহরাওয়ার্দীকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন না। কারণ নেতারা অনেকেই ছিলেন খাজা নাযিমউদ্দিনের অনুগত। শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের সাথে মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের সুসংগঠিত করার সুযোগ পেল। ১৯৪৪ সালে বাংলার মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষের বেশি। সদস্য সংগ্রহে শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।[৭]

১৯৪৪-৪৫ সালে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে যুবকর্মীদের নিয়ে বাংলার ২৭ জেলায় কমিটি গঠন এবং মুসলিম লীগকে ঢাকার আহসান মঞ্জিল থেকে মুক্ত করে জনগণের সংগঠনে পরিণত করা হয়। ঢাকায় কামরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে খাজা পরিবারকে বাদ দিয়ে মুসলিম লীগ কমিটি গঠন করা হয়। ফরিদপুর নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ শুরু হয় ডানপন্থী দলে ছিলেন ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), আব্দুস সালাম, ওয়াহিদুজ্জামান ও তাঁর পিতা এবং অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের দল। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গোপালগঞ্জে হোসেন শহীদ সোহারওয়ার্দীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম সভায় উপস্থিত ছিলেন। উভয়দল লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মারমুখী হয়ে ওঠে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভাষণ দিয়ে বিদ্যমান দলের মধ্যে চলে যান এবং পরিস্থিতি আয়ত্বে আসে। শেখ মুজিবের দল জেলা ও মহকুমা কমিটিতে নির্বাচিত হয়। সভাশেষে সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবের বাসভবনে গমন করেন। ১৯৪৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।[৮]

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে টোকিও যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ ইংরেজদের হাতে বন্দী হয় এবং তাদের বিচার করা হয়। শেখ মুজিব সুভাষ বসুর পরাজয় ও মৃত্যুতে ব্যথিত হন। তিনি ছিলেন শেখ মুজিবের সংগ্রামী জীবনের প্রতীক। শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট শিখেছেন গণতন্ত্র ও রাজপথের রাজনীতি; এবং সশস্ত্র সংগ্রামের শিক্ষা গ্রহণ করলেন সুভাষ বসুর নিকট। গণতন্ত্র ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে শেখ মুজিব পরবর্তী রাজনীতি পরিচালিত করেন। পাকিস্তানের সামরিক সরকার যখন বাঙালিদের গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত্বশাসন অস্বীকার করলো তখন তিনি বেঁচেছিলেন। শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের।[৯]

ইংরেজ সরকার ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া। সেই মতে, ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হয়। যুবনেতাদের সমর্থনে

চৌধুরী, কলকাতার জহিরুদ্দিন, নোয়াখালীর মুহাম্মদ তোয়াহা, নাজমুল করিম, কুমিল্লার অলি আহাদ, চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, দিনাজপুরের মুহাম্মদ দবিরুল ইসলাম প্রমুখ। ডানপন্থী দলে ছিলেন- হামিদুর রহমান, চব্বিশ পরগণার আনোয়ারুল হক, নদীয়ার শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ। (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭)

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৯. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাওয়ার্দী পার্লামেন্টারি বোর্ডের সম্পাদক নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ যুব নেতৃবৃন্দ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তারা মুসলিম লীগকে জনগণের দলে উন্নীত করেন।[১০]

কলকাতা ৩ নম্বর ওয়েলেসলির প্রথম লেনে মুসলিম লীগ পার্টি হাউজ ছিল। মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম কর্মী ও ছাত্রদের ক্লাস নিতেন। এখানে শেখ মুজিব আবুল হাশিমের আলোচনা শুনতেন। আবুল হাশিম ছিলেন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু। আবুল হাশিমের রাজনীতি তাকে প্রভাবিত করেছে।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনকে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ওপর ভারতের মুসলমানদের গণভোট হিসাবে গ্রহণ করে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ছিল কংগ্রেসের সাথে খণ্ডযুদ্ধস্বরূপ। বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম আসন ১১৯টি। অধিকাংশ আসনে মুসলিম লীগ ও শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। মুসলিম লীগ নেতারা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলায় নির্বাচনী সফরে বের হন। খাজা নাযিমউদ্দিন ও তার অনেক নেতা নির্বাচনী প্রচার থেকে বিরত থাকেন। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম বাংলার মুসলমানদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। এ.কে. ফজলুল হকের দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। কারণ, মুসলমানদের অধিকাংশ ভোটার পাকিস্তানের পক্ষে। যুবনেতারা সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে প্রচার চালায়। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছাত্রদের নিয়ে সফর করেন। তিনি ফরিদপুর জেলার সকল মহকুমা ও থানায় নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালান। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনকালে বঙ্গবন্ধু বৃহত্তর ফরিদপুরের গ্রামের মানুষের নিকট 'মুজিব ভাই' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।[১১]

১৯৪৬ সালের ১৯ হতে ২২ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে এ.কে. ফজলুল হকের ব্যক্তিগত জয় হয়েছে। তিনি ৩টি আসনে জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু সারা বাংলায় তাঁর দল ১১৯ আসনের মধ্যে ৬টি আসন লাভ করে এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ১১৪ টি আসন লাভ করে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগ ১১৪, কংগ্রেস ৬৮, কৃষক প্রজা পার্টি-৪, ইউরোপীয় পার্টি ২৫ আসন লাভ করে। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লীতে জিন্নাহ সভাপতিত্বে ভারতে ৫৫০ জনের মধ্যে ৪৮০ জন আইনসভার মুসলমান সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর সাথে কলকাতা থেকে দিল্লীর সম্মেলনে যোগ দেন। সভায় জিন্নাহ-লিয়াকত আলী খান লাহোর প্রস্তাবের-States এর শেষের S বাদ দিয়ে State সংশোধন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমে সংশোধিত প্রস্তাব সম্মেলনে পেশ

---

১০. ১৯৪৫ সালের ১৫ থেকে ২০ নভেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রত্যেক জেলায় নির্বাচনী অফিস প্রতিষ্ঠা এবং একজন সম্পাদক নিয়োগ করেন। জেলাসমূহের নির্বাচন অফিসের সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান- ফরিদপুর, শামসুল হক- ময়মনসিংহ, কামরুদ্দিন আহমদ- ঢাকা, আব্দুল রহমান চৌধুরী- বরিশাল, শেখ আব্দুল আজিজ- খুলনা, ফজলুল কাদের চৌধুরী- চট্টগ্রাম। এভাবে ২৭ জেলায় প্রচার সম্পাদক নিয়োগ করা হয়। (কামরুদ্দিন আহমেদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৩৮২, পৃ. ৪৯-৫০)

১১. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনীর ফলে পূর্বাঞ্চলে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।[১২]

১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী ৭ জন মুসলিম, একজন তফসিলী প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পরে আরো ৩ জন হিন্দুমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।[১৩]

১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য কেবিনেট মিশন প্রেরণ করা হয়। কেবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন ভারত সচিব স্যার প্যাট্রিক লরেন্স, নৌবাহিনীর সচিব এ.বি. আলেকজান্দার এবং বৃটিশ বাণিজ্যমন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস। কেবিনেট মিশন স্বাধীন ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা ভারতের প্রদেশগুলোকে ৩ ভাগে A, B, C গ্রুপে বিভক্ত করার প্রস্তাব করে A- পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান; B- বাংলা ও আসাম এবং ভারতের অবশিষ্ট প্রদেশগুলো নিয়ে C- গ্রুপ গঠন করা হয়। ভারতের অধীনে তিনটি বিভাগ স্বায়ত্বশাসন পাবে। ১৫ মে কেবিনেট মিশন তাদের প্রস্তাব পেশ করে। মুসলিম লীগ এ প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং কংগ্রেস বিরোধিতা করে। পরে পুনরায় কংগ্রেস গ্রহণ করলে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। জওহর লাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। পরে ১৯৪৬ সালে ২৪ অক্টোবর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটার ছিলেন প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যবৃন্দ। বাংলার জন্য ৩৩টি আসন সংরক্ষিত ছিল। এ.কে. ফজলুল হক স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। ৩২টি আসনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। বাঙালি মহিলাদের মধ্যে একমাত্র নির্বাচিত মহিলা ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর মামাতো বোন শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী।[১৪]

---

১২. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

১৩. **নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা ১৯৪৬ সালে গঠিত হয়:**

এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী	-	প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র
আহমদ হোসেন	-	কৃষি
খান বাহাদুর আবুল গোফরান	-	বেসামরিক সিভিল সাপ্লাই
খান বাহাদুর মোয়াজ্জেম হোসেন	-	শিক্ষা
খান বাহাদুর মুহাম্মদ আলী	-	জনস্বাস্থ্য এবং স্থানীয় সরকার
খান বাহাদুর এ.এফ.এম আব্দুর রহমান	-	সমবায় ও সেচ
শামসুদ্দিন আহমদ	-	বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প
যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল	-	বিচার ও পূর্ত
তারকানাথ মুখার্জী	-	অর্থ
নগেন্দ্র নারায়ন রায়	-	-
তারকানাথ বাড়ৈ	-	-
ফজলুর রহমান	-	-

(সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২)

১৪. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ দিবস পালন উপলক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান তার সহকর্মীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনে তার সাথে দেখা করেন। ১৫ আগস্ট বিকালে তিনি ২০টি ট্রাকে ছাত্রদের নিয়ে মিছিল করেন। তাদের স্লোগান ছিল বৃটিশবিরোধী। তারা কংগ্রেস বা হিন্দুবিরোধী প্রচার করেননি। ১৬ আগস্ট তারা সন্ধ্যার পূর্বে হোস্টেলে ফিরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী বেকার হোস্টেলে পুলিশ পাহারা রাখেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট হতে ২০ আগস্ট পর্যন্ত দাঙ্গা চলে। প্রায় ৫ হাজার হিন্দু-মুসলিম নিহত হয়। এ সময় দাঙ্গা দমনে শেখ মুজিবুর রহমান এগিয়ে আসেন। তিনি দাঙ্গাপীড়িত হিন্দু-মুসলমানদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন।[১৫]

ইংরেজ সেনাবাহিনী এগিয়ে এলে দাঙ্গায় এত লোক নিহত হত না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ইসলামিয়া কলেজ ও বেকার হোস্টেল এলাকায় দাঙ্গা প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেন। তিনি ছাত্রজীবনেই মানবতাবাদী ছিলেন। বেকার হোস্টেলের সামনে একদল মুসলমান একজন হিন্দুকে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করছিল। এ দৃশ্য দেখে শেখ মুজিব তাঁর সাথীদের বলেছিলেন, দাঙ্গাকারীরা একজন মানুষ হত্যা করছে। তিনি তাঁর আদর্শ পুরুষ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা প্রতিরোধ ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য কাজ করেছেন।[১৬] এ সকল মানবিক দায়িত্ব ও রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ১৯৪৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান বি.এ পরীক্ষা দিতে পারেননি।

কলকাতা দাঙ্গার পরে নোয়াখালী ও বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়। সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে বিহারে গমন করেন এবং দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের পুনর্বাসনের জন্য ত্রাণ কাজ পরিচালনা করেন।

১৯৪৬ সালের ১৪ নভেম্বর মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গা উপদ্রুত নোয়াখালীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পৌঁছেন। সোহরাওয়ার্দী কলকাতা, নোয়াখালী ও ঢাকায় দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গায় হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম হত্যা, নারী নির্যাতন, সম্পত্তির ধ্বংসের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবাদ জানান। এ দাঙ্গা থেকে তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাই তিনি পূর্ব বাংলায় ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা প্রতিরোধে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৭]

কলকাতা, গোয়া, বিহারের দাঙ্গার মর্মস্পর্শী ঘটনা মানুষের মনে স্থায়ী হলো না। তাদের স্মৃতি থেকে বর্বরতার চিহ্ন মুছে যায়; কিন্তু মহাত্মা গান্ধী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। তাই দেখা যায়, মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দ্বিজাতিতত্ত্বের পরিবর্তে পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির গোড়াপত্তন করেন। শেখ মুজিব মহাত্মা

১৫. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

১৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ৬৩-৭১

১৭. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীর অহিংস ও অসহযোগ নীতি, সোহারাওয়ার্দীর অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেন এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী দলের প্রগতিশীল নেতাকর্মীদের প্রচারের জন্য কোন পত্রিকা ছিল না। প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার সম্পাদক হলেন ময়মনসিংহের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)। বরিশালের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে পত্রিকার সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করা হয়। সোহরাওয়ার্দী তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করেন। পত্রিকাটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। সোহরাওয়ার্দী ভক্ত তরুণ লেখকগণ পত্রিকায় চাকরি গ্রহণ করে পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ ওয়াজিউল্লাহ, মুহাম্মদ মোদাব্বের, খন্দকার মুহাম্মদ ইলিয়াস, কেজি মোস্তফা, সিরাজউদ্দিন হোসেন, রশিদ করিম, কবি আহসান হাবিব, রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই), মুহাম্মদ নাসির আলী, কবি গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ। দৈনিক ইত্তেহাদে আবুল হাশিমের প্রচার কমে যাওয়ায় তার সাথে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।[১৮] বামপন্থী মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে ডানপন্থী মুসলিম লীগের নিকট সোহরাওয়ার্দীকে পরাজয়বরণ করতে হয়। দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। খাজা নাযিমউদ্দিন সরকার পত্রিকাটি পূর্ব বাংলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার অভিজ্ঞতার আলোকে এবং কর্মীদের নিয়ে আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে ঢাকা থেকে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকা প্রকাশ করে এবং ১৯৫৩ সালে পত্রিকাটি দৈনিকে উন্নীত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক হলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়ার মুহাম্মদ খান প্রমুখ।

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্মী নির্বাচন ও সংগঠন গড়ে তোলায় অতুলনীয় ছিলেন। তিনি চল্লিশের দশকে বেছে নিলেন তার দু'জন দক্ষ ও প্রতিভাশালী কর্মী তফাজ্জল হোসনে মানিক মিয়া এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে। শেখ মুজিরের সাংগঠনিক ক্ষমতা ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম লীগবিরোধী আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি শক্তিশালী হতে থাকে। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল কেবিনেট মিশন বাস্তবায়ন ও কংগ্রেস মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে তাকে লন্ডনে ডেকে পাঠানো হয়। তার স্থলে ১৯৪৭ সালের ২৪ মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। মহাত্মা গান্ধী ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হলো স্বাধীন অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কিন্তু জিন্নাহ তার পাকিস্তান দাবিতে অটল ছিলেন। ভারতের দশ কোটি মুসলমানের জন্য তিনি পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলায় মুসলিম

---

১৮. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র-যুব-জনতা প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তান দাবি করছেন। এ সময় এ.কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগে ফিরে আসেন। ১৯৪২ সালে তিনি মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করেছিলেন।[১৯]

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ৮ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ ফজলুল হকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। মুসলিম লীগে এ.কে. ফজলুল হক ফিরে এলে লীগ কর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মওলানা আকরম খাঁ ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি পদে ইস্তফা দেন। সভাপতি পদে এ.কে. ফজলুল হক ও আবুল হাশিম প্রার্থী হলেন। ১৯৪৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা হয়। মুসলিম লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তার দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকা নিরপেক্ষা ভূমিকা পালন করে। আবুল হাশিম সোহরাওয়ার্দীর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। ফজলুল হকের সমর্থক বেশি। উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। কলকাতা মুসলিম ইন্সটিটিউটের সামনে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। হাজার হাজার মুসলিম লীগ কর্মী বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় এসেছে। রাস্তায় বিক্ষোভকারীরা মুসলিম লীগ সভাপতি প্রার্থী আবুল হাশিমের ওপর আক্রমণ চালায়। ঠিক এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান একাই আক্রমণকারীদের প্রতিহত করেন। মনে হলো বিক্ষোভকারীরা শেখ মুজিবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তার সাহস দেখে সবাই অবাক। সেদিন শেখ মুজিব সাহসের পরিচয় না দিলে মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিমের মারাত্মকভাবে আহত হবার আশঙ্কা ছিল। ছাত্রসমাজের ওপর শেখ মুজিবের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, তার উপস্থিতিতে ছাত্ররা শান্ত হয়ে যায়। যদিও শেখ মুজিব আবুল হাশিমের সমর্থক ছিলেন; কিন্তু তাঁর নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী নির্বাচন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। মওলানা আকরম খাঁ তার ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করলে সভাপতি পদের নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়।* প্রকৃতপক্ষে পদত্যাগের সবটাই ছিল

---

১৯. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৫ অক্টোবর, ১৯৮৭

* পার্ক সার্কাস এরিয়ায় বিচারপতি সিদ্দিকী, জনাব আবদুর রশিদ, জনাব তোফাজ্জল আলী (ভূতপূর্ব মন্ত্রী), আরও অনেকে ডিফেন্স পার্টির নেতৃত্ব দিতেন। আমরা ছিলাম স্বেচ্ছাসেবক। শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে হিন্দু ও মুসলমানদের ক্যাম্প করা হয়েছিল- যাতে বাইরে থেকে কেউ এসেই হিদু বা মুসলমান মহল্লায় না যায়। কারণ মুসলমানরা হিন্দুদের মহল্লায় এবং হিন্দুরা মুসলমান মহল্লায় গেলে আর রক্ষা নাই। কলকাতায় মহিলাদের মধ্যে জনাব সোহরাওয়ার্দীর মেয়ে মিসেস সোলায়মান, নবাবজাদা নসরুল্লাহর মেয়ে ইফফাত নসরুল্লাহ, বেগম আক্তার আতাহার আলী, সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদিকানূরজাহান বেগম, বেগম রশিদ, রোকেয়া কবীর এবং মন্নুজান হোস্টেলের ও ব্র্যাবোর্ন কলেজের মেয়েরা খুবই পরিশ্রম করেছেন। রাতদিন রিফিউজি সেন্টারে এরা কাজ করতেন মেয়েদের ভিতর, আমাদের করতে হত পুরুষদের মধ্যে। রাতে অসুবিধা হত, তবুও হাজেরা মাহমুদ আলী, হালিমা নূরুদ্দিন আরও কয়েকজনকে সারা রাত পরিশ্রম করতে দেখেছি। কলকাতার অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে গেছে। মুসলমানরা মুসলমান মহল্লায় চলে এসেছে। হিন্দুরা হিন্দু মহল্লায় চলে গিয়েছে। বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করার জায়গা ছিল একমাত্র এ্যাসপ্লানেডে, যাকে আমরা চৌরঙ্গী বলতাম। এখন অবস্থা হয়েছে আরও খারাপ। বেশ কিছুদিন কোনো গোলমাল নাই। হঠাৎ এক জায়গায় সামান্য গোলমান আর ছোরা মারামরি শুরু হয়ে গেল। শহীদ সাহেব সমস্ত রাতদিন পরিশ্রম করছেন, শান্তি রক্ষা করবার জন্য। কলকাতায় চৌদ্দ-পনের শত পুলিশ বাহিনীর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ-ষাটজন মুসলমান, অফিসারদের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। শহীদ সাহেব লীগ সরকার চালাবেন কি করে? তিনি আরও একহাজার মুসলমানকে পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি করতে চাইলে তদানীন্তন ইংরেজ গভর্নর আপত্তি তুলেছিলেন। শহীদ সাহেব পদত্যাগের হুমকি দিলে তিনি রাজি হন। পাঞ্জাব থেকে যুদ্ধ ফেরত মিলিটারি লোকদের এনে ভর্তি করলেন। এতে ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার

Dhaka University Institutional Repository

কাগজগুলি হৈচৈ বেশি করল। (শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,২০১২, পৃ. ৬৮)

হাশিম সাহে মুসলিম লীগের সভাপতি হতে চাইলেন। কারণ, মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব পদত্যাগ করেছিলেন। শহীদ সাহেব রাজি হন নাই। মাওলানা সাহেবকে অনুরোধ করে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। হাশিম সাহেব রাগ করে লীগ সেক্রেটারি পদ থেকে ছুটি নিয়ে বর্ধমানে চলে গিয়েছিলেন। যখন তিনি কলকাতা আসতেন মিল্লাত প্রেসেই থাকতেন। হাশিম সাহেব এই সময় ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অনেক হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের অনেকেরই মোহ তাঁর উপর থেকে ছুটে গিয়েছিল।

সে অনেরক কথা। তিনি কলকাতা আসলেই শহীদ সাহেরবর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। এর প্রধান কারণ ছিল *মিল্লাত* কাগজকে দৈনিক করতে সাহায্য না করে তিনি দৈনিক *ইত্তেহাদ* কাগজ বের করেছিলেন- নবাবজাদা হাসান আলী সাহেবের ব্যবস্থাপনা এবঙ আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের সমমাদনায়। মাওলানা আকরম খাঁ সাহেবের দৈনিক *আজাদও* ক্ষেপে গিয়েছিল শহীদ সাহেবের উপর। কারণ, পূর্বে একমাত্র *আজাদ* ছিল মুসলমানদের দৈনিক। এখন আর একটা কাগজ বের হওয়াতে মাওলানা সাহেব যতটা নন তাঁর দলবল খুব বেশি রাগ করেছিল।

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে ভারতের রাজনীতিতে এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার বদ্ধপরিকর, যে কোনমতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। ক্যাবিনেট শিমনের প্রস্তাব মুসলিম লীগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস প্রথমে গ্রহণ করে পরে পিছিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে বড়লাট লর্ড ওয়েভেল ঘোষণা করলেন। লর্ড ওয়েভেল মুসলিম লীগের সাথে ভাল ব্যবহার না করায়, মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে অস্বীকার করে। কংগ্রেস পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সরকারে যোগদান করে। যদিও লর্ড ওয়েভেল ঘোষণা করেছিলেন, মুসলিম লীগের জন্য পাঁচনা মন্ত্রিত্বের পদ খালি রইল, ইচ্ছা করলে তারা যে কোন মুহূর্তে যোগদান করতে পারে। সরকারে যোগদান না করে একটু অসুবিধা পড়েছিল মুসলিম লীগ। শেষ পর্যন্ত জনব সোহরাওয়ার্দী লর্ড ওয়েভেলের সাথে সাক্ষা' করেন এবং মুসলিম লীগ যাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মি. জিন্নাহ তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন আলোচনা চালাতে। শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ-ওয়েভেল আলোচনা করে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদান করতে রাজি হয়। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে লিয়াকত আলী খান, আই আই চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিশতার, রাজা গজনফর আলী খান এবং যোগেন্দ্রণাথ মণ্ডল মুসলিক লীগের তরফ থেকে অন্তর্বর্তীকালীণ ভারত সরকারে যোগদান করেন। মুসলিম লীগ যদি কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান না করতে তবে কংগ্রেস কিছুতেই পাকিস্তান দাবি মনতে চাইত না।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে ঘোষণা করা হল ভারতবর্ষ ভাগ হবে। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে ভাগ করতে রাজি হয়েছে এই জন্য যে, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হবে। আসামের সিলেট জেলা ছাড়া আর কিছুই পাকিস্তানে আসবে না। বাংলাদেশের কলকাতা এবং তার আশপাশের জেলাগুলিও ভারতবর্ষে থাকবে। মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব ও মুসলিম লীগ নেতারা বাংলাদেশ ভাগ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বর্ধমান ডিভিশন আমরা না-ও পেতে পারি। কলকাতা কেন পাব না? কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলাদেশে ভাগ করতে হবে বলে জনমত সৃষ্টি করতে শুরু করল। আমরাও বাংলাদেশে ভাগ হতে দেব না, এর জন্য সভা করতে শুরু করলাম। আমরা কর্মীরা কি জানতাম যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছে এই ভাগের ফর্মুলা? বাংলাদেশ যে ভাগ হবে, বাংলাদেশের নেতারা তা জানতেন না। সমস্ত বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে আসবে এটাই ছিল তাদের ধারণা। আজ দেখা যাচ্ছে, মাত্র আসামের এক জেলা- তাও যদি গণভোটে জয়লাভ করতে পরি। আর বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাগুলি কেটে হিন্দুসস্থানে দেওয়া হবে। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। কলকতার কর্মীরা ও পশ্চিবঙ্গের কর্মীরা এসে আমাদের বলত, তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, আমাদের কপালে কি হবে খোদাই জানে! সত্যই দুঃখ হতে লাগল ওদের জন্য। গোপনে গোপনে কলকাতার মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল, যা হয় হবে, কলকাতা ছাড়া হবে না। শহীদ সাহেবের পক্ষ থেকে বাংলা সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী ঘোষণা করেছিলেন, কলকাতা আমাদের রাজধানী *।কবে। দিল্লি বসে অনেক পূর্বেই যে কলকাতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একা* তো আমরা জানতামও না, আর বুঝতামও না।

এই সময় শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের তরফ থেকে এবং শরৎ বসু ও রিকণশংকর রায় কংগ্রেসের তরফ থেকে এক আলোচনা সভা করেন। তাঁদের আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশ ভাগ না করে অন্য কোন পন্থা অবলম্বর করা যায় কি না? শহীদ সাহেব দিল্লিতে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বাংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা একটা ফর্মুলা ঠিক করেন। বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এক ফর্মুলা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। যতদূর আমার মনে আছে তাতে বলা

Dhaka University Institutional Repository

খাজা নাযিমউদ্দিন দলের সাজানো নাটক। তাদের উদ্দেশ্যে ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দলকে ক্ষমতাহীন করা। পরে তারা সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বাংলার নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। আবুল হাশিমের মুসলিম লীগের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সঠিক ছিল না। আবুল হাশিম নিজেই স্বীকার করলেন যে, এ.কে. ফজলুল হকের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া ঠিক হয়নি।[২০]

হয়েছিল, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। জনসাধারণের ভোটে একটা গণপরিষদ হবে। সেই গণপরিষদ ঠিক করবে বাংলাদেশ হিন্দুস্থান না পাকিস্তানে যোগদান করবে, নাকি স্বাধীন থাকবে। যদি দেখা যায় যে, গণপরিষদের বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি পাকিস্তানে যোগদানে পক্ষপাতী, তবে বাংলাদেশ পুরাপুরিভাবে পাকিস্তানে যোগদান করবে। আর যদি দেখা যায় বেশি সংখ্যক লোক ভারতবর্ষে থাকতে চায়, তবে বাংলাদেশ ভারতবর্ষে যোগ দেবে। যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তাও াকতে পারবে। এই ফর্মুলা নিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু দিল্লিতে জিন্নাহ ও গান্ধীর সা দেখা করতে যান। শরৎ বসু নিজে লিখে গেছেন যে জিন্নাহ তাঁকে বলেছিলেন, মুসলিম লীগের কোন আপত্তি নাই, যদি কংগ্রেস রাজি হয়। ব্রিটিশ সরকার বলে দিয়েছে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত না হলে তারা নতুন কোনো ফর্মুলা মানতে পারবেন না। শরৎ বাবু কংওগ্রসের নেতারেদ সাথে দেখা করতে যেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কারণ, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁকে বলেছিলেন, "শরৎ বাবু পাগলঅমি ছাড়েন, কলকাতা আমাদের চাই।" মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরু কোন কিছুই না বলে শরৎ বাবুকে সরদার প্যাটেলে কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর মিস্টার প্যাটের শর শরাৎ বাবুকে খুব কঠিন কথা বলে বিদায় দিয়েছিলেন। কলকাতা ফিরে এসে শরৎ বসু খবরের কাগজে বিবৃতির মাধ্রমে একথা বলেছিলেন এবঙ জিন্নাহ যে রাজি হয়েছিলেন একথা স্বীকার করেছিলেন।

যুক্ত বাংলার সমর্থক বলে শহীদ সাহে ও আমাদের অনেক বদনাম দেবার চেষ্টা করেছেন অনেক নেতা। যদিও এই সমস্ত নেতারা অনেকেই তখন বেঙ্গল মুসলিম লগী ওর্য়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই ফর্মুলা গ্রহণ করেছিলেন। জিন্নাহর জীবদ্দশায় তিনি কোনোদিন শহীদ সাহেবকে দোষারোপ করেন নাই। কারণ, তাঁর বিনা সম্মতিতে কোন কেছুই তখন করা হয় নাই। যখন বাংলা ও আসাম দুইটা প্রদেশই পাকিস্তানে যোগদান করুক, এর জন্যই আমাদের আন্দোলন ছিল, তখন সমস্ত বাংলা পাকিস্তানে আসলে ক্ষতি কি হত তা আজও বুঝতে কষ্ট হয়! যাখন বাংলাদেশ ভাগ হবে এবং যতটুকু পাকিস্তানে আসে তাই গ্রহণ করা হবে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে- তখন সে প্রশ্ন আজ রাজনৈতিক কারণে মিথ্যা বদনাম দেয়ার জন্যই ব্যবহার করা হয়। বেশি চাইতে বা বেশি পেতে চেষ্টা করায় কোন অন্যায় হতে পারে না। যা পেয়েছি তা নিয়েই আমরা খুশি হতে পারি। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ১৯৪৭ সালের ২ শে এপ্রিল ঘোষণা করেছিলেন, 'যুক্ত বাংলা হলে হিন্দু মুসলমানের মঙ্গলই হবে'। মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, "আমার রক্তের উপর দিয়ে বাংলাদেশ ভাগ হবে। আমার জীবন থাকতে বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব না। সমস্ত বাংলাদেশই পাকিস্তানে যাবে।" এই ভাষা না হলেও কথাগুলির অর্থ এই ছিল। *আজাদ* কাগজ আজও আছে। ১৯৪৭ সালের কাগজ বের করলেই দেখা যাবে।

এই সময় বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন তলে তলে কংগ্রেসকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি ভারত ও পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল একসাথেই থাকবেন। জিন্নাহ রাজি হলেন না, নিজেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়ে বসলেন। মাউন্টব্যাটেন সম্বন্ধে বোধহয় তার ধারণা ভাল ছিল না। মাউন্টব্যাটেন ক্ষেপে গিয়ে পাকিস্তানের সর্বনাশ করার চেষ্টা করলেন। যদিও র‌্যাডক্লিফকে ভার দেওয়া হল সীমানা নির্ধারণ করতে, তথাপি তিনি নিজেই গোপনে কংগ্রেসের সাথে পরামর্শ করে একটা ম্যাপ রেখা তৈরি করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হোক, এটা আমরা যুবকরা মোটেও চাই নাই। তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হবেন, পরে প্রেসিডেন্ট হবেন, এটাই আমরা আশা করেছিলাম। লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের বড়লাট থাকলে এতখানি অন্যায় করতে পারতেন কি না সন্দেহ ছিল! এটা আমার ব্যক্তিগত মত। জিন্নাহ অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন আমাদের চেয়ে, কি উদ্দেশ্যে নিজেই গভর্নর হয়েছিলেন তা তিনিই জানতেন। (শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৫)

২০. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল বৃটিশ সম্রাটের পক্ষে ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে শাসনক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করা হবে। ১৯৪৭ সালের ২১ মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে আলোচনা করে ভারত বিভক্ত ও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব মেনে নেন। ইংরেজ সরকার বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ও কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালিনী বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন এবং প্রস্তাবের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেবিনেট মিশনের আলোকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা দাবি করেন এবং বঙ্গভঙ্গের প্রবল বিরোধিতা করেন। মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম, শেখ মুজিবুর রহমানসহ যুবনেতাদের অনেকেই স্বাধীন বাংলা সমর্থন করেন। গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন প্রথম স্বাধীন বাংলার পক্ষে ছিলেন।[২১]

বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডোমিনিয়ন মর্যাদায় বৃহত্তর বাংলা দাবি করে বিবৃতি দেন। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেন-

> এবার আসুন বেবে দেখি বাংলা অবিভক্ত থাকলে তার অবস্থান কি হবে? বাংলা হবে একটি মহান দেশ ভারতের মধ্যে সবচাইতে ধনাঢ্য ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র তার অঙ্গে লালিত জনগণকে দিতে পারবে এক সমুন্নত জীবনযাত্রার মান। বাংলা যদি মহান হতে চায়, তবে সে শুধু নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই তা হতে পারবে। তাকেই নিজের সম্পদের অধিকারী ও নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে। বাংলার ওপর অন্যের শোষণের উচ্ছেদ করতে হবে। ভারতের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলাকে বলি দেয়া চলবে না।[২২]

সুভাষ চন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু সোহরাওয়ার্দী বৃহত্তর বাংলা গঠন প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯৪৭ সালের ২০ মে শরৎচন্দ্র বসুর বাসভবনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মুসলিম নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান, মুহাম্মদ আলী, আবুল হাশিম এবং এম.এ. মালেক; অন্যদিকে হিন্দু নেতাদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায় এবং সত্যরঞ্জন বকশি। সভায় আলোচনান্তে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আবুল হাশিম ও শরৎচন্দ্র বসু। চুক্তির মূল বিষয় ছিল-[২৩]

১. বাংলা হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র;
২. স্বাধীন বাংলার সংবিধানে হিন্দু ও মুসলমানের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী এবং বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

---

২১. এ সম্পর্কে এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর জন্য বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৫

২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

২৩. সিরাজুদ্দীন হোসেন, *ইতিহাস কথা কয়*, ঢাকা : জ্ঞান বিতরণী, ১৯৪৭, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

৩. সমানসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে। মন্ত্রিপরিষদের প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন হিন্দু;
৪. চাকরির ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা হবে;
৫. ১৬ জন মুসলমান এবং অমুসলমান ১৪ জনকে নিয়ে ৩০ সদস্যে গঠিত সংবিধান সভা নির্বাচন করবে;

গঠিত ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ও গভর্নর বারোজ প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলার প্রতি সমর্থন দেন। কিন্তু নেহরু ও কংগ্রেস স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেন। মুসলিম লীগ ও জিন্নাহ স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের প্রতি আন্তরিক ছিলেন না। ফলে সোহরাওয়ার্দীর স্বপ্ন স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ সময়কালে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে অংশ নেন এবং ছাত্র-যুবকদের নিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করেন।

সোহরাওয়ার্দী-শরৎচন্দ্রের বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ভবিষ্যত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করেন। যে স্বাধীন বাংলা ছিল সোহরাওয়ার্দীর স্বপ্ন, সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১৯৪৭ সালের ১ জুন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ভারত বিভাগ রোয়েদাদ গ্রহণ করে। ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারত, পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তিকে সমর্থন করে ভাষণ দেন।

কথিত আছে, ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ভাইসরয়ের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ভিপি মেনন মাত্র চার ঘণ্টায় রচনা করেছিলেন এবং বৃটিশ মন্ত্রিসভা ৫ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বৈঠকে তা অনুমোদন করে। সীমান্ত নির্ধারণের জন্য স্যার সিরিল রেডক্লিফ ৮ জুলাই ভারতে এসে পৌঁছেন। তিনি মাত্র ৫ সপ্তাহের মধ্যে সীমান্ত রোয়েদাদ ৮ আগস্ট ভাইসরয়ের নিকট প্রদান করেন। রেডক্লিফ বাংলা বিভাগের কাজ দ্রুত শেষ করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন দেখলেন বাংলা বিভক্তি ঠেকানো যাবে না তখন তিনি স্বাধীন কলকাতা নগরী দাবি করেন। কিন্তু কংগ্রেস এ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হয়নি।[২৪]

১৯৪৭ সালের ২০ জুন শুক্রবার বঙ্গীয় আইন পরিষদের যে অংশ (পূর্ব বাংলা) বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে সে অংশ এমএলএদের ১০৬-৩৫ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, বাংলা বিভক্ত করা চলবে না। অমুসলিম সংখ্যাগুরু (পশ্চিম বাংলা) অংশ ৫৮-২১ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, বাংলাকে বিভাগ করতে হবে। উভয় অংশের যুক্ত অধিবেশন ১২৫-৯০ ভোটে বাংলা বিভাগের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলা বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সংবাদপত্রে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, “আশা-নিরাশায় যন্ত্রণার ইতি হলো অবশেষে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের আদর্শের পৃষ্ঠে চুরিকাঘাত করা হয়েছে। বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করা হবে অচিরেই, মুসলিম বাংলার ক্ষোভের বিশেষ কারণ নেই। আমরা

২৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য চেয়েছিলাম সুষম ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র, যেখানে আমরা স্বনির্ভর হয়ে আমাদের সম্পদকে সদ্ব্যবহার করে বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী জাতি গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু সেই লক্ষ্যের পথে যৌথভাবে এগিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।"[২৫]

সোহরাওয়ার্দী বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার আন্দোলন তখন ব্যর্থ। কলকাতাকে রাখতে পারলেন না। মন্ত্রিত্বের লোভে এমএলএগণ খাজা নাযিমউদ্দিনের দলে ভিড় করে। এমনি সময় খাজা নাযিমউদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় লীগ নেতা আই.আই. চুন্দ্রিগড়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিত্ব লোভে ও টাকার বিনিময়ে খাজা নাযিমউদ্দিনের পক্ষে এমএলএ সংগ্রহ শুরু করা হয়। সোহরাওয়ার্দীর নিকট এ প্রস্তাব গেলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে খাজা নাযিমউদ্দিন পেলেন ৭৫ ভোট এবং সোহরাওয়ার্দী পেলেন ৩৯ ভোট। এ ছিল নবাব খাজা নাযিমউদ্দিন ও লিয়াকত আলী খানসহ লীগের বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৩ আগস্ট পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাযিমউদ্দিনকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হলেন স্যার ফ্রেডারিখ বোর্ন। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতারা কলকাতার সাথে লাহোর ক্রয় করেন। তারা অনেক সম্পদ ছেড়ে দেয়। এমনকি তারা খুলনা জেলাও ছেড়ে দেয়। পরিশেষে এ.কে. ফজলুল হক কলকাতা বেল ডেভিয়ার হাউজে সীমান্ত নির্ধারণী মামলায় র‍্যাড ক্লিফের নিকট ওকালতি করে খুলনা জেলাকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন।[২৬]

বৃটিশ সরকার চেয়েছিল- লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান ও ভারতের উভয় দেশের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হোক। কিন্তু জিন্নাহ সে প্রস্তাব গ্রহণ না করে নিজেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হবার আশা ব্যক্ত করেন। তিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং নিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইংরেজ সরকার ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীন আইনে পাকিস্তানে একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৮০ জন। বাংলার লোক সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৬ জন। পূর্ব বাংলার ভাগে ৪০ জন সদস্য। তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ৬ জন সদস্য পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়। করাচীকে পাকিস্তানের রাজধানী এবং ঢাকাকে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঘোষণা করা হয়।[২৭]

দেশ বিভাগকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব, বিহার, দিল্লী, যুক্ত প্রদেশ এবং পাকিস্তানে পশ্চিম পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার নামে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান নিহত হয়। হাজার হাজার নারী নির্যাতিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ নারকীয় হত্যাকাণ্ড ইতিপূর্বে হয়নি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তানের স্বাধীনতা এবং দিল্লীতে ভারতের স্বাধীনতা

---

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

২৬. *প্রাগুক্ত*।

২৭. M.A. Rahim, *The Muslim Society & Politics in Bengal (1757-1947)*, Dacca : University of Dacca, 1978, P. 282

Dhaka University Institutional Repository

উৎসব চলছে, অথচ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মহাত্মা গান্ধী উৎসবমুখর রাজধানী থেকে বহুদূরে কলকাতার সোদপুরে হায়দারী ম্যানসনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতির জনক এবং সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস উভয় নেতা স্বাধীনতা দিবসে অবহেলিত।[২৮] ভারতের চার কোটি মুসলমান অরক্ষিত অবস্থায় মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তানে গমন করেছে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গান্ধীর সাথে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সময় হায়দারী ম্যানসনে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের দুই মহান নেতার সাথে শান্তি মিশনে কাজ করছেন।[২৯] ১৯৪৬ সালে রাজনীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিএ পরীক্ষা দিতে পারেননি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বিএ পরীক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। সামনে তাঁর বিএ পরীক্ষা। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে তিনি তাঁর যুব কর্মীদের নিয়ে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য কাজ করছেন। নিজ সম্প্রদায়ের দাবি নিয়ে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন তরুণ বয়সে শেখ মুজিব অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করলেন।[৩০] দেশ বিভাগের সাথে সাথে তাঁর বন্ধুদের অনেকে কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় চলে গেছেন। পাঞ্জাব সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল। কিন্তু তারা পাঞ্জাবে দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। পাঞ্জাবে কয়েক লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান নিহত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট সীমান্ত সংক্রান্ত রোয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার পর পাঞ্জাবের শিখরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলমানরা শিখদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার শিখকে হত্যা করে। পাঞ্জাবের দাঙ্গায় ৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক তাদের ভিটামাটি থেকে বিতাড়িত হয়। এক লক্ষ যুবতী অপহৃত হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারতের বুকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্র জন্ম নেয়ার সময় বিপুল ধারায় রক্ত ঝরেছিল। অগণিত অসহায় মানবসন্তান অভাবনীয় পাশবিকতা ও নির্মমতার শিকার হয়েছিল আগস্টের সে ভয়াবহ দিনগুলোতে।[৩১] একমাত্র কলকাতাসহ বাংলায় দাঙ্গা সংঘটিত হয়নি। ১৯৪৭ সালের দাঙ্গা শেখ মুজিবের জীবনের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে এবং সারাজীবন তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। কোনদিন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেননি এবং সাম্প্রদায়িক দলগুলোয় বিরোধিতা করেছেন মৃত্যু পর্যন্ত।

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা ও কার্যধারা

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ১৯৪৭ সালের ৭ আগস্ট ভাইসরয়ের ডাকোটা বিমানে করাচীর উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তার সাথে ছিলেন তার এডিসি লেফটেন্যান্ট আহসান। জিন্নাহ তার এডিসিকে বলেছিলেন, "আমার

---

২৮. *Ibid*

২৯. সিরাজুদ্দীন হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

৩০. *প্রাগুক্ত*

৩১. Md. Enamul Huq Khan, *AK Fazlul Huq and Muslim League in Bengal (1906-1947),* Dhaka : 2002, P. 25

Dhaka University Institutional Repository

জীবদ্দশায় আমি পাকিস্তানের জন্ম দেখতে পাব এটা আমি কখনও ভাবতে পারিনি।"[৩২] নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বৃটিশ সরকারের পক্ষে অভিনন্দন জানানোর জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৩ আগস্ট করাচী পৌঁছেন। ১৪ আগস্ট বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকার পরিবর্তে অর্ধ চাঁদ ও তারকা খচিত পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। ঢাকায়ও নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার সর্বত্র স্বাধীনতা উৎসব পালিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গ বিভাগ মেনে নিতে পারেননি। তাই দেখা যায় অন্যান্য যুব নেতার ন্যায় তিনি কলকাতা ত্যাগ করে স্বাধীনতা দিবসে ঢাকায় আসেননি। ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।[৩৩] ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালের সিলেট রেফারেন্ডামে কলকাতা থেকে ৫০০ কর্মী নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার চালান। অধিকাংশ সিলেটবাসী পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়ায় সিলেট পাকিস্তানভুক্ত হয়। নতুন মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণকালে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতায় মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শান্তি মিশনের কর্মী হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য কাজ করছেন। একই সাথে তিনি বি.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা; কিন্তু তিনি টুঙ্গিপাড়ায় আসতে পারেননি। ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান ও ফজিলাতুন্নেসার প্রথম কন্যার জন্ম হয়। প্রথম কন্যার নাম শেখ হাসিনা। কন্যার জন্মের এক মাস পরে তিনি পরীক্ষা সমাপ্ত করে টুঙ্গিপাড়ায় এসে কন্যাকে দেখলেন।[৩৪]

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালে বি.এ. পরীক্ষা দেন। তিনি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বি.এ. পাস করেন। পাকিস্তানে একটি দল গঠনের জন্য কলকাতায় থাকা অবস্থায় তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিম লীগের পতাকাতলে পূর্ব বাংলার স্বার্থ বজায় রাখা সম্ভব হবে না। তাই একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা কলকাতায় থাকাকালে চালিয়েছিলেন। তিনি তার বন্ধুদের নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ইসলামিয়া কলেজের নবাব সিরাজউদ্দৌলা হলে এক গোপন সভা আহ্বান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন- কেজি মোস্তফা, আতাউর রহমান, কাজী মুহাম্মদ ইদ্রিস, শহিদুল্লাহ কায়সার, আখলাকুর রহমান প্রমুখ। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের অধীনে সত্যিকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হবে না। পূর্ব বাংলায় যেতে হবে এবং নতুন করে সংগ্রাম শুরু করতে হবে। সে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের শুভ সূচনা হয়।[৩৫]

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ঢাকার মুসলিম লীগ নেতা কামরুদ্দিন আহমদ গণআজাদী লীগ গঠন করেন। গণআজাদী লীগের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। এ দলের সাথে শেখ মুজিবুর

৩২. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

৩৩. M.A. Rahim, *OP, Cit*, P. 161

৩৪. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

৩৫. মাযহারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

রহমান কলকাতা থেকে এসে মিলিত হন। তাজউদ্দিন আহমদ প্রত্যক্ষভাবে এ দলের কর্মী ছিলেন। দলটি রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৯৫০ সালে কামরুদ্দিন আহমেদের দলের নামকরণ করা হয় সিভিল লিবার্টি লীগ। কিন্তু নানা কারণে দলটি শক্তিহীন হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতা ত্যাগ করে গোপালগঞ্জ চলে আসেন এবং তাঁর এক মাসের কন্যা হাসুকে কোলে তুলে নেন। তারপর ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা কোর্টের পিছনে খাজে দেওয়ান লেনে গোপালগঞ্জের মোল্লা জালালউদ্দিন ও খন্দকার আব্দুল হামিদের মেসে ওঠেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন। তাঁর জীবনের ৬ বছর ছিল তাঁর জ্ঞান ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সময়কাল। তাঁর জীবন গঠনের শ্রেষ্ঠতম দিনগুলো ছিল কলকাতার ছাত্রজীবন। তিনি ভারতের বিখ্যাত নেতাদের সাহচর্ষ লাভ করেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। কলকাতার জীবনের তাঁর স্মৃতিবিজড়িত ইসলামিয়া কলেজ বেকার হোস্টেল ত্যাগ করতে হলো। ইসলামিয়া কলেজে তাঁর রোল নম্বর ছিল ১৪। ইসলামিয়া কলেজের বর্তমান নাম মওলানা আজাদ কলেজ। বেকার হোস্টেলের দোতলার ২৪ নম্বর কক্ষটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবন বিকাশের কেন্দ্রস্থল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষটি সংরক্ষণ করছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ২৭ জানুয়ারি কক্ষটির দ্বার উন্মোচন করেন।[৩৬]

১৯৪৪ সালের ১ এপ্রিল ১৫০ মোগলটুলি ওয়ার্কাস ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্যাম্পের সক্রিয় সদস্য ছিলেন– কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ, শওকত আলী, মুহাম্মদ আলমাস, আউয়াল প্রমুখ। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে শেখ মুজিবুর রহমান এ ক্যাম্পে যোগ দেন। ১৫০ নম্বর মোগলটুলিকে কেন্দ্র করে সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিমের অনুযায়ী ছাত্র-যুবক একত্রিত হতে থাকে। তারা খাজা নাজিমউদ্দিন ও আহসান মঞ্জিল-এর প্রভাব থেকে বেড়িয়ে এসে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ বিরোধী নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে এগিয়ে আসে। ছাত্র-যুবক কর্মীরা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আকৃষ্ট। আওয়ামী লীগের সম্পাদক শামসুল হকের সাথে নেতৃত্ব নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও শামসুল হকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিরোধ ছিল।

শেখ মুজিবুর ছাত্রলীগ রাজনৈতিক বন্ধুরা তাঁর আসার পূর্বে ঢাকা এসেছেন। মুসলিম ছাত্রলীগ ও যুবনেতাদের মধ্যে নুরুদ্দিন আহমদ, আব্দুর রহমান চৌধুরী, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় চলে আসেন এবং তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে মুসলিম লীগ বিরোধী ছাত্রনেতা ও যুবনেতাদের অফিস ছিল। শেখ মুজিব ঢাকায় এসে টাঙ্গাইলের শামসুল হকের সাথে যুবকদের নিয়ে পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক লীগ গঠন করেন। এ দলটি স্তিমিত হয়ে যায়।

---

৩৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *শেখ হাসিনা*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

শেখ লুৎফর রহমানের ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র শেখ মুজিব উকিল হবে। পিতার নির্দেশে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। আইন পড়ার সাথে তিনি রাজনৈতিক দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকার মুসলিম লীগ নেতা কামরুদ্দিন আহমদ ১৯৪৭ সালে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান এ দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। মুসলিম লীগ সরকার গণতান্ত্রিক যুবলীগের নেতাকর্মীদের নির্যাতন শুরু করলে দলটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এ সময় কামরুদ্দিন আহমদ পিপলস ফ্রিডম লীগ গঠন করেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাবেক সম্পাদক আব্দুল হাশিম গঠন করলেন তমদ্দুন মজলিস। তারা ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের ওপর জ্ঞান চর্চা ও ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এ দলের অন্যতম নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম।[৩৭]

বামপন্থী মুসলিম লীগ দলের অনুসারীরা ঢাকা মুসলিম লীগ বিরোধী কার্যক্রম শুরু করে। কলকাতা থেকে ছাত্রনেতাদের মধ্যে চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে পড়লে নেতৃত্বের ভার শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর পড়ে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলের নেতাদের মধ্যে বগুড়ার মুহাম্মদ আলী, তোফাজ্জর আলী, ডাঃ এ.এম. মালেক, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ সদস্য খাজা নাযিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দলীয় কর্মীদের সংগঠিত করার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৭ সালের ২০ ডিসেম্বর ঢাকায় বলিয়াদি হাউজে পূর্ববাংলা আইনসভার একটি উপদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভা আয়োজনে শেখ মুজিব মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু খাজা নাযিমউদ্দিন বিদ্রোহী দলের কার্যক্রম স্তব্ধ করার জন্য ডাঃ এ.এম. মালেক, তোফাজ্জর আলী ও মুহাম্মদ আলীকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করায় তারা উপদল ত্যাগ করে খাজা নাযিমউদ্দিনের দলে চলে যায়। পূর্ববাংলা আইনসভায় বিরোধী দল শক্তিশালী হতে পারেনি।[৩৮]

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাযিমউদ্দিনের সরকারি বাসভবন তৎকালীন বর্ধমান হাউজ এবং বর্তমান বাংলা একাডেমিতে নগরীর মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের একটি মিছিল ভাষার দাবিতে সেখানে উপস্থিত হয়। অন্যান্যের সাথে শেখ মুজিব এ মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, আব্দুর রহমান চৌধুরী নইমুদ্দিন আহমদ, কাজী আহমদ কামাল, কাজী গোলাম মাহাবুব, নুরুদ্দিন আহমদ, মুহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, খালেক নেওয়াজ, আব্দুস সামাদ আজাদ, শেখ আব্দুল আজিজ, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে মিলিত হয়ে জিন্নাহর মুসলিম লীগ বিরোধী দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক হলে কয়েকটি সভার পরে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ফজলুল হক হল মিলনায়তনে অধ্যাপক নজমুল করিমের

৩৭. সামীম মুহাম্মদ আফজাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৩৮. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *হোসেন সোহরাওয়ার্দী*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৮২-১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করা হয়।[৩৯]

মুসলিম ছাত্রলীগ তৎকালীন পরিস্থিতিতে মুসলিম শব্দ ব্যবহার করলেও দলের আদর্শ ছিল অসাম্প্রতিক রাজনীতি। ১৯৫৩ সালে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দলটির নামকরণ ছাত্রলীগ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগ সরকার বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা অফিস-আদালতে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ সরকার যখন উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ তার প্রতিবাদ জানান। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৩৫৪ সালের ১২ শ্রাবণ স্থানীয় দৈনিক আজাদে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানান। তিনি উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না- এর পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে পূর্ব বাংলায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন।[৪০]

---

৩৯. ছাত্রলীগের প্রথম আহ্বায়ক কমিটির সদস্যগণ ছিলেন-

নাম	এলাকা	পদ
নইমুদ্দিন আহমদ	রাজশাহী	আহ্বায়ক
আব্দুর রহমান চৌধুরী	বরিশাল	সদস্য
শেখ মুজিবুর রহমান	ফরিদপুর	সদস্য
অলি আহাদ	কুমিল্লা	সদস্য
শেখ আব্দুল আজিজ	খুলনা	সদস্য
শামসুল হক	ঢাকা	সদস্য
খালেক নেওয়াজ	ময়মনসিংহ	সদস্য
আজিজ আহমদ	নোয়াখালী	সদস্য
আব্দুল মতিন	পাবনা	সদস্য
দবিরুল ইসলাম	দিনাজপুর	সদস্য
মফিজুর রহমান	রংপুর	সদস্য
নওয়াব আলী	ঢাকা	সদস্য
নুরুল কবির	ঢাকা শহর	সদস্য
আব্দুল আজিজ	কুষ্টিয়া	সদস্য
সৈয়দ নুরুল আলম	ময়মনসিংহ	সদস্য
আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী	চট্টগ্রাম	সদস্য

(অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪ থেকে ১৯৭৫*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০১২, পৃ. ৩৬-৩৯)

৪০. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, '*পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা*', দৈনিক আজাদ ১২ শ্রাবণ ১৩৫৪ বাং

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিস ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল কাসেম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানান।[৪১]

ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত করাচীতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভায় গণপরিষদ ২৯ নম্বর বিধির ১ উপাবিধিতে উর্দু ও ইংরেজি ভাষার সাথে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন-

> Mr. President, sir, I make that is sub-rule (1) of rule 29, after the word 'English' in line 2, the word or Bengali be inserted.
>
> Sir, in making this-The motion that stands in my name, I can assure the House that I do so not in a spirit of narrow provincialism that this motion receives the fullest consideration at the hands of the members. I know, sir, that Bengali is the language of the majority of the people of the state. So although is a provincial language but as it is a language of the majority of the people of the state and it stands on a different footing, therefore, out of the six crores and ninety lakhs people inhabiting the state 4 crores and 40 lakhs of the people speak the Bengali language. So, Sir what should be the state language of the state. The state lanugate of the state should be language which is used by the majority of the people of the state and for that Sir I consider that Bengali language is a lingua franca of our state.
>
> I know sir, I voice the sentiment of the vast millions of our state.
>
> I should be treated as the language of state of there fore, sir, I suggest that after the word. 'English', the words "Bengali" be inserted in rule 29.[৪২]

---

৪১. তমদ্দুন মজলিসের প্রস্তাবটির বলা হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে:
- পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।
- পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।
- পূর্ব পাকিস্তানের অফিসের ভাষা।
- পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি- বাংলা ও উর্দু।
- বাংলা হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগে প্রথম ভাষা।
- ইংরেজী হবে তৃতীয় ভাষা।

(বি.দ্র. তমদ্দুন মজলিশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, '*পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু*' ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)

৪২. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন– "The object of this amendment is to create a rift between the people of Pakistan" এই সংশোধনের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।[৪৩]

মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণে অস্বীকৃতি এমনকি গণপরিষদের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবি পর্যন্ত অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয় এবং ছাত্রদের মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। ২৬ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও মিছিল আয়োজনে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দেন এবং দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ২৭ তারিখের সংখ্যায় খাজা নাযিমউদ্দিনের উক্তিটির কঠোর সমালোচনা করেন এবং বাংলা ভাষার পক্ষে সম্পাদকীয় লেখেন।[৪৪]

ঢাকাসহ সর্বত্র ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[৪৫]

শামসুল আলমকে সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-যুবকদের অংশগ্রহণই বেশি ছিল। তমদ্দুন মজলিস ও ছাত্রলীগ ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে। ২ মার্চ ফজলুল হক হলে সংগ্রাম কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। শামসুল আলম অনুপস্থিত থাকায় কামরুদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করা হয়। কামরুদ্দিন আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, মুহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবুল কাসেম, রণেশ দাসগুপ্ত, অজিত গুহ প্রমুখ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য ১১ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকার বাইরে ধর্মঘট আয়োজনে ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন ও কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১০ মার্চ ফজলুল হক হলে সংগ্রাম কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সকালে শেখ মুজিবুর রহমান একদল যুবক ও ছাত্র নিয়ে সচিবালয়ে হরতালের সমর্থনে বক্তৃতা ও পিকেটিং শুরু করেন। তিনি সচিবালয়ে কর্মচারীদের ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। এ সময় মেজর জেনারেল আইয়ুব খান পূর্ব বাংলার জিওসি ছিলেন। সরকার ভাষা আন্দোলন দমন করার জন্য সেনাবাহিনী ও পুলিশ নিয়োগ করে। সচিবালয়ে পিকেটিংরত অবস্থায় ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

---

৪৩. *প্রাগুক্ত*।

৪৪. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

৪৫. সংগ্রাম কমিটি উল্লিখিতভাবে গঠিত হয়-

গণআজাদী লীগ	-	২ জন প্রতিনিধি
তমদ্দুন মজলিস	-	২ জন প্রতিনিধি
সলিমুল্লাহ হল	-	২ জন প্রতিনিধি
ছাত্রলীগ	-	২ জন প্রতিনিধি (সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমান, সর্দার ফজলুল করিম, অলি আহাদ, মুহাম্মদ তোয়াহাসহ প্রায় ৩০০ ছাত্রকে গ্রেফতার করে। পরে অনেককে ছেড়ে দেয়। পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে প্রথমে কোতোয়ালি থানায় এবং পরে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত করে।[৪৬]

১১ মার্চ সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয় এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ব্যবসা কেন্দ্র বন্ধ থাকে। ১৯৪৮ সালের ১২ মার্চ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ ১১ মার্চ ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ করে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেন, পুলিশ ২০০ জনকে আহত এবং ৫৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। ১২ মার্চ জগন্নাথ কলেজে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালন করা হয়। ১৪ মার্চ প্রদেশের সকল জেলায় পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ১৫ মার্চ সর্বস্তরের মানুষ ধর্মঘট পালন করে। সচিবালয়ের কর্মচারী, রেল কর্মচারী এবং অন্যান্য অফিসের কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগ দেয়।[৪৭]

ইতোমধ্যে সংবাদ এলো পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাযিমউদ্দিন ছাত্রদের সাথে রাষ্ট্রভাষার বিরোধ মীমাংসা করতে চায়। ১৫ মার্চ সংগ্রাম কমিটির সাথে নাযিমউদ্দিনের দু'বার বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ, আবুল কাসেম, আব্দুর রহমান চৌধুরী, নঈমুদ্দিন আহমদ, মুহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ। অনেক আলোচনার পরে সংগ্রাম পরিষদ ও মুখ্যমন্ত্রীর সাথে নিুলিখিত ৮ দফার ভিত্তিতে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে নেতৃবৃন্দ কয়েক দফা ঢাকা জেলে আটক শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করেন। এই দফাগুলো হলো-[৪৮]

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাষার দাবিতে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মুক্তিদান;
২. পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত করবে;
৩. পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এক বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে;
৪. প্রদেশে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আগামী এপ্রিল মাসে আইন পরিষদে উত্থাপন করা হবে- শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা;
৫. ভাষা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে না;
৬. সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে;
৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হতে যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করা;
৮. "আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, এ আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি।"

৪৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৪৭. *দৈনিক আজাদ*, ১৬ মার্চ, ১৯৪৮

৪৮. *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

খাজা নাযিমউদ্দিনের নিজের হাতের লেখা-এ চুক্তিতে সরকার পক্ষে স্বাক্ষর করেন কামরুদ্দিন আহমদ। ১৫ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দেয়া হয়। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ বিকেলে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তার বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ বিমানে ঢাকা পৌঁছেন। তেজগাঁও বিমান বন্দরে তাঁকে বিরাট সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁর প্রথম সফরে ২০ মার্চ ছাত্র প্রতিনিধিগণ জিন্নাহর সাথে সাক্ষাত করেন। ২১ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হয়। তৎকালীন পাকিস্তানে কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি যে কথা বলবেন তা বাঙালিরা বিনা বাধায় গ্রহণ করবে। বাঙালিরা যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায় সে সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন এবং ছাত্রনেতাদের সাথে খাজা নাযিমউদ্দিনের যে চুক্তি হয়েছে তা তিনি সমর্থন করেননি। মুসলিম লীগ নেতারা মনে করতেন ছাত্ররা জোর করে খাজা নাযিমউদ্দিনের স্বাক্ষর গ্রহণ করেছে। কায়দে আজম তাঁর ভাষণে ভাষা প্রসঙ্গে এসেই ঘোষণা করলেন, “Urdu and Urdu shall be the only state language of Pakistan”।[৪৯] সভায় উপস্থিত ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ হাত তুলে ‘না, না’ বলে প্রতিবাদ জানান। ২৪ মার্চ ঢাকার কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পুনরায় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সভায় উপস্থিত সকল ছাত্র জিন্নাহর ঘোষণার প্রতিবাদ করেন। জিন্নাহ ছাত্রদের প্রতিবাদ দেখে তাদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ছাত্রদের সাথে কয়েক দফা আলোচনা হয়। মুসলিম লীগপন্থী ছাত্রদের নেতা শাহ আজিজুর রহমান একদল ছাত্রকে নিয়ে জিন্নাহের সাথে সাক্ষাত করেন। ছাত্রলীগ নেতারা ভিন্নভাবে জিন্নাহের সাথে দেখা করেন। ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন- কামরুদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুর রহমান চৌধুরী, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, তোয়াহা, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। তাঁরা দাবি করেন যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। জিন্নাহ তাদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, জাতীয় ঐক্যের জন্য পাকিস্তানে একটি রাষ্ট্রভাষা হবে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, গণপরিষদের অনুমোদন গ্রহণ না করে তিনি কি করে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে একক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন; বস্তুত জিন্নাহর ঘোষণা ছিল অগণতান্ত্রিক।[৫০]

২২ মার্চ নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান ও তার দল জিন্নাহর সাথে সাক্ষাত করে। শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ খাজা নাযিমউদ্দিনের দলভুক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

৪৯. জিয়াউর রহমান, “একটি জাতির জন্ম”, মিজানুর রহমান (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ২১৪

৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক ছিল। এ দলের পূর্বে নিখিল শব্দ ছিল না। ২৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ ও মুহাম্মদ তোয়াহা এক যুক্ত বৈঠকে জিন্নাহর সাথে মিলিত হন। ২৪ মার্চ জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিনিধি আব্দুর রহমান চৌধুরী ও মুহাম্মদ তোয়াহার সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁরা ভাষা আন্দোলন প্রশ্ন ছাড়াও ছাত্রলীগের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। জিন্নাহকে তাঁরা বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, শাহ আজিজুর রহমানের ছাত্রলীগের জনগণের মধ্যে কোন ভিত্তি নেই। জিন্নাহ শাহ আজিজের ছাত্রলীগকে মৃত ঘোষণা করেন এবং তাদের সকলকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা বলেন। অদৃশ্য হস্তের কারসাজিতে জিন্নাহ ঘোষণা দেননি। ২৪ মার্চ বিকেলে শামসুল হক, নঈমুদ্দিন আহমদ, কামরুদ্দিন আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল কাসেম, তোয়াহা ও অলি আহাদ কায়দে আজমের সাথে দেখা করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। জিন্নাহ উত্তরে বলেন, ঐক্যের লক্ষ্যে পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৫১]

১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। জিন্নাহ সমাবর্তন ভাষণে পুনরায় বলেন, "একমাত্র উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"।[৫২] ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। জিন্নাহ চলে যাওয়ার পর ভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলাকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলা স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনা করে। আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তী আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর খাজা নাযিমউদ্দিনের সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'দৈনিক ইত্তেহাদ' কঠোর সমালোচনা করতো।[৫৩] বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে দৈনিক ইত্তেহাদ বিশেষ অবদান রেখেছে। মুসলিম লীগ সরকার দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। তখন কলকাতা থেকে আজাদ পত্রিকা প্রকাশিত হতো। কলকাতার দৈনিক অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, যুগান্তর পত্রিকাও সরকারের কোপানলে পতিত হয়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শান্তি মিশনে ব্যস্ত থাকায় তিনি ঢাকায় আসতে পারেননি। ফলে তার সমর্থকগণ হতোদ্যম হয়ে পড়েন। এদিকে জিন্নাহর নির্দেশে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের তিন নেতা-বগুড়ার চৌধুরী মুহাম্মদ আলীকে বার্মার রাষ্ট্রদূত, তোফাজ্জল আলীকে ডেপুটি স্পীকার এবং ডাঃ আব্দুল মোত্তালেবকে অক্টোবর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় যে বিরোধী দল গড়ে উঠেছিল তা দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ১৫০ নম্বর মোগলটুলি কর্মী শিবিরেও বিরোধী কাজকর্মে ভাটা পড়ে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনীতিকে সাংগঠনিক রূপ নঈমদ্দিন আহমদ এবং সভায় ভাষণ দেন শেখ মুজিবুর রহমান,

৫১. *দৈনিক আজাদ*, ২৫ মার্চ, ১৯৪৮

৫২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৫৩. *দৈনিক ইত্তেহাদ*, ২৫ মার্চ, ১৯৪৮

Dhaka University Institutional Repository

দাবিরুল ইসলাম, অলি আহাদ প্রমুখ। তারা সরকারকে জুলুম বন্ধ করার আহ্বান জানান। দিনাজপুরের ছাত্র আন্দোলন তীব্র হয়। সরকার ছাত্রলীগ নেতা দবিরুল ইসলাম, নুরুলহুদা কাদের বক্স এবং এম আর আখতার মুকুলকে কারারুদ্ধ করে। শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, আবদুল আজিজ দিনাজপুর পর্দাপন করলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুস সোবাহান ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের দিনাজপুর ত্যাগ করার আদেশ দেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী সমর্থক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছাত্রলীগের আব্দুর রহমান চৌধুরী ভিপি পদে নির্বাচিত হন এবং তার কেবিনেটে সকলে জয়লাভ করে।

শেখ মুজিবুর রহমান তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতি শিখেছেন। বাংলাদেশে এমন কোনো মহকুমা নেই এমন কোনো থানা নেই যেখানে তিনি যাননি, ঢাকার প্রথম জীবনে তিনি সাইকেলে ঘুরে দলের কাজ করতেন।[৫৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিু বেতনভুক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ ধর্মঘট আহ্বান করে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সমর্থনে ৫ মার্চ থেকে ছাত্র ধর্মঘট শুরু করে। ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুর রহমান চৌধুরী, অলি আহাদ, দবিরুল ইসলাম, আব্দুল হামিদ চৌধুরী প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতি কোন রকম সহানুভূতি প্রদর্শন করেনি এবং ১১ মার্চ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কাউন্সিল ও মুসলিম লীগ সরকার ২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ৬ জন ছাত্রকে ৪ বছরের জন্য এবং বিভিন্ন হলের ১৫ জন ছাত্রকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে। এর মধ্যে ৬ জন ছাত্রকে জরিমানা করা হয়।[৫৫] ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে ১৯৪৯ সালের ১৭ এপ্রিল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।[৫৬] ১৯ এপ্রিল অবস্থান ধর্মঘটের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েক জন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে। আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার আব্দুল মতিন, এনায়েত করিম, বাহাউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, খালেক নেওয়াজ, আতাউর রহমান, বরিশালে শামসুল হক চৌধুরী, আব্দুল লতিফ, আশরাফ আলী খান চৌধুরী প্রমুখকে গ্রেফতার করে। এ আন্দোলন বরিশালের কাজী বাহাউদ্দিন আহমেদের (১৯২৬-৮৯) নেতৃত্বে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। পুলিশ কাজী বাহাউদ্দিনকে গ্রেফতার করে এবং পরে মুক্তি দেয়। বরিশালে ছাত্রদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে এবং এ মামলায় আসামী হওয়ার কারণে আব্দুল লতিফ সিএসপি হতে পারেননি। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা বহিস্কৃত হলেন- তাঁরা

---

৫৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, ২০১২, পৃ. ৯২-৯৩

৫৫. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, ঢাকা-২০১২, পৃ. ১১৩-১১৪

৫৬. বঙ্গলাল সেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান, ইউপিএল, ২০০৯, পৃ. ২০৫-২১২

Dhaka University Institutional Repository

কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন- দবিরুল ইসলাম, আলী আহসান, আব্দুল হামিদ, আব্দুল মান্নান প্রমুখ। যাঁদের জরিমানা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন-

১. শেখ মুজিবুর রহমান	দ্বিতীয় বর্ষ আইন রোল-১৬৬	এস এম হল
২. কল্যানচন্দ্র দাস গুপ্ত	এম এ প্রথম বর্ষ	ঢাকা হল
৩. নৈমদ্দিন আহমদ	দ্বিতীয় বর্ষ আইন	এস এম হল
৪. নাদেরা বেগম	প্রথম বর্ষ	এস এম হল
৫. মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ	প্রথম বর্ষ বি. এ	এফ এইচ হল

শেখ মুজিব ব্যতীত সকলে জরিমানা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু শেখ মুজিব জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় তাঁর আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হলো না।[৫৭] বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের লেখক কামরুদ্দিন আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন, 'আমার নিজের ধারণা, তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বাস্তব ও সময়োপযোগী হয়েছিল। তিনি তখন জননেতা হবার পথে- তাঁর আর ছাত্র থাকা শোভা পাচ্ছিল না।' শেখ মুজিব মুচলেকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে পড়তে অস্বীকার করে বলেছিলেন- 'শেখ মুজিব আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আসবে তবে ছাত্র হিসেবে নয়, একজন দেশকর্মী হিসেবে।' তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। তাঁকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেয়া হয়।[৫৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের (১৪-০৮-২০১০) কার্যবিবরণীর অংশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্রত্বের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার[৫৯]

১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ, শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কর্তৃক তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্রত্ব বাতিলের গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের বিষয় বিবেচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত : সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ১৯৪৯ সালে আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আইন বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র (রোল-১৬৬, এস এম হল) শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ২৬ মার্চ, ১৯৪৯ সালে যে জরিমানা ও অভিভাবক প্রত্যায়িত মুচলেকা প্রদানের ও অনাদায়ে ছাত্রত্ব বাতিলের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, আজকের সিন্ডিকেট সেই সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য করে।

সভা মনে করে যে, ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তিকৃত ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন ও নেতৃত্বদান ছিল তাঁর অসাধারণ দূরদর্শী ও জ্ঞানদীপ্ত গণতান্ত্রিক চেতনার

---

৫৭. মোহীত উল আলম, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা* ১৯৭১, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন ২০১০, পৃ. ৫১

৫৮. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্বাস*, ঢাকা : স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ১৯৫৭, পৃ. ১৩২

৫৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ১৪/০৮/২০১০ খ্রি. তারিখের সিন্ডিকেটের আলোচ্যসূচি ও সিদ্ধান্তের অনুলিপি।

Dhaka University Institutional Repository

বহিঃপ্রকাশ। অধিকন্তু এটি ছিল ঐ সময়ের সাহসী ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে একটি সাহসী পদক্ষেপ। কর্মচারীদের ন্যায় সংগত আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল যথার্থ। তাঁকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক, অনৈতিক, ন্যায় বিচার ও Rule of audi alterem partem- এর পরিপন্থী ছিল বলে আজকের সভা মনে করে। তাই ১৯৪৯ সালে ২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিন কর্তৃক গৃহীত উক্ত বহিষ্কারাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সর্বসম্মতিক্রমে আজ (১৪-০৮-২০১১০) প্রত্যাহার করছে।

(২) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তানুযায়ী জরিমানা ও মুচলেকা প্রদান না করে সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান যে সাহসী প্রতিবাদী ভূমিকা রেখেছিলেন তা এ সভা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৯ সালে ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সাথে অন্যান্য যাঁরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এ সভা তাঁদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

এ সভা মনে করে এ বহিষ্কারাদেশ বহুপূর্বেই প্রত্যাহার করা উচিত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ২৬-০৩-১৯৪৯ তারিখের ছাত্রত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-কে সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

স্বাক্ষরিত
উপ-রেজিস্ট্রার
প্রশাসন-৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্মারক নং- প্রশা-৫/ তারিখঃ / /২০১০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্তদের নিকট অনুলিপি প্রেরিত হইল:

(১) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাঃ বিঃ।
(২) পরিচালক, জনসংযোগ দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
(৩) উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা-২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

স্বাক্ষরিত
উপ-রেজিস্ট্রার, প্রশাসন-৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভিসি মহোদয় প্রদত্ত মানপত্র[৬০]

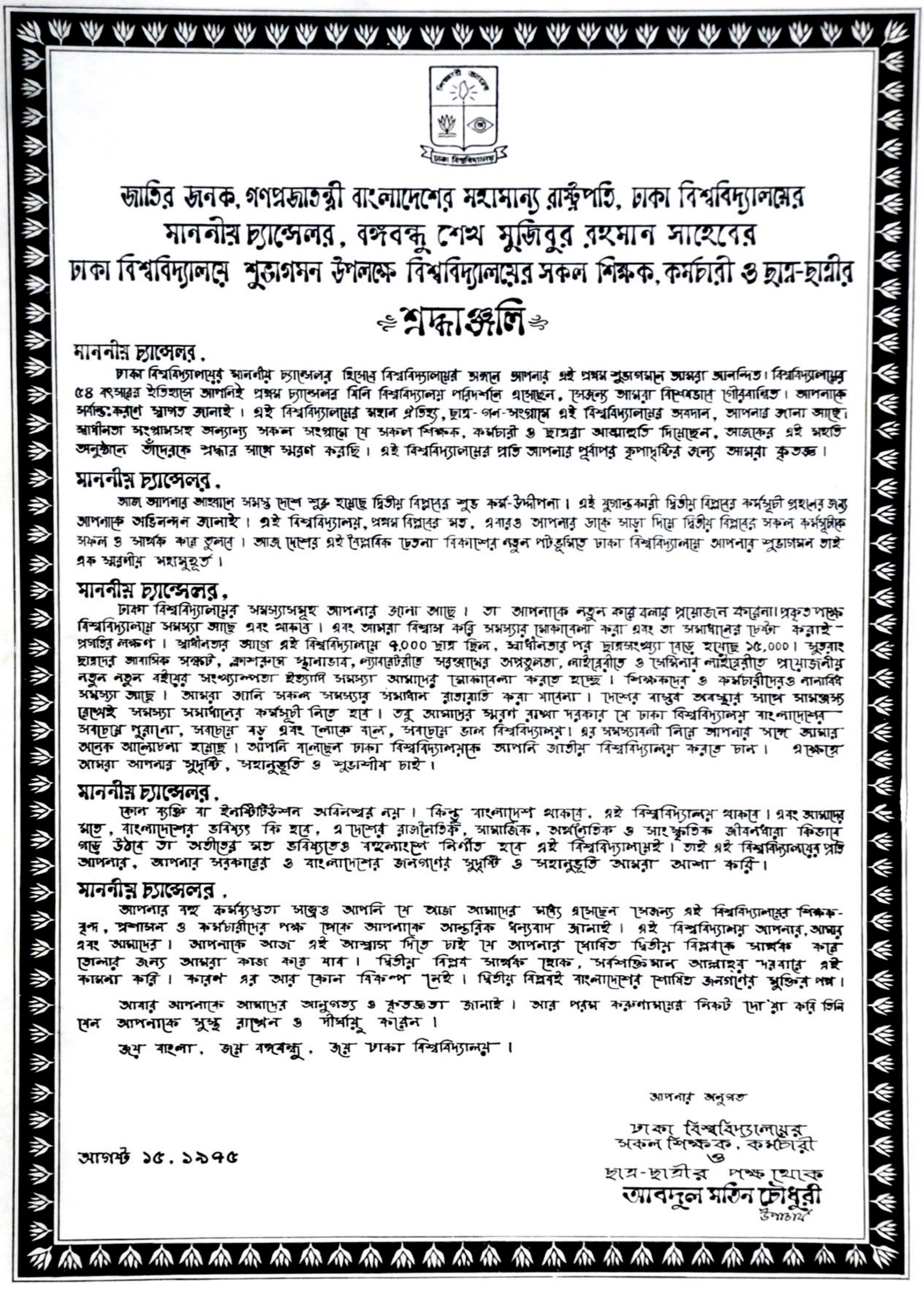

জাতির জনক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
মাননীয় চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভাগমন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাননীয় চ্যান্সেলর,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে আপনার এই প্রথম শুভাগমনে আমরা আনন্দিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪ বৎসরের ইতিহাসে আপনিই প্রথম চ্যান্সেলর যিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছেন, সেজন্য আমরা বিশেষভাবে গৌরবান্বিত। আপনাকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান ঐতিহ্য, ছাত্র-গন-সংগ্রামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান, আপনার জানা আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামসহ অন্যান্য সকল সংগ্রামে যে সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্ররা আত্মাহুতি দিয়েছেন, আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আপনার পূর্বাপর কৃপাদৃষ্টির জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

মাননীয় চ্যান্সেলর,

আজ আপনার আহ্বানে সমস্ত দেশে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিপ্লবের শুভ কর্ম-উদ্দীপনা। এই যুগান্তকারী দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম বিপ্লবের মত, এবারও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে দ্বিতীয় বিপ্লবের সকল কর্মসূচীকে সফল ও সার্থক করে তুলবে। আজ দেশের এই বৈপ্লবিক চেতনা বিকাশের নতুন পটভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার শুভাগমন তাই এক স্মরণীয় মহামুহূর্ত।

মাননীয় চ্যান্সেলর,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাসমূহ আপনার জানা আছে। তা আপনাকে নতুন করে বলার প্রয়োজন করেনা। প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা আছে এবং থাকবে। এবং আমরা বিশ্বাস করি সমস্যার মোকাবেলা করা এবং তা সমাধানের চেষ্টা করাই প্রগতির লক্ষণ। স্বাধীনতার আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭,০০০ ছাত্র ছিল, স্বাধীনতার পর ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫,০০০। সুতরাং ছাত্রদের আবাসিক সঙ্কট, ক্লাশরুমে স্থানাভাব, ল্যাবরেটরীতে সরঞ্জামের অপ্রতুলতা, লাইব্রেরীতে ও সেমিনার লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বইয়ের সংখ্যাল্পতা ইত্যাদি সমস্যা আমাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। শিক্ষকদের ও কর্মচারীদেরও নানাবিধ সমস্যা আছে। আমরা জানি সকল সমস্যার সমাধান রাতারাতি করা যাবেনা। দেশের বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সমস্যা সমাধানের কর্মসূচী নিতে হবে। তবু আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরানো, সবচেয়ে বড় এবং লোকে বলে, সবচেয়ে ভাল বিশ্ববিদ্যালয়। এর সমস্যাবলী নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। আপনি বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করতে চান। এক্ষেত্রে আমরা আপনার সুদৃষ্টি, সহানুভূতি ও শুভাশীষ চাই।

মাননীয় চ্যান্সেলর,

কোন ব্যক্তি বা ইনস্টিটিউশন অবিনশ্বর নয়। কিন্তু বাংলাদেশ থাকবে, এই বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে। এবং আমাদের মতে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি হবে, এ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা কিভাবে গড়ে উঠবে তা অতীতের মত ভবিষ্যতেও বহুলাংশে নির্ণীত হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আপনার, আপনার সরকারের ও বাংলাদেশের জনগণের সুদৃষ্টি ও সহানুভূতি আমরা আশা করি।

মাননীয় চ্যান্সেলর,

আপনার বহু কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আপনি যে আজ আমাদের মধ্যে এসেছেন সেজন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-বৃন্দ, প্রশাসন ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বিশ্ববিদ্যালয় আপনার, আমার এবং আমাদের। আপনাকে আজ এই আশ্বাস দিতে চাই যে আপনার ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবকে সার্থক করে তোলার জন্য আমরা কাজ করে যাব। দ্বিতীয় বিপ্লব সার্থক হোক, সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে এই কামনা করি। কারণ এর আর কোন বিকল্প নেই। দ্বিতীয় বিপ্লবই বাংলাদেশের শোষিত জনগণের মুক্তির পথ।

আবার আপনাকে আমাদের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আর পরম করুণাময়ের নিকট দো'য়া করি তিনি যেন আপনাকে সুস্থ রাখেন ও দীর্ঘায়ু করেন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আপনার অনুগত

আগস্ট ১৫, ১৯৭৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সকল শিক্ষক, কর্মচারী
ও
ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষ থেকে
আবদুল মতিন চৌধুরী
উপাচার্য

---

৬০. ১৫ ই আগষ্ট, ১৯৭৫ খ্রি. তারিখে জাতির জনক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানীয় চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভাগমন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালর সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি (শ্রদ্ধাঞ্জলী টি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।)

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিব ১৯৪৯ সালে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ পুনর্গঠন করেন। ১৯৪৯ সালে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হলেন দবিরুল ইসলাম এবং খালেক নেওয়াজ। ১৯৪৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পিতা বিচারপতি জাহিদুর রহিম সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ৫ মার্চ কপর্দকহীন অবস্থায় করাচীতে তাঁর শ্বশুর বিচারপতি আবদুর রহিমের বাসভবনে ওঠেন এবং পরে তাঁর জামাতা সুলেমানের লাখাম হাউজে বাস করতেন। সরকার তাঁকে করাচীতে আইন ব্যবসা করতে দেয়নি। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাযিমউদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উভয়ে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী মুসলিম ছাত্রলীগকে সুগঠিত করার নির্দেশ দেন এবং বিরোধী দল গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৬১]

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাযিমউদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সোহরাওয়ার্দীকে ভয় করতেন। তারা যখন জানতে পারলেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য আসছেন তখন তাঁর গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিলের জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তারা পাকিস্তান নির্বাচনবিধি সংশোধন নয় এবং নতুন সংশোধনী প্রস্তাব করলেন- যে সকল সদস্য পাকিস্তানের নাগরিক নয় এবং যারা কমপক্ষে পাকিস্তানে ৬ মাস বাস করেনি, গণপরিষদে তাদের সদস্যপদ বাতিল হবে। সোহরাওয়ার্দীর অনুগত মুসলিম লীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ফরমুজুল হক সোহরাওয়ার্দীর জন্য শান্তিনগরে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন। কিন্তু টাকার অভাবে সোহারাওয়ার্দীর বাড়ি করা হয়নি। তিনি ফরমুজুল হককে তার জমি ফেরত দেন।[৬২]

১৯৪৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে নির্বাচন বিধি সংশোধন অনুমোদিত হয়। সোহরাওয়ার্দী নির্বাচন বিধি সংশোধনের বিরোধিতা করেন। তিনি গণপরিষদে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, জীবিতকালে কোন ব্যক্তির তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকা অথবা শোকসভায় ভাষণ দেয়ার সুযোগ হয় না"। সোহরাওয়ার্দী আরো বলেন, সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য দু'রাষ্ট্রের মধ্যে অধিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধ করার অপরাধে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হতে যাচ্ছে। পাকিস্তান সরকার হিন্দুদের ভারতে প্রেরণ করে তাদের বাড়িঘর দখল করতে চায়। ১৯৪৯ সালের ২ মার্চ গণপরিষদের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়, "সরকার গতকাল এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দীর পাকিস্তান গণপরিষদের আসন শূন্য ঘোষণা করেছে"।[৬৩] লিয়াকত আলী খান গণপরিষদের স্পীকার তমিজউদ্দিন খানকে সোহরাওয়ার্দীর সদস্যপদ বাতিল করতে বাধ্য করে। পাকিস্তান আন্দোলনের সিপাহসালার, হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদের সদস্যপদ কেড়ে নেয়ার জন্য কি হীন চক্রান্তই না করেছে মুসলিম লীগ সরকার। শুরু হলো হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়- পাকিস্তানের

---

৬১. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্বাস*, ঢাকা : ১৯৫৭, পৃ. ১৩২

৬২. *প্রাগুক্ত*

৬৩. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দল গড়ে তোলা। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে পাকিস্তানের শাক্তিশালী বিরোধী দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করেন।[৬৪]

১৯৪৯ সালের ৫ মার্চ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসেন। তাঁর শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শহীদুল হকের নিকট পরাজয় বরণ করেন। নির্বাচনে ভোটার ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্যগণ। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাযিমউদ্দিন আইনসভার সদস্য ছিলেন না। সুতরাং তাঁকে ৬ মাসের মধ্যে সদস্য হতে হবে। ১৯৪৮ সালে টাঙ্গাইল আসন খালি হলে খাজা নাযিমউদ্দিন প্রার্থী হন। উক্ত আসনে মওলানা ভাসানী প্রার্থী হলে পরাজয়ের ভয়ে খাজা নাযিমউদ্দিন তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন। তিনি অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে স্কুল টেক্স্ট রোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করলে তার আসন শূন্য হয়ে পড়ে। পরে খাজা নাযিমউদ্দিন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর ভূয়াপুরের শূন্য আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। মিথ্যা অভিযোগে মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইল আসন বাতিল করা হয়। তাঁর শূন্য আসনে ১৯৪৯ সালের ২৫ এপ্রিল উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী ছিলেন করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী এবং সোহরাওয়ার্দী দলের প্রার্থী হলেন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা টাঙ্গাইলের শামসুল হক। কে কে পন্নী জমিদার এবং শামসুল হক সাধারণ কৃষকের ছেলে। শামসুল হকের অর্থ নেই, তার পক্ষে আছে কৃষক সমাজ এবং ১৫০ নম্বর মোগলটুলি ক্যাম্পের নেতা ও কর্মীগণ। শেখ মুজিবুর রহমান এক বিরাট কর্মীবাহিনী নিয়ে শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যান। শামসুল হকের পক্ষে ছিলেন- কামরুদ্দিন আহমদ, আলমাস আলী, আউয়াল, শামসুজ্জোহা, তাজউদ্দিন আহমদ, শওকত আলী, খোদা বক্স মোক্তার প্রমুখ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গভর্নর জেনারেল খাজা নাযিমউদ্দিন, নূরুল আমিন সরকারি শক্তি নিয়ে কে কে পন্নীর পক্ষে প্রচারাভিযান চালান। নির্বাচনে শামসুল হক বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। শামসুল হকের বিজয়ে সারা পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ভিত কেঁপে ওঠে। এরপর পরাজয়ের ভয়ে মুসলিম লীগ কোন উপনির্বাচন দেয়নি এবং সাধারণ নির্বাচন বিলম্বিত করে।[৬৫]

পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শরৎ বসুর বিজয় এবং টাঙ্গাইলে শামসুল হকের বিজয় প্রমাণ করে যে, জনগণ স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার পক্ষে ছিল। একটি রাজনৈতিক দল গঠনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আগ্রহী ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৪ এপ্রিল অবস্থান ধর্মঘটকালে পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে এবং তিনি ২৭ জুলাই পর্যন্ত ঢাকা জেলে আটক ছিলেন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে কয়েক দফা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় অবস্থান করেন। মুসলিম ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক দবিরুল ইসলাম মার্চ মাসে নিজ জেলা দিনাজপুরে গেলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁকে দিনাজপুর জেলে আটক রাখে। এ সময় এম. আর. আখতার মুকুল দিনাজপুরে জেলে বন্দী ছিলেন। ঢাকা হাইকোর্টে দবিরুল ইসলামের হেবিয়াস কর্পাস মামলা পরিচালনার জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী এপ্রিল মাসে ঢাকায় আসেন। দবিরুল ইসলামকে জেলে

৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

৬৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কয়েক বছর পর দবিরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন।[৬৬]

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনকালে ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অবস্থানরত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর পুরানো কর্মীদের সাথে নতুন দল গঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি ঢাকায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে আলোচনা করেন। নেতাকর্মীগণ জনসাধারণের দল গঠনের পরামর্শ দেন। কারণ সরকারী মুসলিম লীগের দরজা সাধারণ মানুষের জন্য খোলা ছিল না। সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের নেতা মানকী শরীফের পীরের দলের নামানুসারে দলের নাম ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ রাখার পরামর্শ দেন। মানকী শরীফের দলের নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। সোহরাওয়ার্দী আসাম থেকে আগত মওলানা ভাসানীকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি নিয়োগ করার নির্দেশ দেন। টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে শামসুল হকের বিজয় ছাত্র-যুবকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ সৃষ্টি করে। সরকারী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দল গঠন করার জন্য চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। সোহরাওয়ার্দীর অনুরাগী শামসুল হক, মওলানা আব্দুল রশীদ তর্কবাগীশ, মওলানা রাগীব প্রমুখের উদ্যোগে নতুন দল গঠনের জন্য ঢাকার স্বামীবাগে কাজী মুহাম্মদ বশীর হুমায়ুনের (১৯২১-১৯৮২) রোজ গার্ডেনের বাসভবনে ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন সভা আহ্বান করা হয়। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও ইয়ার মুহাম্মদ খানকে সম্পাদক করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। ৭ সভায় ৩০০ ডেলিগেট যোগ দেন।[৬৭] সভায় উপস্থিত ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক, আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, কামরুদ্দিন আহমদ, মওলানা রাগীব আহসান, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, ইয়ার মুহাম্মদ খান, তাজউদ্দিন আহমদ, খান সাহেব ওসমান আলী, খয়রাত হোসেন, শেখ আব্দুল আজিজ, কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, আনোয়ারা খাতুন, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুস সালাম খান, আব্দুল জব্বার খদ্দর, অলি আহাদ, আরিফ হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। সভার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন টাঙ্গাইলের শামসুল হক। তিনি ১৫০ নম্বর মোগলটুলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সকল কর্মী নিয়ে রোজগার্ডেনে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোহরাওয়ার্দী দলীয় এমএলএ মওলানা রাগীব আহসান। এ.কে. ফজলুল হক সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ দল গঠনে শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মতি ছিল। এ সময় তিনি জেলে বন্দী। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।[৬৮]

---

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

৬৭. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : ভূমিকা, ২০১০, পৃ. ৩৯

৬৮. সম্মেলনে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। কমিটির সদস্য ছিলেন-

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী	-	সভাপতি
আতাউর রহমান খান	-	সহ-সভাপতি

Dhaka University Institutional Repository

নারায়নগঞ্জের মরহুম ওসমান আলীর বাসভবনে পরের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো রচনা করেন শামসুল হক এবং সভায় তা অনুমোদিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ ১২ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে-[৬৯]

আওয়ামী মুসলিম লীগের ১২ দফা কর্মসূচী

১. পাকিস্তান একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হবে। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে জনসাধারণ।

২. রাষ্ট্রে দু'টি আঞ্চলিক ইউনিট থাকবে- পূর্ব ও পশ্চিম।

৩. অঞ্চলগুলো লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে থাকবে এবং অন্য সকল বিষয় ইউনিটগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

৪. সরকারি পদাধিকারী ব্যক্তিরা কোন বিশেষ সুবিধা বা অধিকারভোগী হবেন না কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বেতন বা ভাতার অধিকারী হবেন না।

৫. সরকারি কর্মচারীরা সমালোচনার অধীন হবেন, কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য তাদের পদচ্যুত করা যাবে এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তাদের ছোটখাটো বা বড় রকমের সাজা দেয়া যাবে। আদালতে তারা কোন বিশেষ সুবিধার অধিকারী হবেন না। কিংবা আইনের চোখে তাদের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাত প্রদর্শন করা হবে না।

৬. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবেন- যথা বাকস্বাধীনতা, দল গঠনের স্বাধীনতা, অবাধ গতিবিধি ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার।

৭. সকল নাগরিকের যোগ্যতানুসারে বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার থাকবে এবং তাদের যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেয়া হবে।

৮. সকল পুরুষ ও নারীর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

আলী আহমদ খান এমএলএ	-	সহ-সভাপতি
আলী আমজাদ খান	-	সহ-সভাপতি
সাখাওয়াত হোসেন	-	সহ-সভাপতি
আব্দুস সালাম খান	-	সহ-সভাপতি
শামসুল হক	-	সম্পাদক
শেখ মুজিবুর রহমান	-	যুগ্ম-সম্পাদক
খন্দকার মোশতাক আহমদ	-	সহ-সম্পাদক
এ.কে.এম. রফিকুল ইসলাম	-	সহ-সম্পাদক
ইয়ার মুহাম্মদ খান	-	কোষাধ্যক্ষ (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১)

৬৯. *Hossain Sahid Suharwady-Memoirs*, Edited by Mohammad H.R. Talukder, UPL, Dhaka, 1987, P. 112-114

Dhaka University Institutional Repository

৯. পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোতে সকল নাগরিকের যোগদানের অধিকার থাকবে। একটি বিশেষ বয়সসীমা পর্যন্ত সকলের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিজস্ব স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর ইউনিট গঠন করা হবে।

১০. মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ দেয়া হবে এবং কোন অবস্থাতেই কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা হবে না। বিনা বিচারে কাউকে দণ্ডদান বা নিধন করা হবে না।

১১. বিনা খেসারতে জমিদারী ও অন্য সকল মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা হবে। সকল আবাদযোগ্য জমি পুনর্বণ্টন করা যাবে।

১২. সকল জমি জাতীয়করণ করা হবে।[৭০]

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা, পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি দাবি নিয়ে আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৭১]

প্রতিষ্ঠাকাল হতে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক বৃন্দ-[৭২]

সাল	পদবি	নাম
১৯৪৯-৫২	সভাপতি সম্পাদক	মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মুহাম্মদ শামসুল হক
১৯৫৩-৫৭ মার্চ	সভাপতি সম্পাদক	মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমান
১৯৫৭-৫৮ ১৯৫৩-৫৮	সভাপতি সম্পাদক	মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ শেখ মুজিবুর রহমান
১৯৬৪-৬৬ ১৯৬৬-৭০	সভাপতি সভাপতি সম্পাদক	মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দিন আহমদ
১৯৭০-৭৩	সভাপতি সম্পাদক	শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দিন আহমদ
১৯৭৪-৭৫	সভাপতি সম্পাদক	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান জিল্লুর রহমান
১৯৭৬	আহ্বায়ক	মিসেস জোহরা তাজউদ্দিন
১৯৭৮-৮১	সভাপতি সম্পাদক	আব্দুল মালেক উকিল আব্দুর রাজ্জাক

৭০. সিরাজুদ্দীন হোসেন, *ইতিহাস কথা কও*, ঢাকা : ১৯৭৪, পৃ. ১৫৮-১৫৯

৭১. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *ইসলাম প্রচার-প্রসারে-জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ১০

৭২. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১-৮৪	সভাপতি সম্পাদক	শেখ হাসিনা আব্দুর রাজ্জাক
১৯৮৫-২০০২	সভাপতি সম্পাদক	শেখ হাসিনা মো. জিল্লুর রহমান
২০০৩-২০০৯	সভাপতি সম্পাদক	শেখ হাসিনা আব্দুল জলিল
২০০৯- বর্তমান	সভাপতি সম্পাদক	শেখ হাসিনা সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় ২৩ জুন। শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্ত হলেন। মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিব সারা পূর্ব বাংলা সফর করেন, আওয়ামী লীগের জেলা ও মহকুমা কমিটি গঠন করেন। পূর্ববাংলায় সোহরাওয়ার্দীর গতিবিধি তখনও 'নিয়ন্ত্রিত' এবং তিনি সরাসরি দল গঠনের এগিয়ে আসতে পারেননি। তাঁর নেতা-কর্মীরা নতুন দল গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সকল পত্রিকা সরকারের কথা বলে, সাধারণ মানুষের কোন পত্রিকা নেই। দলের সিদ্ধান্ত হলো ইত্তেফাক নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। মওলানা ভাসানী ইয়ার মুহাম্মদ খান ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নামে ইত্তেফাক প্রকাশের অনুমতি লাভ করেন। আসগর হোসেন এমএলএ'র ঢাকার ৭৭ নম্বর মালিটোলার বাসভবনে অবস্থিত ছাপাখানা থেকে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং প্রকাশ ইয়ার মুহাম্মদ খান। কিছুকাল পর ইত্তেফাক ঢাকার কলতাবাজার করিম প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। মুসলিম লীগের ভয়ে প্রেসগুলো পত্রিকা ছাপাতে অস্বীকার করে। মওলানা ভাসানীর স্থলে ইয়ার মুহাম্মদ খানকে পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকার করা হয়। সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ঢাকার ৯ নম্বর হাটখোলা রোডে অবস্থিত প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত ও ৯৪ নম্বর নবাবপুর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী নিজ অর্থে পত্রিকার জন্য প্রেস ও টিকাটুলির বর্তমান ইত্তেফাক অফিসের জমি ক্রয় করেন। আওয়ামী লীগ ও দৈনিক ইত্তেফাকের পিছনে রয়েছে হোসেন সোহরাওয়ার্দীর অতুলনীয় অবদান।[৭৩] আওয়ামী লীগের প্রথম অফিস ছিল ইয়ার মুহাম্মদ খানের ১৮ নম্বর কারকুন বাড়ি লেন। পরে আওয়ামী লীগের অফিস ৯৪ নম্বর নবাবপুর রোডে স্থানান্তর করা হয়। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় ইয়ার মুহাম্মদ খানের অবদান অপরিসীম।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে দবিরুল ইসলামকে সভাপতি এবং খালেক নেওয়াজকে সাধারণ সম্পাদক

৭৩. Edited by Mohammad H.R Ralukden, *OP. Cit.*

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত করা হয়। দবিরুল ইসলামকে মুসলিম লীগ সরকার দীর্ঘদিন জেলে আটক রাখে। তার অনুপস্থিতিতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত শামসুল হক চৌধুরী ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন।[৭৪]

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে ময়মনসিংহে মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহের পরই ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে নূরুল আমিন ও হামিদুল হক চৌধুরীর দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নূরুল আমিন হামিদুল হক চৌধুরী ও বরিশালের মুসলিম লীগ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমদকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন অভিযোগে সরকার মহিউদ্দিন আহমদকে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সাল থেকে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববাংলায় সোহরাওয়ার্দীর চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি যেন কোনদিন পূর্ব বাংলায় রাজনীতি না করতে পারেন সেজন্য তাঁর বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে অন্যায়ভাবে শামসুল হকের আইনসভার সদস্যপদ বাতিল করে। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের ওপর, দলের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী, সম্পাদক শামসুল হক, যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানসহ শত শত নেতা-কর্মী জেলে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন শামসুল হকের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়, ফলে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।[৭৫]

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে মাওলানা ভাসানী ও শামসুল হককে জেল থেকে মুক্তি দিলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সরকার মুক্তি দেয়নি। ১৯৫০ সালের ১৪ আগস্ট জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে "পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য ভারতের লেলায়িত কুকুর" বলে আখ্যায়িত করেন। সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী পরিচালিত বিরোধী আওয়ামী মুসলিম লীগকে সতর্ক করে লিয়াকত আলী খান বলেন: "যো আওয়ামী লীগ করেগা, উসকো শেরহাম কুচালদে গা।" লিয়াকত আলী খান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। তিনি সোহরাওয়ার্দীর পাকিস্তান আগমন ও তাঁর দলকে পছন্দ করতেন না। তিনি নিজের দলের মধ্যে বিরোধিতা নির্মমভাবে দমন করেন। পূর্ব বাংলার রাজস্ব ও অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীকে তিনি পদচ্যুত করেন এবং PRODA প্রয়োগ করে তাকে উচ্চপদে থাকার অযোগ্য ঘোষণা করেন।[৭৬]

স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালে ভারত সংবিধান প্রণয়ন করে। কিন্তু পাকিস্তান তখন পর্যন্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়নে কোন উদ্যোগ গ্রহন করেনি। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লিয়াকত আলী খান ভবিষ্যত

৭৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭

৭৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০ ও ১১৩-১১৪

৭৬. মুনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১৯১-২০০

Dhaka University Institutional Repository

শাসনতন্ত্র রচনার ভিত্তি হিসেবে মূলনীতি কমিটির (Basic Principles Committee Report) গণপরিষদে পেশ করেন। এই নীতির বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগ ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে গ্রান্ড ন্যাশনল কনভেনশন আহ্বান করে। সভায় ফজলুল হক, কামরুদ্দিন আহমদ, আতাউর রহমান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মওলানা ভাসানী, শামসুল হক ও শেখ মুজিব তখন জেলে বন্দী। মূলনীতির সুপারিশ অনুসারে পাকিস্তানে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে। উচ্চকক্ষে ৫টি প্রদেশ থেকে সমান সংখ্যক সদস্য থাকবে এবং দ্বিতীয় কক্ষে জনসংখ্যার হার অনুপাতে গঠিত হবে। মূলনীতিতে সংসদের পূর্ব বাংলার অংশ সমান ছিল না এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা উল্লেখ ছিল না। আওয়ামী লীগ প্রদেশব্যাপী মূলনীতি রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করার জন্য সংবিধান রচনার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিপিপি সমালোচনা করে বলেন, সরকার পদ্ধতি, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন, রাষ্ট্রভাষা, স্বায়ত্তশাসন, পৃথক বা যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি মূলনীতিতে আলোচিত হয়নি। শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়ায় জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হতে পারেনি। কামরুদ্দিন আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ, সাখাওয়াত হোসেন, আব্দুল ওয়াদুদ, সৈয়দ মুহাম্মদ আলী, তাসাদ্দক আহমদ, আব্দুল মতিন পাকিস্তান অবজারভার অফিসে বসে কমিটি অব এ্যাকশন ফর ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন গঠন করেন। কামরুদ্দিন আহমদকে কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগও একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটিতে ছিলেন আতাউর রহমান খান, রফিকুল ইসলাম, মানিক মিয়া, নূরুল ইসলাম প্রমুখ। ওদিকে হামিদুল হক চৌধুরী ও শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগও একটি কমিটি গঠন করে। কামরুদ্দিন আহমেদের কমিটি একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে সকল জেলায় প্রেরণ করে। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন আহ্বান করা হয়। সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান। দু'দিনব্যাপী আলোচনার পর সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের প্রস্তাব- 'এক লোক এক ভোট' গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১ সালের পাকিস্তানে মুখ্য আলোচনা ছিল পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র নিয়ে।[৭৭]

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পরে প্রগতিশীল যুবকগণ মুসলিম লীগ বিরোধী দল গঠনে এগিয়ে আসে। পূর্ব বাংলার যুব সম্প্রদায়কে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে মাহমুদ নূরুল হুদা ও মুসলিম ছাত্রলীগের সাবেক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন ঢাকায় ১৯৫১ সালের ২৭ মার্চ সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলন ভণ্ডুল করার জন্য সরকার ঢাকা বারসহ সমগ্র শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

৭৭. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-১০১

Dhaka University Institutional Repository

বুড়িগঙ্গা নদীতে ১৪৪ ধারা না থাকায় ভাসমান নৌকায় রাতের অন্ধকারে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালের ২৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ গঠিত হয়।[৭৮]

যুবলীগ গঠন পূর্ব বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রগতিশীল দল হিসেবে যুবলীগ মুক্ত সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যুবলীগ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। ভাষা আন্দোলনে যুবলীগ নেতা-কর্মীদের ভূমিকা চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পূর্ব বাংলার প্রথম জিওসি ছিলেন মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান। ১৯৫০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আইয়ুব খান প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্রেসির নিকট থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেনারেল গ্রেসি অবসর গ্রহন করে ইংল্যান্ডে চলে যান। কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে ডিঙ্গিয়ে আইয়ুব খানকে পদোন্নতি দিলে সেনাবাহিনীর ভিতরে অসন্তোষ শুরু হয়। প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা ও জেনারেল আইয়ুব খান একত্রিত হয়ে জেনারেল আকবর খান, পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার সম্পাদক কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক সাজ্জাদ জহির, বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন জানজুয়া, মেজর ইসহাক, ক্যাপ্টেন নিয়াজ মুহাম্মদ, কমরেড, মুহাম্মদ হোসনে আতা প্রমুখের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ সরকার উৎপাতের ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এ মামলা পিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আসামীদের আইনজীবী ছিলেন। হায়দারাবাদ জেলে ক্যামেরা বিচার শুরু হয়। মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন আইয়ুব খান। তাকে কয়েক ঘণ্টা সোহরাওয়ার্দী জেরা করেছিলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি সোহরাওয়ার্দীর ওপর রাগান্বিত হন। পরবর্তীতে আইয়ুব খান সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন

---

৭৮. কমিটির সদস্যরা ছিলেন-

মাহমুদ আলী	-	সভাপতি
খাজা আহমদ	-	সহ-সভাপতি
ইয়ার মুহাম্মদ খান	-	সহ-সভাপতি
শামসুজ্জোহা	-	সহ-সভাপতি
আব্দুল মজিদ	-	সহ-সভাপতি
মিসেস দৌলতুন্নেসা	-	সহ-সভাপতি
অলি আহাদ	-	সম্পাদক সম্পাদক
আব্দুল মতিন	-	যুগ্ম-সম্পাদক
রুহুল আমিন	-	সহ-সম্পাদক
তসাদ্দক আহমদ চৌধুরী	-	কোষাধ্যক্ষ
মুহাম্মদ নূরুল হুদা	-	সদস্য
মুহাম্মদ তোয়াহ	-	সদস্য
আব্দুস সামাদ	-	সদস্য
কেজি মোস্তফা	-	সদস্য
এম.এ. অদুদ	-	সদস্য
তাজউদ্দিন আহমদ	-	সদস্য
আব্দুল গাফফার চৌধুরী	-	সদস্য

(সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩)

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রশীদ এবং সরকারী আইনজীবী ছিলেন এ.কে. ব্রোহী। মামলায় আসামীদের দীর্ঘমেয়াদী শাস্তি দেয়া হয়। মামলায় ত্রুটি থাকার জন্য আসামীরা ১৯৫৬ সালে মুক্তি পায়। পিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা করে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন।[৭৯]

জেনারেল আইয়ুব খান, অর্থমন্ত্রী গোলাম মুহাম্মদ এবং মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। তারা জেনারেল আকবরকে দমন করার পর লিয়াকত আলী খানকে হত্যার যড়যন্ত্র করে। ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সময় আততায়ী আকবর লিয়াকত আলী খানকে গুলি করে হত্যা করে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যার সাথে পাকিস্তানের গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে এবং আমলাতন্ত্রের উত্থান হতে থাকে। গণপরিষদের অনুমোদন না নিয়ে আমলা অর্থমন্ত্রী গোলাম মুহাম্মদকে গভর্নর জেনারেল এবং খাজা নাযিমউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ১৯৫১ সালের ১৯ অক্টোবর খাজা নাযিমউদ্দিনের নতুন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে-[৮০]

১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা বাংলায় কৃত্রিম রবণ সঙ্কট সৃষ্টি করে এবং পূর্ববাংলার লবণ শিল্প ধ্বংস করে দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের লবণ পূর্ব বাংলায় আমদানি করে মুনাফা অর্জন করা। লবণের সের দাঁড়ায় ১৬ টাকায়। ফলে মুসলিম লীগ সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। আওয়ামী মুসলিম লীগ ও যুবলীগ জনসভা করে মুসলিম লীগ সরকারের দুর্নীতি ও স্বৈরশাসনের চিত্র জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে।[৮১]

---

৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

৮০. মন্ত্রীসভার সদস্যরা ছিলেন-

খাজা নাযিমউদ্দিন	-	প্রধানমন্ত্রী
স্যার জাফরুল্লাহ খান	-	পররাষ্ট্র
ফজলুর রহমান	-	বাণিজ্য, শিক্ষা
চৌধুরী মুহাম্মদ আলী	-	অর্থ
আব্দুস সাত্তার পীরজাদা	-	খাদ্য, কৃষি ও আইন
খাজা শাহাবুদ্দিন	-	স্বরাষ্ট্র, বেতার ও তথ্য
এম.এ. গুরমানি	-	সীমান্ত, দেশীয় রাজ্য
সর্দার বাহাদুর খান	-	যোগাযোগ
ডাঃ এ.এম. মালেক	-	শ্রম, স্বাস্থ্য, পূর্ত
সর্দার আব্দুর রব নিশতার	-	শিল্প
ডঃ মুহাম্মদ হোসেন	-	কাশ্মীর
ডঃ আই.এইচ. কোরেশী	-	মোহাজের পুনর্বাসন

(সিরাজ উদদীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪)

৮১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ সালের ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত যুবলীগের বার্ষিক সম্মেলনে ১৯৫২-৫৩ সালের যুবলীগ কমিটি গঠন করা হয়। ভাষা আন্দোলনে ও বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে যুবলীগ সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে।[৮২]

ভাষা আন্দোলন ও কারাবরণ

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ফজলুল হক হল এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ছাত্ররা মধুর ক্যান্টিনে একত্রিত হয়ে খাজা নাযিমউদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদ করে এবং ৩১ জানুয়ারি হরতাল আহ্বান করে। ৩১ জানুয়ারি সকল স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্রসমাজের মুখে স্লোগান ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে।' নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। নারায়নগঞ্জের তরুণ নেতা মোস্তফা সারওয়ার এবং সরগাম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ শহরের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতা রাস্তায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল নারায়ণগঞ্জবাসী। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার সকল জেলা, মহকুমায় আন্দোলন, সভা, মিছিল চলছে। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৫০ নম্বর মোগলটুরি অফিসে ৭ ফেব্রুয়ারি ২৮ সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠন করা হয়।[৮৩]

মওলানা ভাষানীকে সভাপতি ও কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ২৯ সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট, মিছিল ও জনসভার আহ্বান করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন। সংগ্রাম পরিষদের অর্থ সংগ্রহের জন্য ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নূরুল আমিন সরকার ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সন্ধ্যা ৭টায় ৯৪ নবাবপুর রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দেয়।

---

৮২. উক্ত কমিটির সদস্যগণ ছিলেন নিম্নরূপ

মাহমুদ আলী	-	সভাপতি
মির্জা গোলাম হাফিজ	-	সহ-সভাপতি
খাজা আহমদ	-	সহ-সভাপতি
মুহাম্মদ তোয়াহা	-	সহ-সভাপতি
ইয়ার মুহাম্মদ খান	-	সহ-সভাপতি
শামসুজ্জোহা	-	সহ-সভাপতি
অলি আহাদ	-	সাধারণ সম্পাদক
মুহাম্মদ সুলতান	-	যুগ্ম সম্পাদক
ইমাদুল্লাহ	-	যুগ্ম সম্পাদক

(সিরাজ উদদীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫)

৮৩. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

২০ ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিব জেলে অন্তরীণ। তিনি মুক্ত থাকলে তাঁর কাছ থেকে সংগ্রামী নেতৃত্ব আশা করা যেত।[৮৪]

শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। সরকার তাঁকে বেশি ভয় করত; তাই তাঁকে গ্রেফতার করে রাখে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন শুরু করেন। তাঁদের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালে ছাত্রনেতাদের আগমন এবং তাঁদের সাথে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের পরামর্শ দিতেন। ছাত্র-জনতার ওপর তার প্রচণ্ড প্রভাব দেখে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে এবং মহিউদ্দিন আহমদকে ফরিদপুর জেলে প্রেরণ করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি অনশন অবস্থায় শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমদ নারায়ণগঞ্জে স্টীমার ঘাটে পৌঁছলে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবকে দেখার জন্য সমবেত হয়। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং ভাষা আন্দোলন চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি ফরিদপুর জেলে দুর্বল হয়ে পড়েন। ২৭ ফেব্রুয়ারি সরকার তাকে এবং মহিউদ্দিন আহমদকে মুক্তি দেয়।[৮৫]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেও ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মহিন, গাজীউল হক, শামসুল আলম, এস.এ. বারী এ.টি., এম.আর. আখতার মুকুল, হাবিবুর রহমান শেলী প্রমুখ। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হয়। সমবেত ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য আওয়ামী লীগ সম্পাদক শামসুল হক অনুরোধ জানান। অন্যদিকে গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।[৮৬] এ সময় আব্দুস সামাদের মধ্যস্থতায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ৫ জন ৫ জন করে দশজনের দল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আইনসভার দিকে অগ্রসর হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের নিকট পুরাতন আইনসভার ভবন ছিল। প্রথমে নাদিরা বেগমের নেতৃত্বে মেয়েদের দলটি অগ্রসর হয়- পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। তারপর ছেলেদের দলটি অগ্রসর হয়- প্রথম দলে ছিলেন আব্দুল মতিন, গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান, শামসুল আলম, এম.আর, আখতার মুকুল প্রমুখ। শত শত ছাত্র মিছিল করে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ও মুখ্য সচিব পাঞ্জাবী আজিজ আহমদ ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবসতা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখন আইজি পুলিশ জাকির হোসেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরায়শি, ডিআইজি হাফিজুদ্দিন, পুলিশ সুপার ইদ্রিস এবং সিটি এসপি মাসুদ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উপস্থিত ছিলেন এবং তারা পুলিশ দিয়ে হলগুলো ঘিরে ফেলে। তারা গুলির নির্দেশ দেন। পুলিশের

৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

৮৫. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

টিয়ারগ্যাস সের নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জের ফলে ছাত্ররা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সমবেত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররাও মেডিক্যাল কলেজে সমবেত হয়েছে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যখন দেখলো ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছে তখন তারাও মিছিলে যোগ দেয়। এ কথা সত্যি- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় মিছিল করে এবং অন্যদিকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ পিছিয়ে ছিলেন না- তারা এগিয়ে আসেন। আইনসভার অধিবেশন ৩টায় শুরু হবে। এমএলএগণ কড়া পুলিশী প্রহরায় জীপে যাচ্ছে- ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, নাযিম-আমিন নিপাত যাক, পুলিশ জুলুম চলবে না প্রভৃতি স্লোগান দিচ্ছে। বেলা ৩টা ২০ মিনিট মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে সমবেত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করলে মেডিক্যাল কলেজ ব্যারাকের পাশে (বর্তমান শহীদ মিনার) দাঁড়ানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম.এ. ক্লাসের ছাত্র জব্বার গুলিবিদ্ধ হন এবং তার মাথার খুলি উড়ে যায়। তারপর রফিক, বরকত, সালাম মেডিক্যাল কলেজের সামনে গুলিবিদ্ধ হন। তাদের ধরাধরি করে হাসপাতালে নেয়া হয়। মাত্র ৩০ মিনিটে ৩-২০ মিনিট হতে ৩-৫০ মিনিটের গুলি বর্ষনে বাঙ্গালি জাতিকে প্রবলভাবে কাপিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে তারা মৃত্যুবরণ করেন। জব্বার, রফিক, সালাম ও বরকতের মৃত্যুর খবরে ঢাকার জনতা রাস্তায় বেরিয়ে আসেন এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে সমাবেত হয়।[৮৭]

ছাত্র হত্যার সংবাদ আইনসভায় পৌঁছলে বিরোধী দলের এমএলএগণ এই জঘন্য ছাত্র হত্যার বিচার দাবি করেন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরে বলেন, “এ হলো কল্পনাবিলাসী গল্প।” তিনি আরো বলেন, “পুলিশ ঠিকই করেছে ... উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য পুলিশ। এর পিছনে কমিউনিস্টদের উস্কানি আছে। তাদের নির্মুল করবই।” পরিষদ সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে আইনসভা মুলতবি দাবি করেন। ছাত্র হত্যার সংবাদ শুনে শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক তাঁর ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়াকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হলেন এবং তীব্র ভাষায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানান। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে ২২ ফেব্রুয়ারি জানাজা অনুষ্ঠিত হবে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আইনসভার সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ, আনোয়ারা বেগম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, খয়রাত হোসেন মুসলিম লীগ ত্যাগ করে মেডিক্যাল কলেজে ছুটে আসেন এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানান। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে পুলিশ জব্বার, বরকত, রফিকের লাশ নিয়ে যায় এবং সরকারের নির্দেশে তাদের আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতা মেডিক্যাল কলেজে সমবেত হয়। কিন্তু লাশ নেই। তারা গায়েবি জানাজা পড়ে মিছির করে নবাবপুরের দিকে যাচ্ছে। জব্বার, রফিক, বরকতের রক্তমাখা কাপড় নিয়ে ছাত্ররা মিছির করছে। হাইকোর্টের নিকট হঠাৎ পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে শফিকুর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ১৯ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা ও শোকসভায় এ.কে. ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি রাতে জব্বার, রফিক, বরকত ও শফিকের

---

৮৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮-২০৬

Dhaka University Institutional Repository

সরণে মেডিক্যাল কলেজের সামনে শহীদ মিনার নির্মিত হয় এবং তা শহীদ শফিকের বাবাকে দিয়ে উন্মোচন করা হয়।[৮৮] ২৩ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন, মিছিল, সভা চলে। সারা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ শত শত ছাত্র-জনতা গ্রেফতার করে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ। কমিউনিস্ট ও তমদ্দুন মজলিস ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়। আইনসভার সদস্য মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, শামসুল হক ও কংগ্রেস সদস্যগণ আন্দোলনে অংশ নেন। তাদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকে বেগবান করে। নূরুল আমিন সরকারের আইনসভার সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ ও খয়রাত হোসেনকে গ্রেফতার করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ধরা পড়েন। আওয়ামী মুসলিম লীগের শামসুল হক, কেজি মাহবুব আত্মগোপন করেন। তোয়াহা, অলি আহাদ, মুজিবল হক, শামসুল আলম গ্রেফতার হন। এ সময় মওলানা ভাসানী সন্তোষে অবস্থান করছিলেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন সিন্ধু প্রদেশে। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলির সংবাদ পেয়ে সোহরাওয়ার্দী পত্রিকায় বিবৃতি দেন। তাঁর বিবৃতি সমালোচিত হয়। তিনি প্রকৃত অবস্থা জানতেন না। তিনি ঢাকা এসে সব ঘটনা জানতে পারেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ স্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। তাতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৭ জুন স্বাক্ষর দান করেন। ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ফেব্রুয়ারি মাসেই স্তিমিত হয়ে যায়। সারা বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের নিপীড়ন ও নির্যাতন চলতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্ররা গ্রামে চলে যায়। গ্রামে গ্রামে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে গ্রামবাংলায় আন্দোলন চলতে থাকে।[৮৯]

১৯৫২ সালে নূরুল আমিন ভাষা আন্দোলনে শুধু ছাত্রদেরই হত্যা করেননি। তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দরের অন্যতম স্রষ্টা শামসুল হককেও ধ্বংস করেছেন। ঠিক একইভাবে জেনারেল আইয়ুব খান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে জেলে পুরে নির্যাতন করে এবং এর ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বৈরুতে চিকিৎসার জন্য গেলেন এবং সেখানে হোটেলে তাঁকে হত্যা করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যা সম্পর্কে তদন্তের জন্য বিচারপতি এলিসকে নিয়োগ করা হয়। জাস্টিস এলিস তদন্তপূর্বক পুলিশের গুলিবর্ষন সঠিক হয়েছে বলে রিপোর্ট দাখিল করেন।[৯০]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মুসলিম লীগ সরকারকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের সূচনা করে এবং পাকিস্তান জন্মের ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভেঙ্গে ফেলে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পিচ্ছিল পথ বেয়ে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ও ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের পথ

---

৮৮. *দৈনিক আজাদ*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

৮৯. আবুল কালাম শামছুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা : খোশরোজ পাবলিকেশন্স লি:, ২০০১, পৃ. ২৪৮

৯০. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

বেয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয় এবং ১৯৭১ সালের সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট-ভিসা প্রবর্তন করা হয়। মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ঘোষণা করে- যে সকল কমিউনিস্ট রাজবন্দী পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে চায় তাদের অনুমতি দেয়া হবে। এ সময় প্রায় ১৫ হাজার দেশপ্রেমিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মী পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। ফলে পূর্ব বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতি অঙ্গনে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলায় শান্তি মিশনের নেতা ছিলেন। ১৯৫২ সালে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিব চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও সেতুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সাথে সাক্ষাত করেন। বিশ্বের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা ও কমিউনিস্ট চিন্তাবিদদের সাথে শেখ মুজিব মাত্র ৩২ বছর বয়সে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর পূর্বে পাকিস্তানের কোন নেতা চীন সফর করেনি। চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে শেখ মুজিব ১৯৫২ সালে শুভ সূচনা করেছিলেন।[৯১]

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানে যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয় তা আমলাদের নেতৃত্বে চলতে থাকে। ১৯৫১-৫২ সালে পাকিস্তানে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। আমেরিকা পাকিস্তানকে খাদ্য ও অস্ত্র সাহায্য দেয়। বগুড়ার মুহাম্মদ আলী তখন আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ, প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান এবং রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আলীর মাধ্যমে পাকিস্তান-আমেরিকা অস্ত্র সাহায্য চুক্তি সম্পাদন করে। গোলাম মুহাম্মদ পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। এদিকে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে খাজা নাযিমউদ্দিনের জনপ্রিয়তা ছিল না। মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন একটি ঘৃণিত দলে পরিণত হয়। এ সুযোগে ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ খাজা নাযিমউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদচ্যুত করেন।[৯২] গোলাম মোহাম্মদের নেতৃত্বে পাকিস্তানের আমলারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম ‘ক্যু’ করে খাজা নাযিমউদ্দিনকে সরিয়ে দেয়। গোলাম মোহাম্মদের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপকে বিনা প্রতিবাদে মুসলিম লীগ গ্রহণ করে। ১৭ এপ্রিল পাকিস্তানের কোথাও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমউদ্দিনের পদচ্যুতির প্রতিবাদ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ খাজা নাযিমউদ্দিনের পতনকে তাদের বিজয় বলে চিহ্নিত করে। ১৯৫৩ সালে এপ্রিল মাসে মওলানা ভাসানী মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভা চলছে। এ সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব ভাষণ দেন এবং খাজা নাযিমউদ্দিনের পদচ্যুতিকে স্বাগত জানায়। খাজা

৯১. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১১৪

৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

নাযিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে এ ছিল অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। তবু ভাষা আন্দোলনে ছাত্র হত্যা ও পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য সৃষ্টির কারণে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ গভর্নর জেনারেলের বেআইনী পদক্ষেপকে সমর্থন জানায়। খাজা নাযিমউদ্দিন চিরদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শত্রুতা করেছেন। খাজা নাযিমউদ্দিনকে পদচ্যুত করার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিত ছিল এবং তাদের পরামর্শে রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আলীকে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তার অধীনে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ছিলেন- মুহাম্মদ আলী, স্যার জাফরুল্লাহ খান, এম.এ. গুরমানী, সর্দার বাহাদুর খান, ডাঃ এ.এম. মালেক, ডঃ এইচ. আই. কোরেশী, এ.কে. ব্রোহী, এ.কিউ. খান, শোয়েব কোরেশী ও তোফাজ্জল আলী।

১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে সংগঠনটির পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নামকরণ করা হয়। অসাম্প্রদায়িক নামকরণ করায় ছাত্রলীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এম. কামরুজ্জামানকে সভাপতি এবং এম. আব্দুল ওয়াদুদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯৫৩-৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করা হয়।[৯৩]

১৯৫২ সালে শামসুল হক অসুস্থ হয়ে পড়লে মওলানা ভাসানী যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্পাদকের চলতি দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৫৩ সালে মওলানা ভাসানী জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভাষণ দেন। সভায় মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, মওলানা তর্কবাগীশ ও আতাউর রহমান খানকে সহ-সভাপতি এবং শেখ মুজিবকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। ১৯৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন সমাপ্ত হয় এবং পূর্ব-পশ্চিম রাজনৈতিক দলগুলো পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে নির্বাচন দাবি করে। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর মুসলিম লীগ প্রায় ৩৬টি আসনে উপনির্বাচন ও সাধারণ নির্বাচন দিতে ভীত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকার ঘোষণা দেয় যে, ১৯৫৪ সালের ৭-১২ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব বাংলার সকল জেলায়, মহকুমায় সফর করে আওয়ামী লীগকে জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত করেন।[৯৪]

কারাবরণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কের ন্যায় শেখ মুজিবুর রহমানকেও রাজনৈতিক কারণে ১২ বছর কারাগারে জীবন কাটাতে হয়েছে। উপমহাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে মহাত্মাগান্ধী, মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওযাহের নেহেরু, নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু প্রমুখ ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে কারাবরণ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি আমলের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারাবরণ করেছেন। তাঁর প্রথম কারাজীবন শুরু হয় গোপালগঞ্জে স্কুল ছাত্র থাকাকালে।

৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫-১১৭

৯৪. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলার প্রধানমন্ত্রী একে ফজলুল হক এবং শ্রম ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের সংবর্ধনার আয়োজন করে। কংগ্রেস মন্ত্রীদের আগমনে বাধা দেয়। শেখ মুজিব ছাত্রদের নিয়ে মন্ত্রীদের সংবর্ধনায় যোগ দেন। ফজলুল হকের চলে যাবার পর কংগ্রেসের অভিযোগের সুযোগে পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। কয়েকদিন হাজতবাসের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। দ্বিতীয়বার তিনি গ্রেফতার হন ১৯৩৯ সালে। একটি মেলার আয়োজনকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার উপক্রম হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে। মামলায় তার ৭ দিনের শাস্তি হয়।[৯৫]

শেখ মুজিবুর রহমান তৃতীয়বার গ্রেফতার হন ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনকালে সচিবালয়ে পিকেটিংয়ের সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করে। ১৩ ও ১৪ মার্চ বন্দিদের মুক্তি দাবিতে হরতাল পালিত হয়। ১৫ মার্চ তিনি মুক্তিলাভ করেন। স্বাধীন পাকিস্তানে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন।[৯৬]

১৯৪৯ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তাঁকে ১৫ টাকা জরিমানা করা হয়। তিনি জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিস্কার করা হয়। এলএলবি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তাঁর রোল নম্বর ১৬৫, হলের নাম ছিল এসএম হল। তিনি মুচলেকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন নি। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন।[৯৭] টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনের পর ১৯৪৯ সালে সরকার দ্বিতীয়বার তাঁকে গ্রেফতার করে।[৯৮] ১৯৪৯ সালের ২৯ এপ্রিল আইন অমান্য কর্মকাণ্ডের জন্য EPPPSO-এর ১৮ (২) ধারায় তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়। তিনি ১৯ জুলাইয়ের পূর্বে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালের ১৯ জুলাই শেখ মুজিবুর রহমান ও আবদুস সালাম খান ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গোপালগঞ্জে জনসভা করেছিলেন। শেখ মুজিব নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন আর এ কারণে তাঁকে ও শওকত আলীকে গ্রেফতার করার জন্য ১৭ অক্টোবর ১৫০ মোঘলটুলির আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসে তল্লাশি চালায়। তিনি গ্রেফতার পরিহার করার জন্য লাহোরে চলে যান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফেরার পর শেখ মুজিব চতুর্থবার গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পুলিশ ৬৯/১ খাজে দেওয়ান রোড হতে কোতোয়ালি থানা মামলা নম্বর ১৯(১০)৪৯ ধারা ১৪৭, ৩২৫ আইপিপি এবং BSPO-এর ৭(৩)১৩ ধারায় তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে রাখা হয়। বন্দি অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে আটকাদেশ বৃদ্ধি

---

৯৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

৯৭. মুহাম্মদ নুরুল কাদের, *দুশো ছেষট্টি দিনের স্বাধীনতা*, ঢাকা : মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ২৬৩

৯৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছিল। তাকে ফরিদপুর, খুলনা ও গোপালগঞ্জ জেলে ভিন্ন ভিন্ন মামলায় হস্তান্তর করা হয়।[৯৯]

জেলের অভ্যন্তরে ১৪৭ পাকিস্তান দণ্ডবিধি ধারায় বিচারে ১২-৯-১৯৫০ তারিখে তার ৩ মাসের জেল হয়। ফরিদপুরে ১৪৩/১৮৮ ppc ধারায় একটি মামলা ফরিদপুরে বিচারাধীন। একই সময় খুলনায় ১৪৭ পিপিপি ধারায় আরো একটি মামলা চলছিল। এ কারণে ১৯৫০ সালের ২৯ ডিসেম্বর তাঁকে ফরিদপুরের জেল থেকে খুলনা জেলে প্রেরণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশ দেয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে হয়রানি, নির্যাতন ও মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য খুলনা ও ফরিদপুর জেল থেকে একাধিকবার গোপালগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়। খুলনা জেলে গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মকর্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে সময় তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন সাধারণ নির্বাচন হলে আওয়ামী মুসলিম লীগ জয়লাভ করবে। গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, He was not willing to execute any bond for his release. His attitude was found very stiff. তিনি বন্ড স্বাক্ষর করে তার মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ছিলেন না। তার মনোবল ছিল অত্যন্ত শক্ত।[১০০] সে কারণে গোয়েন্দা অফিসার তাকে ৬ মাসের আটকের সুপারিশ করেন। ডিআইজি এমডি খালেক ২৮-০৩-৫১ তারিখে ৬ মাসের আটক অনুমোদন করেন। ১৯৫২ সালের ২২ মার্চ খুলনা জেলে গোয়েন্দা কর্মকর্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দেন। তিনি লিখেন-

> I interviewed the S.Pr. Sk. Mujibur Rahman in Khulna Jail on 22-5-51. In course of interview he gave out a history of his work as a Muslim League worker till partition of Bengal. He tried to establish that he did much for the achievement of Pakistan and he would do best of his ability for the betterment of the poor people of Pakistan through whose sacrifice it was achieved. He criticized the ministry of East Bengal for its incapability of redressing any substantial help to the poor class people and also for the betterment of the country. He criticized the BPC report, which according to him was the result of the conspiracy of the higher authority of West Pakistan with a view to ultimately reducing East Bengal to a colony. He also gave out that as an Awami League worker he was very keenly observing the news about the ensuing election of the Punjab which would give a clear idea of the party's strength. He opined that the Muslim League would come out successful in the election in the Punjab with a very small margin. But he was sure that Awami Muslim League would defeat the Muslim League by an overwhelming majority, if there would defeat the Muslim League by an overwhelming majority, if there would be any general election in East Bengal. He was not

---

৯৯. মুনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

১০০. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

> willing or execute any bond for release even if the detention would cause him to face death. His attitude was very stiff.[১০১]

১৯৫১ সালের ৭ মার্চ পুলিশ সুপার নির্দেশ দেন যে নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে এখনই বরিশাল জেলে প্রেরণ করা হোক। এক সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ শাখা তাঁকে মুক্তি ও পুনরায় গ্রেফতার করার আদেশ দেয়। ১৯৫১ সালের ৭ মার্চ তাঁকে খুলনা জেল থেকে তখনই মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়। একই আদেশে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করার আদেশ দেয়।

১৯৫১ সালের ১৪ মার্চ ফরিদপুরের পুলিশ সুপার শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপালগঞ্জে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। সেদিন তাঁকে কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দেয়া হয়। তিনি আগত ছাত্রদের মিছিলে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতারের তিনি নিন্দা করেন। গোপালগঞ্জে ব্যাপক হরতাল পালিত হয় এবং ছাত্ররা স্লোগান দেয়- মুজিবের মুক্তি চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ১৬ মার্চ তাকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৫১ সালের ২২ মে ফরিদপুর জেলে গোয়েন্দা পুলিশের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি বলেন- মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শামসুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মুক্তি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে ভিন্ন আচরণ করা হচ্ছে।

> He was not repentant for his past political activity rather expressed that he would resume his political carrer as an active member of the party after his release. He was unwilling to dicuss his fresh activities. He was eager to go out of Jail. But was determined not to furnish any bond for the same. His attitude was very stiff.[১০২]

পুলিশ রিপোর্টে শেখ মুজিবুর রহমানের অনমনীয় ও প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশ পায়। তিনি জোরের সাথে বলেন, তিনি যে রাজনীতি করেন তার জন্য অনুতপ্ত নয়, বরং মুক্তি পেয়ে তিনি পুনরায় রাজনীতি শুরু করবেন। তিনি কোনো প্রকার সরকারের শর্ত মেনে বন্ড দিয়ে মুক্তি লাভ করবেন না। ২২-৫-৫১ তারিখের রিপোর্টের আইবি অফিসার বলেন- He is still-full of potentialities for mischief making. His detention in Jail for a further period of 6 months is considered essential for the security of the

১০১. গোয়েন্দা কর্মকর্তা লেখেছেন-

আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে ২২-২-৫১ তারিখে সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। তিনি সাক্ষাতকালে পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভাকে সমালোচনা করে বলেন, তারা গরীব মানুষের কোনো সহায়তা করতে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিপিসির সমালোচনা করে বলেন, এ হল পূর্ববাংলাকে কলোনি করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র। তিনি পাঞ্জাবের নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, হয়তো মুসলিম লীগ অল্প ব্যবধানে জয়লাভ করবে। তবে তাতে বিরোধী দলের শক্তি প্রমাণিত হবে। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলায় যদি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আওয়ামী মুসলিম লীগ ব্যাপক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করবে। যদি কারাগারে মৃত্যুও হয় তবু তিনি চুক্তি স্বাক্ষর করে মুক্তি লাভ করবেন না। [মুনায়েম সরকার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩-২০৪]

১০২. মুনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

state.[১০৩] ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপরোক্ত সুপারিশ অনুমোদন করায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাকে ৬ মাসের জন্য অন্তরীণ রাখা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য ঢাকা হাইকোর্ট রিট পিটিশন করা হয়। ৮-৬-৫১ তারিখে হাইকোর্ট শুনানি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের আটক আদেশ বহাল রাখা হয়। ফরিদপুর জেলে শেখ মুজিবুর রহমান অসুস্থ হয়ে পরেন। তিনি চোখের পীড়ায় ভুগছিলেন। ১৯৫১ সালের ৩০ আগস্ট তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে হস্তান্তর করা হয়। ১৯৫১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

১। আপনি সরকার উৎখাতের জন্য ঢাকা, ফরিদপুর এবং পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলায় একটি গুপ্ত বাহিনীর বেআইনী কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

২। আপনার উপরোক্ত কার্যাবলী এ প্রদেশের জন্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।

৯-১১-৫১ তারিখে ঢাকা জেলে আতাউর রহমান খান এবং আবদুস সালাম খান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে এবং হাইকোর্টে রীট করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

১৯৫১ সালে করাচী থেকে আখতার আহাদ ঢাকা জেলে শেখ মুজিবের নিকট পত্র লেখেন। পত্রে তিনি জানান যে, করাচীর এক সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন- That had there been five Mujibur Rahman the whole country would have been with him (Suhrawardy).[১০৪]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন- শেখ মুজিবুর রহমানের মতো ৫ জন শেখ মুজিবুর রহমান থাকলে সমগ্র দেশ তার সাথে থাকতো। শেখ মুজিব সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর উচ্চ ধারণা ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট নিয়মিত পত্র লিখতেন। সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এসে জেলে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতেন এবং তার মামলা পরিচালনা করতেন।

১৬-১১-৫১ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগে প্রেরণ করা হয়। চক্ষু পরীক্ষা করে একই দিনে তাকে জেলে নিয়ে যায়। ডাক্তার তাকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন।

৮ ডিসেম্বর এসএইচ সোহরাওয়ার্দী, আজিজ আহমদ এবং সাখাওয়াত আলী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেখা করেন। শেখ মুজিব তাদের হাইকোর্টে তার মুক্তির জন্য মামলা করতে বলেন। শেখ মুজিব হাসপাতালে ভর্তি হলে আনোয়ারা খাতুন, এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ আহম্মদ হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন মানিক তার সাথে দেখা করেন। চোখের চিকিৎসার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে

---

১০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮

১০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ সালের ২৯ নভেম্বর ভর্তি হন। প্রত্যেক দিন তার সাথে রাজনীতিবিদরা দেখা করতে আসেন। গোয়েন্দা পুলিশ তার ওপর কড়া নজর রাখত। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ২ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। ৪ ডিসেম্বর আলী আহম্মদ খান এমএলএ সিআর ২০ এফ মান্নান এমএলএ, কফিলউদ্দিন চৌধুরী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করার জন্য ঢাকার ডিআইজির নিকট আবেদন করেন। ১৯৫১ সালের ২২ ডিসেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেন- "My heart bleeds to find Sheikh Mujibur Rahman still undert detention inspite of his seriuos illness. His condition is so serious that he had to be removed from the Jail to the Medical College Hospital."[১০৫] শুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানকে এখনও বন্দি দেখে আমার হৃদয়ে রক্ত ঝরছে। তার অবস্থা এতো খারাপ যে, তাকে জেল হতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করতে হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৫২ সালের ২৯ জানুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কারাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ও বরিশালের মহিউদ্দিন আহম্মদ ১৯৫২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের নিকট আটকাদেশের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যদি প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে তারা ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ও ধর্মঘট করার হুমকি দিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন।

সরকার ভীত হয়ে নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদকে ট্রেনে নারায়নগঞ্জ প্রেরণ করা হয়। শত শত ছাত্র জনতা নারায়নগঞ্জ চাষাড়া রেলস্টেশনে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদকে স্বাগত জানায়। শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তারা স্টীমারে নারায়নগঞ্জ হতে গোয়ালন্দ পৌঁছেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি তাদেরকে ফরিদপুর জেলে গ্রহণ করা হয়। ফরিদপুর জেলে পৌঁছে শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন শুরু করেন। এ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফরিদপুর জেলা কর্তৃপক্ষের ১৮-০২-৫২ তারিখের লেখা পত্রঃ Security Prisoner (1) Sheikh Mujibur Rahman and (2) Mohiuddin Ahamed, who were now detained in jail, have started hunger strike from this morning stating that they will fast unto death if they are not released unconditionaly.[১০৬] তারা বিনাশর্তে এখনই মুক্তি চায়। তা না হলে তারা মৃত্যু পর্যন্ত অনশন করবেন। তাদের মুক্তি চেয়ে সারাদেশে প্রচারপত্র বিলিও করা হয়েছিল।

---

১০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

১০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবুর রহমানের অনশনের বিষয়টি ২০ ফেব্রুয়ারি আনোয়ারা খাতুন এমএলএ আইন সভায় মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমি আনোয়ারা খাতুনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদের স্বাস্থ্যের অবস্থা দ্রুত অবনতি ঘটে। ১৯ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ডাক্তারের রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র দফতরে প্রেরণ করা হয়। রিপোর্টে শেখ মুজিবুর রহমানের হৃৎপিণ্ড ও চোখের অবস্থা খারাপ ছিল। বন্দিদ্বয়ের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ফরিদপুর জেলে রাজবন্দি নেপাল নাথ, ড. মারুফ হোসেন, চুনিলাল চক্রবর্তী, সত্য মৈত্র, পুর্নেন্দু দে কানুগো ২৫ ফেব্রুয়ারি ২৪ ঘণ্টা অনশন পালন করেন।

গণদাবির মুখে ২৭ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১-৩-৫২ তারিখে মহিউদ্দিন আহমদকে বিনা শর্তে সরকার মুক্তি দেয়। সরকারের দেয়া শর্ত মেনে নিলে শেখ মুজিবুর রহমান অনেক পূর্বে মুক্তি পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি বন্ড স্বাক্ষর করে মুক্তি চাননি। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান জয়ী হলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি বিপুল ছাত্র-জনতা তাকে ফরিদপুর জেল গেট থেকে সংবর্ধনা দিয়ে শহরে মিছিল করে এবং জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ফরিদপুর থেকে টুঙ্গি পাড়ায় চলে যান।[১০৭]

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধুর কার্যধারা

পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন বিলম্বিত করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন।

১৯৫২ সালে ১৪ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলন ইংরেজিতে যে ভাষণ দেন- তার বঙ্গানুবাদ-

আপনারা কষ্ট স্বীকার করে এ সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জেল থেকে মুক্তি লাভ করে আমি ভাবলাম আমার প্রথম দায়িত্ব হল পশ্চিম পাকিস্তানে এসে শাসকচক্র পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বীকৃতির দাবির আন্দোলন সম্পর্কে জনগণের মনে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছে তা দূর করা। ১৯৪৮ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন উর্দুর সাথে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্য সংগ্রাম কমিটির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু একই ব্যক্তি তার রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষের প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দুই অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু করছেন। তিনি ভালো করে জানেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে তার কোনো অবস্থান নেই। পাকিস্তানে তথা আন্তর্জাতিকভাবে তার অবস্থান দৃঢ় করার জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে সফল হয়েছেন। আরো পরিষ্কারভাবে বলছি- আমরা আদৌ উর্দুর বিপক্ষে নই। আমরা উর্দু ভাষা শিখতে আগ্রহী। একই সাথে আমরা আশা করি সাড়ে চার কোটি মানুষের ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

---

১০৭. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

আপনারা পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতি জেনে খুশি হবেন। আমি আপনাদের বলছি- সেখানকার পরিস্থিতি বিস্ফোরণ উন্মুখ, সরকারের অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি ব্যাপকভাবে চলছে। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষে খুলনায় ২০,০০০ লোক মারা গেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খুলনা পাকিস্তানের শস্যভাণ্ডার এবং সবসময় উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদিত হয়ে আসছিল।

আপনারা জানেন, আমি করাচীতে খাজা নাজিম উদ্দিন (প্রধানমন্ত্রী)-কে পূর্ব পাকিস্তানে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্মারকলিপি দিয়েছি। আমাকে ধৈর্য সহকারে শুনা এবং আশ্বাস প্রদানের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞ। যা হোক, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার আশ্বাসসমূহ বাস্তবায়িত না হয় ততোক্ষণ আমি তার আশ্বাসকে প্রহসন বলে মনে করবো। কারণ, তারা এখনো বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মুক্তি দেয়নি। মুসলিম লীগ যে সকল কারচুপি করছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আমার অন্যতম প্রধান কাজ। আমি নিশ্চিত যে, ভোটার আস্থার অনুপাতে আইন সভায় মুসলিম লীগ সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন হলে তাদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতো। যেসব পুরুষ-মহিলা ভোট দেয়নি তাদের ব্যাপারে সংগঠিতভাবে ব্যাপক কারচুপি করা হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা ভোটার দূরে রেখে মিথ্যা ভোট প্রদান করা হয়েছে। এভাবে তারা ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। পূর্ব বাংলায় তারা একই কৌশল অবলম্বন করতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি করাচীর প্রশাসনের ঊর্ধ্বমহল এবং মুসলিম লীগারদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছি যে, পূর্ব বাংলায় মাটিতে এসব কৌশল কার্যকর হবে না। সর্বশেষ কথা হলো পূর্ব বাংলা ভাওয়ালপুর নয়- সেখানে প্রতি নির্বাচনী এলাকায় ভোটার সংখ্যা ২০,০০০। কমপক্ষে পূর্ব বাংলায় ভোটার সংখ্যা হবে ৩ কোটি এবং পাকিস্তানের অন্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলের রাজনৈতিক সচেতনতা বেশি।

আওয়ামী মুসলিম লীগ আসন্ন সাধারণ নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানের সকল আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারকে আমাদের নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিতে হবে। যদি তাদের ছেড়ে দেয়া না হয় তাহলে আমি চিন্তা করবো যে আমরা নির্বাচনে যাব কিনা অথবা আমরা প্রয়োজনীয় উপায় খুঁজবো।

পরিশেষে এ মানুষটি পূর্ব পাকিস্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন আর তিনিই নীচ ও হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। পাকিস্তানের সুশাসনের প্রতি এ কি কলঙ্ক নয়? আমি বিষয়টি পরিষ্কার করলাম- প্রেসের ভদ্র মহোদয়গণ পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থে আমার বিশ্বাস আপনারা স্বাধীন এবং নির্ভয়ে আপনাদের দায়িত্ব পালন করবেন- ভদ্র মহদোয়গণ আমার কথা শেষ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।[১০৮]

১০৮. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ২২৬-২২৮

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ২১ দফা

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করা হবে এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে অন্য সকল বিষয় ইউনিট সরকারের অধীনে আনয়ন করা হবে। নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হবে। আনসার বাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়ায় রূপান্তরিত করে অস্ত্রসজ্জিত করা হবে।

২. বাংলাকে পাস্তিানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৩. সকল নিরাপত্তা ও বিবর্তনমূলক আটক আইন বাতিল করা হবে এবং বিনা বিচারে সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের উন্মুক্ত আদালতে বিচার করা হবে।

৪. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।

৫. বিনা খেসারতে জমিদারী ও জমিতে সকল খাজনাভোগী স্বার্থ বিলোপ করা হবে। উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং খাজনা হ্রাস করে ন্যায্য স্তরে নামিয়ে আনা হবে ও খাজনা আদায়ের সার্টিফিকেট প্রথা বিলোপ করা হবে।

৬. সমবায় কৃষি খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং সরকারি সাহায্যে কুটির শিল্পের পূর্ণ বিকাশ সাধন করা হবে।

৭. পূর্ব বঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে এবং কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্পে ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে।

৮. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে এবং দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচানো হবে।

৯. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে ও পাট উৎপাদনের জন্য ন্যায্যমূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

১০. পূর্ব বঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্প উভয় আকারে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মুসলিম লীগ আমলে লবণ অব্যবস্থার জন্য দায়ী অপরাধীদের শাস্তিদান করা হবে।

১১. অবিলম্বে মোহাজেরদের পুনর্বাসন করা হবে।

১২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে পার্থক্যের অবসান করে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষায় প্রবর্তন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন বিলোপ করা হবে। শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছে আরো সহজলভ্য করে তোলা হবে এবং ছাত্রদের জন্য স্বল্প খরচে আবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি নির্মূল করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে সকল কর্মচারী ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অর্জিত সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করা হবে, যে সম্পত্তি অর্জনের উপায় সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হবে না সে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৬. প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যয়হ্রাস করতে হবে, উচ্চ ও নিম্নবেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারীদের বেতনের হার যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। মন্ত্রীরা তাদের মাসিক বেতন এক হাজার টাকার বেশি গ্রহণ করবেন না।

১৭. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিকে অমর করার জন্য তাঁদের কবরের উপর একটি মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিজনকে ক্ষতিপূরণ দান করা হবে।

১৯. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সাধারণ ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হবে।

২০. পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভা কোনক্রমে আইন পরিষদের আয়ু বৃদ্ধি করবে না এবং স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচনের ৬ মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন।

২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে ৩ মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যতা পূরণ করতে হবে। পর পর ৩টি উপ-নির্বাচনে মন্ত্রিসভার মনোনীত প্রার্থীরা পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।[১০৯]

২১ দফা ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার সাড়ে চার কোটি বাঙালির মুক্তি সনদ। ২১ দফায় নিহিত ছিল পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের দাবি। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে। ১৯৫৪ সালে ৭-১২ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের প্রতীক নৌকা এবং মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল হারিকেন। পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় মোট আসনসংখ্যা ছিল ৩০৯টি; তন্মধ্যে ৭২ হিন্দু-তফসিলী এবং ২৩৭ মুসলিম আসন। যুক্তফ্রন্টের সাথে পরবর্তীতে নিজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল যোগ দেয়।[১১০]

যুক্তফ্রন্টের সভাপতি হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য ছিলেন তিন মহান নেতা- এ.কে. ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব ছিল সোহরাওয়ার্দীর ওপর। এগারো শ’র বেশি দরখাস্ত পড়ে।

---

১০৯. *প্রাগুক্ত*।

১১০. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ২০ জন নেতা নিয়ে একটি সিলেকশন বোর্ড গঠন করেন। যুক্তফ্রন্টের অফিস ছিল সদরঘাটের ৫৪ নম্বর সিমসন রোডে। যুক্তফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক ছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ এবং ট্রেজারার ছিলেন গোলাম কাদের। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের মুখপত্র ছিল দৈনিক ইত্তেফাক। পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া 'মুসাফির' ছদ্মনামে লিখে বাংলার মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলেন। এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান সারা পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। চার নেতার মধ্যে এ.কে. ফজলুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচন প্রার্থী ছিলেন। ভাসানী ১৯৪৮ সালের পরে কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সোহরাওয়ার্দী প্রার্থী হননি। সিদ্ধান্ত হলো এ.কে. ফজলুল হক প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবেন এবং সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রের নেতা হবেন। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খান, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, গোলাম মুহাম্মদ লুন্দখোর, মাহমুদুল হক ওসমানী, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা প্রচারাভিযান চালান।

শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ কেন্দ্র থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ প্রার্থী ছিলেন লীগের কেন্দ্রীয় নেতা অহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়া। উভয় পক্ষে জোর প্রচার চলছে- জনতা শেখ মুজিবকে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়।[১১১]

ভারত শাসন আইনের ৯২ (ক) ধারায় গ্রেফতার

১৯৫৪ সালের ৩০ মে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা অনুসারে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয় এবং ব্যাপকহারে রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করে। ১৯৫৪ সালের ৩০ মে রাতেই মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে লালবাগ থানা সেপ্টেম্বর ১৯ তারিখ ৭-৫-১৯৫৪ ধারা ১৪৭/৪৪৭/৪২৭/৩২৬/৩৫৩ পিপিসি অভিযোগে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখে। সরকার মিথ্যা অভিযোগ আনে যে, শেখ মুজিব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভাঙ্গতে যায়। তখন গুজব ছিল যে, বন্দি শেখ মুজিবের উপর আক্রমণ হয় এবং তিনি আহত হয়েছেন। বেগম মুজিব এবং এডভোকেট আতাউর রহমান খান ১৯৫৪ সালের ৫ জুন ঢাকা জেলে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন।

১০ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর কন্যা আখতার সোলায়মান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। ১৯৫৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব আলতাফ গওহর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপারকে লিখেন- নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান তার অসুস্থ পিতাকে দেখার জন্য অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক। শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন। গেটে তাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তিনি নারায়নগঞ্জ থেকে স্টিমারে বরিশাল হয়ে ২১ ডিসেম্বর গোপালগঞ্জ পৌঁছেন।

২১ ডিসেম্বর গোপালগঞ্জে প্রায় চার হাজার লোক তাকে সংবর্ধনা জানায়। অসুস্থ পিতাকে দেখে ঐদিন তিনি যশোর হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।[১১২]

---

১১১. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। প্রায় ৭ মাস বন্দী জীবন যাপন করে তিনি মুক্তি লাভ করে পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হন। তখন তিনি তাঁর এক কন্যা শেখ হাসিনা, দু'পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামালসহ মিন্টো রোডের বাসা ত্যাগ করে একটি ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করেন। সোহরাওয়ার্দী কয়েকটি শর্তে মন্ত্রিসভায় যোগদানে সম্মত হন। ১৯৫৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর তিনি আইনমন্ত্রী হিসেবে মুহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। সোহরাওয়ার্দীর নিকট দেশ বড় ছিল, তাই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। মওলানা ভাসানী ইউরোপ থেকে ফিরে কলকাতায় একটি হোটেলে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ নেই। যুক্তফ্রন্ট নিষ্ক্রিয় প্রায়। এদিকে গোলাম মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দীকে জিজ্ঞেস না করে কেএসপি নেতা আবু হোসেন সরকারকে কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। গোলাম মুহাম্মদ শেরে বাংলার সাথে আলোচনা করে আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রী করেছিলেন। এ ঘটনায় সোহরাওয়ার্দী খুবই দুঃখ পেলেন।[১১৩]

আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান, মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উভয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি করে। পরিশেষে ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি আইন পরিষদে অনাস্থার পক্ষে-বিপক্ষে ভোটগ্রহণ করা হয়- এ.কে. ফজলুল হক ১৯৯ জন এবং আতাউর রহমান খান ১০৫ জন সদস্যের সমর্থন পান। অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হলো। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল, যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্য শেখ মুজিবকে বেশি দায়ী করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।[১১৪]

পাকিস্তান পার্লামেন্টে পূর্ব বাংলার দাবি ও স্বৈরাচারী কার্যাবলীর জন্য কঠোর সমালোচনা

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাহচর্যে থেকে তিনি একজন বিজ্ঞ ও প্রতিভাবান পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট করাচীতে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টের অধিবেশনে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট গঠন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং এক ইউনিট বিলের পক্ষে জনগণের সমর্থন গ্রহণ করতে বলেন। শেখ মুজিব করাচীকে এক ইউনিট ভুক্তকরণ এবং পাকিস্তানের রাজধানী স্থানান্তরের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দু'শ ষাট কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাজধানী করাচী শহরের ওপর পূর্ব বাংলার জনগণের সমঅধিকার রয়েছে। সুতরাং করাচী পশ্চিম পাকিস্তানের একার সম্পত্তি নয়। তিনি সরকারি দলকে (মুসলিম লীগ) treachery বিশ্বাসঘাতক আখ্যায়িত করেন। স্পীকারের অনুরোধে শেখ মুজিব তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। তিনি ক্ষমতাসীন দলকে লক্ষ্য করে বলেন, "I apeal to the people who are now in power, who have got absolute power in their hand, I think sometimes

১১২. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০-২৭৭

১১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭

১১৪. কামরুদ্দীন আহমেদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৩৮২ বাং, পৃ. ৪৯-৫০

they are more powerful than Allah."[১১৫] যারা ক্ষমতায় আছেন, যাদের হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতা রয়েছে; তাদের নিকট আমি আবেদন করছি; আমি মনে করি তারা অনেক সময় আল্লাহর চেয়ে ক্ষমতাশালী। স্পীকার আব্দুল ওহাব খান শেখ মুজিবকে তার আল্লাহর সাথে তুলনা প্রত্যাহার করতে বলেন। উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, "But who is offended? Is Allah offended? If He is offended, well He will punish me" কিন্তু কে আহত হলেন? আল্লাহ কি আহত হয়েছেন? যদি তিনি আহত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি আমাকে শাস্তি প্রদান করবেন। স্পীকারের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তার ভাষণের অংশবিশেষ প্রত্যাহার করেননি। পরিশেষে দলের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণের বিতর্কিত বাক্য প্রত্যাহার করেন।[১১৬]

১৯৫৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে শেখ মুজিব প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ এবং সকল নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের নিশ্চয়তা প্রদানের প্রস্তাব করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও উন্নয়নের ওপর ভাষণ দেন। ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি পররাষ্ট্র, মুদ্রা ও প্রতিরক্ষা ব্যতীত সকল বিষয় পূর্ব বাংলা প্রদেশের নিকট প্রদানের দাবি জানান। তিনি সংখ্যাসাম্য সম্পর্কে বলেন, আমরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি ও চাকরির দাবি করি।

শেখ মুজিব তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে Parity সংখ্যাসাম্য নীতি সমর্থন করেন। তিনি বলেন, যদিও পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের লোকসংখ্যার ৫৬ ভাগ বসবাস করে তবু দু'অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি প্যারিটি গ্রহন করে বলেন, "East Pakistan claim parity in all matters. We should be guided in all things on population basis. Not only in the matter of representation, there should be parity in the services- defence, everything. We will have parity, we will fight to the last." প্রতিরক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে তিনি সংখ্যা সাম্যের দাবি করেন। ১৯৫৬ সালের ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি শাসনতন্ত্র থেকে জননিরাপত্তা আইন ও আটক আইন বাতিল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের দাবি জানান। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিষয় শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন দাবি করে ভাষণ দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদদের স্মরণে তিনি সংসদ অধিবেশনের মুলতবি প্রস্তাব করেন। পূর্ব বাংলার সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা করেছে।

১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি পাকিস্তানের দু'টি রাজধানী- একটি করাচী অপরটি ঢাকায় প্রতিষ্ঠার দাবি করেন।[১১৭]

---

১১৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩

১১৬. *Speeches of Sheik Mujibur Rahman in Pakistan Parliment-1956*, Edited by Ziaur Rahman-1990, Dhaka.

১১৭. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

১৯৫৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এ সময় তিনি Leadership Exchange Programme-এ আমেরিকা সফর করেন। তিনি পেটের পীড়ায় ভুগছিলেন। তিনি বোস্টন হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসার পর শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ সময় মতিউল ইসলাম সিএসপি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। সেখানে মতিউল ইসলামের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমান যখন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী তখন মতিউল ইসলাম তাঁর উপসচিব ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমলে মতিউল ইসলাম ৩০৩ জনের সাথে চাকরিচ্যুত হন। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু মতিউল ইসলামকে চাকরিতে পুনর্বহাল করেন। তিনি সরকারের সচিব ছিলেন। মতিউল ইসলাম এক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ “হার্ভার্ডের দিনগুলোতে আমার ও শেখ মুজিবের মধ্যে যে প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, নিষ্ঠুর নিয়তি আমাদের মাঝ থেকে এই মহামানবকে ছিনিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়েই ঘটে তার আত্মিক সমাপ্তি।”[১১৮] আমেরিকা থাকাকালে শেখ মুজিব নিউইয়র্ক, হলিউড প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিযে আলোচনা করেন। প্রায় এক মাস আমেরিকায় থাকার পর তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ও বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম

১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার নির্দেশ জারি করে। অনেকেই অনুমান করেন, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করবে। ফলে পুরোদমে নির্বাচন বানচাল করার জন্য প্রেসিডেন্ট সেনাপতি আইয়ুব খানের সাথে সব রকম ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ইসকান্দার মির্জা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে ঘোষণা করেন, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পরিবর্তে ‘কন্ট্রোল্‌ড্‌ ডেমোক্র্যাসি’ প্রয়োজন। অবশেষে তিনি তাঁর ষড়যন্ত্রের খেলায় বিজয়ী হন। তাঁর অনুচররা আইনসভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ডেপুটি স্পীকারকে আহত করেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। এ সকল ঘটনা ইসকান্দার-আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্র তৈরি করে।[১১৯]

পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের পরিকল্পনা সফল হলে তাঁরা কেন্দ্রেও ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু করেন। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে রিপাবলিকান মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না- এ শর্তে তাদের সমর্থন করে। কিন্তু মন্ত্রিসভা ও আওয়ামী লীগকে জনগণের সামনে হেয় করার জন্য ইসকান্দার মির্জা ও আইয়ুব খান ফিরোজ খান নূনকে আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব নেই। তাদের প্রতিনিধি থাকা একান্ত প্রয়োজন। ফিরোজ খান নূন ছিলেন আরামপ্রিয় লোক। ইসকান্দার মির্জার ষড়যন্ত্র বুজতে পারেননি। তিনি ইসকান্দার মির্জার চাপের মুখে সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর দলের মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য বার বার চাপ দিতে থাকেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী নূনের

---

১১৮. উদ্ধৃত: সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

১১৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৫৮, ২৬ সেপ্টেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। তিনি শেষে ভুল করে বসলেন। তিনি তার মন্ত্রিসভায় নূনের যোগদানে সম্মত হলেন। এ সংবাদ পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছলে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও আবুল মনসুর আহমদ আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় তাঁর যোগদানের বিরোধিতা করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের পর তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ যোগদান করবে না- নূন মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন ঘোষণাকালে স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছিল। এমন কোনো নতুন পরিস্থিত হয়নি যে জন্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে। তবু ইসকান্দার মির্জা তাঁর তাগাদা অব্যাহত রাখেন। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন।[১২০]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য জহিরুদ্দিন, দেলদার আহমদ, আদেলউদ্দিন, আব্দুর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান এবং ন্যাপের নূরুর রহমান ও কংগ্রেস দলীয় গোমেজ করাচী গমন করেন। কিন্তু এ সংবাদ আতাউর রহমানকে জানানো হয়নি। ফলে তিনি ক্ষুব্ধ হন। তফাজ্জল হোসেন সোহরাওয়ার্দীর সাথে টেলিফোনে কথা বলেন এবং বলেন যে, আতাউর রহমান না যাওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় যেন যোগদান করা না হয়। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও আতাউর রহমান সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাত করেন। মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। কিন্তু শহীদ সাহেব বলেন যে, ফিরোজ খান নূন এমনভাবে অনুরোধ করলেন যে, তা উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। কথা হলো- মন্ত্রিসভার বসন্ত দাসকে অপসারণ করতে হবে। কিন্তু ফিরোজ খান নূনের টালবাহানা নিয়ে সন্দেহ জাগে। তখন তফাজ্জল হোসেন নেতাকে বলেন, 'স্যার সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একটা চাল বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা বোধ হয় আর একটা জালে আটকাইয়া পড়িলাম।' এইবার তিনি প্রতিবাদ করিলেন না। শুধু বলিলেন, 'হইতেও পারে, দেখা যাক।' সেদিন সোহরাওয়ার্দী নির্বাচনের প্রচারে কোয়েটা গমন করেন। কিন্তু এবার মন্ত্রিসভায় যোগদানের ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের উৎসাহ ছিল বেশি। কিন্তু মন্ত্রিসভায় দপ্তর বণ্টন নিয়ে কেলেঙ্কারি শুরু হওয়ার শেখ মুজিবুর রহমান তফাজ্জল হোসেনকে বলেন, 'মানিক ভাই আপনার কথাই ঠিক হইয়াছে। এটা একটা চক্রান্ত। ফিরোজ খান নূন এখন পোর্ট ফোলিও বণ্টন এবং বসন্ত দাসের অপসারণ নিয়া টালবাহানা করিতেছে।' কোয়েটায় অবস্থানরত সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলাপ হলো। তিনি দপ্তর বণ্টন নিয়ে গোলমাল করতে নিষেধ করেন। তবে বসন্ত দাসকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ না করা হলে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিবর্গ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ইসকান্দার মির্জা নির্বাচন হতে দেবেন না। তিনি কিছু একটা করতে যাচ্ছেন বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। সেনাবাহিনীর লোকদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হচ্ছে। ফিরোজ খান নূন ওয়াদা ভঙ্গ করায় নেতার নির্দেশে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী জহিরুদ্দিন, দেলদার আহমদ, আদেলউদ্দিন, আব্দুর রহমান খান, নূরুর রহমান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সকালে পদত্যাগ করেন। ঐ দিন রাতেই অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। ইসকান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করে মন্ত্রিসভা, আইন পরিষদ বাতিল এবং সেনাপতি আইয়ুব খানকে প্রধান

---

১২০. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র হত্যার পূর্ব মুহূর্তের ঘটনা সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন:

"এ পর্যন্ত আমার দলকে কোন দপ্তর গ্রহণের অনুমতি না দিয়ে মালিক ফিরোজ খান নূনের সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছি। আমাদের মন্ত্রিসভায় যোগদান করার জন্য তিনি বিরক্তিকরভাবে বার বার অনুরোধ করছেন। আমি এর কারণ তখন অনুমান করতে পারিনি। আমি তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললাম, যে তিনি বিপদে পড়বেন এবং আমাদের সমর্থনে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমি তাঁর সাথে তর্ক করলাম যে, তিনি কিভাবে আশা করেন যে, তাঁর মন্ত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছেড়ে দেবেন এবং এগুলো ছাড়া আমার দলের পক্ষে মন্ত্রিসভায় যোগদান করা সম্ভব নয়। যদি সমভাবে বণ্টন না করে, যদি তার দলের মন্ত্রীদের ছোট মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হয় তবে তা হবে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে অপমান করা। যা হোক তিনি কথা দিলেন যে, দপ্তরগুলো যাতে সুন্দরভাবে বণ্টন করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং আমার দল যাতে মন্ত্রিসভায় যোগদান করে সে ব্যাপারে সম্মতি দেয়ার জন্য আমাকে প্রভাবান্বিত করেন। যা আমি আশা করেছিলাম তা হলো- তিনি তাঁর রিপাবলিকান মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করতে সক্ষম হন।"[১২১]

সামরিক আইন জারির দিন সোহরাওয়ার্দী নির্বাচনী সফরে ছিলেন। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি হিসেবে সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে পরবর্তী ৫ মাসের জন্য উভয় অঞ্চলে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার সভার সফরসূচী প্রণয়ন করেন। তিনি কোয়েটায় প্রথম জনসভা করেন। সেখানে ফিরোজ খান নূন সরকার বিদ্রোহের অভিযোগে কালাতের খানকে গ্রেফতার করেন। তিনি পরবর্তী জনসভা করেন সিন্ধু প্রদেশের জোকোকাবাদে। উভয় সভায় সোহরাওয়ার্দীর ধারণা চেয়ে জনতার উপস্থিতি ছিল বেশি। তখন তিনি সংবাদ পেলেন শাসনতন্ত্র বাতিল, মন্ত্রিসভা ও আইনসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। সামরিক আইন জারি করা হয়েছে এবং দেশ শাসনের ভার প্রেসিডেন্ট গ্রহন করেছেন। এভাবে আমলাদের ক্যুয়ের যুগের অবসান হলো এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীদের শাসন শুরু হলো সামরিক শাসন দিয়ে। নামেমাত্র যে গণতন্ত্র ছিল তার সমাপ্তি ঘটলো এবং পাকিস্তান গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। সোহরাওয়ার্দী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন সেনাপতি আইয়ুব খানের সাথে কোনো কোনো ব্যাপারে তাঁর মতের অমিল হয়। তখন প্রায়ই শোনা যেত সেনাবাহিনী ক্যু করবে। সোহরাওয়ার্দী এ কথা আইয়ুব খানকে জানালে তিনি উত্তরে বলতেন, "স্যার, যদি কোনো ক্যু হয়, তবে তা হবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে।" প্রথমে আইয়ুব খান বলেছিলেন তিনি স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় থাকবেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত হলে তিনি ক্ষমতা বেসরকারী হাতে ছেড়ে দেবেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন আইয়ুব খান দশ বছরের জন্য ক্ষমতায় বসলেন! প্রকৃতপক্ষে তিনি ১০ বছরই ক্ষমতায় ছিলেন।

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছে তা অকার্যকর বলেও তিনি ঘোষণা দেন। তিনি আরো বলেন, শাসনতন্ত্রে কতগুলো বিষয়ে আপোস করা হয়েছে এবং এর ত্রুটি দূর করা না

১২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩

হলে দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে এবং তা জনমত যাচাইয়ের জন্য পেশ করা হবে। শাসনতন্ত্র একটি পবিত্র দলিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় দেশ, জনগণের কল্যাণ ও শান্তি। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তার দায়িত্ব দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করা যা আজ বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা বিপন্ন। দেশ ধ্বংস হবে আর তিনি দর্শকের ন্যায় দেখবেন, তা হতে পারে না। তাই পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন:[১২২]

১. ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চের শাসনতন্ত্র বাতিল হবে।

২. অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বাতিল হবে।

৩. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে।

৪. সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করা হবে।

৫. সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হলো।

প্রেসিডেন্ট প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং সকল স্তরের সশস্ত্র বাহিনীকে তার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পরিশেষে তিনি বিশ্বাসঘাতকদের দেশ ছেড়ে যাবার উপদেশ দেন।

৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভা ছিল নিম্নরূপ:

মেজর জেনারেল (অব) ইসকান্দার মির্জা	-	প্রেসিডেন্ট
লেঃ জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান	-	প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক
লেঃ জেনারেল মুহাম্মদ আজম খান	-	পুনর্বাসন
লেঃ জেনারেল বারকি	-	স্বাস্থ্য ও শ্রম
বিচারপতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম	-	আইন
আবুল কাসেম খান	-	শিল্প ও পূর্ত
এফ.এম. খান	-	যোগাযোগ
লেঃ জেনারেল কে.এম. শেখ	-	স্বরাষ্ট্র
হাফিজুর রহমান	-	খাদ্য ও কৃষি
জুলফিকার আলী ভুট্টো	-	বাণিজ্য

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর সুলতানউদ্দিন আহমেদের স্থলে পুলিশের সাবেক আই.জি. জাকির হোসেনকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর আখতার হোসনের স্থলে কালাবাগের আমির আজমকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।[১২৩] অক্টোবর থেকে সামরিক নির্দেশ জারি হতে শুরু করে। আঞ্চলিক ও জেরা সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত

---

১২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

১২৩. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনি, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫৭

হলেন মেজর জেনারেল ওমরাও খান। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়ে আইয়ুব খান ঢাকা আগমন করেন এবং পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। প্রথম দিকে একদল জনতা সামরিক শাসনকে স্বাগত জানায়। আইয়ুব খানের ঢাকায় অবস্থানকালেই ২৪ অক্টোবর তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। তিনি ২৭ অক্টোবর শপথ নেন।

সামরিক শাসন ঘোষণা সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী বলেন,

> ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা তাঁর কঠোর কাজের সমর্থনে এবং দেশ যে সকল ব্যাধিতে ভুগছিল তা বর্ণনা করে একটি ঘোষণা জারি করেন। তার মধ্যে অনেক রাজনৈতিক ব্যাধির কথা ছিল যা আমি আমার ভাষণে উল্লেখ করেছি। কিন্তু গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে গলা টিপে হত্যা করার ভিতর দিয়ে মির্জা তার সমাধান খুঁজে পান। বস্তুত আইন ও শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে সত্যিকার এবং মুক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিতর এর উত্তর নিহিত রয়েছে। রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দলের, এমনকি দর্শন হিসেবে রাজনীতিতে নির্বিচারে গালিগালাজ করা হয়েছে এবং পাকিস্তানের সকল ব্যাধির জন্য একেই দায়ী করা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে যদিও সত্যিকারভাবে গণতন্ত্র কার্যকর করার জন্য কোনো সুযোগ প্রদান করা হয়নি।[১২৪]

বঙ্গবন্ধুর জেলবাস সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ তার লেখা 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে লিখেছেন-

> পরে জানিয়াছিলাম মওলানা সাহেব ও শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য আমাদের দুশ্চিন্তা ছিল নিতান্তই অনাবশ্যক। তারা সকাল সন্ধ্যা সবজির বাগান করেন। সবজি-বেগুন দিয়ে ভর্তা ও নানা রকম মৌসুমী ফুলের চারা লাগিয়ে আনন্দেই দিনকাল কাটাতেন। নিজের হাতে লাগানো ফুলতো তারা উপভোগ করবেনই। এমনকি মরিচ-বেগুন দিয়ে ভর্তা, চাটনিও খেয়ে যাবার সিদ্ধান্ত তারা করে ফেলেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। অন্য ওয়ার্ড হতে একটি ফজলি আমের চারা (কলম নয়) জোগাড় করে তিনি নিজের সেলের ছোট আঙ্গিনায় লাগাইয়া ফেলেছেন এবং জেল সুপারকে বলেছেন, এই গাছের আম খেয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মনস্থ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বল দেখে অফিসাররা পর্যন্ত অবাক হতেন।[১২৫]

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদিত দৈনিক 'ইত্তেফাক' ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ইত্তেফাকের সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে সামরিক শাসক সেই অন্ধকার যুগের আলোকবর্তিকা ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়াকে ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রাত ১২টায় গ্রেফতার করে এবং সামরিক আদালতে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিচার করা হয়। জেলে তাঁকে প্রথমে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর মর্যাদা দেয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দৈনিক ইত্তেফাকে বঙ্গমঞ্চ লেখা ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে চীন ভ্রমণের অভিযোগ আনা হয়। সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগই প্রমাণে ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে ডন সম্পাদক আলতাফ হোসেন জেলখানায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করে জানান যে, তিনি মুচলেকা দিলে মুক্তি পাবেন। কিন্তু মানিক মিয়া কোনো মুচলেকা দিয়ে মুক্তি চাননি। পূর্ব বাংলার চীফ সেক্রেটারি আসগর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব

---

১২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮

১২৫. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাবমহল, ১৯৯৫, পৃ. ১৪১

খানকে বলে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু জেল থেকে বের হয়েও তছার লেখনী- ভূমিকার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইত্তেফাকের পাতায় ‘মুসাফির’ ছদ্মনামে লিখিত ‘রাজনৈতিক মঞ্চ’ নিয়মিত বের হতে থাকে। স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে মুক্তচিন্তা ও সংগ্রামের জ্বলন্ত ইতিহাস সৃষ্টি করে ইত্তেফাক।[১২৬]

কারাজীবন : শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৫৮-১৯৫৯)

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয় ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে। ১২ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রাখে। প্রথমে তিনি সাধারণ বন্দি ছিলেন। ২০ অক্টোবর থেকে তাকে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে দেখানো হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের পূর্বে তার লালজীপে নম্বর EBP111 Red Jeep পুলিশ আটক করে। ১০ অক্টোবর তিনি জীপ গাড়ি ফেরত চেয়ে পুলিশ সুপারকে পত্র দেন। লাল জীপ গাড়িটি সোহরাওয়ার্দী তাকে উপহার দিয়েছিলেন।

২৫ নভেম্বর বেগম মুজিব জেলখানায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, তিনি যে বর্তমানে সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় বাস করেন তা জঙ্গল এলাকা। পানি নেই। তিনি ভালো বাসার চেষ্টায় আছেন। বেগম মুজিবুর রহমানের পিএ আবুল হোসেন জনালেন যে, ডিআইটি বরাদ্দ জমির ইনস্টলমেন্ট দিতে হবে। পুলিশ জমির কাগজ জব্দ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাকে সরকারের নিকট জমির মূল্য জমা দেয়ার সময়ের জন্য দরখাস্ত দিতে বলেন।

সরকারের নির্দেশে আইবি অফিসার তার সাথে ৯-১২-৫৯ তারিখে দেখা করে রিপোর্ট দেন- তিনি লিখেন- “Mr. Mujibur Rahman’s attitude is reported to be mild. But he was not agreed to give any undertaking or execute any bond, if he is released.”

অবশেষে সরকার ১৯৫৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর আদেশ নং- ৯৫৯-Hs দ্বারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ রেখে ৫টি শর্ত আরোপ করে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকার কেন্দ্রীয় জেল থেকে মুক্তি প্রদান করে।[১২৭] তিনি মুক্তি লাভ করে ৭৬ সেগুনবাগিচার ঠিকানায় বসবাস করেন। আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক রাজনীতি ধ্বংস করার লক্ষ্যে নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনে অসংখ্য মামলা দায়ের করেন। পাকিস্তানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আইনজীবী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৮ হতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মামলা পরিচালনা করে অনেককে মুক্ত করেন।

সামরিক সরকারের মামলা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে

১৯৫৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও সামরিক সরকার তার বিরুদ্ধে ১৪টি দুর্নীতির অভিযোগ করেন। তদন্ত শেষে ৬টি মামলার চার্জশীট দাখিল করে। তাঁর নেতৃত্ব ধ্বংস

১২৬. মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ১২০-১২১

১২৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪

করার জন্য সামরিক সরকার তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে মামলা করে। এ সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে মাসে ১৫০০ টাকা বেতনে আলফা ইন্সিউরেন্সের পৃষ্ঠপোষক কন্ট্রোলার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করে ১৯৬০ সালের মার্চ থেকে তিনি ইন্সিউরেন্সের কাজ শুরু করে দলের কাজের সুবিধায় সোহরাওয়ার্দী তাকে একটি লাল রঙের জীপ নম্বর ১১০০ উপহার দেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার জন্য ঢাকার হাটখোলার জমি ও প্রেস ক্রয় করে দেন। আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ও তফাজ্জল হোসেনকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী থাকাকালে এ অঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। এ কারণে সামরিক সরকার তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করে। ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ১৯৬০ সালের ঢাকার স্পেশাল জজ এ এম এস রশীদের কোর্টে মামলার বিচার শুরু হয়। মামলার আসামীদের মধ্যে তার কনিষ্ঠা ভ্রাতা শেখ নাসের ছিলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আব্দুস সালাম, জমির উদ্দিন শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষের আইনজীবী ছিলেন। ১৯৬০ সালের ৩১ মে বিচারক রশীদ শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর ভ্রাতা শেখ নাসেরকে মুক্তি দেয়। পরের দিন ১ জুন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়।[১২৮]

ঢাকা জেলা জজ ও স্পেশাল জজ এম এ মওদুদ ১৯৬০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মামলায় শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্ট কাজী আবু নাসেরকে অসাধারণ ও উক্ত কাজের সহায়তার অভিযোগে তাদের প্রত্যেককে দু'বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো দু'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৬০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করে। একই সময় সরকার আলফা ইনসিউরেন্স কোম্পানি ও শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেয়। ১৯৬১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-

> জানা যায় যে, আওয়ামী লীগের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহায়তায় শেখ মুজিবুর রহমান আলফা ইন্সিউরেন্সের পূর্ব পাকিস্তানের কন্ট্রোলার হয়েছেন। তার যোগদানের সাথে কোম্পানির ভাল ব্যবসা হয়েছে। জানা গেছে যে, পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার পরিচালক সিএসপি এক সময় কোম্পানির ৩৫ লক্ষ টাকা মেরিন ইনসিউরেন্স লাভ করেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে কোম্পানি সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের প্রভাব বিস্তার করবে। কোম্পানি রাজনীতির সাথে জড়িত নয়। তাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকারক কিছু পাওয়া যায়নি।[১২৯]

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনিত অধিকাংশ মামলা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরিচালনা করতেন। তাকে সহায়তা করতেন এডভোকেট সালাম খান, এস আর পাল, জহিরুদ্দিন প্রমূখ। জেলা জজ এস এম মওদুদ প্রদত্ত কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান হাইকোর্টে আপিল

---

১২৮. 1st June, *Pakistan Observer*, 1960

১২৯. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ১৯৬১ সালের ২১ জুন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি আসিরের বেঞ্চে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৫ ঘণ্টা সওয়াল-জবাব করেন। সরকারি আইনজীবী ছিলেন বরিশালের আজিজুদ্দিন। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যুক্তিতর্কের ফলে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আসামী এ মামলা থেকে মুক্তি লাভ করেন।[১৩০]

১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদে এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬৭ এবং পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সংখ্যা ছিল ১৫৫ জন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী, খান এ সবুর, ফজলুল কাদের চৌধুরী, নবাবজাদা হাসান আলী, মশিউর রহমান, এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান, এ.টি.এম মোস্তফা, সৈয়দ আব্দুস সুলতান, মোনায়েম খান, নবাবজাদা হাসান আসকারী, ওয়াহেদুজ্জামান। আইয়ুব খান উপলব্ধি করলেন- দেশে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন আছে। তাই তিনি ১৯৬২ সালের ৯ মে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ জারি করেন। ১৯৬২ সালের ৮ জুন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। নির্বাচনের সময় সকল এমএনএ, এমপিএ অঙ্গীকার করেছিলেন তারা জনগণের সাথে থাকবেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু মন্ত্রিত্বের লোভে অনেক এমএনএ আইয়ুব খানের দলে ভিড়ে যায়। পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডিতে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালের ৮ জুন আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। ৮ জুন তমিজউদ্দিন খান স্পীকার, আবুল কাশেম ও আফজাল চিমা ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালের ১৩ জুন বগুড়ার মুহাম্মদ আলীকে সিনিয়র মন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়[১৩১]:

মুহাম্মদ আলী	-	পররাষ্ট্র
বিচারপতি মুহাম্মদ মুনীর	-	আইন
আব্দুল কাদির	-	অর্থ
আব্দুল মোনায়েম খান	-	স্বাস্থ্য, শ্রম
হাবিবুল্লাহ খান	-	স্বরাষ্ট্র, কাশ্মীর
ওয়াহেদুজ্জামান	-	বাণিজ্য
জুলফিকার আলী ভুট্টো	-	শিল্প ও প্রাকৃতিক গ্যাস
সবুর খান	-	যোগাযোগ
এ.কে.এম. ফজলুল কাদের চৌধুরী	-	খাদ্য ও কৃষি
আব্দুল ওয়াহেদ খান	-	তথ্য ও বেতার
এ.টি.এম. মোস্তফা	-	শিক্ষা

পরে মন্ত্রিসভা থেকে আইনমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে তাদের স্থলে নিম্নের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

১৩০. *প্রাগুক্ত*

১৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩-২১৪

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুহাম্মদ শোয়েব	-	অর্থ
শেখ খুরশীদ আহমদ	-	আইন
আব্দুল্লাহ জহিরুদ্দিন	-	স্বাস্থ্য ও শ্রম

বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পর জেড.এ. ভুট্টোকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভা ও শাসনতন্ত্র পূর্ব বাংলার জনগণ গ্রহণ করেনি। তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখে। আইয়ুব খান কিছুটা নমনীয় ভাব দেখান। ১৯৬২ সালের ১৮ জুন সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদককে মুক্তি দেন। শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি লাভ করে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি সকল দলকে সংগঠিত করে জনগণ নির্বাচিত গণপরিষদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জোরদার করেন। ১৯৬২ সালের ২৪ জুন পূর্ব বাংলার ৯ জন নেতা এক যৌথ বিবৃতিতে সর্বজনীন ভোটাধিকার নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আহ্বান জানান।[১৩২]

নয় নেতা তাদের বিবৃতিতে বলেন, সামরিক আইন প্রত্যাহারের ফলে গণতন্ত্রের দ্বার উন্মুক্ত হবার পথে, কিন্তু গণতন্ত্র এখনও আসেনি। স্থায়ী শাসনতন্ত্র একমাত্র জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণয়ন করা সম্ভব। তারা বলেন, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তারা সরাসরি সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলেন, তারা কেন্দ্রশাসিত সরকারের পরিবর্তে যুক্তরাজ্য সরকারের দাবি করেন। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে প্রাধান্য দিতে হবে। দু'অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে কাজ চালিয়ে যেতে দিতে হবে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সকল জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হবে।[১৩৩]

নয় নেতার বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ছাত্র ও জনগণের মধ্যে বিপুর সাড়া পড়ে যায়। এ বিবৃতি ৯ নেতার বিবৃতি বলে পরিচিত। পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা ৯ নেতার বিবৃতিকে স্বাগত জানায়। ৯ নেতার বিবৃতির সমর্থনে ১৯৬২ সালের ৮ জুলাই ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। নূরুল

১৩২. শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নেতারা হলেন-

নূরুল আমিন	-	মুসলিম লীগ
আতাউর রহমান	-	আওয়ামী লীগ
শেখ মুজিবুর রহমান	-	আওয়ামী লীগ
আবু হোসেন সরকার	-	কেএসপি
হামিদুর হক চৌধুরী	-	কেএসপি
এস.এম. সোলায়মান	-	কেএসপি
মাহমুদ আলী	-	ন্যাপ
সৈয়দ আজিজুল হক	-	কেএসপি
মৌলানা পীর মুহসেনউদ্দিন আহমদ দুদ মিয়া	-	নেজামে ইসলাম

(সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪)

১৩৩. Begum Shaista Suhrawardy Ikramulla, *Huseyn Shahid Suhrawardy*, Oxford University Press, 1991, P. 175

Dhaka University Institutional Repository

আমিন জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় আতাউর রহমান, আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ ভাষণ দেন। আবু হোসেন সরকার আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ উপস্থিত জনতাকে বিমোহিত করে। তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং তার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তি দাবি করেন। জনসভায় সংবিধান প্রণয়নের জন্য জনগণ কর্তৃক গণপরিষদ নির্বাচন এবং দেশবরেণ্য নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গাফফার খান, আল্লামা মাশরেকীসহ সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয়। জনসভা শেষে পীর দুদু মিয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন এবং বগুড়ার ষড়যন্ত্র থেকে দেশের মুক্তি কামনা করেন। কয়েক মাস পরে বগুড়ার মুহাম্মদ আলী মৃত্যুবরণ করেন। আইয়ুব খানের সরকার ১৯৬২ সালের জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে থাকে।[১৩৪]

১৯৬২ সালের ৪ অক্টোবর পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে এনডিএফ গঠন করা হয়। ১৯৬২ সালের ৬ অক্টোবর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতাকে নিয়ে লাহোর থেকে ঢাকা পৌঁছেন। আগে থেকেই ঘোষণা দেয়া হয় ৭ অক্টোবর ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। ৭ অক্টোবর বিকেলে পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভায় প্রায় ৫ লক্ষ লোক সমবেত হয়। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভায় নয় নেতা মঞ্চে। প্রধান বক্তা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন এবং গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য সকলকে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এনডিএফের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, মাহমুদ আলী প্রমুখ ভাষণ দেন। পল্টন ময়দানে সর্বকালের সর্ববৃহৎ সভায় সোহরাওয়ার্দী এক ঘণ্টার বেশি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার। তিনি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল ও নয় নেতার বিবৃতির সাথে একমত পোষণ করেণ। তিনি জনতাকে গণতন্ত্র উদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিভিন্ন দলের নেতাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এনডিএফ কমিটি গঠন করেন। পাশাপাশি তিনি জেলা, মহকুমা ও থানা এনডিএফ কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেন। আওয়ামী লীগের ২ জন, মুসলিম লীগের ২ জন, কেএমপির ২ জন, ন্যাপের ২ জন ও নেজামে ইসলামের ১ জন নিয়ে জেলা, মহকুমা ও থানা কমিটি গঠন করা হয়।[১৩৫]

আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কেএসপি, মুসলিম লীগের একাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, গণতন্ত্র উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। তারা এনডিএফে থাকবেন এবং শাসনতন্ত্র- গণতন্ত্রায়নের জন্য সংগ্রাম করবেন। খাজা নাযিমউদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একটি অংশ পুনরুজ্জীবিত হলেও তারা এনডিএফের সাথে কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

---

১৩৪. আশরাফ হোসেন, *বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : উত্তরণ প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ৪৮

১৩৫. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানে ভিন্ন প্রেক্ষিতে এনডিএফ গঠিত হয়। এনডিএফের আহ্বায়ক ছিলেন আওয়ামী লীগের নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান। ন্যাপ, মুসলিম লীগ, জামায়াত পুনরুজ্জীবিত হলেও তারা এনডিএফের সাথে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালের ৬ অক্টোবর হতে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন। তিনি সমমনা দলের সাথে আলোচনা করে এনডিএফের সাংগঠনিক তৎপরতা প্রদেশব্যাপী ছড়িয়ে দেন। সকল জেলা, মহকুমা, থানায় শাখা গঠন করা হয়। ১৯৬২ সালের ১৩ অক্টোবর হতে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্য নেতাদের সাথে নিয়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় সফর শুরু করেন। তিনি ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর জেলার শত শত জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি ট্রেনে সফর করলে নির্ধারিত সময়ের ১০/১২ ঘণ্টা পরে ট্রেন গন্তব্য স্থানে পৌঁছতো। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসতো তাদের প্রিয় নেতা সোহরাওয়ার্দীকে দেখার জন্য। শেরে বাংলার মৃত্যুর পর তিনিই বাঙালিদের একমাত্র ভরসা। সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় যে জাগরণ সৃষ্টি হয় তা বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়।[১৩৬]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন রাজনৈতিক দার্শনিক ও ভবিষ্যত স্বপ্নদ্রষ্টা। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের প্রেক্ষাপটে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন যে, অদূর অভিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান হবে। তিনি লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানের আশঙ্কা করা হচ্ছে, সার্বিক বিচারে রাজনৈতিক স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন হলো কি করে এর সমাপ্তি হবে। সাধারণ নিয়ম হলো যখন শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করে দেয়া হয়, তখন জনগন অশাসনতান্ত্রিক উপায়সমূহ অবলম্বন করে; যাকে সংক্ষেপে 'বিপ্লব' বলা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে বিরাট বৈষম্য থাকায় এরূপ বিপ্লব সম্ভব না-ও হতে পারে। সম্ভবত আমরা একটি আকস্মিক ঘটনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং তা হলো পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষ করে তার সেনাবাহিনী, শিল্পপতি এবং অবাঙালি রিফিউজিদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান ঘটবে। এর ফলে রক্তাক্ত দাঙ্গা ও হত্যাকা- হতে পারে এবং তা হবে একমাত্র ঘৃণার ওপর ভিত্তি করে। আমি তা স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে তা সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়েছে কি-না? যদি তা না নিভে থাকে তাহলে প্রচণ্ড ক্রোধে পুনরায় ধূমায়িত অগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে পারে এবং এ পথে সবকিছুর সাথে আমাকেও ধ্বংস করবে।[১৩৭]

ছয়দফা আন্দোলন : প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচন

১৯৬৪ সাল শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর তিনি আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তিনি মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দাঙ্গা

---

১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১৩৭. *Memuir's of Huseyn Shahid Suharwardy*, P. 215

প্রতিরোধ করেছেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে সারা বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। কাশ্মীরের মসজিদ হতে 'হযরত বাল' চুরি হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা শুরু হয়।[১৩৮] পাকিস্তান সরকার হযরত বাল চুরি হওয়ার ঘটনাকে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী খুলনার সবুর খান ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের ইঙ্গিতে খুলনা ও ঢাকায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে তাদের ঘরবাড়ি লুট, হত্যা ও নারী নির্যাতন চলে। এ সময় শেখ মুজিব দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ও ধর্মান্ধতার শিকারে পরিণত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। ১৪ জানুয়ারি তিনি দাঙ্গাকারীদের সম্মুখীন হয়ে তাদের নিরস্ত্র হতে বলেন, নারায়ণগঞ্জে মিলের হাজার হাজার শ্রমিক হিন্দুদের বাড়ি লুট করে। শত শত হিন্দু নিহত হয়। ১৫ জানুয়ারি ঢাকার ওয়ারী এলাকায় হিন্দুদের নিরাপদ স্থানে পালাবার সময় শেখ মুজিব বিপদের সম্মুখীন হন। দাঙ্গা প্রতিরোধে দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সাহসী ভূমিকা পারন করেন। ১৬ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক অফিসে ঢাকার সমাজের সর্বস্তরের ৯৯ জন নাগরিক নিয়ে 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোক্তা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।[১৩৯]

১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিবুর রহমান অনুভব করলেন যে, এনডিএফের প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ পকিস্তান এনডিএফকে টিকিয়ে রাখার সোহরাওয়ার্দীর পর কোন নেতা ছিলেন না। দ্বিতীয়ত ন্যাপ, মুসলিম লীগ, জামায়াতকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কার্যক্রম শুরু না করলে রাজনৈতিক শূন্যতা অন্য দলের দখলে চলে যাবে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লন্ডনে থাকাকালেই শেখ মুজিবুর রহমান দল পুনরুজ্জীবিত থেকে বিরত থাকেন। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তাঁকে বিরত রাখার মতো কোন নেতৃত্ব ছিল না। তাই বাস্তবতার আলোকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে তাঁর বাসভবসে মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর, আব্দুস সালাম খান, খন্দকার মোশতাক আহমদসহ নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং তারা দল পুনরুজ্জীবিত করার বিরোধিতা করেন। সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৫ জানুয়ারি সবায় নিম্নলিখিত দাবিসমূহ গৃহীত হয়:[১৪০]

- দেশে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন।
- আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব।
- রাজবন্দীদের মুক্তি।
- পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থানান্তর করা।

---

১৩৮. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১৩৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪

১৪০. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সভায় মওলানা তর্কবাগীশকে সভাপতি ও শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়। পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ এনডিএফ বিরোধী ছিল না। এনডিএফের অঙ্গসংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় আতাউর রহমান খান পত্রিকায় দুঃখ প্রকাশ করে ভাষণ দেন। এনডিএফ আফসোস করে যে, আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করে তারা নীতিবহির্ভুত কাজ করেছে।[১৪১]

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তান গমন করেন এবং তাঁর উদ্যোগে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কনভেনশন মুসলিম লীগ আইয়ুব খানকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেয়। সরকার পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের টিভি কেন্দ্র চালু করে এবং সরকারের পক্ষে প্রচারণার লক্ষ্যে দৈনিক পাকিস্তান নামে বাংলা এবং ডেইলি টাইমস ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকায় মুসলিম লীগ ও ভাসানী ন্যাপপন্থীরা নিয়োগ লাভ করে। ১৯৬৪ সালের ৫ জুন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৪২] সভায় আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ১১ দফা উত্থাপন করেন এবং সভায় তা গৃহীত হয়। ১১ দফাই ছিল ১৯৬৬ সালের ৬ দফার ভিত্তিমূল।[১৪৩]

৬ দফার স্বাপ্নিক শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রণেতাও তিনি। লাহোর সম্মেলনে পেশ করার জন্য শেখ মুজিব গোপনে ৬ দফা প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তরুণ সাংবাদিক ও একুশে গানের রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরী টাইপ করা ৬ দফার একটি কপি পেয়ে তিনি তা সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ' পত্রিকায় প্রকাশ করে দেন। অতঃপর ১৯৬৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ ও নূরুল ইসলাম চৌধুরীসহ লাহোরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। পূর্ব বাংলা থেকে ২১ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬০০ সদস্য সম্মেলনে যোগ দেন। লাহোরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী বাসভবনে ৫ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল মুসলিম

---

১৪১. আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের প্রতিবাদ করে এনডিএফভুক্ত আওয়ামী লীগে যে সকল নেতা ২৫ জানুয়ারি বিবৃতি দিয়েছেন তারা হলেন- আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, নূরুর রহমান, খয়রাত হোসেন, আব্দুল জব্বার খদ্দর, এ.কে. রফিকুল হোসেন, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। (*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮)

১৪২. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, পৃ. ৬৫-৬৬

১৪৩. ১. ফেডারেশন অব পাকিস্তান নামে সত্যিকার অর্থে ফেডারেল পদ্ধতি প্রবর্তন।
২. বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র কায়েম ও যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন।
৩. কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীসহ সকল সরকারী উচ্চপদে মেধা অনুসারে বাঙালিদের নিয়োগ।
৪. পাকিস্তানের উভয় অংশের বৃহৎ শিল্পকারখানা জাতীয়করণ।
৫. মোহাজেরদের জন্য সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন কর্মসূচী প্রণয়ন।
৬. ফেডারেশনকে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক কৃষি, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ সাধনে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী প্রণয়ন।
৭. পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন কায়েমের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থাসহ পৃথক অর্থনীতি প্রণয়ন।
৮. পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন।
৯. বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব-নিকাশ ও আয়-ব্যয়ের পূর্ণ অধিকার প্রদেশের হাতে ন্যস্তকরণ।
১০. পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দপ্তরসহ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে মিলিশিয়াবাহিনী গঠন।
১১. ছাত্রদের দাবিদাওয়াসহ শ্রমিক-কৃষকদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ।
(সিরাজ উদদীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ আফজালের সভাপতিত্বে সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি সাবজেক্ট কমিটির সভায় শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৬ দফা দাবি পেশ করেন। কিন্তু সভায় তা গৃহীত হয়নি। পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ফরিদ আহমদসহ অনেকে আপত্তি করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে সংবাদপত্রে শেখ মুজিবের ৬ দফা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চান। শেখ মুজিব ও তাঁর দেশের প্রতিনিধিদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তারা গোপনে লাহোর ত্যাগ করে করাচীতে সোহরাওয়ার্দীর কন্যার বাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি টেলিফোনে ঢাকায় সম্মেলনের অবস্থা বর্ণনা করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে আসেন এবং বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের নিকট ৬ দফা তুলে ধরেন।

লাহোরে সাবজেক্ট কমিটির বৈঠকে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা পেশ করেন:[১৪৪]

প্রস্তাব-১ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি : দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির। সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম।

প্রস্তাব-২ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি : কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল দু'টি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩ মুদ্রা বা অর্থ সম্পর্কীয় ক্ষমতা : মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দু'টির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে:

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দু'টি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

(খ) সমগ্র দেশের জন্য কেবল একটি মুদ্রা চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র ব্যবস্তা থাকতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আর্থিক বা অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব-৪ রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা : ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রের রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর সকল করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা :

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহিঃবাণিজ্যিকে পৃথক হিসাব করতে হবে।

(খ) বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে।

১৪৪. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

(গ) কেন্দ্রর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্র মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা-নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব-৬ আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা: আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ মুজিব

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬ দফা অনুমোদিত হয়। তবে সিদ্ধান্ত হয় ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদন নিতে হবে। মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ৬ দফা প্রশ্নে দ্বিমত পোষন করেন এবং কাউন্সিল অধিবেশন ত্যাগ করেন।[১৪৫] সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়ে যান। এডভোকেট আব্দুস সালাম ৬ দফার বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তিনি ভাবলেন তাকে সভাপতি করা হবে- এ বিশ্বাসে তিনি ৬ দফার পক্ষে কথা বলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতিঝিল ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান, কামরুজ্জামান, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মিসেস আমেনা বেগম, আমজাদ হোসেন, শাহ আজিজুর রহমান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আব্দুল মালেক উকিল, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, সাদ আহমদ, আব্দুস সালাম খান, মতিউর রহমান। দ্বিমত সত্ত্বেও কাউন্সিল অধিবেশন ৬ দফা দাবি অনুমোদিত হয়। সভায় পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতা মিয়া মঞ্জুরুল হকসহ সকলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানান। ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি ও তাজউদ্দিন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।[১৪৬]

---

১৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

১৪৬. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি ছিল নিম্নরূপ:

সভাপতি	-	শেখ মুজিবুর রহমান
সহ-সভাপতি	-	সৈয়দ নজরুল ইসলাম, হাফেজ হাবিবুর রহমান, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী)
সাধারণ সম্পাদক	-	তাজউদ্দিন আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক	-	মিজানুর রহমান চৌধুরী
শ্রম সম্পাদক	-	জহুর আহমদ চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক	-	অ্যাডভোকেট আবদুল মোমেন
মহিলা সম্পাদক	-	আমেনা বেগম
অফিস সম্পাদক	-	মোহাম্মদ উল্লাহ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	-	কে এম ওবায়দুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ	-	নুরুল ইসলাম চৌধুরী

(শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা গৃহীত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা' পুস্তিকা ১৮ মার্চ বিতরণ করা হয়। এখানে তা হুবহু তুলে ধরা হল-

> এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তাতো করা হয়ই নাই, বরং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ, ইপিআর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তানকে আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচানো হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে- এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির ওপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদেরকে তাহাই করিয়া রাখিয়াছে।[১৪৭]

১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা অনুমোদনের পর ঐদিন বিকেলে পল্টন ময়দানে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক ভাষণ দেয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও জনসভায় বিশাল জনসমাবেশ হয়েছিল। ২১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক নিম্নোক্ত খবর পরিবেশন করে:

"চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, প্রত্যন্ত প্রদেশে সর্বস্ব পণ করিয়াই আমরা আজ আন্দোলনে এ কসুমাকীর্ণ পথে পা বাড়াইয়াছি।"

> শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন, ৬ দফা নতুন কিছু নয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবি আমরা জানিয়ে আসছি পাকিস্তানের জন্মকাল থেকেই। প্রদেশের জন্য অধিকতর ক্ষমতা কেন্দ্রকে দুর্বল করে ফেলবে- এ কথা যারা বলে, তারা আসলে পাকিস্তানের অমঙ্গল কামনা করছেন। পাকিস্তান সেদিন উন্নত হয়। শেখ মুজিব ৬ দফার প্রতিটি দফা ব্যাখ্যা করে বললেন, আপনারা নতুন করে পুরনো দাবিগুলোর কথা শুনছেন। ২১ দফার মধ্যে ছিলো স্বায়ত্তশাসনের দাবি। কিছুদিন আগেও আমরা ১১ দফায় স্পষ্ট করেই স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছি। ৬ দফা মূলত আমাদের বাঁচার অধিকারের দাবি। আমাদের ভাষার ওপর কেন হামলা হয়েছিল? হয়েছিল বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য। আমি নিশ্চিত ৬ দফা বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রাণের দাবি হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। আপনাদের কাছে আকুল আবেদন, আপনারা ৬ দফার কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবেন। বাঙালি আজ সচেতন জাতি। ৬ দফার আন্দোলনই এখন থেকে বাঙালির একমাত্র আন্দোলন।[১৪৮]

---

১৪৭. উদ্ধৃত: সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

১৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ মার্চ ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

> ৬-দফা বাংলার মানুষের মুক্তি সনদ। আমরা মুক্তি সনদ কেন দিলাম, আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন। তাই তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করলেন আমাদের বিরুদ্ধে– সামরিক বাহিনীর কিছু বাঙালি ছেলে, বাঙালি সরকারি কর্মচারী ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। তাঁরা আমাদের কারাগারে বন্দী করলেন। আওয়ামী লীগকে ব্যান্ড করলেন না, কিন্তু তাঁরা বন্দি করলেন অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকে। আওয়ামী লীগ ভাঙার জন্য পাকিস্তান থেকে কিছু নেতা এসে তখন চেষ্টা করলেন। ভাঙলেন কিছুটা। কিছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতা বুঝতে না পেরে যোগদান করলেন তাদের সাথে। আমি তখন কারাগারে বন্দি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, শামসুল হক, জালাল, জহুর ও চিটাগাং-এর আজিজ সহ আমার বহু সহকর্মী বন্দি হয়। যারা বাইরে রইল, তারা ৬-দফাকে আঁকড়ে ধরল। তারা মোকাবেলা করল, নেতৃত্ব দিল। নজরুল ছিলেন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট। এই অবস্থায়ই তারা শুরু করল। শাসকরা পারল না আওয়ামী লীগকে দাবাতে।[১৪৯]

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের প্রাক্কালে তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকাসহ ৬-দফা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পরে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা' শিরোনামে প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমেন কর্তৃক ৬-দফার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়– এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। পাকিস্তান সরকার ৬-দফাকে নতুন চ্যালেঞ্জ এবং হুমকিস্বরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আইয়ুব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬-দফার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন।[১৫০]

আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গসংগঠনগুলো ৬-দফার প্রচার জোরদার করতে মাঠে নামে। ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে ৬-দফা অনুমোদনের পর ওই দিন বিকালে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভা হয়। এ সভায় তেজস্বী ভাষায় ভাষণ দেন শেখ মুজিব। সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন এবং ৬-দফার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন।

১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মানিকগঞ্জের শিবালয়ে এক জনসভায় তিনি ভাষণ দেন। শেখ মুজিবুর রহমান ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত পূর্ব বাংলার প্রায় জেলা, মহকুমা ও থানা সদরে অসংখ্য জনসভা ও পথসভা করেন। তার সাথে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ-সব সভায় অংশগ্রহণ করে। জনসভা ছাড়াও দলীয় সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্ত ভিত দেওয়ার জন্য প্রত্যেক জায়গায় কর্মীসভাও করেন। কারণ দলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীই হল আসল প্রাণশক্তি, যারা আন্দোলন ও সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৬-দফা ঘোষণার পর শেখ মুজিবুর রহমান ৭ এপ্রিল পাবনা, ৮ এপ্রিল বগুড়া, ৯ এপ্রিল রংপুর, ১০ এপ্রিল দিনাজপুর, ১১ এপ্রিল রাজশাহী, ১৪ এপ্রিল ফরিদপুর, ১৫ এপ্রিল কুষ্টিয়া, ১৬ এপ্রিল যশোর, ১৭ এপ্রিল খুলনায় জনসভায় ভাষণ দেন। উল্কার মতো তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রাপ্ত পর্যন্ত ছুটে গেছেন। খুলনার জনসভা শেষে ঢাকা ফেরার পথে ১৮ এপ্রিল ভোর রাতে যশোরে শেখ মুজিবকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। যশোর মহকুমা হাকিম তাকে

১৪৯. খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধু দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৩৯
১৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

জামিনে মুক্তি দেন। তিনি মাগুরায় জনসভা শেষে ঢাকা চলে আসেন। ২০ মার্চ পল্টন ময়দানে রাষ্ট্রদ্রোহী ভাষণ দেওয়ার জন্য শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে ১৯ এপ্রিল। ২১ এপ্রিল ঢাকার মহকুমা হাকিমের আদালতে তার জামিন নাকচ করলেও আইনজীবীদের তাৎক্ষণিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়রা জজ তার জামিন মঞ্জুর করেন।[১৫১]

পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি ক্রমেই গতিশীল ও দুর্বার হয়ে ওঠায় বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলো সংবাদ পরিবেশনসহ পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, অভিমত, প্রতিক্রিয়া দিতে থাকে। ২১ এপ্রিল (১৯৬৬) জামিন লাভের পর পুরানা পল্টনে কর্মীসভা করে ধানমন্ডির বাসভবনে ফিরে আসেন তিনি। ধানমন্ডির বাসায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেতে বসেছেন এমনি সময়ে পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে সিলেট মেইল ট্রেনে সিলেট নিয়ে যায়। ঢাকা রেলস্টেশনে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় এবং নেতার মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেয়– এতে ট্রেন ছাড়তে এক ঘণ্টা বিলম্ব হয়। ২৩ এপ্রিল সিলেট কোর্টে হাজির করা হলে কোর্ট প্রাঙ্গণে হাজার-হাজার মানুষ সমবেত হয়। সিলেট দায়রা জজের কোর্টে একঘণ্টা জেরার পর শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়। সিলেট জেল গেটে আবার ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হয় পুলিশ, ময়মনসিংহে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ সময় জেলগেটে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। তাকে পুলিশ প্রহরায় ট্রেনে ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হয়। ময়মনসিংহে জনতা প্রতিবাদ জানায় শেখ মুজিবকে অযথা হয়রানির জন্য, এতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। শেখ মুজিবকে অযথা হয়রানির প্রতিবাদে দেশব্যাপী জনগণ পথসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করে। ২৫ এপ্রিল ময়মনসিংহের দায়রা জজ শেখ মুজিবের জামিন মঞ্জুর করেন। ২৬ এপ্রিল শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৯ এপ্রিল শেখ মুজিব কুমিল্লা শহরে জনসভা করেন। ইতোমধ্যে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় তিনি রেশনিং ব্যবস্থা চালুর ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি দাবি জানান।[১৫২]

সিলেট মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য শেখ মুজিব ৪ মে রেলযোগে সিলেট যান। তার সাথে আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমদ, আবদুল মোমেন, মিজানুর রহমান চৌধুরী সিলেট গমন করেন। ৬ মে আদালতে হাজিরা শেষে সিলেটে জনসভা করে আবার ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় শ্রমিক জনসভা শেষে ঢাকার বাসায় ফিরলে ৯ মে প্রথম প্রহরে দেশরক্ষা আইনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৬-দফা ঘোষণার পর শেখ মুজিবের ওপর কারা নির্যাতন বেড়ে যায় এবং তাকে ঘন-ঘন গ্রেপ্তারের শিকার হতে হয়। ওই দিন আরও গ্রেপ্তার হন তাজউদ্দিন আহমদ, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এম এ আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) এবং আবদুর রহমান সিদ্দিকী।

১৯৬৬ সালের ৭ জুন সরকারের শত নির্যাতন সত্ত্বেও সারা প্রদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। কলকারখানা, অফিস-আদালত, দোকানপাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তেজগাঁও শিল্প এলাকায় বেঙ্গল বেভারেজে চাকরিরত সিলেটের অদিবাসী মনু মিয়া নিহত হন। শ্রমিক আবুল

---

১৫১. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-৭৬

১৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

হোসেনসহ আরও পাঁচজন শ্রমিক নিহত হন। শ্রমিকের মৃত্যুতে শিল্পাঞ্চলসহ সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ বারুদের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। ওই দিন সন্ধ্যার পর সরকার ঢাকার বুকে কারফিউ জারি করে। আওয়ামী লীগের প্রথম সারির প্রায় নেতা গ্রেপ্তার হন। ১৫ জনু ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করে ইত্তেফাক অফিস ও প্রেস বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে মিজানুর রহমান চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, মোল্লা জামালউদ্দীন, ফণীভূষণ মজুমদার, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মণি, শেখ শহীদুল ইসলামসহ অনেকে গ্রেপ্তার হন। এ সময় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আমেনা বেগম আওয়ামী লীগের হাল ধরেন।[১৫৩]

আওয়ামী লীগের এমনি দুর্দিনে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও আবদুল সালাম খানরা মিলে পিন্ডিপন্থি আওয়ামী লীগ গঠন করেন। ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি। তার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের করে কারাগারেই বিচার চলছে। রাশিয়া ও চীনে তাত্ত্বিক বিরোধ নিয়ে ন্যাপও দ্বিধাবিভক্ত হয়। একদিকে মওলানা ভাসানী, অন্যদিকে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ নেতৃত্ব দেন। ন্যাপের ছাত্র সংগঠনও দু'ভাগ হয়ে যায়– এক ভাগে রাশেদ খান মেনন এবং অন্যভাবে মতিয়া চৌধুরী নেতৃত্ব দেন।

১৯৬৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে ৬-দফা দাবি দিবসের কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রতিটি জেলা ও মহমুকায় সভা সমাবেশ হয়। চট্টগ্রামে সদ্য কারামুক্ত নেতা এম এ আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরীসহ অনেকেই জনসভায় বক্তব্য রাখেন। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ৬-দফা আন্দোলনকে বেগবান করে রাখে।[১৫৪]

১৯৬৭ সালের ২২ জুন আইয়ুব সরকার রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ এবং বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত করে। এ সময় এর প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিবৃতি দেন ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ড. কাজী মোতাহের হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, এম এ বারী, অধ্যাপক আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. খান সরওয়ার মুর্শিদী, ড. আহমদ শরীফ, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, সিকান্দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। এ বিবৃতির ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়।[১৫৫]

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময় কর্তৃপক্ষ রেডিও পাকিস্তান ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেন। তখন যুদ্ধকালীন সময়ের মতো বিশেষ মুহূর্তের জন্য সংবাদপত্রসমূহ এরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে। যুদ্ধ অবসানের পর ১৯৬৬ সালের প্রথমদিকে পুনরায় সীমিত আকারে রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার শুরু হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠলে

---

১৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

১৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

১৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারে বাধার সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে সরকার মনে করে যে, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে যে ছয় দফার আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে তাতে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মকবোধক সঙ্গীত তাদের বিপথগামী করছে। এ সকল কারণে ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তর পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ঘোষণা করেন যে, জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারার পরিপন্থী রবীন্দ্র সঙ্গীত রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার বন্ধ করা হবে।[১৫৬] ২৪ জুন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় সরকারি সংবাদ সংস্থা এপিপির বরাত দিয়ে রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার করা হবে না শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদে বলা হয়:

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবেনা এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে। রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরীর এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে খাজা শাহাবুদ্দিন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।[১৫৭]

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এরূপ বক্তব্য জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপাকিস্তানে পুনরায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বুদ্ধিজীবী মহল এবং পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত প্রথম সারির সংবাদপত্রে-এর একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এ ঘোষণার পক্ষে-বিপক্ষে সংবাদপত্রে দেয়া বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে। দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকা প্রতিটি বিবৃতি পরপর প্রকাশ করে। প্রথমেই ১৯৬৭ সালের ২৫ জুন মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি শিরোনামে যে, বিবৃতিটি দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত হয় তাতে সরকারি সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত দুঃখজনক আখ্যায়িত করে বলা হয়:

স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২১শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি।[১৫৮]

২৬ জুন পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্বতন্ত্র সদস্য আসাদুজ্জামান খান পরিষদ অধিবেশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত বিষয়ে সরকারের মনোভাবের নিন্দা করেন। এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এরূপ প্রবল প্রতিবাদের মুখে সরকার এ সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন। দৈনিক মর্নিং নিউজ সরকারের মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে 'Clarification' শীর্ষক সংবাদে লিখে:

> A Spokesman of the ministry of information yesterday clarified Mr. Shahabuddin's about statment Tagore songs. He said the

১৫৬. *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৩ জুন, ১৯৬৭

১৫৭. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ জুন, ১৯৬৭

১৫৮. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৫ জুন, ১৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

> minister had stated that only those songs which were against Pakistan's cultural values' would not be broadcast in future and the use of other songs would also be reduced.[১৫৯]

পাকিস্তান সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে উক্ত বক্তব্য প্রকাশের পরও রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কিত বিতর্কের অবসান ঘটেনি। ২৯ জুন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় দু'টি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। একটি উপরোক্ত ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে ৫ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি, অপরটি সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ৪০ জন বুদ্ধিজীবীর একটি বিবৃতি।[১৬০] উভয় বিবৃতিতে বৃদ্ধিজীবীগণ প্রকারান্তরে সরকারের প্রদত্ত সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালির একাংশের কবি বলে উল্লেখ করেন।

এরূপ বিতর্কে বুদ্ধিজীবীদের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সংবাদ পত্রসমূহও বিভক্ত হয়ে পড়ে। দৈনিক আজাদ, মর্নিং নিউজ, দৈনিক পাকিস্তান সরকারের বক্তব্যের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। ৩০ জুন (১৯৬৭) দৈনিক আজাদ, 'রবীন্দ্র সাহিত্য ও পূর্ব-পাকিস্তান'- শীর্ষক সম্পাদকীয়তে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের পূর্বোক্ত বক্তব্যের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে এবং একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত কবি বলে মন্তব্য করে লিখেঃ

বাংলা সাহিত্যের সেই চিরস্থায়ী ব্যবধান ভাঙ্গার কাজের রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিভাকে কখনো নিয়োজিত করেন নাই। তিনি মনে, প্রাণে, বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় সেই বঙ্কিম, হেম, নবীনেরই ধারার একান্ত অনুসারী এবং সেই ধারাকেই তিনি পরিণত, পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন। বাংলার অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে তাহার উৎসুক্য ছিল না, এবং মুসলমানদের প্রতি উপেক্ষা ও ঘৃণা লইয়া যে একপেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সীমানা ভাঙ্গায় কিছুমাত্র আগ্রহও তিনি দেখান নাই।[১৬১]

অপরদিকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সে ধারার পত্র-পত্রিকা সরকারের এ ঘোষণাকে বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি সরকারের ধারাবাহিক বিদ্বেষ ও চক্রান্ত বলেই অভিহিত করে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কিত সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন এবং একে চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এরূপ অপচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।[১৬২] ন্যাপ সমর্থক দৈনিক সংবাদ খাজা শাহাবুদ্দিনের বক্তেব্যের কড়া সমালোচনার পাশাপাশি উদ্ভুত বিতর্ককে অবাঞ্ছিত ও দুভার্গ্যজনক বলে মন্তব্য করে। ২ জুলাই (১৯৬৭) প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে পত্রিকাটি লিখেঃ "কোনো কোনো রবীন্দ্র সঙ্গীত পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মর্যাদার পরিপন্থী ইহাই বা কে নির্ধারণ করিবে? এই নিরিখে সকল রবীন্দ্র সঙ্গীতই যে বর্জিত হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কী?

---

১৫৯. *মর্নিং নিউজ*, ২৮ জুন, ১৯৬৭
১৬০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন, ১৯৬৭
১৬১. *দৈনিক আজাদ*, ৩০ জুন, ১৯৬৭
১৬২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন, ১৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

আমরা মনে করি রবীন্দ্র সঙ্গীত বর্তমানে যে বিতক্ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অবাঞ্ছিত ও দুর্ভাগ্যজনক। সুতরাং অবিলম্বেই এই বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত।”[১৬৩]

রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কিত বিতর্ক চলাকালীন সময়ে **১৯৬৭** সালের ৮ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৭৪) রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে অন্যান্য সংবাদপত্র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে; কিন্তু সরকারি ট্রাষ্ট্রের পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ২২ শ্রাবণ (রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী) উপলক্ষ্যে কোনো সংবাদ কিংবা বিশেষ প্রতিবেদন কিছুই প্রকাশ করেনি। একমাত্র শেষ পৃষ্ঠায় পত্রিকাটি তৎকালীন পাকিস্তান তমদ্দুনিক আন্দোলন-এর সম্পাদক কবি বেনজীর আহমদের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। উক্ত বিবৃতিতে বিদেশী সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ প্রতিহত করার আহ্বান জানানো হয়।[১৬৪] **১২** আগস্ট দৈনিক পাকিস্তান ‘জাতীয় সংস্কৃতি চরিত্র’ শীর্ষক এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে উপরোক্ত বিবৃতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে বিদেশী সংস্কৃতি বলে অভিহিত করে একে গ্রহন করা মানে আত্মবিলুপ্তি বা আত্মহননের সামিল বল উল্লেখ করা হয়।[১৬৫]

ষাট দশকের শেষার্ধে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীত বর্জনের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে বাংলা বর্ণমালার ওপরও কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করা হয়। বাংলা ভাষা বা বর্ণমালা সংস্কারের অপচেষ্টা বহু পূর্ব থেকে চলে আসলেও আয়ুব খানের আমলে তা নতুন উদ্যোগে শুরু হয়।[১৬৬] আয়ুব খান নিজেও বিশ্বাস করতেন যে, দুটি জাতীয় ভাষা, নিয়ে এক জাতি ও রাষ্ট্রগঠন করা যায় না।[১৬৭] কিন্তু একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়ুব খান সময়ে সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এসব অযৌক্তিক ও অসম্ভব উদ্যোগ কখনও ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৬২ সালে মার্চ মাসে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ‘বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি’ গঠিত হয়। সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে গঠিত বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসনাৎ, মুহম্মদ আব্দুল হাই, মুহম্মদ ওসমান গণি, মুহম্মদ ফেরদাউস খান, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। উক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ দীর্ঘ দিন গবেষণা করে বাংলা বানান ও লিপি সংস্কারের সুপারিশ পেশ করেন। সেসব সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য **১৯৬৮** সালের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৬৮] কিন্তু এসব সংস্কার প্রশ্নে আবারও পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য এ বিতর্কেও সংবাদপত্রসমূহ বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষা সংস্কারের উদ্যোগকে দৈনিক সংবাদ এবং এক্ষেত্রে দৈনিক আজাদও

---

১৬৩. *দৈনিক সংবাদ*, ২ জুলাই, ১৯৬৭

১৬৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ আগস্ট, ১৯৬৭

১৬৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১২ আগস্ট, ১৯৬৭

১৬৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য : সাঈদ উর রহমান, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৭-৭২

১৬৭. বাঙালি মুসলমানের ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে আয়ুব খানের বিজাতীয় মন্তব্য দেখুন, *Mohammad Ayub Khan: Friends Not Masters: A Political Autobiography (London 1967)*, P. 187, 194-195; [এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, কামরুদ্দিন আহমদ, *বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, খ.২, ঢাকা : ১৩৮২ বাং]

১৬৮. *Minutes of the Academic Council*, Dhaka University File, 15(A), August 3, 1968

যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে এর বিরোধিতা করে। ১৯৬৮ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক আজাদ ‘বাংলা বর্ণমালা সংস্কার প্রসঙ্গে’ শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখে:

> উর্দু ভাষার পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা যদি উর্দু বর্ণমালা সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার তাত্ত্বিকেরা কেন হঠাৎ এই সংস্কারের ছুরিতে ভাষা বহুধা খণ্ডিত করিতে চাহিতেছেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। ভাষা সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। কারণ বাংলা ভাষা ওপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ আঘাত আসিয়াছে বহুবার।[১৬৯]

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় এসময় ভাষা সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন লেখকের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে ৪ অক্টোবর প্রকাশিত (১৯৬৮) ‘পাকিস্তানী সংস্কৃতি’ শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে পত্রিকাটি ভাষা সংস্কারের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। একই তারিখে মুনীর চৌধুরী লিখিত ‘বাংলা বানান ও বর্ণমালা সংস্কারের সমস্যা’ শীর্ষক নিবন্ধে বাংলা ভাষা সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করা হয়। উক্ত নিবন্ধের পাল্টা একটি জবাব দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় ১২ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, ১৯৬৮ সালের পুরো সময়টি পত্র-পত্রিকা রবীন্দ্র সাহিত্য ও ভাষা সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে লেখা-লিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সাহিত্য-সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে যখন পত্র-পত্রিকা ও বিদ্যুৎ সমাজ বিতর্কে লিপ্ত, ঠিক সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে উপস্থিত হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রসঙ্গ-যার সূত্র ধরে ক্রমান্বয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে দেখা দেয় চরম গণঅসন্তোষ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও এর প্রভাব

আগরতলা মামলার মাধ্যমে বাঙালি জাতির জাগরণ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা শীর্ষে পৌঁছে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর ওপর ছিল গভীর বিশ্বাস। তিনি প্রায়ই বলতেন ‘আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, একদিন শেখ মুজিব ইতিহাস সৃষ্টি করবে।’ শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর স্মৃতিচারণে শেখ মুজিব সম্পর্কে বলেন, “আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এবং নিষ্ক্রিয়তার কারণে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা পিছিয়ে আছে। ফলে বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান অস্থির হয়ে উঠেছেন। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারকে তিনি তখনকার মতো একমাত্র প্রধান ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করতে রাজি ছিলেন।”[১৭০]

১৯৬২ সালে বিভিন্ন কারণে সচেতন জাতীয়তাবাদী বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়। সাধারণ নাগরিকদের ভোটের অধিকার নেই। পাকিস্তানে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটের অধিকার আছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক পথে বাঙালিদের অধিকার অর্জনে বৈষম্য দূর হবে না। তাদের একমাত্র ভরসা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সামরিক বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে করাচী জেলে আটক রেখেছে। শেখ মুজিব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের বিকল্প পথ খুঁজছিলেন।

---

১৬৯. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ আগস্ট, ১৯৬৯

১৭০. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮

তিনি বিশ্বাস করতেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক সরকারকে উৎখাত করা যাবে না। তাই তিনি নেতাজী সুভাস বসুর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন। তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে একদল তরুণ সৈনিকদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি পরিকল্পনা করেন ভারতে অবস্থান করে ভারতের সহযোগিতায় স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বের একদল সেনা সদস্য বিএলএফ প্রতিষ্ঠা করেন। তারা বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। তাই তাদের নিয়ে এককভাবে যুদ্ধ করে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা সম্ভব হবে না বহির্বিশ্বের সহায়তা অবশ্যই প্রয়োজন হবে। তাই শেখ মুজিব ভারত থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৭১]

শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকজন বামপন্থী নেতার সাথে আলোচনা করেন- তিনি দেশ ত্যাগ করবেন। প্রথমে ভারত, তারপর সেখান থেকে লন্ডনে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাবেন। একই সাথে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলবেন। যেমন করেছিলেন নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু। এ গোপন পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, আহমেদ ফজলুর রহমান এবং সিলেটের চা বাগানের মালিক মোয়াজ্জেল হোসেন চৌধুরী। ভারতীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। সংকেত পেয়ে শেখ মুজিব আগরতলা যাবেন, সেখানে মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী থাকবেন। রুহুল কুদ্দুস সংকেত দিলেন। শেখ মুজিব গোপনে কালো চাঁদর মুড়ে টঙ্গী স্টেশন থেকে সিলেটগামী ট্রেনে উঠলেন। কুলাউড়া স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে শেখ মুজিব আগরতলা পৌঁছেন। কিন্তু মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সব ঠিক করতে পারেননি। এ পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ছিলেন শেখ মুজিবের ফুফাত ভাই মোমিনুল হক খোকা, তারেক চৌধুরী ও রেজাউল আলী চৌধুরী ও হারুন অর রশীদ। কিন্তু আগরতলার মিশন বাস্তবায়িত হয়নি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ভারতে থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাতে অনুমতি দেয়নি।[১৭২]

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অন্তর্ধানে ব্যর্থ হয়ে আবার গোপনে দেশে ফিরে আসেন। যেদিন এলেন, ঐদিন রাতেই পুলিশ পুনরায় তাকে গ্রেফতার করে। দেখা যাচ্ছে শেখ মুজিব ভারতের সহায়তায় পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা ১৯৬৩ সালেই গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি দিবাগত রাত্রি ১টার দিকে ঘুমে আচ্ছন্ন শেখ মুজিবকে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানা থেকে বের করে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু খবর রটে যায় শেখ মুজিবকে কোনো-এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলের বাইরে এ খবর আসার পর চারদিকে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করে। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি একটি সরকারি প্রেসনোটে শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও

১৭১. *প্রাগুক্ত*

১৭২. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯-২৯০

পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়। সরকার এই ষড়যন্ত্রকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে অভিহিত করে।[১৭৩] তথাকথিত এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বাঙালি রাজনীতিতে, সরকারি আমলা, সামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ মোট ৩৬ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ২১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় শেখ মুজিবের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ দেশের প্রচলিত আইনে বিচার করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করা হয়।[১৭৪]

প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ বলে সাবেক প্রধান বিচারপতি এম এ রহমান, বিচারপতি মুজিবুর রহমান এবং বিচারপতি মকসুমুল হাকিমকে নিয়ে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও মামলার অন্যান্য আসামীদের বিচারের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।

শেখ মুজিবকে আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত করার প্রতিবাদে সারা পূর্ববাংলা জ্বলে ওঠে। ১৯৬৮ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে প্রথম পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। ১৯৬৮ সালের ২০ জুন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হয়। গোয়েন্দা বিভাগের সামরিক কর্মকর্তা কর্ণেল হাসান ও কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান আসামিদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাত। ট্রাইব্যুনাল কক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং অন্য অভিযুক্তদের আত্মীয়স্বজন উপস্থিত থাকতেন। ১৯৬৮ সালের ২০ জুন হতে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। কক্ষে সাংবাদিকদের বসার জায়গা ছিল। সাংবাদিকগণ প্রত্যেক দিনের সাক্ষীর বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। অভিযুক্তদের মধ্যে ১১ জন আসামি রাজসাক্ষীর ভূমিকা নেয়।

ইংল্যান্ডের রাণীর কৌসুলি স্যার টমাস উইলয়াম শেখ মুজিবুর রহমানের কৌসুলি নিযুক্ত হন।[১৭৫] লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালিরা চাঁদা সংগ্রহ করে তাঁকে ঢাকা পাঠান। ১৯৬৮ সালে ১৯ অক্টোবর ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসরাম। সভা উদ্বোধন করেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। সভায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করেন। সারা দেশে আগরতলা মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল চলছে- 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব' স্লোগানের মধ্য দিয়ে আন্দোলন চলতে থাকে।

রাজনৈতিক অবস্থায় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে কতিপয় বাঙালি সেনাসদস্যের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে সরকারের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারি সরকারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে জারিকৃত এক প্রেসনোটে বলা হয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার

---

১৭৩. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

১৭৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

১৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে।[১৭৬] ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি পূর্বের জারিকৃত মামলা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রেসনোটটি প্রকাশ করা হয়। উক্ত সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়ঃ

একটি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রটি গত মাসে উদঘাটিত হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। বিশৃংখলা সৃষ্টির এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘৃণা ষড়যন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে দেশের উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে যে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে সরকার সে ব্যাপারে সচেতন। সরকার তাই তদন্তের ফলাফল, অগ্রগতি এবং এদের বিচার সম্পর্কিত সব তথ্য জনসাধারণকে জানাবে।[১৭৭]

সরকারি প্রেসনোটে পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি অফিসার লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে ১ নম্বর অভিযুক্ত আসামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মাত্র ১১ দিন পর ১৮ জানুয়ারি সরকার অপর একটি প্রেসনোট প্রচার করে এবং এতে ১৯৬৬ সালের মে মাস থেকে কারাগারে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের পরিবর্তে শেখ মুজিবকে মূল অভিযুক্ত রূপে ঘোষণা করে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্ত" শিরোনামে মামলা দায়ের করা হয়।[১৭৮]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ঘটনাবলী নিয়ে গণমানুষের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ মামলা দায়ের করার দুই বৎসর পূর্ব থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপত্তা আইনে কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৮ জানুয়ারি গভীর রাতে তাকে মুক্তি দিয়ে জেল গেট থেকেই ষড়যন্ত্র মামলায় পুনরায় গ্রেফতার করে সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। দ্বিতীয়তঃ সরকারের জারিকৃত দ্বিতীয় প্রেসনোটে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রথম অভিযুক্ত আসামীরূপে ঘোষণা করে পরবর্তীতে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী ঘোষণা দিয়ে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। তৃতীয়তঃ ৬ তারিখে জারিকৃত প্রেসনোটের ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, সরকার তার রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী ও জনগণের কাছে জনপ্রিয় করার একটি মোক্ষম সুযোগ হিসেবে এ মামলাটি ব্যবহার করতে চায়। কেননা যেখানে সামরিক আদালতে বিচারাধীন বন্দীদের বিচার সংক্রান্ত খবর গোপন রাখা হয়, সেখানে মামলা সংক্রান্ত সকল খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এতে জনগণের নিকট সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মামলাটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং প্রতিপক্ষকে দমন ও হয়রানির উদ্দেশ্যেই মামলাটি সাজানো হয়েছে।[১৭৯]

মামলার স্বরূপ উদঘাটনে এবং মামলা বিরোধী ব্যাপক জনমত সৃষ্টিতে সংবাদপত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন থাকাকালে মামলার পক্ষে-বিপক্ষে নিজস্ব কোনো মতামত ব্যক্ত করে প্রতিবেদন কিংবা সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করা সংবাদপত্রের পক্ষে

---

১৭৬. *দৈনিক আজাদ*, ১ জানুয়ারি, ১৯৬৮

১৭৭. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮

১৭৮. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮

১৭৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব হয়নি। কিন্তু মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের দৈনন্দিন জবানবন্দী, সাওয়াল-জওয়াব ও রাজনৈতিক বন্দীদের নির্যাতনের কাহিনী সবকটি দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলে উল্টো অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষে ক্রমান্বয়ে জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে আয়ুব খানসহ কেন্দ্রীয় রাজনীতির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর পুঞ্জিভূত ক্ষোভ আরও ঘনীভূত হয়।

এ পর্যায়ে ১৯৬৮ সালের জুন মাসে আগরতলা মামলার অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযোগ (চার্জসিট) গঠন করা হয়। ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের একটি সুরক্ষিত কক্ষে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় মামলার বিচারকার্য শুরু হয়। এ মামলা শুনানী কালে (৮ জুন ১৯৬৮ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে মামলা প্রত্যাহারের পূর্ব পর্যন্ত) প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রদত্ত জবানবন্দীতে পাকিস্তানের ইতিহাস, আওয়ামী লীগের সংগ্রামের ইতিহাস এবং তাঁর ওপর সরকারের নির্যাতনের ধারাবাহিক বিবরণ জোরালো ভাষায় উপস্থাপন করেন।[১৮০] সমসাময়িককালে বহুল প্রচারিত দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংবাদ এবং দৈনিক পাকিস্তান বিশাল বিশাল শিরোনামে এসব জবানবন্দীর পূর্ণ বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এসব বিবরণ সর্বস্তরের পাঠককে খুবই আকৃষ্ট করে। এমনকি রাস্তাঘাটে ও দোকানপাটে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তা ব্যাপক আলোচিত হতে থাকে। মূলত ১৯৬৮ সালের শেষার্ধ থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ প্রকাশ করে পূর্বপাকিস্তানের সংবাদপত্র পাকিস্তান বিরোধী জনমতকে আরও প্রবল করে তোলে।

আওয়ামী লীগ সমর্থক দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা তখনও বলবৎ ছিল। দৈনিক আজাদ রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন না দিলেও এ সময় পত্রিকাটি মামলা বিরোধী জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৮১] মূলত আদালতের সংবাদ প্রচার করে সংবাদপত্রগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে শেখ মুজিব ও মামলার অন্যান্য আসামীকে জনগণের কাছে অভাবনীয় জনপ্রিয় করে তোলে। ইহা খুবই স্পষ্ট যে, সংবাদপত্রের কল্যাণেই পরবর্তী উনসত্তরের মার্চে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট সূচিত হয়।

---

১৮০. Mohammad Asghor Khan, *Op. Cit*, P. 19. [আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং এর পূর্ণ বিবরণ সম্বন্ধে দেখুন, সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলির পত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০]

১৮১. আলোচ্যকালে প্রকাশিত ১৪ পৃষ্ঠার দৈনিক আজাদ প্রথম পাতায় মামলা সংক্রান্ত খবরাদি এবং ভিতরের ১২ পাতায় মামলার প্রতিদিনের কার্যক্রমের পূর্ণ বিবরণ ধারাবাহিক প্রচার করে। ১৯৬৬ সালেল ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ছয় দফার আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব পত্র-পত্রিকার পাতায় যে স্থান লাভ করেছিলেন এবার কারাগারে বন্দী থেকেও সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তিনি আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ প্রচার সংবাদপত্রে কতখানি স্থান লাভ করেছিল তা দৈনিক আজাদের প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষ সংবাদপত্রের শিরোনামগুলি জরিপ করলে বুঝা যায়। ১৯৬৮ সালের শুধু জুন মাসে (৮ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত) দৈনিক আজাদের প্রথম পৃষ্ঠার ১২টি শীর্ষ শিরোনাম ছিল, যা শুধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সংক্রান্ত। জুলাই মাসে এ অবস্থা কিছুটা হ্রাস পেলেও (৬টি শীর্ষ সংবাদ শিরোনাম) আগস্ট মাসে ৩৪টি শীর্ষ শিরোনাম মামলা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং নভেম্বর মাসে (১৯৬৮) এ সংখ্যা ৪৭-এ উপনীত হয়। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে এসে মামলা সংক্রান্ত খবর দ্রুত হ্রাস পায়। কারণ এসময় মামলার শুনানী প্রায় শেষ হয়ে গেলে আদালত কী ধরনের রায় প্রদান করে তা নিয়ে সংবাদপত্র উৎকণ্ঠিত ছিল। একই সঙ্গে পত্রিকাটির ভিতরের ১২ পাতায় নিয়মিত মামলার বিবরণ প্রকাশ নির্ধারিত ছিলই। এছাড়া আলোচ্য সময়ে দৈনিক আজাদে আগরতলা মামলা সংক্রান্ত ছোট-বড় প্রায় ১৭০টি খবর প্রকাশিত হয়। [সাহিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও ৬ দফার দাবিতে প্রদেশব্যাপী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ৭ জুন ৬ দফা আন্দোলনের 'প্রতীক' পালিত হয়। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে আন্দোলন স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিরোধী দল প্রাদেশিক আইন পরিষদ বর্জন করে। পরিষদের নেতা শিল্পীমন্ত্রী দেওয়ান আব্দুল বাসেত বলেন, আমরা ৭ জুন নিহতদের শহীদ বলে মনে করি না, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং তারা অপরাধীদের চেয়ে নিকৃষ্ট। ১৯৬৮ সালের ১৪ জুলাই ছাত্ররা বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে মিছিল করলে পুলিশ তাদের বলাকা সিনেমা হলের নিকট লাঠিচার্জ এবং অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ১৯৬৮ সালের ১৬ জুলাই সরকার জগন্নাথ কলেজকে সরকারি কলেজে রূপান্তরিত করলে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এর প্রতিবাদে ২৪ জুলাই ছাত্রদের আহ্বানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মঘট পালন করে।

১৯৬৮ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সভা উদ্বোধন করেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। সভায় সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জহুর আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ সভায় ভাষণ দেন এবং সকলে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করেন।

১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার বেতার ভাষণে বিরোধীদলসমূহের প্রতি বিষোদগার করেন এবং কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। লে. জে. আজম খান (প্রাক্তন গভর্নর) ঘোষণা করেন বর্তমান শাসনতন্ত্রে জনগণের আশা-আশাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে না। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগই সর্বপ্রথম আইয়ুবের অধীনে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। ৮ জানুয়ারি ন্যাপও একই পন্থা অবলম্বন করে।

১৯৬৮ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সরকার সমর্থিত জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ উল্লেখযোগ্য আসন পায়। ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ৬-দফা সংবলিত ১১-দফার ভিত্তির কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে:[১৮২]

১. তোফায়েল আহমদ, সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)
২. নাজিম কামরান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)
৩. আবদুর রউফ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
৪. খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
৫. সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মস্কোপন্থি)

১৮২. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

৬. সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মস্কোপন্থি)
৭. মোস্তফা জামাল হায়দার, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (পিকিংপন্থি)
৮. মাহবুব উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (পিকিংপন্থি)
৯. মাহবুবুল হক দোলন, সভাপতি, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এনএসএফ)
১০. ইব্রাহীম খলিল, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এনএসএফ)

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হলেন ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমদ।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি স্বৈরশাসনের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে ৮-দফা ভিত্তিতে বিরোধীদলগুলো Democratic Action Committee (DAC) অর্থাৎ ডাক গঠন করা হয়। শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি ডাকের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আওয়ামী লীগ তাতে যোগ দেয় এবং আইয়ুবের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বৃহত্তর আন্দোলন সৃষ্টি করা।

১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ দাবি দিবসের আহ্বান জানান। ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জঙ্গি মিছিল বের করে। পুলিশের লাঠিচার্জ ও নির্যাতনে অনেক ছাত্র আহত হয়। ওদিন ছাত্রদের ওপর পুলিশের বেপরোয়া আক্রমণ চলে। ১৮ জানুয়ারি ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরসমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ঘোষণা করে।

আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত উত্তপ্ত জনমতকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে মাওলানা ভাষানী তৎপর হয়ে ওঠেন। এ লক্ষ্যে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যেরও প্রচেষ্টা চালান।[১৮৩] সংবাদপত্রগুলি মাওলানা ভাসানীর এরূপ প্রচেষ্টাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। দৈনিক পাকিস্তান এর রিপোর্টে বলা হয়:

গণ আন্দোলন তথা জনসাধারণের দাবীদাওয়া আদায়ের ব্যাপারে সংগ্রামের জন্য বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে মাওলানা ভাসানীর সাথে গতকাল বুধবার ছয় দফা পন্থী আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এক বৈঠকে মিলতি হন।[১৮৪]

এরূপ ঐক্যের সূত্র ধরে ১৯৬৮ সালের ৩ নভেম্বর ন্যাপ (ভাসানী) এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাওলানা ভাসানী আয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং একই সঙ্গে দেশব্যাপী লাগাতার ঘেরাও আন্দোলনের ডাক দেন।[১৮৫] মাওলানা ভাসানীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ৪ নভেম্বর দৈনিক সংবাদ বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তিনি তার বক্তৃতায় ছয় দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন:

---

১৮৩. আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ জেলে আটক থাকায়- ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমেনা বেগম এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে দলটি পরিচালিত হয়।

১৮৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ নভেম্বর, ১৯৬৮

১৮৫. *দৈনিক সংবাদ*, ৪ নভেম্বর, ১৯৬৮

> পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ১৩শত মাইলের ব্যবধানের কথা স্মরণে রাখিয়াই নিজেরদেরকে শাসন করার পূর্ণ অধিকার সমূহ দুটি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে পাকিস্তান গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে জিন্নাহ সাহেবের সভাপতিত্বে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। পাক ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, পূর্ব পাকিস্তানের অসহায়তা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির একান্ত অপরিহার্যতাকে পুনর্বার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে।[১৮৬]

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে সাংবাদিকরাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ ও দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তৎকালীন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল্লাহ কায়সার, সাধারণ সম্পাদক আতাউস সামাদ এবং প্রেস ক্লাব সভাপতি এবিএম মুসা এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।[১৮৭] সাংবাদিক সমাজ সংবাদপত্রের ওপর দমন পীড়নের প্রতিবাদে ১ ডিসেম্বর এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এ সম্পর্কিত দৈনিক সংবাদের এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে ঢাকায় সাংবাদিক সমাজ ও সংবাদপত্র সেবীদের সভা ও বিক্ষোভ মিছিল।[১৮৮]

রাজনৈতিক দল ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার বিরোধী আন্দোলন রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ৫ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান ব্যবিট্যাক্সি ইউনিয়নের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাওলানা ভাসানী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সরকার বিরোধী গণআন্দোলনের ডাক দেন।[১৮৯] সভাশেষে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি জঙ্গী মিছিল গভর্নর হাউস ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। পুলিশ মিছিলের ওপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ করলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং এতে বহু মানুষ আহত হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে মাওলানা ভাসানী ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় এবং ৮ ডিসেম্বর সমগ্র প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দেন।[১৯০] দেশব্যাপী লাগাতার হরতালকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গন চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা করে। প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনকালে পুলিশ ছাত্র-জনতার ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায়। এ অবস্থায় প্রাদেশিক মোনায়েম সরকার ৭ ডিসেম্বর হরতাল সংক্রান্ত যাবতীয় খবর প্রকাশে সংবাদপত্রের ওপর আরোপ করে প্রি-সেন্সরশিপ। বিরোধীদলের আন্দোলন এতো তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, এ যাত্রায় সব সংবাদপত্র সরকারের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা নীরবে অনুসরণ করেনি। বিশেষ করে দৈনিক সংবাদ আন্দোলনের ওপর নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করে। ৮ ডিসেম্বর তারিখে হরতাল পরিস্থিতি ও পুলিশী নির্যাতনের খবর প্রকাশ করে দৈনিক সংবাদ এক প্রতিবেদনে লিখে:

> পুলিশ সারাদিন বিভিন্ন এলাকয় সময় সময় দোকানপাট এবং সরকারি বে-সরকারি ভবনে প্রবেশ করিয়া জনতার উপর লাঠি চার্জ করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় কাঁদুনে গ্যাস

---

১৮৬. *প্রাগুক্ত*

১৮৭. *দৈনিক সংবাদ*, ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

১৮৮. *প্রাগুক্ত*, ২ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

১৮৯. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

১৯০. *প্রাগুক্ত*

> নিক্ষেপ করা হয়। মাগরেবের নামাজের পর পুলিশ বায়তুল মোকারমে প্রবেশ করে তথায় আশ্রয় গ্রহণকারী ভীত-সন্ত্রস্ত বালকসহ বহু লোককে প্রহার করে এবং মসজিদ হইতে প্রায় ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শহরে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর গুলিবর্ষণ, বিভিন্ন স্থানে পুলিশের লাঠিবার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপে তিনজন নিহত ও কমপক্ষে ত্রিশজন আহত হয়।[১৯১]

হরতাল চলাকালীন সময়ে কর্তব্য পালনরত সাংবাদিকদের ওপরও পুলিশ ব্যাপক লাঠি চার্জ করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ৯ ডিসেম্বর দেশব্যাপী সাংবাদিক ধর্মঘট পালিত হয়। এ সময় পত্রিকাগুলো শুধু সরকার বিরোধী আন্দোলনের খবর পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হয়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে একই মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আয়ুব খান সরকার বিরোধী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়। একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য দলগুলির প্রতি অনুরূপ আহ্বান জানিয়ে লিখে: "পল্টন ময়দানের র‌্যালিতে মাওলানা নিজেকে পুনরায় আবিস্কার করেছেন। সরকারকে দোষারোপের ব্যাপারে তার বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, জনগণের জন্য তার কর্মসূচী ছিল মাটির কাছাকাছি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম শুরু করার জন্য তাঁর আহ্বান ভূক্তভোগীরা উপেক্ষা করতে পারেন না।"[১৯২]

এ পটভূমিকায় ১৯৬৯ সালের শুরুতে সমগ্র পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্যবন্ধ আন্দোলনের তাগিদ অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যে ৮ জানুয়ারি 'একনায়কত্বের অবসান ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের' সংকল্প নিয়ে গঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি)।[১৯৩] পাকিস্তানের উভয় অংশের ৮টি বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত এ ঐক্যজোট ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১৯৪] বিরোধী দলের সমন্বয়ে ঐক্যজোট গঠনকে দৈনিক আজাদ এবং দৈনিক সংবাদ চলমান প্রেক্ষাপটে খুবই ইতিবাচক হিসেবে মন্তব্য করে। কিন্তু ট্রাস্টের পরিচালনাধীন ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ বিরোধী দলের ঐক্যকে উদ্দেশ্যবিহীন বলে বিদ্রƒপ করে লিখে:

> Supposing President Ayub were to take his detractors at their words and step down tomorrow. What will happen? A political and administrative vacuum for the simple reason that jointly the

১৯১. *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

১৯২. *সাপ্তাহিক হলিডে*, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৮। উদ্ধৃত- তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ; জান্তা না জনতা* (অনু.), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৪

১৯৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯

১৯৪. *Rounaq Jahan, Pakistan: failure in national integration (Dhaka 1973)*, P. 172. ডাক (DAC) এর আট দফা দাবি ছিল (১) ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠা; (২) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন; (৩) জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার; (৪) নাগরিক অধিকার পুনর্বহাল ও নিবর্তনমূলক আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল; (৫) শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুল ওয়ালী খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী এবং আটককৃত ছাত্র, শ্রমিক ও সাংবাদিকদের মুক্তিদান; (৬) ১৪৪ ধারা বলে প্রদত্ত সমস্ত আদেশ প্রত্যাহার; (৭) শ্রমিক ধর্মঘটের অধিকার; (৮) প্রকাশের অনুমতি প্রদান, জাতীয়কৃত প্রগ্রেসিভ পোপারস লিমিটেডকে পূর্ব মালিকদের হাতে ফেরত প্রদান। (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭)

Dhaka University Institutional Repository

> opposition (DAC) has no policy and no plan and individually one opposition party would not let the other make any move. In fact the decisition to boycott the elections sprung from the plain fact that the parties were unable to agree on a single condidate.[১৯৫]

১৯৬৯ সালের জানুয়ারির মধ্যভাগ থেকে পাকিস্তানের উভয় অংশেই আয়ুব খান বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানেও ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। আয়ুব খান সরকারের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো তাঁর নবগঠিত 'পাকিস্তান পিপলস পার্টির' নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রাক্কালে আয়ুব খান সরকার জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ ন্যাপ (মস্কোতান্ত্রী) প্রধান খান আব্দুল ওয়ালী খাঁন ও অন্যান্য বিরোধী রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করলে, সেখানে গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।[১৯৬] ইতোপূর্বে গঠিত 'ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি' এসকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে মাওলানা ভাসানী সরকারি কোষাগারে খাজনা বন্ধের হুমকি দেন। ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এক জনসভার উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক আজাদ ১৫ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রধান শিরোনামে লিখে: হাতিরদিয়াতে মাওলানা ভাসানী বলেন- অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনবোধে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করা হইবে।[১৯৭]

১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যেও জোটবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান ৪টি ছাত্র সংগঠন এবং ডাকসুর নেতৃত্বে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।[১৯৮] ১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে।[১৯৯] ছাত্রদের ১১ দফার অন্যতম ২নং দফায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি সন্নিবেশিত হয়। ৩নং দফায় আওয়ামী লীগের ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পত্র-পত্রিকায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন ও কর্মসূচি ফলাও করে প্রচারিত হয়। ফলে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। ১৭ জানুয়ারি (১৯৬৯) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করলে, প্রাদেশিক সরকার বিক্ষোভ মিছিলটিকে বাধাগ্রস্থ করতে ঢাকা শহরে জারি করে ১৪৪ ধারা। আন্দোলনরত ছাত্র সমাজ ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ে সমাবেশ শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলের প্রস্তুতি নিলে পুলিশ

---

১৯৫. *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ১১ জানুয়ারি, ১৯৬৯

১৯৬. তারিক আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-৩৮

১৯৭. *দৈনিক আজাদ*, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯

১৯৮. ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এবং ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন এই ৪টি সংগঠনের সমন্বয়ে, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। [বিস্তা. দ্র : হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র দ্বিতীয় খণ্ড*, ঢাকা : হক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮২, পৃ. ৪০৫-৪০৮]

১৯৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের ওপর বেধড়ক লাঠি চার্জ ও কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ করে।[২০০] দৈনিক সংবাদপত্রগুলি পরের দিন বিশাল বিশাল শিরোনামে ছাত্র নির্যাতনের খবর পরিবেশন করে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও পিছিয়ে থাকতে পারেনি।

ছাত্র মিছিলে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২০ জানুয়ারি (১৯৬৯) পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। মূলত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান চরম আকার ধারণ করে ২০ জানুয়ারির ঘটনাবলী পর থেকে।[২০১] এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী ছাত্ররা পুলিশ ব্যরিকেড ভেঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে সমবেত হলে এক পুলিশ অফিসার ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আসাদুজ্জামান আসাদকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনায় একই সঙ্গে আরও ৪ জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয় এ নির্মম হত্যাকান্ডের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করার সময় দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের ফটো সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন পুলিশের প্রহারে গুরুতর আহত হন।[২০২]

আসাদের নির্মম হত্যাকাণ্ড ছাত্র আন্দোলনকে অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করে। ২১ জানুয়ারি হরতাল ঘোষণা করা হয় এবং পল্টন ময়দানে আসাদের গায়েবি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলের অগ্রভাগে আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে লাখো জনতার জঙ্গি মিছিল সারা শহর প্রকম্পিত করে। ২৪ তারিখ পর্যন্ত শোক দিবস ঘোষণা করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি হরতাল চলাকালে ঢাকার ছাত্র-মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র কিশোর মতিউর রহমান মল্লিক নিহত হন। ওই দিন মকবুল, রুস্তম আলীসহ আরও কয়েকজন নিহত হয়।

সরকার গণরোষ দমনে সেনাবাহিনী তলব করে এবং সান্ধ্য আইন জারি করে। সান্ধ্য আইন অমান্য করে ছাত্র-জনতা মিছিল বের করে, সরকারি প্রশাসন ভেঙে পড়ে। সেনাবাহিনীর গুলিতে তেজগাঁও নাখালপাড়ায় আনোয়ারা বেগম নিহত হন। তেজগাঁও পলিটেকনিকের ছাত্র আবদুল লতিফও সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে নিহত হয়। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারা দেশব্যাপী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে আন্দোলন চলতে থাকে।

শত অত্যাচার-নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ চলার পরও গণআন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েও গনআন্দোলন থামানো সম্ভবপর হচ্ছে না। দেশের কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিল্পী, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবীসহ সব পেশার মানুষ আন্দোলনের সপক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করেন। গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করতে না পেরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বুঝতে পারে তার দিন ফুরিয়ে আসছে এবং পথ খুঁজতে থাকে সম্মানজনকভাবে কিভাবে বিদায় নেওয়া যায়। পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৭ ফেব্রুয়ারি আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুক্ষ গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানান। আইয়ুবের আহ্বান সত্ত্বেও সারা দেশে ধর্মধট, মিছিল-মিটিং

২০০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৬৯

২০১. *দৈনিক সংবাদ*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৬৯

২০২. *দৈনিক পাকিস্তান*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অহরহ চলতে থাকে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে আগরতরা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া গোলটেবিল বৈঠক বসতে পারবে না। ১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তাজউদ্দিন আহমদসহ কিছু বিরোধী নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবকে সেনানিবাসে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় শেখ মুজিব কক্ষের বাইরে পায়চারি করছিলেন। সে সময় একজন পাঠান ক্যাপ্টেন শেখ মুজিবকে ত্বরিত কক্ষে চলে যেতে বলেন। এ যাত্রা শেখ মুজিব মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে মামলায় অভিযুক্ত আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক টয়লেটে যাওয়ার সময় এক সৈনিক উপরের নির্দেশে হঠাৎ করে গুলি করে। গুরুতর আহত হয়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন। সার্জেন্ট জহুরুলের মৃত্যু আইয়ুবকে গদিচ্যুত করে। তার মৃত্যু ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে চূড়ান্ত পর্যায়ে রূপ দেয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি পল্টনে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। সার্জেন্ট জহুরুলের মৃত্যুতে বাঙালি জাতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আইয়ুব খান সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করে ১৯ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করে।[২০৩]

১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ে ধর্মঘট চলাকালে রসায়ন বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষক ড. সামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন বুকের ওপর গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে ড. জোহা মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তাছাড়া ইপিআরের গুলিতে ছাত্র নুরুল ইসলামসহ কয়েকজন নিহত হয়। রাজশাহী শহরে কারফিউ জারি করা হয়। ড. জোহার মৃত্যুর খবর দাবানলের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে বাংলার জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি বাহিনীর গুলিতে আরও অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে সংগ্রামী জনতা মন্ত্রী ও মুসলিম লীগ নেতার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি এস এ রহমানের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। প্রাণের ভয়ে বিচারপতি রহমান এক কাপড়ে পালিয়ে বিমানবন্দরে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান।[২০৪] ওই দিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঘোষণা দিলেন, তিনি আর দ্বিতীয়বার নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। লৌহমানব আইয়ুব খান জনতার আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন। শেখ মুজিব ছাড়া গোলটেবিল বৈঠক সম্ভব নয়। প্যারলে তিনি যেতে রাজি হলেন না। এ ব্যাপারে বেগম মুজিবও তাকে সতর্ক করে ছিলেন।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান হঠাৎ ঘোষণা করলেন, আগরতলা মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। সকল বন্দির মুক্তি দেওয়া হল। শুরু হয় বিজয় মিছিল। জনতার স্রোত সেনানিবাসের

---

২০৩. আশরাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

২০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

দিকে এগিয়ে যায় তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বরণ করে নিতে। এ দেশে শহীদের রক্ত কখনও বৃথা যায় না। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে শহীদদের রক্ত বৃথা যায়নি।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শনিবার দুপুরে শেখ মুজিবসহ ছাউনি থেকে মামলার সকল আসামী মুক্তিলাভ করেন। সেনাবাহিনীর ছাউনি থেকে মুক্তিলাভের পর বাংলার আপামর জনসাধারণ তাদের প্রিয় নেতা ও অন্যদের অভিনন্দন জানান। কৃষকনেতা মণি সিংহ, কে এম ওবায়দুর রহমান ও মতিয়া চৌধুরী মুক্তিলাভ করেন। শেখ মুজিব সোজা তার বাসভবনে গমন করেন। দুঃশাসনের অন্ধকার থেকে আলোর জগতে ফিরে আসলেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জেগে ওঠা ব্যাপক গণজোয়ারের চাপে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আয়ুব খান সাংবিধানিকভাবে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তাঁর উত্তরসরী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করেন।[২০৫] জেনারেল ইয়াহিয়া খান একই কায়দায় ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ রাতে সমগ্র পাকিস্তানের পুনরায় সামরিক আইন জারি এবং একই সঙ্গে সংবিধান বাতিল করে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ৩১ মার্চ সামরিক আইনের এক ঘোষণায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[২০৬] প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক জারিকৃত একের পর এক সামরিক বিধি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এ সংক্রান্ত এক সামরিক বিধিতে ঘোষণা করা হয় যে, শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও জনমনে উত্তেজনা সৃষ্টি এবং দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, এমন কোনো খবরাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা যাবে না। এরূপ প্রচেষ্টা করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করা হয়।[২০৭]

১৯৬৯ সালের ৮ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল এবং এক ব্যক্তি এক ভোট ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেন।[২০৮] এছাড়া ফেডারেল সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, নব-নির্বাচিত গণপরিষদের প্রথম বৈঠক থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা, গণপরিষদকে জাতীয় পরিষদে রূপান্তর এবং ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু করারও ঘোষণা দেন। এই ভাষণে ইয়াহিয়া খান দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে একটি আইনগত

২০৫. আয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করেছেন লেখক তারিখ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫। এ সম্পর্কে গবেষক লেনিন আজাদ প্রাগুক্ত গ্রন্থে (পৃ. ৬০৭) লিখেন: বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের এমন কোনো রূপরেখা দেওয়া হয়নি, যার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আইয়ুব সরকারকে চাপ দেওয়া যেতে পারে। ফলে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের ও লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সেনা বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।

২০৬. *দৈনিক আজাদ*, ১ এপ্রিল, ১৯৬৯

২০৭. *প্রাগুক্ত*।

২০৮. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৯ মার্চ, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামোর (Legal Frame Work Orders) আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও আভাস দেন।[২০৯] সে মোতাবেক ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর পাকিস্তানের ৫টি প্রাদেশিক পরিষদের জন্য সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে আগস্ট মাসে ব্যাপক বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব-ঘোষিত তারিখের পরিবর্তে যথাক্রমে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারিত হয়।[২১০]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উক্ত ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রকাশ্য রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ থাকলেও সামরিক আইনে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি। সংবাদপত্রগুলি আসন্ন নির্বাচনের স্বাগত জানায়, আবার সামরিক কর্তৃপক্ষের ঘোষণা মোতাবেক আদৌ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা- এরূপ সংশয়ও ব্যক্ত করে। সমগ্র পাকিস্তানে ২৫ মার্চ সামরিক শাসন জারির পরপর ২৮ মার্চ (১৯৬৯) সামরিক শাসন এবং নির্বাচন প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন তাঁর নির্ধারিত কলামে সামরিক শাসন যাতে দীর্ঘস্থায়ী না হয় সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে লিখেন:

> সাধারণভাবে সামরিক শাসন ব্যবস্থা কাহারো কাম্য নয়। জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তৃতায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষত ১৯৫৮ সালে প্রবর্তিত সামরিক শাসন দীর্ঘকাল চলিবার পরে দেশে পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তিত করিতে হইবে, ইহা কেহই ধারণা করে নাই। প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর ভাষণে ছাত্র শ্রমিক কৃষকদের সমস্যার উল্লেখ করিয়া ইহা সমাধানে যত্নবান হওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আশা করি প্রথম সুযোগেই ইহা যথাসম্ভব পূর্ণ করিয়া দেশের অভাবী মানুষেরই দুর্দশা লাঘবের পথ তিনি প্রশস্ত করিবেন।[২১১]

জাতীয় জীবনে সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরে উক্ত নিবন্ধে আরও বলা হয়: আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত জাতীয় ভিত্তিতে একটিবারও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্যই বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। আমরা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। কেননা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অন্য কোনো ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যাইবে না। নির্বাচন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের প্রকৃষ্ট উপায়।[২১২]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে ঘিরে সংবাদপত্রগুলি পুনরায় তাদের নিজ নিজ মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্মিলিতভাবে বিরোধী রাজনীতিতে যেভাবে সমর্থন জানিয়েছিল, নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে তা পরিলক্ষিত হয়না। দৈনিক সংবাদ মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টিকে সমর্থন জানায়। অপর

---

২০৯. *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ মার্চ, ১৯৬৯। মর্নিং নিউজ ৩১ মার্চ, ১৯৬৯

২১০. দুর্গত এলাকার নির্বাচন, ১৭ জানুয়ারি (১৯৭১) পিছিয়ে দেয়া হয়।

২১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মার্চ, ১৯৬৯। এর দুই মাস পর ১ জুন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের এক হোটেল কক্ষে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মরা যান। উল্লেখ্য, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রথম সামরিক শাসন জারির পর ১৭ অক্টোবর তফাজ্জল হোসেন অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখেন।

২১২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মার্চ ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

দিকে দৈনিক ইত্তেফাক সমর্থন জানায় আওয়ামী লীগকে। বদরুদ্দীন ওমরের সম্পাদনায় সদ্য প্রকাশিত সাপ্তাহিক গণশক্তি ও এনায়েতুল্লাহ খানের পরিচালনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক হলিডে আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচারণায় অংশ নেয়।[২১৩] এ সময় প্রচার সংখ্যা ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে দৈনিক ইত্তেফাক এবং দৈনিক আজাদের পরই সংবাদের অবস্থান ছিল শীর্ষে। দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদুল কবীর ন্যাপ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭০ সালের জানুয়ারি অবধি প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় রাজনৈতিক দলগুলি প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে পারেনি- সেক্ষেত্রে একমাত্র সংবাদপত্র ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা ও শাসনতান্ত্রিক সংকট এবং নির্বাচন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ১৪ আগস্ট (১৯৬৯ সংখ্যায় উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আবুল মনসুর আহমদ সংসদীয় রাজনীতির পক্ষে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করে আশু নির্বাচনে অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।[২১৪] কোনো কোনো নিবন্ধে দেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট অবসানকল্পে সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের ভূমিকার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাক মঞ্চে নেপথ্যে' কলামে অনুরূপ মন্তব্য করে লিখে:

> সাধারণ মানুষ রাজনীতির সাত পাঁচ আজ আর বুঝিতে চায় না। তারা চায় নির্বাচন- যে নির্বাচন যত সত্ত্বর আসে, ততই তাহাদের জন্য মঙ্গল বলিয়াই তাহারা মনে করে। তারা চায় শাসনতান্ত্রিক সংকটের অবসান হোক, দেশে সাধারণ নির্বাচন আসুক-তবেই তাহাদের অভাব অভিযোগ সরকারের দৃষ্টিতে আসিবে, প্রতিকার না হইলেও প্রতিকারের চেষ্টা অন্ততঃ করা চলিবে। কিন্তু এই সংকটের অবসান কিভাবে হইবে, আর দেশ সাধারণ নির্বাচনেই বা শরিক হইতে পারিবে কবে- সে প্রশ্নের জবাব তাহাদের জানা নাই। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যত সরকারের হইলেও রাজনীতিকদের দায়িত্বও এক্ষেত্রে আদৌ কম নয়।[২১৫]

দীর্ঘ আন্দোলনের পর আয়ুব খান সরকারের পতন হলেও দেশে পুনরায় সামরিকশাসন জারি হওয়ায় মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক এরূপ গুমট অবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। দৈনিক ইত্তেফাকের জনৈক পাঠক ভবিষ্যৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশংকা ব্যক্ত করে লিখেন:

> দেশের রাজনৈতিক আকাশ গুমটভাব ধারণ করিয়াছে। সুতরাং ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা দুরূহ। তবে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠান লইয়া দেশের মানুষের ভিতর নানা প্রকার আশা-নিরাশার সৃষ্টি হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়াদির উপর রাজনীতিবিদের একমতে পৌঁছিতে না পারিলে প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সরাসরি জনগণের দরবারে যাইবেন বলিয়া ইতিপূর্বে ঘোষণা করিয়াছেন। আর শাসনতন্ত্রের

---

২১৩. *সাপ্তাহিক হলিডে এবং গণশক্তি*, (মালিক মোহাম্মদ তোয়াহা) পত্রিকা দুটি পিকিংপন্থী সমাজতন্ত্র আদর্শে পরিচালিত হতো।

২১৪. আবুল মনসুর আহমদ "গণতন্ত্রের হায়াত ফুরাইয়াছে কি?" *দৈনিক আজাদ*, ১৪ আগস্ট, ১৯৬৯

২১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

> ব্যাপারে রেফারেন্ডামের মারফত জনমত যাচাইয়ের অসুবিধাদি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বহু আলোচনাও হইয়াছে।[২১৬]

নির্বাচনের পূর্বে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের ঐক্যমত কামনা করে উক্ত নিবন্ধে আরও বলা হয়: বিগত বাইশ বছরে সৃষ্ট রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়াদি যত সায়ত্ত্বশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব ও এক ইউনিট বাতিল ইত্যাদির ব্যাপারে কোনো প্রকার ঐক্যমতে না পৌঁছিয়ে এবং সম্পূর্ণ শাসনতান্ত্রিক শূন্যতার ভিতর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পরবর্তীকালে দেশে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে উহা ভাবিয়া অনেকে আবার মনে করেন যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্রে বসিয়া আলাপ আলোচনার মারফত বিতর্কমূলক বিষয়াদির উপর ঐকমত্য পৌঁছান।

১৯৭০ সালের জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হলে তা ক্রমশ নির্বাচনমুখী হয়ে ওঠে। সত্তর সালের মধ্যভাগে এসে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গন পূর্ণমাত্রায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে ইয়াহিয়া সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের রেডিও টেলিভিশনে ভাষণ দানের ব্যবস্থা করেন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রধান-তাঁদের প্রদত্ত ভাষণে স্ব স্ব দলের কর্মসূচি জনগণের কাছে তুলে ধরেন এবং তা পরদিন দৈনিক সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে।[২১৭]

নির্বাচনী খবরাখবর প্রচার ও প্রকাশে যখন পত্র-পত্রিকা ব্যস্ত ঠিক সে মুহূর্তে পূর্ব-পাকিস্তানের উপকূলীয় এলাকায় নেমে আসে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর গভীর রাতে স্মরণ কালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণীঝড় বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় তীব্র আঘাত হানে। এ ভয়াবহ ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছাসে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং অজস্র গবাদি পশু ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।[২১৮] ঘূর্ণীঝড়ের পূর্বাবাস পাওয়া সত্ত্বেও জনগণের কাছে তা ব্যাপক প্রচার কিংবা এ ব্যাপারে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতার কারণে দু'দিন পর থেকে পত্র-পত্রিকায় জলোচ্ছাসের সচিত্র সংবাদ ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ প্রচারিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রচারণার খবরাখবর ব্যাপক হারেহ্রাস পায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হতে থাকলে, পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ হতবাক ও শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। ১৫ ও ১৬ নভেম্বর যথাক্রমে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক পূর্বদেশ-এ প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন থেকে অনুধাবন করা যায় পত্রিকাগুলির বিবরণ কত মর্মস্পর্শী ছিল। দৈনিক ইত্তেফাক সে ভয়াল রাতে দুর্গত

---

২১৬. আনোয়ার হোসেন, "গোল টেবিল বৈঠক বনাম রাজনৈতিকদের দৃষ্টিভঙ্গি" *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯। শাসনতান্ত্রিক সংকট সম্বন্ধে আরও লিখেন: আবুল হাসনাত, "রাজনৈতিক সংকট ও তার সমাধান" দৈনিক ইত্তেফাক ১, ২, ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

২১৭. প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। ভাষণটি দেখুন- *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ অক্টোবর, ১৯৭০

২১৮. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ নভেম্বর, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেঃ সেই দুর্যোগেময় রাত্রে উন্মাত্ত দৈত্যরাজির তাথৈ তাথৈ নৃত্যের প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া সামনে যা কিছু পড়িয়াছে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া, বাসাইয়া দিয়া ধ্বংসের সেই অপদেবতা সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছাস এক সময় বিষাদ নিয়াছে। কিন্তু খুলনা হইতে কক্সবাজার পর্যন্ত সুবিস্তৃত উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলে সর্বত্র ছাড়াইয়া আছে মৃত্যু আর ধ্বংসের বিভীষিকাময় স্বাক্ষর বাংলার উপকূলে নামিয়া আসিয়াছে মৃত্যুর স্তব্ধতা।[২১৯]

দৈনিক পূর্বদেশ ১৬ নভেম্বর (১৯৭০) বাংলার মানুষ কাঁদো শিরোনামে আবেগতাড়িত হয়ে লিখেঃ পূর্ব বাংলার মানুষ, তুমি কাঁদো। কাঁদো বাংলার মানুষ। এখন কান্না ছাড়া আর তোমার জন্য কি বাকী আছে বলো? লাখো মানুষের গলিত শব ছড়িয়ে আছে জনপদে, পানিতে, কচুরিপানার মত ভাসছে অচেনা শবের মিছিল- তাঁদের জন্যে কাঁদো বাংলা-কাঁদো।[২২০]

১৫ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে দৈনিক পাকিস্তান প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহত-নিহতদের স্মরণে জাতীয় শোক পালন করার আহ্বান জানায়।[২২১] কিন্তু দুর্গত এলাকায় ত্রাণ-রিলিফ বিতরণে সরকার যথেষ্ট তৎপরতা দেখায়নি, এমনকি জলোচ্ছাসে আহত-নিহত লাখ লাখ বানভাসী মানুষকে উদ্ধারেও কোনো সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এরূপ উদাসীনতা আর অবহেলার খবরও পত্র-পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রচার হতে থাকে। এমনকি সরকারি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান অপর এক সম্পাদকীয় কলামে দুর্গতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সরকারি ব্যর্থতার সমালোচনা করে ব্যাপক প্রাণহানির জন্য সরকারকে দায়ী করে। ১৯ নভেম্বর (১৯৭০) প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কলামে সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেন-

> ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রের জলোচ্ছাস তার আকস্মিক থাবার আঘাতে লাখ লাখ আদম সন্তানের জীবনাবসান ঘটিয়ে চলে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে আরও লাখ লাখ জীবন্মৃত মানুষ। ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া যাচ্ছে দীর্ঘদিনের অনাহারে কদাহারে এদের অনেকে মরেছে। মরতে বসেছে। এদের এই মৃত্যুর জন্য প্রকৃতিকে নিশ্চয়ই দায়ী করা যেতে পারে না- আগেকার মহা মন্বন্তরের মৃত্যুর মতো এদের মৃত্যুও মেন-মেড। এদেশের মানুষের বিশেষ করে শাসক গোষ্ঠীর অপরিহার্য কর্তব্য ছিল এই জীবনমৃত মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা। রিলিফ কমিশনার স্বীকার না করলেও ইতিমধ্যে যে তাদের গাফেলতির জন্য বেশ কিছু সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে- একটু সহৃদয় চেষ্টা চালালেই তাদের বাঁচানো অসম্ভব ছিল না। এই 'মেন-মেড' মৃত্যুর দায়িত্ব তারা এড়াবেন কি করে।[২২২]

এছাড়া দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সরকারি উচ্চ পর্যায়ে কোনো নেতা বা মন্ত্রী আসেননি। এ সব ঘটনায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণীর প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমান উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনে যান। দুর্গত এলাকা থেকে ফিরে এসে উভয়ই সংবাদপত্রের সঙ্গে মতবিনিময় করেন

---

২১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

২২০. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০

২২১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

২২২. *প্রাগুক্ত*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

এবং সরকারি কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করেন।[২২৩] রাজনৈতিক জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ নভেম্বর ন্যাপ-এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মাওলানা ভাসানী সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। দৈনিক পাকিস্তান মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে এক অভাবনীয় খবরের প্রধান শিরোনাম করে। ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত ৪ কলামব্যাপী প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল: স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান- জিন্দাবাদ।[২২৪] মাওলানা ভাসানী কর্তৃক 'স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান' ঘোষণা পত্র-পত্রিকা সমূহ বিশেষ গুরুত্বসহকারে প্রচার করে। এভাবে প্রায় পুরো নভেম্বর মাস দেশীয় সংবাদপত্র বন্যা ও ঝড় জলোচ্ছাসের খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সমালোচনা ও উদাসীন জনগণের সম্মুখে তোলে ধরে পাকিস্তান বিরোধী জনমত সৃষ্টি করে।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পৌঁছে সংবাদপত্রে নির্বাচনী তৎপরতা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে পত্রিকা সমূহের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয়। দৈনিক সংবাদ ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থিত পত্রিকা হলেও আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়নি। এছাড়া নির্বাচনের প্রাক্কালে দৈনিক পূর্বদেশ, ইংরেজি দৈনিক দি পিপল, সাপ্তাহিক হলিডে, সাপ্তাহিক গণশক্তি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে।[২২৫] দৈনিক পূর্বদেশ এবং সাপ্তাহিক গণশক্তি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত হলেও পত্রিকা দুটি সমাজতন্ত্রে আদর্শে বিশ্বাসী মাওলানা ভাসানীর কার্যক্রমকে সমর্থন করেনি। দি পিপল এবং সাপ্তাহিক হলিডে প্রচণ্ড পাকিস্তান বিদ্বেষী এবং একই সঙ্গে সরকার বিরোধী ছিল। তবে সংবাদপত্রগুলি তাদের সমর্থিত দল বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালালেও সামগ্রিকভাবে আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানী শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তিলাভের কামনা করে। কোনো কোনো পত্রিকা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য বিজয় স্বীকার করেও আওয়ামী লীগের আদর্শ ও ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে। বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত ও পরিচালিত সাপ্তাহিক গণশক্তি পত্রিকা- এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনা করে। ৬ ডিসেম্বর (১৯৭০) প্রকাশিত 'পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী জনগণ সতর্ক হও' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে শেখ মুজিব ও তাঁর ঘোষিত ছয় দফা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে পত্রিকাটি লিখে: "তিনি বৈষম্যের প্রশ্ন এনে, জয় বাংলা ধ্বনী তুলে, ছয় দফা মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু এবারও তিনি তাদের পূর্ববর্তী রেকর্ড অনুসারে যে পূর্বের মতোই ৯৮% ভাগ স্বায়ত্বশাসন বাংগালীদের এনে দেবেন- তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংগালী মুৎসুদ্দীদের সরাসরি লেনদেনের ব্যবস্থাও তিনি চূড়ান্ত করবেন।"[২২৬]

---

২২৩. শেখ মুজিবুর রহমান ৬ নভেম্বর দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট দুর্গত এলাকার বর্ণনা দেন। *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০

২২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০

২২৫. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট মাহবুবুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক গণশক্তি ১৯৭০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি মাওলানা ভাসানী উদ্বোধন করেন। বদরুদ্দিন ওমর পরিচালিত প্রত্রিকাটি ছিল পিকিংপন্থী।

২২৬. *সাপ্তাহিক গণশক্তি*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে নভেম্বর মাসে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছাসের অজুহাত দেখিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া বা স্থগিত রাখার পক্ষে মত দেন।[২২৭] এমনকি স্বয়ং মাওলানা ভাসানী নির্বাচনের পূর্বে ভাতের দাবি তোলে নির্বাচন পিছানোর পক্ষে প্রচারণা চালান।[২২৮] কিন্তু নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করে সরকারের প্রতি দাবি জানায় পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ও ঘটনা প্রবাহ

১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি নিম্নরূপঃ

> **প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা!**
>
> আস্‌সালামু আলাইকুম
>
> জনগণের মুক্তির জন্য যে সব বীর শহীদান রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন, সেসব বীরসন্তানদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার, নির্যাতন উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন দিয়ে তাঁরা আন্দোলনের পর আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অগনিত মানুষ সর্বপ্রকার নিস্পেষণের মুখেও তারা নতি স্বীকার করেননি। সেই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত আন্দোলন গত বছরের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল। সেই একটানা আন্দোলন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত আমি আজ জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য পেশের যে সুযোগ পেয়েছি, তাকেও জনগণের সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, আজ পর্যন্ত এ সুযোগ ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া ছিল।
>
> আমাদের সংগ্রাম চলবেই, কারণ আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো আমরা পৌঁছিনি। জনগণের ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।"[২২৯]

শেখ মুজিব জাতীয় সংসদের নির্বাচনে জয় লাভের লক্ষ্যে নিুলিখিত কর্মসূচী পেশ করেন-

- ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান।
- বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য দূর করতে হবে।
- শাসনতান্ত্রিকভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

---

২২৭. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৭; মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা :আগামী প্রকাশনী, ১৯৭৪, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪

২২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৭০। এ সময় ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। ১ জুন ১৯৬৯ সালের তফাজ্জল হোসেন মারা গেলে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে ১০ ডিসেম্বর স্বাধীনতার প্রাক্কালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক অপহৃত হওয়ায় পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

২২৯. মাযহারুল ইসলাম, শেখ মুজিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৮-৫৮৯

Dhaka University Institutional Repository

- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পষ্ট রূপরেখা।
- আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর।
- দুর্নীতি দমন।
- ভূমি সংস্কার- ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি খাজনা মাফ।
- উভয় অঞ্চলে দ্রব্যমূল্যের সমতা- বর্তমানে সোনা প্রতিভরি করাচীতে ১৩৫ টাকা; ঢাকায় ১৫০ টাকা। ঢাকায় চাল মনপ্রতি ৫০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ২৫ টাকা।
- পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান।
- গ্যাসের সদ্ব্যবহার।
- যমুনা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যার ওপর সেতু নির্মাণ।
- জনসংখ্যার ভিত্তিতে চাকরিতে নিয়োগ।
- প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন।
- চাষীদের বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, ভূমিহীনদের ভূমি বন্টন।
- ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদান।
- প্রতি ইউনিয়নে একটি পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।
- উপজাতীয় এলাকায় সর্বাত্মক উন্নয়ন।
- সর্বনাশা ফারাক্কা বাঁধের ফলে অর্থনীতির যে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হবে তা মোকাবিলা করা।[২৩০]

আওয়ামী লীগ প্রচারাভিযান অব্যাহত রাখে। ৬ দফার অন্যতম বিষয় দুঅঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য। আওয়ামী লীগ প্রচারিত বৈষম্যের একটি ছক এখানে তুলে ধরা হলো-

বৈষম্য বিষয়	**পূর্ব পাকিস্তান**	**পশ্চিম পাকিস্তান**
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি	শতকরা ১৫ ভাগ	শতকরা ৮৫ ভাগ
সামরিক বিভাগে চাকরি	শতকরা ১০ ভাগ	শতকরা ৯০ ভাগ
চাল মণপ্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণপ্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তেল সেরপ্রতি	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
স্বর্ণ প্রতিভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

আওয়ামী লীগ কর্তৃক এ সকল বৈষম্যমূলক তালিকা জনগণের মধ্যে অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। পূর্বেই ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি নির্বাচনের তারিখ সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর যথানিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং দুর্গত এলাকায় জাতীয়

২৩০. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ও প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০টি আসনের নির্বাচন ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ৯টি বাদে ১৫৩টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং দুটি ব্যতীত সকল আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। পিডিপির নূরুল আমিন ময়মনসিংহের নান্দাইল থেকে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত হন। ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে ১৬টি বাদে অবশিষ্ট আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিকাংশ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয় লাভ করে। ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সব আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয় লাভ করে।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর যথারীতি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সমাপ্ত হয়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সংবাদপত্র সমর্থন জানিয়ে যে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে তা নির্বাচনে যথার্থ প্রতিফলিত হয়। উক্ত নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে বিজয়ী হয়।[২৩১] উল্লেখ্য এল.এফ.ও (Legal Fram Work Orders) এর

---

২৩১. Legal Fram Work Ordes অনুযায়ী পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা নিম্নোক্ত ভাবে বিন্যস্ত ছিল:

(ক) পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ (Pakistan National Assembly):

প্রদেশসমূহ	**সাধারণ আসন**	**মহিলা আসন**
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	০৭
পাঞ্জাব	৮২	০৩
সিন্ধু	২৭	০১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় এলাকা	০৭	-
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	০১
বেলুচিস্তান	০৪	০১
মোট ঃ	**৩০০টি**	**১৩টি**

(খ) প্রাদেশিক পরিষদ (Provincial Assembly):

প্রদেশসমূহ	**সাধারণ আসন**	**মহিলা আসন**
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	০৬
সিন্ধু	৬০	০২
উঃ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	০২
বেলুচিস্তান	২০	০১
মোট ঃ	৬০০	২১

বিধান মতে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৬২টি সাধারণ আসন এবং ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ মোট ১৬৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি সাধারণ আসন এবং ১০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১০টি আসন নির্ধারিত ছিল।[২৩২] সে হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ উভয় নির্বাচনেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই অভূতপূর্ব নির্বাচনী ফলাফল এবং পরবর্তী রাজনীতি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আরো ত্বরান্বিত করে।

আওয়ামী লীগ রমনা রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি নির্বাচিত সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। একশ বিশ ফুট লম্বা নৌকা নির্মাণ করে সভামঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল : মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আসন, ডান পাশে জাতীয় সংসদ সদস্যদের আসন এবং অন্যপাশে প্রাদেশিক সদস্যদের আসন নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া বিদেশী কূটনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং মহিলাদের জন্য পৃথক আসন রাখা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমএনএ ও এমপিদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।[২৩৩]

শপথ গ্রহণের পর শেখ মুজিব সমবেত বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। ১৯৭১ সালের ৭ জুনের পর এ ছিল তাঁর প্রথম জনসভা। তিনি তাঁর ৫০ মিনিটব্যাপী ভাষণে বলেন, নির্বাচনের পূর্বে যে ষড়যন্ত্র চলছিল তা এখনও চলছে। পাবনার নবনির্বাচিত ২৫ বছরের এমপিএ আহম্মদ রফিক এবং খুলনার মমতাজের হত্যা সে ষড়যন্ত্রের কয়েকটি প্রমাণ। তিনি জনগণকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'দাবি আদায়ের সংগ্রামে কাল আমি হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারি। সে ক্ষেত্রে তোমাদের দায়িত্ব হবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।' তিনি উৎফুল্ল জনতাকে বলেন, যে সদস্যরা শপথ গ্রহণ করবে তিনিসহ যদি শপথের প্রতি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের জীবন্ত কবর দেয়া হবে। তিনি নারীদের উদ্দেশ করে বলেন, নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর

---

২৩২. (ক) ১৯৭০ সালের নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল (শুধু পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় ও প্রদেশিক পরিষদে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা)

রাজনৈতিক দলের নাম	**জাতীয় পরিষদে আসন লাভ**	**প্রাদেশিক পরিষদে আসন লাভ**
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	১৬০ + ৭ (মহিলা আসন)	২৮৮
পিডিপি	০১ (নুরুল আমীন)	০২
জামায়েত ইসলাম	০	০১
নেজামে ইসলাম	০	০১
ন্যাপ (ওয়ালী)	০	০১
স্বতন্ত্র	০১ (রাজা ত্রিদিব রায়)	০৭
মোট ঃ	**১৬২ + ৭টি মহিলা**	**৩০০**

২৩৩. বঙ্গবন্ধুর সাথে এমএনএ ও এমপিরা শপথ পাঠ করেন বলেন, 'আমরা আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ মহান আল্লাহর নামে শপথ গ্রহন করছি। আমরা শপথ নিচ্ছি সকল সাহসী শহীদ এবং সংগ্রামী জনতার নামে, যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন এবং নির্যাতিত হয়েছেন- আমাদের বিজয়ের প্রথম পর্বের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সকল মানুষের নামে আমরা শপথ গ্রহণ করছি। বিগত জাতীয় নির্বাচনে দেশের সর্বস্তরের জনগণের ব্যাপক সমর্থন এবং যারা গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তাদের মর্যাদা রক্ষা করবো।' (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে না। প্রয়োজন হলে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার প্রণয়নের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হবে। ৬ দফার প্রতি, জনগণের রায়ের প্রতি আমাদের অগাথ বিশ্বাস রয়েছে এবং সংবিধানে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন এবং ১১ দফা বাস্তবায়নে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হবে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে কোন আসন না পাওয়ায় দলটি আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ নিয়ে যে বিশাল ভূখণ্ড সেখানে আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলার কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের নির্বাচনী ফলাফলও এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। নির্বাচনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে, এটা ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু তা না হয়ে ঘটনা তার বিপরীতে ঘটতে লাগল। পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো বেঁকে বসলো। শুরু হল ভুট্টো-ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্র। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষুদ্ধ হতে থাকে। জনতার মধ্য থেকে শ্লোগান উঠে 'আমার দেশ, তোমার দেশ'; 'বাংলাদেশ, বাংলাদেশ'। জাগো জাগো বাঙালী জাগো। 'তোমার আমার ঠিকানা'; 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা'। ৩ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা থাকলেও সামরিক সরকার তা স্থগিত করে। মওলানা ভাসানীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় 'গণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড় পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন কর।' পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্মুখে রেখে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য জনগণকে আহবান জানায়। ১ মার্চ, ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ২ মার্চ ৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি আ.স.ম আব্দুর রব উপস্থিত লাখো জনতাকে সামনে রেখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্র লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতিহার পাঠ করেন। পল্টন ময়দানে তখন শ্লোগান উঠে "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।" ।[২৩৪]

অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চের ভাষণ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচন উত্তর ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন।[২৩৫] কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার শুরুতেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে পুনরায় শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয় 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি'র নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে ৮৮টি আসন লাভ করেছিল। তাঁরা কোনো অবস্থাতেই পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী ছিলেন না। ফলে নানা অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি করা হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, তিনি ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য

২৩৪. প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

২৩৫. *পাকিস্তান অবজারভার*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবেন না।[২৩৬] তিনি ছয় দফার পুনর্বিন্যাসের দাবি জানান এবং এক্ষেত্রে ভারতের ষড়যন্ত্র কথাটি যুক্ত করে পরিস্থিতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন।

পাঁচদিন হরতালের পর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিতে এলেন। ততদিনে পুরো পূর্ব পাকিস্তান চলছে বঙ্গবন্ধুর কথায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ভাষণ শুনতে এসেছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আক্ষরিক অর্থে একটি জনসমুদ্র। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[২৩৭] পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ভাষণ খুব বেশি দেয়া হয়নি। এই ভাষণটি সেদিন দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অকাতরে প্রাণ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার শক্তি জুগিয়েছিল।

৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা নিম্নরূপ:

> আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুন আর্তনাদ-এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
>
> ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব খার পতনের পর ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের জেরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলি মধ্যে আলোচনা করবো এমনকি এ পর্যন্ত ও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।
>
> ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমার আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সাথে আমরা আলোচনা করলাম-আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো-সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি

২৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

২৩৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৭২, পৃ, ২১২–২১৪

বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল, দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষের দোষ দেওয়া হল আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। আমি বললাম, আমার জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যা লঘু-আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবদের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি কিসের এসেম্বলি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা।

২৫ তারিখে এসেম্বলি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেম্বলি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-'ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারিনা।

আমি প্রধান মন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত জিনিষগুলি আছে, সেগুলি হরতাল কাল থেকে চলবেনা। রিক্সা, গরুর গাড়ী, রেল-চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীটকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গর্ভনমেন্ট দপ্তর ওয়াপদা কোন কিছু চলবেনা। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবেনা। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবানা। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবানা।

Dhaka University Institutional Repository

> আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামীলীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে- প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল- কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে। লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী-অবাঙালী-তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমার কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবে না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।
>
> এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে– বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম! এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম! জয় বাংলা![২৩৮]

শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্সের ভাষণ সরাসরি বেতার মারফত প্রচার করার দাবী উঠেছিল আগে থেকেই। কর্তৃপক্ষ প্রথমে রাজী হলেও শেষ পর্যন্ত ৭ মার্চ সরাসরি ভাষণ প্রচার করেনি। বেতার কর্মচারীদের দাবী ও আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত ৮ মার্চ সকালে ভাষণটি কোন রকম কাট-ছাট ছাড়াই পুণঃপ্রচার করা হয়। ৮ মার্চ সকালে বাঙালী জাতি ঢাকা বেতার থেকে শেখ মুজিবের এই ঐতিহাসিক ভাষণ একযোগে শুনতে পান এবং তা থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে অনুপ্রাণিত হন।[২৩৯]

জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগের ঘটনাটি বাঙালীদের মনে এত বেশী ক্ষোভের সঞ্চার করে যে, বিচারপতি বি.এ ছিদ্দিকী টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন। ফলে গভর্ণর হিসেবে তাঁর পক্ষে সরকারী কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে। সেই সাথে বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক কর্মকর্তাগণ ঢাকা ত্যাগ করলে সরকারের পক্ষে তা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান এর আহবানে সারাদেশে অসহযোগ চলতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য

৭ মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। ছাব্বিশ বছর পূর্বে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

---

২৩৮. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ২০০০, পৃ. ৩৪-৩৬

২৩৯. প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রাখেন- ইতিহাসখ্যাত ৭ মার্চের ভাষণ। তৎকালীন পাকিস্তানি জনগণই শুধু নয়, সারা বিশ্বের মানুষ ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে আছে, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে কী বলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য এ ছিল অন্তিম মুহূর্ত। অপরদিকে, স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা। বাঙালিদের ব্যাপক সমর্থন ও ভোট (১৯৪৬) না পেলে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো কি-না সন্দেহ, সেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ রাষ্ট্রে তাদের অবস্থা দাঁড়ালো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের। শুরু থেকেই পূর্ববাংলা পরিণত হলো পশ্চিম অংশের 'কলোনি' বা 'বাজারে'। গণতন্ত্রহীন অবস্থায় সামরিক-বেসামরিক আমলা নিয়ন্ত্রিত এ রাষ্ট্রের ওপর প্রতিষ্ঠা পেল পশ্চিম পাকিস্তানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। শোষণ-শাসনের পাশাপাশি বাঙালিদের ওপর চললো জাতি নিপীড়ন। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বাঙালির মুক্তিসনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট অতি দ্রুত চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের মুখোমুখি নিয়ে এসে দাঁড় করায়। এমনি ফলাফলের জন্য শাসকগোষ্ঠী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। শুরু হলো প্রাসাদ (ক্যান্টনমেন্ট) ষড়যন্ত্র। এরই অংশ হিসেবে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত Constituent Assembly-র অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। পাকিস্তানি প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চের সামরিক হস্তক্ষেপ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই দেশ পরিচালিত হতে থাকলো। তিনিই হয়ে উঠলেন defacto সরকারপ্রধান। তাঁর ধানমন্ডি ৩২ সড়কের বাড়িটি পরিণত হলো ব্রিটেনের নম্বর ১০ ডাইনিং স্ট্রিট (প্রধানমন্ত্রীর অফিস-কাম-বাসভবন)-এর অনুরূপ। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক *Evening Standard* পত্রিকার ভাষায় :

> Sheikyh Mujibur Rahman now appears to be the real boss of East Pakistan, with the complete support of the population... Rahman's home- in Dhanmondi, already known as Number 10 Downing Street in imitation of the British Prime Minister's residence- has been besieged by bureaucrats, politicians, bankers, industrialists an people from all walks of life.[২৪০]

দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় বাহিনী নির্বিচারে গুলি ছুড়ে প্রতিদিন বহুজনকে হতাহত করে চলে। রাস্তায় রাস্তায় গড়ে উঠে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। সবাই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বড় ধরনের রাজনৈতিক ঘোষণার অপেক্ষায় অধীর। এমনি এক প্রেক্ষিতে

---

২৪০. *The Daily Evening Standard*, 12 March, 1971, P. 10

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঘোষণা এলো। দেশ-বিদেশে সকলের ধারণা বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ তাঁর ভাষণে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় এ মর্মে খবর ছাপা হয়।[২৪১]

শেখ মুজিব কর্তৃক একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণার সম্ভাবনা দেখে পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক চক্র নতুন কৌশল অবলম্বন করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬ মার্চ রাতে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে ইতিপূর্বে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষিত Constituent Assembly-র সভা ২৫ মার্চ আহ্বানের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজনে যে কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণে তার সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করে সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হয়। এরপর শুরু হয় মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠক। এর পেছনে পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক চক্রের উদ্দেশ্য ছিল কালক্ষেপণ, যাতে পশ্চিম অংশ থেকে এ সুযোগে সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে এসে এখানে মোতায়েন করা যায়। ২৫ মার্চের সেনা অভিযানই ছিল তাদের মূল পরিকল্পনায়।

বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড এ বিষয়ে ওয়াকেবহাল ছিলেন। প্রকাশ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছিল। কাজেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নীল-নকশা বুঝতে কোনোরূপ অনুমানের আশ্রয় নেয়া দরকার হয়নি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে এটি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট।

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে মূল বক্তব্য কী হবে, তা স্থির করার লক্ষ্যে এর পূর্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি একটানা ৩৬ ঘণ্টা বৈঠকের পরও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় যা বলা আবশ্যক, তাই বলবেন বলে বঙ্গবন্ধু নিজের ওপর দায়িত্ব নিলেন। বঙ্গবন্ধু তাদেরকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানাতে তিনি এলেন। মাত্র ১৮ মিনিটের এক ভাষণ রাখলেন। চমৎকার বক্তব্য যেমনি সারগর্ভ, ওজস্বী ও যুক্তিযুক্ত, তেমনি তির্যক, তীক্ষ্ণ ও দিক-নির্দেশনাপূর্ণ। অপূর্ব শব্দশৈলী, বাক্যবিন্যাস ও উপস্থাপনা। একান্তই আপন, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বঙ্গবন্ধু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে- পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাঙালিদের অবস্থা ব্যাখ্যা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ তুলে ধরা, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা, সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ, প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষাবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়ায় ইঙ্গিত, শত্রুর মোকাবিলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, যে কোনো উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পরামর্শ দান, ইত্যাদি কিছুর পর ঘোষণা করেন: "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"[২৪২]

একজন দক্ষ কুশলির মত ভাষণের শেষ পর্যায়ে তিনি স্বাধীনতার কথা এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যাতে ঘোষণার কিছু বাকিও থাকল না, অপরদিকে তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণার

---

২৪১. *The Sunday Times*, 7 March, 1971; *The Daily Telegraph*, 6 March, 1971

২৪২. *The Financial Express*, 31 March, 1971

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ উত্থাপন করাও শাসকগোষ্ঠীর জন্য আদৌ সহজ ছিল না। The Daily Telegraph পত্রিকার প্রতিনিধি ডেভিড লোশাক ঢাকা থেকে প্রেরিত 'The end of the old Pakistan' শিরোনামযুক্ত এক প্রতিবেদনে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: 'On Sudnay (৭ মার্চ) Sheikh Mujib came as near to declaring this (স্বাধীনতা) as the could without inviting immediate harsh reaction from the Army.'[২৪৩]

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতারই ঘোষণা। একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বহির্বিশ্বে যাতে চিহ্নিত না হন, এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সদা সতর্ক চিলেন। তাহলে, স্নায়ুযুদ্ধ চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। তাঁর সম্মুখে দৃষ্টান্ত ছিল কিভাবে নাইজেরিয়ার বেয়াফ্রা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (১৯৬৭-১৯৭০) বৃহৎ শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কঠোরহস্তে দমন করা হয়। তাই বঙ্গবন্ধু ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর অ্যাপরোচ হলো : মেজরিটি (বাঙালি) মাইনরিটি (পশ্চিম পাকিস্তানি) থেকে বিচ্ছিন্ন হবে কেন? বরং মাইনরিটিই 'সিসিডি' করেছে বা আক্রমণকারী এটাই প্রতিভাত বা দৃষ্ট হোক।[২৪৪] নিউজ উইক ম্যাগাজিনে এ বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা মিলে:

> A month ago, at a time when he was still publicly refraining from proclaiming independence, Mujib privately told Newsweek's Loren Jenkins that "there is no hope of salvaging the situation. The country as we know it is finished." But he waited for President Mohammed Yahya Khan to make the break. "We are the majority so we cannot secede. They, the Westerners, are the minority, and it is up to them to secede.[245]

বঙ্গবন্ধু অনুসৃত এ যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে সমর কৌশলীদের বক্তব্য যা-ই হোক না কেন, রাজনৈতিকভাবে দেখলে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্ব জনমতের সমর্থন এবং কূটনীতি উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সংগ্রামের পক্ষে এর সুফল পাওয়া যায়।

৯ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানী চৌদ্দ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উক্ত জনসভায় আরো বক্তব্য করেন আতউর রহমান খান, মশিউর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান। মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা তোমাদের শাসন তন্ত্র রচনা কর, আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র রচনা করি।"[২৪৬]

ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ভূট্টোর নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। ভূট্টোর পিপলস্ পার্টি ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ ব্যতিত পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা দাবীর সমর্থন করে তাঁকে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন

---

২৪৩. *The Daily Teligrath*, 10 March, 1971

২৪৪. *The Sunday Times*, 7 March, 1971

২৪৫. *Newsweek*, 5 April, 1971

২৪৬. *প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ*, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ভূট্টো সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যার তদন্ত ও সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য শেখ মুজিবের প্রস্তাবিত দাবী সমর্থন করলেও অন্য দুটো দাবী অস্বীকার করে। এদিকে ১৫ মার্চ শেখ মুজিব বাংলাদেশে একটি বেসামরিক প্রশাসন চালু করার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐদিনই উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের একটি দলসহ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১৬ মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবনে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় বসেন।[২৪৭] কিন্তু আলোচনা সন্তোষজনক মনে না হলে ১৬ মার্চ রাত্রে জেনারেল টিক্কা খানকে কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। পরবর্তী ১০ দিন আলোচনা অব্যাহত থাকলেও তা ছিল একটি প্রহসন।

অন্যদিকে আলোচনার ব্যর্থতা বুঝতে পেরে বাঙালীদের মধ্যেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়।[২৪৮] উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে জয়দেবপুরের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও স্থানীয় জনতা যৌথভাবে। ১৯ মার্চের জয়দেবপুরের সেনাবিদ্রোহ এবং ২০ মার্চ ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণবাহিনী রাজপথে ডামী রাইফেল কাঁধে নিয়ে কুচকাওয়াজ করা বাঙালীদেরকে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে বাংলাদেশের সর্বত্র গণবাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। শেখ মুজিব ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব দিবস উপলক্ষে ২৩ মার্চ ছুটি ঘোষণা করেন এবং সংগ্রাম পরিষদ এই দিনটিকে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালনের আহবান জানায় এবং কর্মসূচি ঘোষণা করে। এদিকে ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভূট্টোর ত্রিপাক্ষীক বৈঠক ব্যর্থ হলে ২২ মার্চ ঘোষিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে পুনরায় স্থগিত করতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হন। এভাবে একের পর এক অধিবেশন স্থগিত করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারের ব্যর্থতা ও ষড়যন্ত্রের আভাস ফুটে উঠছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকায় পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশী পতাকা উত্তোলন করে। পল্টন ময়দানে জনসভা শেষে জয় বাংলা বাহিনী সামরিক কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করে। ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসগুলোতে নতুন পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পরদিন একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়, "A new flag is born" এতে লেখা হয়-

> A new flag is born today a flag with a golden map of Bangladesh implanted on a red circle pleaded in the middle of deep green rectangle base. This is the latest flag added to the total list of the flat representing various states and nations of the contemporary world. This is the flag for "Independent Bangladesh." This is the Flag that Symbolizes the emancipation of 75 million Banglaees.[২৪৯]

১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে আলোচনাকালে বাঙালীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন নতুন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র আনা হয়।

---

২৪৭. The Morning News, 16th March, 1971

২৪৮. ইত্তেফাক, ২২ মার্চ ১৯৭১

২৪৯. *দি পিপল*, (ঢাকা) ২৩ মার্চ ১৯৭১, *মোহাম্মদ হান্নান*, পৃ. ৩১২

২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এম.ভি, সোয়াত জাহাজ থেকে সামরিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার কথা শহরে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার লোক বন্দর এলাকা ঘেরাও করে এবং রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনী গুলি চালিয়েও প্রতিরোধ ভাঙ্গতে ব্যর্থ হয়। পূর্ব বাংলার যেসব শহরে পাকিস্তানী বিহারীরা বসবাস করত যেসব শহরে বাঙালী-বিহারী দাঙ্গা শুরু হলে সেনাবাহিনী অধিকাংশ শহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। এ অবস্থায় ঢাকায় তাজউদ্দিন আহমেদ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠক ঘোষণা করেন যে, "আওয়ামীলীগ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে রাজী নয়।" ফলে ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া তার দলবল সহ ঢাকা ত্যাগ করে। একই সাথে ভূট্টো ঢাকা ত্যাগ করে। ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে ইয়াহিয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আক্রমণের পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে যান। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে বলেছিল, তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে। গণহত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা অনেক আগে থেকে করা আছে সেই নীলনকশার নাম অপারেশন সার্চলাইট,[২৫০] সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে কেমন করে আলাপ আলোচনার ভান করে কালক্ষেপণ করা হবে, কীভাবে বাঙালি সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করা হবে, সোজা কথায়, কীভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।[২৫১]

শহরের প্রতিটি রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে দেরি হবে তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাত সাড়ে এগারোটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের কাজ শুরু করে দিল। শুরু হলো পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ, এই হত্যাযজ্ঞের যেন কোনো সাক্ষী না থাকে সেজন্যে সকল বিদেশী সাংবাদিককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তারপরেও সাইমন ড্রিং নামে একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরে লুকিয়ে এই ভয়াবহ গণহত্যার খবর ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে জানিয়েছিলেন।[২৫২]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর এবং শুরু হয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বর্বরতম গণহত্যা অভিযান। নিষ্ঠুরভাবে পাক সেনারা সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের হত্যা করতে থাকে। বস্তুত: এই রাতটি ছিল বাঙালী জাতির জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ রাত। এই রাতেই শেখ মুজিবকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাবার আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহবান জানিয়ে গেলেন।[২৫৩] তাঁর

---

২৫০. Mir Shawkat Ali, *The Evidence*, Dhaka : Somoy Prokashon, 2008, Vol-1, P. 196

২৫১. Robert Payne, *Massacre*, The Mackillan Company, 1973, P. 50

২৫২. Lieutenant General ASM Nasim Bir Bikram, *Bangladesh Fights for Independence*, Dhaka : Columbia Prokashani, 2002, P. 557

২৫৩. Siddiq Salik, *Witnes to Surrender*, Dhaka : The University Press Limited, 1997, P. 75

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাটি তৎকালীন ই.পি.আর-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :

Declaration of War of Independence

> Pak-Army suddenly attacked pre base at Pilkhana, Rajarbag police line and killing citizens stop street battle are going on in every street of Dhaka-Chittagong stop I appeal to the nations of the world for help our freedom fighters are gallantly fighting with the enemies to free the Motherland stop I appeal and order you all in the name of almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country stop ask police, EPR, Bengal Regiment and Ansar to standby you and to fight stop convey this message to all Awami League Leaders, workers and other patriots and lovers of freedom stop may Allah bless you stop Joy Bangla stop Sheikh Mujibur Rahman stop.[২৫৪]

একই রাতে বঙ্গবন্ধু আরো একটি স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ইপিআর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বার্তাটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

> This may be my last meassage. From today Bangladesh is indepencent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of accupation to the last. Your fight must go on until the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.[২৫৫]

কয়েক মিনিটের মধ্যে আর্মির গাড়ি বাসভবন ঘেরাও করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। প্রবল গুলিবর্ষণের মধ্যে শেখ মুজিব নিচে চলে আসেন এবং গুলি বন্ধ করতে বলেন। সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলে এক কর্নেল তাঁকে রক্ষা করেন। তিনি উপরে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেন এবং স্ত্রী-পুত্রদের নিকট থেকে রাত ১.৩০ মিনিটে বিদায় নেন। শেখ মুজিব মুখে কথা বলেননি; কিন্তু মনে মনে সিংহের ন্যায় গর্জন করছিলেন। পাক সেনারা তাঁকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে চলে যায়। বঙ্গবন্ধুর বিদায়ের পর বেগম ফজিলাতুন্নেসা শেখ জামাল, শেখ রাসেলকে নিয়ে পাশের বাসায় আশ্রয় নেন। তারপর পাক সেনারা বাসায় প্রবেশ করে মালামাল লুট করে।[২৫৬] শেখ মুজিব কিভাবে গ্রেফতার হলেন সে সম্পর্কে পাকিস্তানী মেজর সিদ্দিক সালিক তার 'witners to Surrender' গ্রন্থে লিখেছেন, "যখন প্রথম গুলিবর্ষণ করা হয় তখন রেডিও পাকিস্তানে ক্ষীণভাবে শেখ মুজিবের কণ্ঠ শোনা যায়। মনে হলো পূর্বে রেকর্ডকৃত বাণী। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে

২৫৪. সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪

২৫৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খণ্ড*, ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ১

২৫৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৬

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করছেন।” কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জেড.এ. খান এবং কোম্পানি কমান্ডার মেজর বেলাল ঘেরাওবাহিনীর সাথে ছিলেন। কমান্ডোরা বাসভবনের নিকট এসে গার্ড পোস্টে গুলি করে পাহারাদারদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। তারপর ৫০ জন জঙ্গী সৈনিক দেয়াল টপকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে স্টেনগানের গুলিবর্ষণ করে তাদের আগমন বার্তা জানায়। শেখ মুজিব বেরিয়ে আসেন এবং তিনি গ্রেফতারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মনে হলো তিনি অপেক্ষা করছিলেন। বাসভবনের সকলকে একত্রিত করে জীপে তাদের সেকেন্ড ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে। কয়েক মিনিট পরে ৫৭ ব্রিগেডের মেজর জাফর তাঁর বেতার কণ্ঠ শুনতে পেলেন। “বড় পাখি খাঁচায়, অন্যরা বাসায় নেই- Big bird in the cage, others not in their nest...।” সংবাদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সেনাবাহিনীর জীপে সাদা শার্ট পরিহিত বড় পাখিকে (শেখ মুজিব) নিরাপত্তার জন্য ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যেতে দেখি। একজন জেনারেল টিক্কা খানকে জিজ্ঞেস করেন তাকে কি তার সামনে নিয়ে আসবেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, “আমি তার মুখ দর্শন করতে চাই না।” বাসার কাজের লোকদের পরিচয় পাওয়ার পর তাদের ছেড়ে দেয় এবং রাতে তাঁকে আদমজী স্কুলে আটক রাখা হয়। ২৬ মার্চ তাঁকে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে স্থানান্তর করা হয়। তিন দিন পরে তাঁকে বিমানে করাচী পাঠানো হয়। পরবর্তীতে মুজিবের শেষ পরিণতি নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। তাঁকে মুক্তি দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয়। ১ মার্চ আমি আমার বন্ধু মেজর বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম অপারেশনের মুহূর্তে তাঁকে কেন হত্যা করা হয়নি। তিনি বলেন, জেনারেল মিঠা তাঁকে জীবিত ধরার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নির্দেশ দেন।

সেনাবাহিনী ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল থেকে বাধার সম্মুখীন হয়। ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ৩০৩ রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকবাহিনী তখন মর্টার, রকেট, রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে আক্রমণ করে ছাত্রদের অবস্থান ধ্বংস করে এবং অনেককে হত্যা করে রাত ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হলগুলো দখল করে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে হত্যা করে। নিহত শিক্ষকগণ হলেন:[২৫৭]

ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব	-	দর্শন বিভাগ
ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা	-	ইংরেজী বিভাগ
ডঃ ফজলুর রহমান	-	মৃত্তিকা বিভাগ
ডঃ এন.এম. মনিরুজ্জামান	-	পরিসংখ্যান বিভাগ
অসদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য	-	পদার্থ বিভাগ
আতাউর রহমান খান খাদিম	-	পদার্থ বিভাগ
ডঃ সাদাত আলী	-	শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
অধ্যাপক শারাফত আলী	-	গণিত বিভাগ

২৫৭. মিজানুর রহমান খান, ১৯৭১ *আমেরিকার গোপন দলিল*, ঢাকা : *সময় প্রকাশন*, ২০০৮, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সুখরঞ্জন সমাদ্দার, সিলেট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সামসুদ্দিন আহমেদকে হত্যা করে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শ' ছাত্রকেও হত্যা করে। মৃতদেহগুলো জগন্নাথ হলের মাঠে চাপামাটি দেয়। পাকসেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে প্রবেশ করে মেয়েদের ধর্ষণ ও হত্যা করে। মৃতদের তারা চাপামাটি দেয়। মাটি দেয়ার পরেও মৃতদের হাত-পা বেরিয়ে ছিল। মানব ইতিহাসের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হয়।[২৫৮]

পাঞ্জাব ও বেলুচ রেজিমেন্ট রাত ১২টায় রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। পুলিশ পাল্টা আক্রমণ করে পাকসেনাদের ক্ষতিসাধন করে এবং অনেকে নিহত হন। পুলিশ ৩০৩ রাইফেল নিয়ে পাকবাহিনীর ভারী অস্ত্রের কাছে টিকতে পারেনি। পুলিশ লাইনের কয়েক হাজার পুলিশের অনেকে পালিয়ে যায় এবং অবশিষ্ট পুলিশকে নিরস্ত্র করা হয়। পাকসেনা পুলিশ লাইন ধ্বংস করে দেয়। একই সময় পাকবাহিনী পিলখানায় ইপিআর ক্যাম্পাসে আক্রমণ করে। অনেক ইপিআর আক্রমণ প্রতিহত করে নিহত হয়। অনেকে পিছু হটে যায়। অন্যদের নিরস্ত্র করা হয়। পাকবাহিনী রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলে, হাজার হাজার লোক হত্যা করে এবং নারী নির্যাতন করে।[২৫৯] ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে সরকার গঠন করা হয়:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	-	রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	-	উপরাষ্ট্রপতি, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দিন আহমেদ	-	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা, সংস্থাপন
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	-	অর্থ
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	-	পররাষ্ট্র
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	-	স্বরাষ্ট্র
কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী	-	প্রধান সেনাপতি

শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএকে। কোরআন তিলাওয়াতের পর জাতীয় সঙ্গীত- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' পরিবেশন করা হয়। এর পর অধ্যাপক ইউসুফ আলী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বিবরণ অপর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হলো:[২৬০]

২৫৮. সিদ্দিক মালিক, *নিয়াজী আত্ম-সমর্পনের দলিল*, (অনু. মকসুদুল হক), ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন্স ১৯৮৮, পৃ. ২১৭

২৫৯. সিরাজ উদ্দীন আহমদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

২৬০. *সিভিক এডুকেশন*-২, গাজীপুর : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ৬৩-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, তারিখ ঃ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১; শনিবার, ২৭ চৈত্র, ১৩৭৭

"যেহেতু ১৯৭০ সন ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল।"

এবং

"সেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন।"

এবং

"যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন।"

এবং

"যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছায় এবং বেআইনীভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন।"

এবং

"যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছেন।"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।"

এবং

"সেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য-সেহেতু আমরা বাংলাদেশকে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা, পূর্বাহ্নে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।"

Dhaka University Institutional Repository

"এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ণের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশন আহবান ও উহার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা দ্বারা বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাঁহার কর্তব্য ও প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরের জন্য আমরা অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।"

স্বাক্ষরিত
এম.ইউসুফ আলী
বাংলাদেশ গণপরিষদের পক্ষ থেকে

পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বন্দিজীবন

১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ শেখ মুজিবকে করাচী নিয়ে আসা হয় এবং তাঁকে ফয়সালাবাদ জেলে বন্দী করে রাখা হয়। যুদ্ধ শুরু হলে তাঁকে মিয়ানওয়ালী জেলে স্থানান্তর করা হয়। ইয়াহিয়া খানের বাঙালি উপদেষ্টা জি.ডবি- উ. চৌধুরী বলেন, ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বিচারের ব্যাপারে তত আগ্রহী ছিলেন না। এমনকি বিচারকালে শেখ মুজিবের আইনজীবী এ.কে. ব্রোহীর মাধ্যমে আলোচনা শুরু করা হয় এবং এ ব্যাপারে আমেরিকার কর্মকর্তাগণ অবহিত ছিলেন। যুদ্ধবাজ জেনারেলদের শান্ত করার জন্য ইয়াহিয়া খানকে বিচার শুরু করতে হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে জেনারেলদের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে অনেক ছাড় দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ইয়াহিয়া খানের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে যায়নি এবং ঢাকায় তার সাথে আলোচনাকালে ৬ দফা থেকে একটুও সরে দাঁড়াতে চাননি। এ কারণে ইয়াহিয়া খানের মধ্যে Ego বা আত্মাভিমান কাজ করে। সে কারণে

যারা শেখ মুজিবকে বিশ্বাস না করতে বলেছেন তাদের নিকট তিনি অপমানিত ও হেয়প্রতিপন্ন হলেন। সর্বশেষে ২৬ মার্চের ভাষণে তিনি শেখ মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক বলে উভয়ের মধ্যে সকল প্রকার আলোচনার দ্বার বন্ধ করে দেন। এ প্রসঙ্গে জেনারেল ওমর বলেন-

> As far as Mujib was concerned the President mind was completely closed. Peerzada, who was dealing with the case, would not allow any body to meet Mujib except Brohi (Who was his defence counsel). The suggestion that Yahaya wanted to negotiate with Mujib through Brohi is not correct... . But once or twice when if they had ever through at all of any understanding with Mujib to save the situation and wanted serious negotiations with him, the President would have turned to move. But once or twice put some questions regarding Mujib, Peerzada said, "don't interfere in this.[২৬১]

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে বিচারে সামরিক জান্তার আন্তরিকতা ছিল না, তা ঠিক নয়। কারণ পাকিস্তান আর্মি এ্যাক্টের অধীনে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক- সিএমএলএ ফিল্ড জেনারেল কোর্টের ক্ষমতা দিয়ে বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। কোর্টের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। কোর্টের আরো ২ জন আর্মি অফিসার, একজন নৌবাহিনী ও একজন বিমান বাহিনী কর্মকর্তা এবং পাঞ্জাবের একজন জেলা জজ ছিলেন। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ আনা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনটি অভিযোগ পাকিস্তান দণ্ডবিধির এবং অন্যান্য অভিযোগ ছিল সামরিক আইনে। অধিকাংশ অভিযোগের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। যদিও শেখ মুজিবের অনুমতি নিয়ে এ.কে. ব্রোহিকে তার আইনজীবী নিয়োগ করা হয়; কিন্তু শেখ মুজিবকে যখন ২৬ মার্চের ইয়াহিয়া খানের দেয়া ভাষণের টেপ শুনানো হলো, তখন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকার করেন এবং ব্রোহিকে অব্যাহতি দেন। শেখ মুজিব বলেন, তার ভাগ্য পূর্ব নির্ধারিত। তা সত্ত্বেও ব্রোহিকে সরকার শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা চালিয়ে যেতে হবে। সরকার ১০৫ জন সাক্ষীর তালিকা পেশ করে। কিন্তু অর্ধেক সাক্ষীকে জানানো হয়। সাক্ষী মূলত বাঙালি সেনা কর্মকর্তাগণ। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কথা তারা স্বীকার করে। অবশ্য সেনাবাহিনী পুলিশের হেফাজতে রেখে তাদের স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর বিচার কাজ সমাপ্ত হয়। ৪ ডিসেম্বর বিশেষ সামরিক আদালত জেলা জজ ব্যতীত সকল সদস্য মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় প্রদান করে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এ রায় কার্যকর করার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অনুমতি প্রয়োজন হবে।

জুলাই মাসের দিকে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করে অক্টোবর মাসের ভেতর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দেখতে দেখতে শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্ডার আউটপোস্টগুলো নিয়মিতভাবে আক্রমণ করে দখল করে নিতে শুরু করে। গেরিলাবাহিনীর

---

২৬১. উদ্ধৃত: সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণও অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই আক্রমণের জবাব দিত রাজাকারদের নিয়ে গ্রামের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে আর স্থানীয় মানুষদের হত্যা করে। ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তারা আর সহজে তাদের ঘাঁটির বাইরে যেতে চাইত না।[২৬২]

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখতে দেখতে এত খারাপ হয়ে গেল যে পাকিস্তান তার সমাধান খুঁজে না পেয়ে ডিসেম্বরের তিন তারিখ ভারত আক্রমণ করে বসে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ আক্রমণ করে ভারতের বিমানবাহিনীকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেবে কিন্তু সেটি করতে পারল না। ভারত সাথে সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে তার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ভেতর তখন পাকিস্তানের পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণের জন্য তিনগুণ বেশি অর্থাৎ ১৫ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা মাত্র আট ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার সাহস পেয়েছিল।[২৬৩] কারণ তাদের সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী। সেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এর মাঝেই পুরোপুরি অচল করে রাখতে পেরেছিল। শুধু যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তা নয়- এই যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষও ছিল যৌথবাহিনীর সাথে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর সেটি চলেছে মাত্র তেরো দিন। একেবারে প্রথম দিকেই বোমা মেরে এয়ারপোর্টগুলো অচল করে দেবার পর পাকিস্তান এয়ারফোর্সের সব পাইলট পালিয়ে গেল পাকিস্তানে। সমুদ্রে যে কয়টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ ছিল সেগুলো ডুবিয়ে দেবার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাকি রইল শুধু তার স্থলবাহিনী- নিরীহ জনসাধারণ হত্যা করতে তারা অসাধারণ হত্যা করতে তারা অসাধারণ পারদর্শী কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধে কেমন করে, সেটি দেখার জন্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একটি একটি করে পাকিস্তানের ঘাঁটির পতন হতে থাকল- তারা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে অল্পকিছু জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঢাকার কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে যায়। মেঘনা নদীতে কোনো ব্রিজ ছিল না, সাধারণ মানুষ তাদের নৌকা দিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের ভারী অস্ত্রসহ পার করিয়ে আনল।[২৬৪]

ঢাকায় জেনারেল নিয়াজী এবং তার জেনারেলরা বাংলাদেশের যুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে যে দুটি বিষয়ের ওপর ভরসা করছিল, সেগুলো ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। প্রথমত, তারা বিশ্বাস করত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে তারা ভারতকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করবে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর সরে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্যে উত্তর দিক

---

২৬২. Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, USA : Oxford University Press, 1997, P. 101

২৬৩. মেজর কামরুল হাসান ভূইয়া, *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা*, ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৪

২৬৪. *The Times of India*, 3 May, 2005

Dhaka University Institutional Repository

থেকে আসবে চীনা সৈন্য আর দক্ষিণ দিক থেকে আসবে আমেরিকান সৈন্য। কিন্তু দেখা গেল, তাদের দুটি ধারণাই ছিল পুরোপুরি ভুল। পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানিরাই চরমভাবে পর্যুদস্ত হলো আর কোনো চীনা বা আমেরিকান সৈন্য তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না![২৬৫]

মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহ্বান করল। গভর্নর হাউসে বোমা ফেলার কারণে তখন গভর্নর মালেক আর তার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান শেরাটনে) আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ফেলেছে, সেখানে লেখা 'মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো।'[২৬৬]

ঢাকার 'পরম পরাক্রমশালী' পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথাটি দেখে একজন পাকিস্তানি জেনারেল দুর্বলভাবে একবার সেখান থেকে বাংলাদেশের নামটি সরানোর প্রস্তাব করেছিল কিন্তু কেউ তার কথাকে গুরুত্ব দিল না, ইতিহাসে সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।[২৬৭]

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেয়ার দলিলে স্বাক্ষর করল। সে বিজয়ের জন্যে এই দেশের মানুষ সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করছিল সেই বিজয়টি এই দেশের স্বজন হারানো সাতকোটি মানুষের হাতে এসে ধরা দিল।

বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানের সব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে শেষ করতে করতে ডিসেম্বরের ২২ তারিখে হয়ে গেল।

---

২৬৫. Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, P. 199

২৬৬. Habibul Alam Birpratik, *Brave of Heart*, Dhaka : Academic Press & Publishers Library, 2006

২৬৭. Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, P. 211

Dhaka University Institutional Repository

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

AAK Niazi

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

INSTRUMENT OF SURRENDER[২৬৮]

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theater. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as the instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning of interpretation of the surrender terms.

Lieutenant JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTANI origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

[Signed] (JAGJIT SINGH AURORA) Lieutenant-General General Officer Commanding in Chief India and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre 16 December 1971	[Signed] (AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI) Lieutenant-General Martial Law Administrator Zone B and Commander Eastern Command (Pakistan) 16 December 1971

২৬৮. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১-৬১২; website : http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_ of_Surrender_%281971%29

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলের বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ:

আত্মসমর্পণ দলিল

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপতি বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সশস্ত্র সেনাবাহিনী নিয়ে পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়। পাকিস্তানের সকল স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর প্যারামিলিটারি এবং বেসামরিক সশস্ত্র সেনাবাহিনী এ আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সকল সৈন্য তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করবে এবং লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহের অধীনস্থ নিকটস্থ নিয়মিত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করবে।

এ দলিল স্বাক্ষরের সাথে সাথে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনী লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার অধীনে চলে আসবে। নির্দেশ ভঙ্গ করলে তা আত্মসমপনের শর্ত ভঙ্গকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তা যুদ্ধের রীতি ও আইন অনুসারে বিচার করা হবে। যদি আত্মসমর্পণের শর্তের সম্পর্কে কোন সন্দেহ অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে জগজিৎ সিংহ অরোরার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরা নিশ্চিত আশ্বাস দেন, যে সকল সৈন্য, আত্মসমর্পণ করবে তাদের সাথে জেনেভা কনভেনশনের বিধির অধীনে সেনাবাহিনীর প্রাপ্যতা অনুসারে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে ব্যবহার করা হবে এবং পাকিস্তানের সৈন্য এবং প্যারামিলিটারি যারা আত্মসমর্পণ করছে তাদের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার অধীনে সেনাবাহিনী বিদেশী নাগরিক, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করবে।[২৬৯]

জগজিৎ সিংহ অরোরা
লেঃ জেনারেল
পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় এবং
বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান
সেনাপতি ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজী
লেঃ জেনারেল
সামরিক প্রশাসক জোন-খ এবং
পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয়
সেনাপতি ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অরোরা যে দলিলে স্বাক্ষর করেছিল সেখানে সময়ের উল্লেখ ছিল (ভারতীয় স্থানীয় সময়) বিকেল ৪.৩১ মিনিট (১৬.৩১ মিনিট) কিন্তু প্রকৃত সময় ছিল ৪.৫৫ মিনিট। নিয়াজী তার বেল্ট ও ব্যাজ

২৬৯. আশরাফ হোসেন, *বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : উত্তরণ প্রকাশন, ২০১৪, পৃ. ১৫৩-১৫৪

দুটো খোলেন এবং ৩৮ বোরের রিভলভার অরোরার হাতে সমর্পণ করেন। তখন নিয়াজী নীরবে কাঁদছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, জনতা নিয়াজীবিরোধী স্লোগান দিচ্ছে। সেকি অপূর্ব দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ লোক জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনি দিচ্ছে আর নিয়াজী ও পাকিস্তানী সৈন্যদের তীব্র ভাষায় গালাগাল করছে। তারা নিয়াজীকে ছিনিয়ে নিতে চায়। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মিত্রবাহিনী পাক সেনাদের পাহারা দিচ্ছে। সেদিন মানুষ ও মুক্তিবাহিনী অতুলনীয় শৃঙ্খলার পরিচয় দেয়। বিদ্রোহী লক্ষ জনতা জেনারেল নিয়াজী ও পাকিস্তানী সৈন্যদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারতো বা রেসকোর্সে গুলি করে হত্যা করতে পারতো। তারা বিশ্বাস করতো খুনিদের বিচার হবে। মুক্তিবাহিনী আনন্দে আকাশে বৃষ্টির ন্যায় গুলিবর্ষণ করছে। এ পরিস্থিতিতে সিনিয়র ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাগণ নিয়াজীকে পাহারা দিয়ে গাড়িতে ওঠান। দলিলে স্বাক্ষরের পর ভারতীয় বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান জেনারেল অরোরা তার দল নিয়ে হেলিকপ্টারে সন্ধ্যায় আগরতলা চলে যান। পাকিস্তানী জেনারেল নিয়াজীও তার দল বাইরের অবস্থান থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যান। মিত্রবাহিনী ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের জন্ম হলো।

পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করার পর বিজয়ের অবিশ্বাস্য আনন্দ উপভোগ করার আগেই একটি ভয়ংকর তথ্য বাংলাদেশের সকলকে স্তম্ভিত করে দিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন সবাই বুঝে গেছে এই যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, সত্যি সত্যি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের স্থান করে নিচ্ছে, তখন এই দেশের বিশ্বাসঘাতকের দল আলবদর বাহিনী দেশের প্রায় তিনশত শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁদের উদ্ধার করার জন্যে দেশের মানুষ যখন পাগলের মতো হন্যে হয়ে খুঁজছে তখন তাদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ রায়ের বাজার বধ্যভূমি এবং অন্যান্য জায়গায় খুঁজে পাওয়া যেতে থাকল। দেশটি যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়ে যায় তারপরেও যেন কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেই ব্যাপারটি এই বিশ্বাসঘাতকের দল নিশ্চিত করে যাওয়ার জন্য এই দেশের সোনার সন্তানদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকা স্বাধীন হলেও বঙ্গবন্ধুর পরিবার গৃহবন্দী। ১৭ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর মেজর তারা তাদের মুক্ত করে। মুক্তিযুদ্ধকালে বিহারী লোকজন বাঙালিদের হত্যা ও তাদের ওপর নিপীড়ন চালায়। তাই অনেক স্থানে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়। এ সময় অনেকে বিহারী সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়। ভারতীয় সৈন্যরা অবাঙালি বিহারীদের রক্ষা করে। অবশ্য পাকবাহিনীর দালালীর অভিযোগে অনেক বিহারীকে হত্যা করা হয়। কোন কোন স্থানে বিহারীদের প্রতি প্রতিশোধের মাত্রা বেশি ছিল। বাংলাদেশ সরকার ২২ ডিসেম্বর শাসনভার গ্রহন করার পর সকল প্রকার হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অপরাধীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়। আইন নিজেদের হাতে তুলে না নেয়ার নির্দেশ কঠোরভাবে পালিত হয়।[২৭০]

২৭০. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২

ঢাকায় পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে ১৬ ডিসেম্বরেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বিজয় লাভের প্রাক্কালে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড ও অন্যান্য দেশকে মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

১৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন-

> আজকের বিজয় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিজয়, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর বিজয়, সত্য, ন্যায় ও গণতন্ত্রের বিজয়। আমাদের সাফল্যের এই মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। তিনি যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও নেতাদের কাছে আমাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং যেভাবে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, ইতিহাসে তার নজির নেই। আমাদের সংগ্রামের ফলে ভারতের জনসাধারণকে বিপুল ভার বহন করতে হয়েছে। তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি। আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এখনও শত্রুর কারাগারে। পাকিস্তানী শাসকদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি তারা শেষ মুহূর্তেও অন্তত শুভবুদ্ধির পরিচয় দিন। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করুন।[২৭১]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত পাকবাহিনী অস্ত্র পরিত্যাগ করে মিত্রবাহিনীর আশ্রয়ে চলে আসে। কিন্তু ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসায় অবস্থানরত পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করেনি। বরং পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ শুনে যারা বেগম মুজিব ও শেখ হাসিনার নিকট যাচ্ছিলেন, পাকবাহিনী তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ১৭ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর মেজর তারা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে উদ্ধার করার জন্য ধানমন্ডি গমন করে। পাকবাহিনী তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।[২৭২]

বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোড হতে ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[২৭৩]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি লাভ

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সাড়ে সাত কোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে প্রবল আন্দোলন শুরু করে। ইয়াহিয়া খান পদত্যাগ করলে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।[২৭৪] মিঃ ভুট্টো বিশ্বের চাপে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। একই দিনে ডঃ কামাল হোসেনও মুক্তি পান। বঙ্গবন্ধু পিআইএ-এর একটি বিশেষ বিমানে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। তিনি লন্ডন হোটেল ক্লারিজে অবস্থান করেন। হোটেল থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন, বেগম মুজিব ও শেখ হাসিনার সাথে কথা

---

২৭১. সিমিন হোসেন রিমি, *আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ*, ঢাকা : প্রতিভাস, ২০০১, পৃ. ৫১

২৭২. আশরাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

২৭৩. সিরাজ উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

২৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

বলেন। ১০ নম্বর ডাইনিং স্ট্রীটে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি লন্ডনের ক্লারিজ হোটেলে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের জয় বাংলা বলে স্বাগত জানিয়ে বলেন-

> আজ আমি মুক্ত। আমার প্রিয় দেশবাসীর সাথে স্বাধীনতার সীমাহীন আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণ করছি। আমরা এক মহাকাব্যের ন্যায় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সংগ্রামে শেষ অর্জন হলো একটি স্বাধীন-সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। আমি যখন একটি কনডেম্‌ড সেলে ফাঁসির কাষ্ঠে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অপেক্ষায় ছিলাম; তখন আমার দেশবাসী আমাকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে। সে সকল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশ আমাদের জাতীয় সংগ্রামে সমর্থন প্রদান করেছে, তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সকল দেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান, আমাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসংঘে অবিলম্বে সদস্যপদ লাভের জন্য সমর্থন প্রদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।[২৭৫]

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বেলা ১টা ৪১ মিনিটে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের অধিনায়ক এবং তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িত জনতার মুখপাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানাবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকা বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়। রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছতে তার ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। সেদিন তিনি ১০ লক্ষ মানুষের উদ্দেশে কান্নাভেজা কণ্ঠে বক্তৃতা দেন।

ভাষণের সারাংশ নিম্নরূপ:

> গত ৭ মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আপনারা বাংলাদেশের মানুষ এই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালির প্রান থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।
>
> আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্যে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।
>
> নেতা হিসাবে নয়, ভাই হিসাবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে- পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্যে কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি

---

২৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪০

> তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।[২৭৬]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দিন এবং আমার জন্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই। আমি চাই, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে, তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোন আক্রোশ নাই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যে কোন রাষ্ট্রের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধু সেই ধরনের বন্ধুত্বই হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে যে পরিবারে লোক মারা যায়নি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান ৪র্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবত রাজনীতি করেছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর নাতনিও। তার সাথে আমি দিল্লীতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতোমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতী গান্ধী যা করেছেন তার জন্যে আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্যে বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তারা যেন আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক- যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তি

---

২৭৬. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৪৪-৪৬

সংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তিবাহিনী, ছাত্র, কৃষক-শ্রমিক সমাজ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান, পুলিশ, বেঙ্গর রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন তার জন্যে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনার যুদ্ধ করেছেন, তার নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

পাকিস্তানী কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচারে গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্তর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন। জয় বাংলা।”

আমাদের মাতৃভূমির যে মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ওপরে তাকালে যে আকাশ আমরা দেখতে পাই কিংবা নিঃশ্বাসে যে বাতাস আমরা বুকের ভেতর টেনে নেই, তার সবকিছুর জন্যেই আমরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ঋণী। সেই ঋণ বাঙালি জাতি কখনোই শোধ করতে পারবে না, বাঙালি কেবল তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করার একটুখানি সুযোগ পেয়েছে তাঁদেরকে বীরত্বসূচক পদক দিয়ে সম্মানিত করে।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে সাতজন হচ্ছেন মনণোত্তর সবচেয়ে বড়ো পদকপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ। তাঁরা হচ্ছেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, হামিদুর রহমান, মোস্তাফা কামাল, রুহুল আমীন, মতিউর রহমান, মুন্সী আব্দুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ। এঁদের মাঝে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ ছিল পাকিস্তানে এবং বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ ছিল ভারতে। তাঁদের দুজনের দেহাবশেষই এখন বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অন্য বীরশ্রেষ্ঠ এবং অসংখ্য শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সাথে সাথে তাঁদের দুজনকেও এখন গভীর মমতায় আলিঙ্গন করে আছে আমাদের মাতৃভূমির মাটি।

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদান রাখার জন্যে যাঁদের বীরত্বসূচক পদক দেয়া হয়, তাঁদের মাঝে নারী মুক্তিযোদ্ধারাও আছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দেশের নারীরা শুধু যে

মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য সহায়তা করেছেন তা নয়, অস্ত্র হাতে পুরুষদের পাশাপাশি তাঁরা যুদ্ধও করেছেন।[২৭৭]

যেকোনো যুদ্ধই হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা- যুদ্ধের সাথে কোনোভাবে সম্পর্ক না থাকার পরও যুদ্ধের সময় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়- আমাদের দেশেও সে ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে থেকে এক ধরনের অমানুষিক নৃশংসতায় বাঙালিদের নির্যাতন নিপীড়ন আর হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। তাদের নৃশংতার জবাবে মুক্তিযুদ্ধের আগে, পরে এবং চলাকালে অনেক বিহারিকে হত্যা করা হয়, যার ভেতরে অনেকেই ছিল নারী, শিশু কিংবা নিরপরাধ। বিহারিদের প্রায় সবাই পাকিস্তানে ফেরত যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও পাকিস্তান সরকার তাদের নিজের দেশে নিতে আগ্রহী নয় বলে এই হতভাগ্য সম্প্রদায় দীর্ঘদিন থেকে জেনেভা ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার, মিলিশিয়া বাহিনী ছিল আরো ২৫ হাজার, বেসামরিক বাহিনী প্রায় ২৫ হাজার, রাজাকার, আলবদর, আলশামস আরো ৫০ হাজার। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় সেনা মিত্রবাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়। যুদ্ধ শেষে আত্মসমর্পণের পর প্রায় একানব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ভারতে স্থানান্তর করা হয়।[২৭৮]

যুদ্ধ চলাকালে প্রায় আড়াই লক্ষ নারী পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর তাদের পদলেহী বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল- অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, এই এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ না করলে তাদের প্রত্যেককেই হয়ত এই দেশে হত্যা করা হতো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা চলাকালে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে সে সম্পর্কে গণমাধ্যমে বেশ কয়েক ধরনের সংখ্যা রয়েছে। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড আলমানাকে সংখ্যাটি ১০ লক্ষ, নিউ ইয়র্ক টাইমস (২২ ডিসেম্বর ১৯৭২) অনুযায়ী ৫ থেকে ১৫ লক্ষ, কম্পটনস এনসাইক্লোপিডিয়া এবং এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা অনুযায়ী সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ।[২৭৯] প্রকৃত সংখ্যাটি কত, সেটি সম্ভবত কখনোই জানা যাবে না। তবে বাংলাদেশে এই সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়।

বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে আটক, জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এবং হত্যা করার পর তাঁর মৃতদেহ

---

২৭৭. সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : নারী*, ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ২০১০, পৃ. ৭৮

২৭৮. *Figures from the fall of Dacca by Jagjit Singh Aurora in the Illustrated Weekly of India*, 23 December, 1973

২৭৯. Mathew White's, *Death tolls for the major wars and atrocities of the twentieth century.*

সমাহিত করার জন্যে জেলখানায় তাঁর জন্যে একটি কবরও খোঁড়া হয়েছিল। বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজিত হবার পর বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে ফিরে আসেন[২৮০] এবং ১৫ মার্চের ভেতর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজ দেশে ফিরে যায়।

আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তানের শাসক মহল বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলে লন্ডন হয়ে ঢাকা ফেরার পথে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দিল্লীতে স্বল্পকালীন যাত্রাবিতরতির সময়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হয়। লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি ভারতীয় বিমান আগে থেকে তৈরি ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এতই স্বাধীনচেতা ছিলেন যে, তা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর ঊর্ধ্বতন সচিব ও পরবর্তীকালে মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন অন্যতম উপদেষ্টা ডি পি ধর সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, প্রথম দর্শনেই বঙ্গবন্ধু ইন্দিরা গান্ধীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য কবে অপসারিত হবে।

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি দিল্লীর 'প্রেট্রিয়ট' পত্রিকাসহ অন্যান্য ভারতীয় পত্রিকায় এ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কোলকাতায় ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকের সময়ে বঙ্গবন্ধু আবারো বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চের আগে তা করা হবে বলে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার আদায় করেন। এই অঙ্গীকারের ব্যাপারে শাসক কংগ্রেস, ভারত সরকার ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একাংশের কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধা এসেছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান জেনারেল জে এন চৌধুরী তখন ভারতীয় ইংরেজি 'দৈনিক স্টেটসম্যান' ও 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'য় লিখিত এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'কেবল মাত্র শেখ মুজিবের ক্যারিশমা এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তির ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ থেকে এতো তাড়াতাড়ি ভারতীয় সৈন্য অপসারণ করা ঠিক হবে না।'[২৮১]

বিখ্যাত ফরাসি লেখক, দার্শনিক ও কূটনীতিক আঁদ্রে মালরোঁ বলেছিলেন- "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি যদি শেখ মুজিব দেশে ফিরতে না পারতেন, তাহলে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারত এত তাড়াতাড়ি সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি হতো কিনা সন্দেহ।"[২৮২]

---

২৮০. S.A. Karim, *Sheikh Mujib Triumph and Tragedy*, Dhaka : The University Press Ltd., 2009, P. 259

২৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

২৮২. আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *স্বাধীনতা জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : উত্তর কমলাপুর, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬-৬৭

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কৃতিত্ব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ

পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের ৯ মাসের নিঃসঙ্গ বন্দিজীবন শেষ হয় ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি। পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো[১] তাঁর মুক্তির আদেশ দেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিলেই বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মুজিবকে তাঁর অবর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করেন। আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, সম্ভবত বৃহৎ শক্তিবর্গ শেখ মুজিবকে কোনো পূর্বশর্ত ব্যতিরেকেই মুক্তিদানের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানে নতুন ক্ষমতাশীন পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ মহলও সম্ভবত এমন পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়ে থাকবেন যাতে এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে উপমহাদেশে দ্রুত স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা যায়।[২]

জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-আনন্দের পরিবেশে মুক্তিলাভের দুই দিন পর ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান, সবার বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে আসেন। তাঁর প্রথম কাজ হয় নতুন রাষ্ট্রের জন্য একটি স্থায়ী সরকার গঠন করা। পরের দিন তিনি একজন সাবেক বাঙালি রাজনৈতিক নেতার পুত্র ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আবু সঈদ চৌধুরীকে মন্ত্রিসভার বৈঠক চলাকালেই ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বিস্মিত করে দিয়ে নতুন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন।[৩] মুজিব ঘোষণা করেন যে, তিনি সরকারের বাইরে থাকতে চান এবং কেবল আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যেতে আগ্রহী। এটা হয়তো তাঁর তরফে নিছকই কৌশল ছিল এবং তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলাদেশের জনগণ তাঁর সরকারের বাইরে থাকার অবস্থান কোনোভাবেই সমর্থন করবে না। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেছেন, জনগণের এ মনোভাব তিনি জানতে এবং এ কারণে মুজিবকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। মুজিব তাতে সম্মতি জানান। ১২ জানুয়ারি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রথম কাজ ছিল শেখ মুজিবকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানানো। এভাবেই, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর মতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক শূণ্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা পরিহার করা সম্ভব হয়।[৪]

---

১. *দি নিউ ইয়র্ক টাইমস*, ৯ জানুয়ারি, ১৯৭২

২. অনেক দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক দলসমূহ শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি উত্থাপন করে। দেখুন দি টাইমস, ৫ ও ১২ আগষ্ট ১৯৭১; *দি নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *দি ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর*, *ওয়াশিংটন পোস্ট*, *দি টেলিগ্রাফ* (লন্ডন), ১২ আগষ্ট, ১৯৭১ এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র।

৩. এটা ছিল বিচারপতি চৌধুরীর নিজস্ব ভাষ্য।

৪. ড. জিল্লুর রহমান খান, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪, পৃ. ১৮৯-১৯০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশের সাময়িক শাসনতন্ত্র অধ্যাদেশ জারি করেন:

যেহেতু ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলে স্বাধীনতা ঘোষণা আদেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শাসনের জন্য অস্থায়ী বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং সেহেতু উক্ত ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতিকে সকল নির্বাহী, আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল এবং সেহেতু উক্ত ঘোষণাপত্রে বর্ণিত বেআইনী ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধের অবসান এখন ঘটেছে এবং সেহেতু বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত আকাঙ্ক্ষা এই যে, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর করা হবে এবং যেহেতু উক্ত লক্ষ্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে অবলিম্বে কতগুলো বিধান প্রদান করা প্রয়োজন।

সেহেতু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতা ষোষণাপত্র আদেশে এবং উক্ত আদেশে তাঁকে প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা অনুসারে রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত আদেশ জারি করেছেন।

১. এ আদেশ বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ নামে অভিহিত হবে।
২. বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের প্রধান থাকবেন।
৩. রাষ্ট্রপতি সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে যে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী সংবিধান আদেশে তা পরিবর্তন করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি হতে ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী সংবিধান আদেশ কার্যকর ছিল। অস্থায়ী সংবিধানে বাংলাদেশ হাইকোর্ট গঠন, প্রধান বিচারপতিসহ কয়েকজন বিচারপতি নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যা হোক, ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নতুন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হলেন- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, আবদুস সামাদ আজাদ, এইচএম কামরুজ্জামান, শেখ আবদুল আজিজ, অধ্যাপক ইউসুপ আলী, জহুর আহমদ চৌধুরী, শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার, ডঃ কামাল হোসেন, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত।[৫]

১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বীরোচিত অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ গৃহহারা, সম্পদহারা, কৃষকদের বাঁচাবার জন্য ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সুদসহ সকল বকেয়া খাজনা মওকুফ করা হয়। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, জাতীয় পতাকায় বাংলাদেশের মানচিত্র থাকবে না, লাল সূর্য থাকবে। একই বৈঠকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রখ্যাত গান

৫. Larry Collins and Domique La Pierre, *Freedom At Midnight*, Dhaka : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1996, P. 456

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'-এর প্রথম দশ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়।[৬]

জাতীয় কুচকাওয়াজ সঙ্গীত হিসেবে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্' গানটি নির্বাচিত হয়। জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় পশু বাঘ এবং দোয়েলকে জাতীয় পাখি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলা সনের পহেলা বৈশাখ ও ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধু ১৭ জানুয়ারি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দিতে বলেন। ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনীর ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ৩১ জানুয়ারি মুজিববাহিনী অস্ত্র জমা দেয়।[৭]

আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের সমানভাবে সৃষ্টি করছে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ দেশকে পুনর্গঠন করে। দেশের সংবিধান পাকিস্তানী পরিকল্পনা শিক্ষা কমিশন গঠনসহ দেশের উন্নয়নের জন্য যে সকল কাজ করেছে তা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হল-

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে অতি জরুরি ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন:

- ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ফেরত পাঠানো
- আইন শৃঙ্খলা উন্নতি করা।
- প্রশাসন চালু করা।

---

৬. জাতীয় সংগীত এর দশ চরণ
'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ
তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনের
ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায় হায়রে
ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আকি কি দেখিছি মধুর হাসি।'
(উদ্ধৃত- সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০, পৃ. ৬৪৫)

৭. ড. জিল্লুর রহমান খান, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪, পৃ. ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

- ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা।
- শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা।
- পাক যুদ্ধবন্দিদের বিনিময় ব্যবস্থ্যা করা।
- ভারত থেকে ফেরত আসা শরণার্থীদের দালালদের বিচার করা।
- পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে কতগুলো জাতীয় নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন

১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মন্ত্রীসভায় কতগুলো জাতীয় নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন:

১. জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়ার কারণে গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা গৃহহারা ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হয়েছেন তার কারণে ১৯৭২ সালের ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত সুদসমেদ সকল কৃষি জমির খাজনা মাফ করা হইল।

২. বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি” কবিতাটির প্রথশ ১০ লাইন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের “চল চল উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল” কবিতাটির প্রথম ১০ লাইন জাতীয় কুচকাওয়াজ বা রণ সঙ্গীত হিসাবে গৃহিত হয়।

৩. শাপলা- জাতীয় ফুল, বাঘ- জাতীয় পশু, কাঁঠাল- জাতীয় ফল, দোয়েল- জাতীয় পাখি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৪. জাতীয় পতাকার কিছুটা পরিবর্তন করে, মুক্তি যুদ্ধকালীন ব্যবহৃত পতাকার মাঝের মানচিত্রটি পরিবর্তন হয়ে সেখানে লাল গোলাকার সূর্যের মতো বৃত্ত থাকবে।

৫. রক্তাক্ত ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস এবং ১লা বৈশাখ সরকারি ছুটির দিন থাকবে।

৬. স্বাধীনতা দিবস ২৬ শে মার্চ এবং বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।[৮]

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করলেন

বঙ্গবন্ধু সারাটা জীবনই সংগ্রাম করেছেন মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। আর তাই তিনি ১৪ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালের এক নীতি নির্ধারণী বক্তৃতায় দেশ পরিচালনার জন্য গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতয়িতাবাদ রাষ্ট্র পরিচালনায় এই চারটি নীতির কথা ঘোষণা করলেন। সামাজিক অবিচার, অন্যায় অপরাধ ও পারিবারিক অশান্তি দূর করার লক্ষ্যে ১৫ই জানুয়ারি এক ঘোষণায় দেশে মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি খেলা ও ব্যবসা বন্ধ ঘোষণা করেন।[৯]

---

৮. আশরাফ হোসেন, *বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : উত্তরণ, ২০১৪, পৃ. ১৭৬-১৭৭

৯. বাংলাদেশ গণপরিষদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা : সরকারী মুদ্রনালয়, ১৯৭২, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রদূত এবং গণতন্ত্রের বরপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামানুসারে রাখা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

পাকিস্তানি যুদ্ধ বন্দিদেরকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্থানান্তর

১৬ই ডিসেম্বরে যুদ্ধবন্দি ও পাকিস্তানি বাহিনীর কর্মকর্তা ও সাধারাণ সৈনিকদের সংখ্যা ছিল ৯১,৫৪৯ জন। বাংলাদেশের নতুন সরকার তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ভারত স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে এদেরকে ভারতে পাঠানো শুরু হয়। ডিসেম্বরের শেষের দিকে পাকিস্তানি পরাজিত সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে লে. জে. এ.এ.কে. নিয়াজী, বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জে. রাওফরমান আলী, মে. জে. জমসেদ, রিয়ার এডমিরাল শরীফ, এয়ার কমোডর ইমামুল হক প্রমুখদেরকে হেলিকপ্টার যোগে কলকাতায় নিয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ইস্টার্ন হেড কোয়ার্টাস ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে রাখা হয়। এই সমস্ত যুদ্ধ বন্দি সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে ১৯৭২ সালের ১৮ই জানুয়ারির মধ্যে ভারতে স্থানান্তর করা হয়।

দালাল আইন প্রবর্তন এবং দালালদের বিচার করা হবে

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাক হানাদার বাহিনীকে এদেশে তাদের দোসররা- অর্থাৎ দালাল আল-বদর, আল-সামস, রাজাকার এবং শান্তি কমিটির লোকেরা বিভিন্নভাবে স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল এবং হানাদার বাহিনীকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। বাংলার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হত্যা, বাড়ি-ঘরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া, লুণ্ঠন করা, নিরীহ নারীদেরকে পাক বাহিনীর লালশার কাছে তুলে দেয়া ইত্যাদি কাজ এই সমস্ত বাহিনী করেছিল। যুদ্ধ পরবর্তী তাদের এই সমস্ত কর্মকাণ্ড মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের এই সমস্ত অপরাধের বিচারের জন্য গঠন করা হয় দালাল আইন। ১৯৭২ সালের ২৪ শে জানুয়ারি সরকার এই সমস্ত দালালদের বিচারের জন্য দালাল আইন করে বিচার করার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করেন।[১০]

বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোগদ্ধাদেরকে অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দিলেন

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে যে বাঙালি তরুণ সমাজ জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আর তারই দেশটাকে স্বাধীন করেছিল, আবার সেই সব মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্যী বঙ্গবন্ধু আদেশ দিলেন। ২২ শে জানুয়ারি অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়ে যার যার কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এবং আহ্বানে সাড়া দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত কাদেরিয়অ বাহিনী এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দিলেন। ১৯৭২ সালের বিশেষ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা স্টেডিয়ামে ৩০ শে জানুয়ারি মুক্তিবাহিনী, ৩১ শে জানুয়ারি মুজিব বাহিনী এবং ২৭ শে জানুয়ারি মুক্তিবাহিনীসহ সকল বাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।[১১]

---

১০. আশরাফ হোসেন, *বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭
১১. *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, ঢাকা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ২০১২, পৃ. ২২

১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান মুজিবাবহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দেন। ৬ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী প্রধান কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীকে জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা, থানায় শত শত গণকবর আবিষ্কৃত হয়। পাকবাহিনী ও তাদের দোসররা লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করে গণকবর দেয়।

সরকার ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ৩১টি টাউন কমিটিকে পৌরসভায় উন্নীত করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সকল ছাত্রছাত্রীকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ঘোষণা দেয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব মন্ত্রীদের বেতন মাসে এক হাজার টাকা নির্ধারণ করে দেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি সরকার মুজিববাহিনীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সকল সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করে।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পায়ওয়ার পর লন্ডন হয়ে দেশে ফেরার পথে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী হয়ে আসেন। কিন্তু ভারতের যেই পশ্চিমবঙ্গ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এত কিছু করল, তাদের সেখানে বঙ্গবন্ধু যাওয়া হয় নাই। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের ও ভারতের সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে ১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ সফরে যান।

কলকাতা গড়ের মাঠে বঙ্গবন্ধু আসবেন এবং ভাষণ দেবেন শুনে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন ঐ মাঠে উপস্থিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু জনসভায় ভাষণ দান করে বলেন যে, ভারতের জনগণ, ভারতের সরকার, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ করে ভারতের মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। হানাদার বাহিনী আমার দেশের এক কোটি মানুষকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করেছে আর এই অসহায় জনগণকে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সরকার আশ্রয়, বাসস্থান, খাদ্য আর চিকিৎসা দিয়ে সহযোগিতা তরেছিল। নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয় দিয়ে, অন্ন দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে আপনারা আমার দেশের মানুষের যে উপকার করেছেন, তা আমি এবঙ আমার দেশবাসী কোন দিনও ভুলবনা। আমি আপনার জনগণও সরকারের কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমি আপনাদের এই দান কোন দিনও শোধ করতে পারবনা। আমার সে সাধ্য নাই। তিনি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসামের জনগণের ও সরকারের প্রতিও তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১২]

বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ ও সরকারকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দৃঢ় সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য এই ভাষণেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের জনগণও সরকারকে, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সংবাদপত্রকে বাংলদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। কিন্তু মার্কিন সরকারকে তিনি বলেন যে, আমি মার্কিন সরকারের নীতির প্রশংসা করতে পারছি না। কারণ মার্কিন সরকার খুনী ইয়াহিয়া সরকারকে অস্ত্র দিয়ে

১২. আশরাফ হোসেন, *বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তারা ভারতকে সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করছে।

তিনি আরও বলেন যে, এদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিষবাষ্প নিশ্চিহ্ন করা হবে, এই ভুখণ্ডে আর সাম্রাজ্যবাদের খেলা চলবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র আমাদের দুই দেশেরই আদর্শ। দুই দিন সফর শেষে ৮ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় সাথে বাংলাদেশে অবস্থিত যুদ্ধে আগত ভারতীয় সেনা বাহিনীকে ফেরত নেয়ার ব্যাপারে কথা হয় যে, আগামী ২৫ শে মার্চের মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে ফেরত নেয়া হবে। তবে ২৫ শে মার্চের কথা থাকলেও ১২ মার্চের মধ্যেই সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়া হয়।[১৩]

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ত্যাগ করে ১ মার্চ মস্কো পৌঁছেন। বিমানবন্দরে তাঁকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানানো হয়। ২ মার্চ সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের ৩৩০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঐতিহাসিক অবদান রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত সরকার ও জনগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাতে ছুটে আসেন রাশিয়ায়। ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় ফিরে আসেন। ২২ মার্চ বাংলাদেশ তার সামুদ্রিক বন্দর থেকে মাইন, যুদ্ধে বিধ্বস্ত জাহাজ সরিয়ে নেয়ার জন্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি সম্পাদন করে।[১৪]

প্রধানমন্ত্রী ১৯৭০-এর মেনিফেস্টো অনুসারে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ সকল ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ দেন এবং কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ বিমানের ঢাকা-যশোর ও সিলেটে বিমান চলাচল শুরু হয়।

৭ এপ্রিল জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী ও জেনারেল আব্দুর রব এমসিএ সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ৮ এপ্রিল হতে সম্মিলিত বাহিনীর পরিবর্তে পৃথকভাবে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছা ছিল লেঃ জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিনকে সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ করবেন। কিন্তু একদল উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তার বিরোধিতার ফলে জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে সেনাপ্রধান হিসাবে পদায়ন করা সম্ভব হয়নি। কর্নেল জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান পদে নিয়োগের জন্য প্রচেষ্টা চালান। জেনারেল

১৩. আশরাফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০-১৮১
১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

ওসামানীর সুপারিশে বঙ্গবন্ধু কর্নেল শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার বিমানবাহিনী এবং ক্যাপ্টেন নূরুল হককে নৌবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়।[১৫]

রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের নেতা নির্বাচিত হন। আরো ৭ জন এমসিএ'র সদস্যপদ বাতিল করা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। শাহ আব্দুল হামিদ ও মোহাম্মদ উল্লাহ যথাক্রমে গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন চীফ হুইফ নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদে বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৫ জন সংসদ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৭২ সালের ১২ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু ৮ জন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করেন-আব্দুল মালেক উকিল, মোল্লা জালামউদ্দিন, সোহরাব হোসেন, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ডঃ মফিজ চৌধুরী এবং জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য সরকার এডভোকেট এস.আর. পাল ও সিরাজুল হককে সরকারি উকিল নিয়োগ করে। ১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী ঘোড়দৌড় ও মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ এপ্রিল এডভোকেট জিল্লুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[১৬]

১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য লাভ করে। কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ২৯ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান ভিয়েতনাম থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি করেন। দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার সেনাবাহিনীর সাথে ভিয়েতনামীদের যুদ্ধ চলছিল।

১৯৭২ সালের ১ মে স্পীকার শাহ আব্দুল হামিদ মৃত্যুবরণ করেন। মোহাম্মদ উল্লাহ স্পীকার নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবকে ডাকসুর সদস্যপদ প্রদান করা হয়। ১৮ মে সরকার ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করে। ২৪ মে বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং তার পরিবারকে একটি ভবন ও রাষ্ট্রীয় ভাতা মঞ্জুর করেন। ১০ জুন সরকার ওয়াপদাকে পানি উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নামে দুটো সংস্থায় বিভক্ত করে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি অতিদ্রুত শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে এবং ১৩ জুন ডঃ কামাল হোসেন খসড়া নিয়ে জাতীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করেন।

১৯৭২ সালের ১৭ জুন বাংলাদেশ আইএমএফ এবং ২২ জুন আইএলও'র সদস্যপদ লাভ করে।

---

১৫. Rabindranath Trivedi (Compiled), *International Relations of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1971-73*, V-1, New Delhi : Parama Prokashon, 1999, P. 136-140

১৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০২

১৩ জুলাই সরকার সচিব আব্দুর রবকে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্যবিশিষ্ট পে-কমিশন গঠন করে।[১৭]

১৭ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মুহাম্মদ ইদ্রিস ঘোষণা করেন যে, ১ অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ শুরু হবে।

১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা কমিশনের প্রথম সভার উদ্বোধন করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সরকারবিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন।

১৯৭২ সালের ২ অক্টোবর পর্যন্ত ২৭৫ পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৪১ হাজার দালাল গ্রেফতার হয়েছে।

৮ অক্টোবর শাসনতন্ত্র কমিটির ৭০তম সভায় খসড়া সমাপ্ত করেছে এবং ১২ অক্টোবর ডঃ কামাল হোসেন খসড়া শাসনন্ত্র গণপরিষদে পেশ করেন।

১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর বিশ্ব শান্তি পরিষদ (World Peace Council) বঙ্গবন্ধুকে জুলিও-কুরি শান্তি পুরস্কার প্রদান করে।

১৪ অক্টোবর পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শেখ মুজিব জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন।

১৫ অক্টোবর তিনি আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির নিকট পাকিস্তান হতে বাঙালিদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান। ১৭ অক্টেবার বাংলাদেশ জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদানের অনুমতি পায় এবং ১৮ অক্টোবর ইউনেস্কোর সদস্যপদ লাভ করে।

২২ অক্টোবর এক হিসাবে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিরা যুদ্ধকালে বাংলাদেশ থেকে ৭৮৫ কোটি টাকা পাকিস্তানে পাচার করে নিয়ে যায়।[১৮]

বাংলাদেশ গণপরিষদ শাসনতন্ত্রের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে; এবং ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদ বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র অনুমোদন করে। ১৪ ডিসেম্বর শাসনতন্ত্রে উপস্থিত সকল সদস্য স্বাক্ষর করেন। একই দিনে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক বছরের মধ্যে গণপরিষদ জাতিকে শাসনতন্ত্র উপহার দেন এবং তা ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর হতে কার্যকর হয়। ১৫ ডিসেম্বর হতে গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বঙ্গবন্ধু রমনা রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধাপরাধীদের বাংলার মাটিতে বিচার হবে।[১৯]

১৯৭২ সালের ১৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে শপথ গ্রহন করেন।

---

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮২
১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০৩
১৯. *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ সুপ্রীম-হাইকোর্টের শুভ উদ্বোধন করেন।

১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্র উইনিয়ন ভিয়েতনাম হতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে।

১১ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে প্রধান করে আওয়ামী লীগ ১০ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে।

২৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দরকে সচল করার কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়। ২৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন দলীয় প্রতীক বরাদ্দ করে। নির্বাচনের ভোটারসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫১ লক্ষ। ৩০ জানুয়ারি ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়।

জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। ১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ও ভোলা থেকে দুটো আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ৩০০ আসনে ১০৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় করেন।

১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) সদস্যপদ লাভ করে।

৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু পিজি হাসপাতালে অসুস্থ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে দেখতে যান।

৭ মার্চের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৮০ আসনে জয়লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তার কারণে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে।[২০]

১২ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন।

১৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ১৬ জন সদস্য নিয়ে মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহন করেন। ২২ মার্চ মন্ত্রিসভার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ এপ্রিল সরকার ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করার কথা ঘোষণা করে।

১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল সরকার নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক গোলাম আযম প্রমুখের নাগরিকত্ব বাতিল করে।

১৯৭৩ সালের ৩ জুন সরকার ঘোষণা দেয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে সরকারি কর্মচারী হবেন এবং কর্নেল জিয়াউর রহমানকে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি দেন।

---

২০. Rabindranath Trivedi, *Op. Cit*, P. 140

Dhaka University Institutional Repository

১০ জুলাই আওয়ামী লীগ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দশটি জাতীয় স্কেল ঘোষণা দেয়। সরকার বেতন কাঠামোয় দীর্ঘদিনের বেতন বৈষম্য ব্যাপকভাবে সমতা আনয়ন করে।

প্রধানমন্ত্রী আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেন। সম্মেলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।[২১]

১৯৭৩ সালের ১০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহ ও মেজর জিয়াকে পদোন্নতি দিলেন অথচ তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

১৩ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮ অনুমোদন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ দিনের সরকারি সফরে যুগোস্- াভিয়া ও কানাডার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি ২৮ জুলাই বেলগ্রেডে প্রেসিডেন্ট টিটোর সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু কানাডার রাজধানী অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য ৩ আগস্ট অটোয়া পৌঁছেন। তিনি ৭ আগস্ট কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভাষণ দেন।

১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট সিমলায় জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে পাকিস্তানে আটক বাঙালি ও ভারতে বন্দী পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাকিস্তানে ফেরত দেয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিমলা চুক্তির ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৫ লক্ষ বাঙালি পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারবে।[২২]

১৯৭৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয আইন পাস করে।

১৯৭৩ সালের ৭ জুন জাপান সরকার প্রধানমন্ত্রীকে জাপান সফরে আমন্ত্রণ জানায়। ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তার কন্যা শেখ রেহানা ও পুত্র রাসেলসহ জাপানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৯ অক্টোবর জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার সাথে বঙ্গবন্ধু দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। তিনি যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য জাপানী সহায়তার আশ্বাস পান। উভয় সরকার অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য যুক্ত বিবৃতি দেয়।

সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫,৫৯৪ জন শিক্ষককে ১৯৭৩ সালের ২৫ অক্টোবর হতে সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

জনগন ভৈরব সেতুর নাম বঙ্গবন্ধু সেতু নামকরণের ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সেতুর নাম রাখলেন শহীদ হাবিলদার আব্দুল হালিম সেতু।

---

২১. আতিউর রহমান, *বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৮৫
২২. দ্রষ্টব্য: আশরাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২২

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ১৯ ডিসেম্বর হতে ১৯৭৪ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। ২৭ নভেম্বর ৪৪৫ কোটি টাকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী ১৯৭৩-৭৪-১৯৭৭-৭৮ ঘোষণা করে।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেন। তবে যারা খুন, নারী নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগে জড়িত তারা ক্ষমা পাবে না।[২৩]

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ঘোষণা করেন তাঁকে জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সুতরাং তার পক্ষে আওয়ামী লীগ প্রধান থাকা সম্ভব নয়।

২০ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান এমপি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

২৪ জানুয়ারি স্পীকার মোহাম্মদ উল্লাহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। আব্দুল মালেক উকিল স্পীকার নির্বাচিত হন।

২৯ জানুয়ারি যুগোস্- াভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ঢাকা সফরে আসেন।

পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে; কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে বঙ্গবন্ধু লাহোর যাবেন না। ইসলামিক কনফারেন্সের মহাসচিব ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা পৌঁছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো ঘোষণা করলেন পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি খন্দকার মোশতাক আহমেদকে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাহোরে ইসলামিক কনফারেন্সে যোগদানের জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭৪ সালের ৭ মার্চ শেরেবাংলা নগরে নতুন সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮ মার্চ আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট গোমোডিন হুরারি ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের প্রথম মিলিটারি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লা সেনানিবাসে মিলিটারি একাডেমি উদ্বোধন করেন। এ সময় কুমিল্লা সেনানিবাসের জিওসি ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

১৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসার জন্য মস্কোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

৫ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্যসেন হলে ৭ জন ছাত্রলীগ কর্মী দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে নিহত হন। হত্যার অভিযোগে ছাত্রলীগ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়। হত্যায় জড়িত

---

২৩. Rabindranath Tnivedi, *Op. Cit*, P. 141

ছাত্রদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। পরবর্তীতে জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখল করে শফিউল আলমসহ হত্যাকারীদের মুক্তি দেন।

১৯৭৪ সালের ১২ মে প্রধানমন্ত্রী ৫ দিনের সফরে দিল্লী গমন করেন। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ৫টি এনক্লেভের পরিবর্তে বাংলাদেশ বেরুবাড়ী ছেড়ে দেবে।

২৫ মে মহিলা প্রতিমন্ত্রী বদরুন্নেসা আহমেদ লন্ডনে প্রাণত্যাগ করেন। তার স্মরণে বকশিবাজারের ইডেন গার্লস কলেজের নামকরণ করা হয় বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ।

১৯৭৪ সালের ৩১ মে প্রধানমন্ত্রীর মা সায়েরা খাতুন মৃত্যুবরন করেন।

১৯৭৪ সালের ৭ জুন শিক্ষা কমিশন শিক্ষানীতির প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করে।

১০ জুন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদানের সুপারিশ সাধারণ পরিষদে পেশ করে।

১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে ১১৮.২২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়।

৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রী বন্যাপ্লাবিত এলাকা হেলিকপ্টারে পর্যবেক্ষণ করেন। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী বন্যার মোকাবেলা করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করেন।

১৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করে জনগণকে সাহসের সাথে বন্যা মোকাবেলা করতে বলেন। বন্যা পরিস্থিতি আরো চরম আকার ধারণ করে। অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশে ত্রাণ প্রেরণ করে।

১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ বাংলাদেশের সদস্যপদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেয়ার জন্য নিউইয়র্কের পথে ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন।[২৪] তিনি প্রথম বাঙালি যিনি প্রথম জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। ফলে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির মর্যাদা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৫]

১৯৭৪ সালের বন্যায় বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। দেশে চরম খাদ্যাভাস দেখা দেয়। ২৯ সেপ্টেম্বর হতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৪৩০০টি ইউনিয়নে লঙ্গরখানা চালু করা হয়। ৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মুখপত্র প্রকাশ করে যে, বাংলাদেশে ৬ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি। এক কোটি বিশ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িতের জন্য ৫ লক্ষ টন খাদ্য প্রয়োজন; কিন্তু আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ৩,৪৭,০০০ হাজার টন খাদ্য প্রেরণের অঙ্গীকার করে এবং জাহাজের অভাবে তা পাঠাতে বিলম্ব হয়। ৬ অক্টোবর এক তথ্যবিবরণীতে দেখা যায় দেশে ৩৩০০

২৪. আশরাফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬-২৪১

২৫. Rabindranath Tnivedi, *Op. Cit*.

লঙ্গরখানায় ২৩ লক্ষ লোককে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। ১ নভেম্বরে এক তথ্যবিবরণীতে দেখা যায় ৪২ লক্ষ লোকের জন্য ৫৭৫৭ লঙ্গরখানা চালু করা হয়। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশে খাদ্যাভাবে সরকারি হিসেবে ২৭ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে। ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকায় আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম জানিয়েছে যে, ১৯৭৪ সালের ১ জুলাই হতে ডিসেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত তারা ঢাকা শহরে ২৪৪৩টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে। বিরোধী দল বলে থাকে ১৯৭৪ সালে লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করেছে। তারা রংপুরের বাসন্তী কাপড়ের অভাবে জাল পরে ছিল-এ উদাহরণ দিয়ে থাকে। অথচ এগুলো ছিল মিথ্যা প্রচার।[২৬]

১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকায় জাপানী বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে যমুনা সেতু নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যমুনা নদীর ওপর তিন মাইল দীর্ঘ সেতু নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু জাপান সফরের পর জাপানের সহায়তায় যমুনা সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। যমুনা সেতুর কাজ ১৯৭৪ সালের সূচনা করেন বঙ্গবন্ধু এবং ১৯৯৮ সালে তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে যমুনা সেতুর কাজ সমাপ্ত হয় এবং নামকরণ করা হয় বঙ্গবন্ধু সেতু।

২০ নভেম্বর সংসদ প্রেস এবং পাবলিকেশন সংশোধনী বিল ১৯৭৪ পাস করে।

১৯৭৪ সালের ২৩ নভেম্বর শাসনতন্ত্রের তৃতীয় সংশোধনী পাস করে। বিলের পক্ষে ২৬১ এবং বিপক্ষে ৭ ভোট পড়ে।

৩ ডিসেম্বর ঢাকা-দুবাই বিমান সার্ভিস চালু হয়।

৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয এক বিশেষ সমাবর্তনে দেশের ৮ জন বরেণ্য সন্তানকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। ডিগ্রী প্রাপ্তরা হলেন- অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (মরণোত্তর), ডঃ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (মরণোত্তর), কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ওস্তাদ আলী আকবর খান, ডঃ হীরেন্দ্রনাথ দে, ডঃ মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন এবং অধ্যাপক আবুল ফজল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করেছিল।

১৫ ডিসেম্বর শেখ মুজিব জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।[২৭]

১৮ ডিসেম্বর ৩ দিনের সফরে তিনি আবুধাবি যাত্রা করেন।

বঙ্গবন্ধু যখন দেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত তখন বামপন্থী দলগুলো বিশেষ করে জাসদ, সর্বহারা পার্টি, চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও ১৯৭১ সালের পাকবাহিনীর সহযোগীরা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। তারা আওয়ামী লীগের ৫ জন সংসদ সদস্যসহ

---

২৬. আশরাফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১-২৪২

২৭. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৬৬-১৭১

কয়েক হাজার কর্মী-নেতাঁকে হত্যা করে। তাই সমাজবিরোধীদের দমন করার জন্য সরকার দেশব্যাপী জরুরী আইন জারি করে। হরতাল নিষিদ্ধ এবং মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।[২৮]

১৯৭৫ সালের ৩ জানুয়ারি সরকার ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী, মজুতদার, কালোবাজারীদের মৃত্যুদন্ড দেয়ার জন্য বিশেষ ক্ষমতাবিধি ১৯৭৫ ঘোষণা করে।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সৈযদ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। সকল মন্ত্রীকে সম্পদের হিসাব রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ফারাক্কা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দিল্লী গমন করেন।

৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানী কাগমারীতে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

৩০ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ৯৪ বছর বয়য়ে টুঙ্গিপাড়ার গ্রামের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শেখ মুজিব ২৯ মার্চে কিংস্টনে অনুষ্ঠিতব্য কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগাদানের উদ্দেশ্যে ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। ১ মে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন। ৩ মে তিনি কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভাষণ দেন। তিনি পাকিস্তানকে বাংলাদেশের সম্পদ হস্তান্তরের আবেদন জানান। বাংলাদেশে যে ৬৬ হাজার পাকিস্তানী রয়েছে তাদের ফেরত নিতে বলেন।[২৯]

প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে ২০ মে ডবি- উএফপি ও বাংলাদেশের মধ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কাজের বিনিময়ে খাদ্য পাবে। ফলে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মিত হবে।

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ১২ জুন পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ-ভূ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন।

১৯ জুন রাষ্ট্রপতি ৬০টি জেলা ঘোষণা করেন। প্রত্যেক জেলা প্রশাসনের কাউন্সিল থাকবে। জেলায় একজন গভর্নর নিয়োগ করা হবে। ২২ জুন ৬০টি জেলার গভর্নরদের নামের তালিকা ঘোষণা দেয়া হয়। ২২ জুন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী সংসদ নেতা নির্বাচিত হন।

১৬ জুলাই রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ৬১ জন গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তারা ১ সেপ্টেম্বর হতে কাজ শুরু করবেন। ২১ জুলাই গভর্নরদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন।

---

২৮. Rabindranath Tnivedi, *Op. Cit.*
২৯. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১৩

২৬ জুলাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুকে ডক্টরেট অব ল ডিগ্রী প্রদানের যে প্রস্তাব দেয় তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হয়ে এ ডিগ্রী গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তার কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়।

খন্দকার মোশতাক নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে। ১০ জন মন্ত্রী ও ৫ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করে। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

১৬ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে টুঙ্গিপাড়ায় কবর দেয়া হয়। মোটের ওপর, বিজয়ের আনন্দ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের পর দেশের মানুষের ভেতর ভবিষ্যৎ নিয়ে যে স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের নতুন সরকারের জন্যে সেটি পূরণ করা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। যারা সরকার চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে তাদের কারো সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে রাস্তাঘাট কলকারখানা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে, দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি বিধ্বস্ত। রাজনীতিতেও ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়।[৩০]

দেশের এরকম দুঃসময়ের একটি সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর কিছু তরুণ অফিসার বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করে ফেলল, নববিবাহিতা বধু কিংবা শিশু সন্তানটিও সেই নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পেল না। এখানেই শেষ নয়, আওয়ামী লীগের সবচেয়ে প্রবীণ চারজন নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানকে জেলখানায় আটকে রেখে তাঁদের সেখানেই হত্যা করা হলো। যেন এটি সভ্য জগৎ নয়- যেন এটি বর্বর মানুষের দেশ।

শুরু হলো অন্ধকার জগৎ। বঙ্গবন্ধুর সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেশদ্রোহীদের একটি অংশকে ক্ষমা করেছিলেন- কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধাপরাধী, যারা খুন, জখম, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো ভয়ংকর অপরাধ করেছিল তাদের কাউকে ক্ষমা করা হয়নি। এরকম ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের জন্যে আটক রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার তাদের ক্ষমা করে ছিল।[৩১] যুদ্ধাপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেলে তাদের পুনর্বাসিত করতে থাকে পরবর্তী সামরিক সরকার আর স্বৈরশাসকেরা। ১৯৭২ সালে যে অপূর্ণ সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেটিতে একটির পর একটি পরিবর্তন এনে ধর্মনিরপেক্ষতার মতো রাষ্ট্রের মূল

৩০. S.A. Karim, *Sheikh Mujib Triumph and Tragedy*, Dhaka : The University Press Limited (UPL), 2010 , P. 259
৩১. *The Daily Star*, 14 December, 2008

আদর্শে হাত দেয়া শুরু হলো।[৩২] ধর্মান্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতা স্থান করে নিতে থাকল সরকারের ভেতর, সমাজের ভেতর।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব ও অবদান

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন- 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবের বিশ্বাস করে, এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথা মাত্র নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভীত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বো।'[৩৩]

শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাংক, বীমা, পাট, বস্ত্র প্রভৃতি জাতীয়করণ করেন। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ-পিও ১৬ আদেশে সকল ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকসমূহ জাতীয়করণ করে ৬টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন ব্যাংকগুলো- সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, উত্তরা ও পূবালী। পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা হয়। পাট, বস্ত্র ও ভারী শিল্পগুলো জাতীয় করণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশ ট্রেডিং করপোরেশনকে শক্তিশালী করা হয়। টিসিবিকে আমদানি রফতানির দায়িত্ব দেয়া হল। ন্যায্য মূল্যে যাতে জনগণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতে পারে যে জন্য গ্রাম পর্যায়ে ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ন্যায্য মূল্যের দোকান বন্ধ হয়ে যায়।

অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সমন্বিত বাজেট প্রণয়ন করে বাংলাদেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন করেন। ১৯৭২-৭৫ বছরের বাজেট বরাদ্দ নিম্নে দেয়া হল-

অর্থ বছর-বাজেটের আকার- রাজস্ব আয়- উন্নয়ন

১৯৭২-৭৩ ৭৮৬- ২১৮.১৫ কোটি- ৫০১ কোটি

১৯৭৩-৭৪- ৯৯৫- ৫৫৯.৩৭- ৫২৫

১৯৭৪-৭৫- ১০১৪.৩৭- ৪৫৯.৩৭ ৫২৫

বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি করেন। সরকারি কর্মচারীদের অসংখ্য বেতন স্তর ছিল তা সমন্বিত করে মাত্র ১০টি গ্রেড করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন। প্ল্যানিং কমিশন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

---

৩২. মুনতাসীর মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-৯০*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৮, পৃ. ৯৯

৩৩. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও ড. মোঃ রহমত উল্লাহ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার-দর্শন*, ঢাকা : জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ২০১৩, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রণয়ন করে। পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ধরা হয়-৪৪৫৫ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য নির্ধারণ করা হয় ১৯৫৭ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের ৪০ ভাগ আসবে বিদেশ থেকে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

১. দরিদ্র দূরীকরণ- জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি
২. পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখা
৩. বার্ষিক জিডিপি ৫.৫ শতাংশে বৃদ্ধি
৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৩ থেকে ২.৮হ্রাস করা
৫. বেকারত্ব দূর-চাকরি সংখ্যা ৪২ লাখে উন্নীতকরণ
৬. খাদ্য শস্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন
৭. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্তি ও স্বল্প মূল্য নিশ্চিত করা
৮. দ্রব্যমূল্যর উর্ধ্বগতি রোধ
৯. মাথা পিছু আয় ২.৫ শতাংশে বৃদ্ধি করা
১০. সমাজতন্ত্রে রূপান্তরে অর্জিত সাফল্যকে সমন্বিত করা
১১. দেশীর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার- পর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা
১২. মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন করা
১৩. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গীকার
১৪. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে অবহেলিত সমাজ ও মানব সম্পদের উন্নয়ন।
১৫. দেশে সমহারে আয় ও কর্মের সুযোগ সম্প্রসারিত করা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি দিগদশর্নের দলিল। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা।[৩৪]

ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি-১৯৭৫

ভারতের পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার রাজমহল এবং ভগবানগোলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর ওপরে ফারাক্কা বাঁধ অবস্থিত। বাংলাদেশ থেকে ১৬.৫ কিলোমিটার দূরে ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হয়েছে। মূল বাঁধের দৈর্ঘ্য ২২.৪৫ মিটার, উচ্চতা ২৩ মিটার। আয়তন ২২ মিটার এবং বাঁধের মোট ১০টি গেট আছে। বাঁধের খালগুলোর দৈর্ঘ্য ৩৮.২৩ কি.মি. এবং নীচের বিস্তৃতি ১৪০.৮৮ মিটার।

ভারত সরকার ১৯৫১ সালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করে। বাঁধ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৭৫ সালে। ২০০ কোটি টাকা ব্যয় বাঁধ নির্মিত হয়।

৩৪. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- বিএম আব্বাস, পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত চুক্তিকালে উপস্থিত ছিলেন না। এ চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ শুকনো মৌসুমে-জানুয়ারি-মে মাসে সর্বনিু ৪৪ হাজার কিউসেক পানি পাবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সমস্যা হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সামরিক শাসন ভারত বিরোধী রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে ফারাক্কা সমস্যা সৃষ্টি করে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৬ মার্চ ১৯৭৬ তারিখের সংগ্রামে ফারাক্কা লং মার্চ শুরু করে।[৩৫]

ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। হাজার হাজার স্কুল, কলেজ অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করেছে। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র লুট করে ছাত্র-শিক্ষকদের হত্যা করেছে। ১৯৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি সরকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন ১৯৭১ সালের মার্চ হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মওকুফ করা হয়। শিক্ষকদের বকেযা বেতন বিবেচনাধীন ছিল। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সরকার ঘোষণা করে যে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। ছাত্রদের বেতন পুনর্নির্ধারণ করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ ঘোষণা করেন যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হবে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শতকরা ৪০ ভাগ কমমূল্যে বই সরবরাহ করা হবে। বাজেটে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি রাখা হয়।

কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়নের বোর্ডের পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব বাংলা একাডেমীকে দেয়া হয়। নিরক্ষরতা দূর করার বিশেষ বরাদ্দ এবং ব্রিগেড গঠন করা হয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতন মওফুক করা হয় এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত বালাক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিক্ষা কমিটি উদ্বোধন করেন। কমিশন ১৯৭৩ সালের ৮ জুন অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। ৫ বছরের মধ্যে ১১ থেকে ৪৬ বছর বয়সী সাড়ে তিন কোটি নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করা হবে।

১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বঙ্গবন্ধুর সরকার ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদাকে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন ১৯৭৩ সালের ৮ জুন একটি অন্তবর্তী রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করে। রিপোর্টের অনেকে ৯০ দফা প্রশ্ন তৈরি করে ১০ হাজার কপি বিতরণ করে জনগণের মতামত নেয়া হয়। ১৯৭৪ সালের মে মাসে পুর্নাঙ্গ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়।

৩৫. *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৬ মার্চ, ১৯৯২

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক নীতিমালা সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয় অডিন্যান্স ১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জারি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা।

The University must honour the principle of Collegiate equality in its own academic structre. স্বাধীন দেশে সরকার কর্তৃক শিক্ষা ব্যবস্থা গণমুখী ও সার্বজনীন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ এবং বেতন বৃদ্ধি বঙ্গবন্ধু সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপের ফলে ৩৬১৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১৫৭৭৪২ শিক্ষকদের চাকরি সরকারি করা হয়। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গিকার বাস্তবায়ন করেন। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৩৬]

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর কয়েকটি ধর্মীয় দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম ধর্ম নিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল সরকার সকল ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবে। বঙ্গবন্ধু একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন। তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতেন। পাকিস্তান আমলে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাশিম বায়তুল মোকাররমে ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বাওয়ানী গ্রুপ মসজিদ নির্মাণ করেন। বায়তুল মোকাররম মসজিদ পরিচালনার জন্য বায়তুল মোকাররম সোসাইটি ছিল। স্বাধীনতার পরও প্রতিষ্ঠান দুটো সরকারের তত্ত্বাবধানে চলে। মসজিদ ও একাডেমির প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে না চলায় রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠান দুটো সরকারের পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং এ জন্য তিনি আইন প্রণয়ন করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যাকলী পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড অব গভর্নরস থাকবে। এ অধ্যাদেশের আলোকে ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন জারি হয়।[৩৭]

টঙ্গী বিশ্ব এস্তেমার জন্য জমি বরাদ্দ

টঙ্গি এলাকায় তাবলীগ সমাবেশ হয়। এজতেমার জন্য তাদের নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টঙ্গী ব্রীজের নিকট তুরাগ নদীর তীরে- বিরাট এলাকা নিয়ে জমি বরাদ্দ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ হতে লক্ষ লক্ষ মুসল্লি টঙ্গী এস্তেমায় যোগ দেয়। প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাসে এস্তেমা অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে সামীম মোহাম্মদ আফজাল তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন-

> তাবলীগ জামাত একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। ইসলামের পথে দাওয়াত দেয়াই হচ্ছে এ সংগঠনের একমাত্র কাজ। এই সংগঠনটি যাতে বাংলাদেশে অবাধে ইসলামের

৩৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৬
৩৭. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যাদেশ*, ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এ উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাতের বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গিতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন। প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ থেকে দাওয়াতি কজে সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার তাবলীগী ভাই এই জামাতে সমবেত হন। বঙ্গবন্ধু টঙিগ বিশ্ব এজতেমার এ স্থানটি বরাদ্দ করেছিলেন বলেই এজতেমায় আগত লক্ষ লক্ষ মুসলিম এখানে সমবেত হয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রণহ করে দাওয়াতি কাজ পরিচালনার জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন।[৩৮]

বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সলের জাতিসংঘে তিনিই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি ছিল নিম্নরূপঃ

জনাব সভাপতি!

আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে। জনাব সভাপতি, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি শীর্ষসম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান অবদানের কথা আমি স্মরণ করিতেছি।

যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজে স্থানলাভ করিয়াছে এই সুযোগে আমি তাঁদেরকেও অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমর্থনদানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাঁহারা মূল্যবান সাহায্য দিতেছেন তাঁহাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে যাঁহারা আমাদের স্বাগত জানাইয়াছেন তাঁদেরকে আমি বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হইতেছে সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম আর সেই জন্যই জন্মলগ্ন হইতেই বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে এই ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এইসব

৩৮. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *ইসলাম প্রচার-প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০, পৃ. ২৪-২৫

নীতিমালার বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কি তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইতেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার চরম আত্মদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র জাতিসংঘ সনদ স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনরুদ্ধার সম্ভব।

আগ্রাসনের মাধ্যমে বেআইনীভাবে ভূখন্ড দখল, জনগণের অধিকার হরণের জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার এবং জাতিগত বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। আলজিরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউ এই সংগ্রামে বিরাট বিজয় অর্জন করিয়াছে।

চূড়ান্ত বিজয়ে ইতিহাস যে জনগণ ও ন্যায়ের পক্ষেই যায়, এইসব বিজয় এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের বহু অংশে এখনো অবিচার ও নিপীড়ন চলিতেছে। অবৈধ দখলকৃত ভূখণ্ড পুরাপুরি মুক্ত করার জন্য আমাদের আরব ভাইদের সংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে এবং প্যালেস্টাইনী জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকার এখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়ার যদিও অগ্রগতি হইয়াছে কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই, বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের জিম্বাবুয়ে (দক্ষিণ রোডেশিয়া) এবং নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়তার সাথে লড়াই করিয়া যাইতেছে। বর্ণবৈষম্যবাদ, যাহাকে মানবতার বিরোধী বলিয়া বার বার আখ্যায়িত করা হইয়াছে তাহা এখানে আমাদের বিবেককে দংশন করা অব্যাহত রাখিয়াছে।

একদিকে অতীতের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাইতে হইতেছে, অপরদিকে আমরা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতেছি। আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পথ বাছিয়া নিবে তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে এই পথ বাছিয়া নেওয়ার বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে আমরা সামগ্রিক ধ্বংসের ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া এবং ক্ষুধা, বেকারী ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব অথবা আমরা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব-যে বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ন সম্ভব করিয়া তুলিবে। এবং যে বিশ্ব কারিগরিবিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে। যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়াছে তাহা একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া জরুরিভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে। এই বৎসরের প্রথম দিকে এই পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বর্তমান জটিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানিয়াছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার উপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পরপর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা সর্বশেষে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতেছে এই বৎসরের নজিরবিহীন বন্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ, তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ।

আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদীন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

মিত্রদেশগুলি এবং বিশ্বের মানবিক সংস্থাসমূহও এ ব্যাপারে সাড়া দিয়েছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হয় নাই ইহার ফলে দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাছাড়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো দেশগুলিতে দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে বার্ষিক মাথাপিছু একশ ডলারে ও কম আয়ের জনগণ বর্তমানে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা বর্তমান স্তরের চাইতেও তাদের জীবনযাত্রার মান কমাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিশ্বখাদ্য সংস্থার বিবেচনায় শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকার জন্য যে সর্বনিম্ন সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহার চাইতেও কম ভোগ করিয়াছে যেসব মানুষ তাহারা আজ অনাহারের মুখে পতিত হইয়াছে। দারিদ্র দেশগুলির ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার। শিল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানি পণ্য, খাদ্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যের দরুন তাহা আজ ক্রমশ তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টাও প্রয়োজনীয় উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও দুস্প্রাপ্যতার ফলে প্রচন্ডভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইতিমধ্যেই দারিদ্র ও ব্যাপক বেকারীর নিস্পেষণে পতিত দেশগুলি তাহাদের পাঁচ হইতে ছয় শতাংশ উৎপাদন বৃদ্দির হার সম্বলিত পরিমিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাঁটাই করার ভয়ানক আশংকার হুমকিতে পতিত হইয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের খরচই বহুগুণ বাড়িয়া যায় নাই, উপরন্তু তাহাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য তাহাদের সামর্থ্যও প্রতিকূলভাবে কমিয়া গিয়াছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে না পারিলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরো চরমে উঠিবে, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের সেই দুঃখ-দুর্দশর আর কোন পূর্ববর্তী নজির পাওয়া যাইবে না। ইহার পাশাপাশি অবশ্য থাকিবে গুটিকয়েক লোকের অপ্রত্যাশিত সুখ-সমৃদ্ধি। শুধুমাত্র মানবিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়িয়া তোলা এবং পারস্পরিক স্বনির্ভরতার স্বীকৃতি এই পরিস্থিতির যুক্তিযুক্ত সমাধান আনিতে পারে এবং এই মহাবিপর্যয় পরিহার করিবার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হয় নাই। এই ধরনের ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করাই নয়, ইহাতে একটি স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নেরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি। আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

আমরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিবেশেই সমাধান করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হইবে। ইহাতে শুধুমাত্র এই ধরণের

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশই সৃষ্টি হইবে না, ইহাতে অস্ত্রসজ্জার জন্য যে বিপুল সম্পদ অপচয় হইতেছে তাহাও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা যাইবে।

বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব- এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহন করিয়াছে। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে আমাদেরকে সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই জন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা-বিশ্বের যে কোন অংশে যে কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন, আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই। এই নীতির প্রতি অবিচল থাকিয়া অনুমোদন করিয়াছে, তাহাকে সমর্থন করি।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রতিও সমর্থন জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সমবেত উন্নয়নশীল দেশসমূহ শান্তির স্বার্থকে দৃঢ় সমর্থন করে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যাবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নরনারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাইবে। এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে আপোস মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তি কাঠামো এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ইহাছাড়া আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সাথে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি নাই, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোন উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোন পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোন দরকাষাকষি করি নাই। আমরা কেমলমাত্র আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।

৬৩ হাজার পাকিস্তানী পরিবারের অবস্থা এখনো মানবিক সমস্যারূপে রহিয়া গিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে এবং নিজ দেশে ফিরিবার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে। যে দেশের প্রতি তাহারা আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে সেই দেশে তাহাদের যাইবার অধিকার আছে। আইন ও

আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারেই এই অধিকার তাহাদের উপর বর্তাইয়াছে। এই মানবিক সমস্যার অবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন। আরো একটি জরুরি সমস্যা হইল সাবেক পাকিস্তানের পরিসম্পদ বণ্টন। পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত রহিয়াছে। আমরা আশা করি, উপমহাদেশের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এইসব অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হইবে, যাহাতে স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া সফল হইতে পারে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষার সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।

জাতিসংঘ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহার ২৫ বৎসরের কার্যকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবিক অগ্রগতির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে। এক কথায় বলা যায়, বিরোধ ও মানবিক দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ভাবীকালের দিকে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে। বিশ্ব সংস্থার সুনির্দিষ্ট সাফল্য ও সম্ভাবনাময় দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছে এমনটি আর কেউ করে নাই। ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীদের জন্যই বাংলাদেশে যুদ্ধের দাগ মুছিয়া ফেলিতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পূর্ববস্থায় ফিরাইয়া আনিতে এবং ভারত হইতে ফিরিয়া আসা এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করিতে জাতিসংঘ আমাদের দেশে ব্যাপক সাহয্য ও পুনর্গঠন কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব শরণার্থী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়াছিল। জাতিসংঘের মহাসচিব, তাঁর সহকর্মী এবং বিভিন্ন মানবিক সংস্থা যাঁহারা আমাদের দেশে বিরাট কর্মসূচীতে অংশ নিয়াছিল, তাঁহাদেরকে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমরা বিশ্বাস করি জাতিসংঘের গঠনমূলক নেতৃত্ব উপমহাদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে সহায়ক হইবে্ আমি আগেই বলিয়াছি, সাম্প্রতিক বিপর্যয়কারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রয়াসে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়িয়াছে। বাংলাদেশ বিশেষ অসুবিধার জন্য এমন কোন প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই, যাহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এ ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাইয়া আসিতে পারে। জাতিসংঘ দুর্যোগ ত্রাণ সমন্বয় অফিস স্থাপন করিয়াছে। এই ব্যাপারে স্বল্প হইলেও একটি দৃষ্টান্ত সূচনা করিয়াছে। লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগ সমন্বিত করার ব্যাপারে তাই জাতিসংঘের সদস্যদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

জনাব সভাপতি, মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই। আমাদের মতো সেইসব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ়। আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি কিন্তু মরিব না। টিকিয়া থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি। আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আমাদের পথ হইতেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকান্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ

> নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আর লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা আগাইয়া যাইব।[৩৯]

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বিবিসি বাংলা বিভাগের শ্রোতাদের ভোটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালির তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ১৪ এপ্রিল শীর্ষ ২০ জন বাঙালির প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম প্রচারিত হয়। ২৬ মার্চ ২০তম স্থান লাভকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নাম প্রথম প্রচারিত হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই ২০ বাঙালি সন্তান হচ্ছেন প্রথম- শেখ মুজিবুর রহমান, ২য়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩য়- কাজী নজরুল ইসলাম, ৪র্থ- এ কে ফজলুল হক, ৫ম- সুভাষচন্দ্র বোস, ৬ষ্ঠ- বেগম রোকেয়া, ৭ম- জগদ্বীশচন্দ্র বসু, ৮ম- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৯ম- মাওলানা ভাসানী, ১০ম- রাজা রামমোহন রায়, ১১তম- শহীদ তীতুমীর, ১২তম- লালন শাহ, ১৩তম- স্বামী বিবেকানন্দ, ১৪তম- অমর্ত্য সেন, ১৫তম- ভাষা শহীদগণ, ১৬তম- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৭তম- স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮তম- অতীশ দীপঙ্কর, ১৯তম- জিয়াউর রহমান এবং ২০তম- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

পহেলা বৈশাখ বিবিসি'র প্রভাতী অনুষ্ঠানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম প্রচারিত হওয়ার পর বাংলার মানুষ আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে। পহেলা বৈশাখ বা ১৪ এপ্রিল এটাই ছিল সবচেয়ে আনন্দময় খবর।

বিবিসি'র শ্রোতাদের ভোটে শীর্ষ ২০ জন বাঙালির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর মুজিবের নাম এক নম্বরে থাকায় আবার প্রমাণিত হলো ক্ষমতার জোরে সত্যকে মিথ্যা বানানো যায় না। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

কেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ?

১. ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পায়। প্রাদেশিক পরিষদ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন আওয়ামী লীগ পায়। কোনো বাঙালি নেতা তাঁর দেশের কোনো নির্বাচনে এতো বিপুল সমর্থন পেয়েছে কি?

২. ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ১৯৭১ অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শুরু হয় শেখ মুজিবের নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের বক্তৃতা স্মরণকালের বা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বক্তৃতা। তখন পূর্ব

৩৯. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩-২৮৮

পাকিস্তানের মানুষ চেয়েছিল তিনি যেন ঐদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে সামরিক কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় রেসকোর্সের ময়দানে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে জনসভায় রক্তগঙ্গা বয়ে দেয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সরাসরি যেমন স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি- আবার স্বাধীনতা ঘোষণার বাকিও রাখেননি।

৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর লেখা 'ফেরারী ডায়েরী' গ্রন্থে লিখেছেন: "মুজিবের ৭ মার্চের ভাষন গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দলিল, লিংকনের গৃহযুদ্ধ ভাষনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এবং শুধু ভাষণ হিসেবেও- এমনি অনবদ্য যে, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বের দশটি শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণের অন্যতম। এই ভাষণ শুধু যেন ভাষণ নয়- এক বীজমন্ত্র, যা কোটি কোটি মানুষকে শুধু উদ্দীপ্ত করেনি, এক কঠিন সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করেছে। যেন কোনো ব্যক্তি নয়, একটা আলোড়িত জাতির মর্মমূল থেকে এই ভাষণের উৎপত্তি- প্রাকৃতিক ঘটনার মতো।"[৪০]

৩. একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর সশস্ত্র হামলা করলে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পহেলা মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক শাসন কার্যত অচল হয়ে যায়। এই ২৫ দিন প্রকৃতপক্ষে দেশ পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিব। গভর্ণর হাউজ নয়, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসভবনই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। পাকিস্তানি নেতা খান মোঃ ওয়ালী খান বলেছেন, 'শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এবারের অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের চেয়েও শক্তিশালী।" ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সরকারের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক তার লেখা '*Witness to Surrender*' গ্রন্থে লিখেছেন: 'অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুজিবের শাসন সারা পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করে।'[৪১] পাকিস্তানি নেতা আসগর খান ১৯৭১-এর মার্চে পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর বলেছিলেন, 'ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট হাউজ ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়তে তিনি দেখেননি।' তখন পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষ বঙ্গবন্ধুর কথা শুনেছেন। যেমন- ৭ মার্চ, ১৯৭১ টিক্কা খান গভর্ণর হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। কিন্তু হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বি.এ সিদ্দিকী টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাননি। ৭ মার্চ ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ সরাসরি প্রচার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সামরিক সরকার সেই ভাষণ প্রচার করতে না দেয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। পরদিন ৮ মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করার অনুমতি দেয়ার পর সেই ভাষণ প্রচারের মাধ্যমে বেতার কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭১-এর ৫ মার্চ লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় বলা হয়- 'শেখ মুজিবই

৪০. আলাউদ্দীন আল আজাদ, *ফেরারী ডায়েরী*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১২, পৃ. ১১০
৪১. Siddiq Salik, *Witress to Surrender*, Dhaka : The University Press Limited, 1977, P. 76

হচ্ছেন বিদ্রোহী পূর্ব বাংলার শাসক।'[৪২] **১৯৭১** সালের **১২** মার্চ 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় : 'জনগণের আস্থাভাজন শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত শাসনকর্তা বলে মনে হয়। ইতোমধ্যে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রাস্তায় অবস্থিত বাড়িকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থানের অনুকরণে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।'[৪৩]

৪. আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। বাংলাদেশ নামকরণও বঙ্গবন্ধুই করেন। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে, 'আজ হতে এ অঞ্চলের নাম হবে বাংলাদেশ।'

৫. ১৯৭১ সালে নয় মাস যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানি কারাগারে বন্দী। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়। তার কারণ হলো, শত্রুর কারাগারে বন্দী হওয়া সত্ত্বেও সে সময় মুজিবের মতো জনপ্রিয় অন্য কোনো নেতা আওয়ামী লীগে বা বাংলাদেশে ছিল না। আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে পরিচিত বর্তমান আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ তার লেখা গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "নেতৃবৃন্দ জানতেন যে একমাত্র শেখ মুজিবের নামে সংগ্রাম পরিচালনা করলেই জনগণের সমর্থন অর্জন করা সম্ভব। এটা ছিল বাস্তবিক অর্থে বিস্ময়কর যে, শেখ মুজিব পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলেও এবং নিজে গ্রেপ্তারবরণ করলেও তাঁর জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি ছিল অটুট। এভাবে এমন একজনের নামে নয় মাসব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনা করা হয় যিনি স্বয়ং সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন না এবং কোনোদিন নিজ বাসভূমিতে ফিরে আসবেন এমন নিশ্চয়তা ছিল না। মুজিবের জীবনে এটা ছিল সর্বোচ্চ সাফল্য।"[৪৪]

৬. এ কথা ঠিক একাত্তরে নয় মাস পাকিস্তানি কারাগারে বন্দী থাকলেও বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দেশের বিবেক বলে পরিচিত আবুল ফজল লিখেছেন: "আজ আমরা যে নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে সাহস পাচ্ছি এও শেখ মুজিবেরই অবদান। তাঁর দু'সাহসী কণ্ঠই আমাদের কণ্ঠে এ দাবি তুলে দিয়েছে। আমরা আজ বন্ধনমুক্ত। আজ এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টোর কারাগারে বন্দী শেখ মুজিব মুক্ত শেখ মুজিব থেকে কিছুমাত্র কম শক্তিশালী নয়। দেড় হাজার মাইলের দূরবর্তী জিন্দানখানা থেকে তিনি অর্থাৎ তাঁর নাম, তাঁর আদর্শ, তাঁর আত্মা-পুরুষই যেন ন'মাস ধরে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে জুগিয়েছে মরণপণ সংগ্রামের প্রেরণা। যে প্রেরণা অজেয় শক্তি হয়ে আমাদের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে স্বাধীনতাকে- পাকিস্তানি

৪২. *The Sunday Times*, 5 March, 1971
৪৩. *Evening Standard*, 12 March, 1971
৪৪. মিজান রহমান (সম্পাদনা), *বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ৩৬৩

সামরিক শাসকদের নির্মম কবল থেকে। অনুপস্থিত সেনাপতির এমন সেনাপতিত্ব সত্যিই অভিনব, ইতিহাসে এমন নজির বিরল।”[৪৫]

৭. বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসীম সাহসী নেতা। তাঁকে হত্যা করতে পারে এটা প্রায় নিশ্চিত জেনেও তিনি আত্মগোপন না করে ’৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণার পর শত্রুর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, তিনি পালিয়ে থাকলে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী তাঁর খোঁজ করতে গিয়ে ঢাকায় শত শত লোককে হত্যা করতো। তাছাড়া ’৭১ সালে পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কোনো বক্তব্য বা বিবৃতি আদায় করতে পারেনি। জেলখানায় সেলের সামনে কবর খুঁড়লেও বঙ্গবন্ধু ভীত হননি। তিনি ওদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘আমার লাশটা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিও।’[৪৬]

৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারেও বঙ্গবন্ধু দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সশস্ত্র হামলা চালানোর পর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া যেত না। উল্লেখ্য, তৎকালীন মার্কিন ও চীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও সঠিক সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার কারণে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই মাত্র নয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

৯. বঙ্গবন্ধুর অনন্য সাধারণ নেতৃত্বের জন্য ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ‘*নিউজ উইক*’ তাঁকে ‘রাজনীতির কবি’ বলে উল্লেখ করেন। একজন কূটনীতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত ম্যাগাজিনে লেখা হয় : “একাকী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময়েও মনে হয় তিনি যেন ৬০ হাজার লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি- পাকিস্তানের তিনটি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর পটুত্ব আছে। নিজেকে মৌলিক চিন্তাবিদ বলে ভান করেন না মুজিব। বঙ্গবন্ধু রাজনীতির কবি- প্রকৌশলী নন, তবে বাঙালিরা যত না প্রায়োগিক, তার চেয়ে শৈল্পিক বেশি। কাজেই, এ অঞ্চলের সকল শ্রেণী ও মতাদর্শকে ঐক্যবদ্ধ করতে যা প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধুর রীতিতে হয়তো ঠিক তাই আছে।”[৪৭]

১০. সততার দিক দিয়েও বঙ্গবন্ধুর সাথে কারও তুলনা হয় না। অনুন্নত দেশে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী বা ক্ষমতার সাথে জড়িতরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে সপরিবারে নিহত রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার-পরিজন কারও নামে কোনো অর্থ সম্পদ পাওয়া যায়নি।

১১. বঙ্গবন্ধু ছিলেন সমগ্র বিশ্বের দু’চার পাঁচজন জনপ্রিয় নেতাদের অন্যতম। ’৭০-এর নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব বাংলার শতকরা ৯০ জনেরও বেশি মানুষ শেখ মুজিবের নৌকায় ভোট

---

৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪
৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪
৪৭. *Newsweek*, 5 April, 1971

দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন, "শেখ মুজিবুর রহমানের মতো জনপ্রিয় নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই অসামান্য জনপ্রিয়তা এমনিতেই আমলকির মতো এসে যায়নি তাঁর হাতের তালুতে। যদি আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব কী করে তিনি নিজেকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে গেছেন। এসব কিছুর পেছনেই ছিল ঐকান্তিক দেশপ্রেম এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা।"[৪৮]

১২. বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ প্রসঙ্গে বিরোধী বলে পরিচিত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ লিখেছেন, "শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যূদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর বেশি অবদান রেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।"[৪৯]

১৩. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ বের হয়েছে। বাঙালি কবি অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই বলেছেন:[৫০]

"যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ রক্তগঙ্গা।
অশ্রুগঙ্গা বহমান
তবু নাহি ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।"

১৪. একজন বিদেশী লেখক রঞ্জন তার গ্রন্থে লিখেছেন : "দেশে দেশে তো অনেকেই জন্মান। কেউ ইতিহাসের একটি পঙক্তি, কেউ একটি পাতা, কেউ বা এক অধ্যায়। কিন্তু কেউ আবার সমগ্র ইতিহাস। শেখ মুজিব এই সমগ্র ইতিহাস। সারা বাংলার ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের পলি মাটিতে তাঁর জন্ম। ধ্বংস, বিভীষিকা ও বিরাট বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই পলি মাটিতে সাত কোটি মানুষের চেতনায় শক্ত ও জমাট করে একটি ভূখন্ডকে শুধু তাদের মানসে নয়, অস্তিত্বের বাস্তবতায় সত্য করে তোলা এক মহা ঐতিহাসিক দায়িত্ব। মুজিব মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয় নেতার মতো এই ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসের সন্তান ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্বের ঐতিহাসিকতা।"[৫১]

---

৪৮. মিজান রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪
৪৯. উদ্ধৃত- মিজান রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫
৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫
৫১. উদ্ধৃত: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫

তিনি আরও লিখেছেন: "কোনো নেতার জীবনকাল তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব গুণের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়- বলেছেন অনেক খ্যাতনামা জীবনীকার। তবু নিজের জীবনকালেই কেউ কেউ অত্যাশ্চর্যভাবে কোনো দেশ বা তার ইতিহাসের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন ভবিষ্যতের সমালোচনা ও মূল্যায়নের পরোয়া না করেই। যেমন- ভারতের গান্ধী, মিশরের নাসের, ভিয়েতনামের হো চি মিন, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা, চীনের মাও সেতুং, রাশিয়ার লেনিন এবং আর কেউ কেউ। আজ বাংলাদেশে মুজিবও তাই।"[৫২]

১৫. বঙ্গবন্ধু মুজিবই যে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা একটি বিদেশী পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে সহজে তা অনুমান করা যায়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরদিন লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় লেখা হয় : 'সবকিছু সত্ত্বেও শেখ মুজিব স্মরণীয় হয়ে থাকবেন- এ জন্য যে, তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশ কখনও বাস্তবে পরিণত হতো না।[৫৩]

১৬. নিহত হওয়ার পর গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশে একটি মুজিবের পক্ষ, অপরটি মুজিবের বিপক্ষ- এই দু'পক্ষই বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এতেই কি প্রমাণিত হয় না 'মৃত মুজিব জীবিত মুজিবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।'

দোষে-গুণেই মানুষ। বঙ্গবন্ধুও মানুষ ছিলেন। কাজেই তাঁরও নিশ্চয়ই কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন, বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান, তাঁর নেতৃত্ব গুণ নিয়ে ইতোমধ্যে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে বঙ্গবন্ধুর মতো বিশাল মাপের মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করা একেবারেই সম্ভব নয়। এ কথাও ঠিক, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অসংখ্য বাঙালি নামি-দামি শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে একটা স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠায় একক কৃতিত্ব না হলেও সিংহভাগ কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধু মুজিবের। বঙ্গবন্ধুর সহজ সরল জীবন, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সততা, অসম সাহসী নেতৃত্ব, দুরদর্শিতা, সর্বোপরি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাসে তিনি অনন্য হয়ে থাকবেন। ১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এক স্মরণসভায় বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন বলেছিলেন, "যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, যতদিন বাংলা থাকবে, বাঙালি থাকবে, গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, করতোয়া, কীর্তনখোলা নদীর দুই তীরের মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, যতদিন এদেশের মানুষের হৃদয়ে উত্তাপ থাকবে, ততদিন অন্তরের মণিকোঠায় একটি নাম চির জাগরুক থাকবে- শেখ মুজিবুর রহমান।"[৫৪]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থসহ করে

---

৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬
৫৩. *The Times*, 16 August, 1975
৫৪. মিজান রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল- দুর্নীতি দমন; ক্ষেতে খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চ তৈরি করেন।[৫৫]

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় চলে আসে। নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না।[৫৬]

উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয়, উপমাহাদেশের ইতিহাসেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। স্বাধীন ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে একই সারিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা স্ব স্ব জাতিকে একটি দেশ, একটি পতাকা দিয়েছেন। হাজার হাজার বছর ধরে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে জাতির জনক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।[৫৭]

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)

স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯৬৯ সালের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সমবয়সী কস্তুরবাকে বিয়ে করেন। এন্ট্রাস পাস করে তিনি লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যান। ১৮৯৩ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার আদায়ের জন্য ২১ বছর সংগ্রাম করেন। ১৯১৫ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কংগ্রেসের রাজনীতিতে দোগদেন। তিনি ১৯২০-২২ সালে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৩০ সালে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪২ সালে তিনি ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাক দেন এবং কারাবরণ করেন। তার আন্দোলনের মূলনীতি ছিল অহিংস আন্দোলন। তিনি ১৯৪৫ সালে মুক্তি ভাল করেন। তিনি কেবিনেট মিশনের নিকট অখন্ড ভারত দাবি করেন। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান দাবিতে অটল ছিলেন। তিনি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলমানের জন্য পৃথক আবাসভুমি দাবি করেন। মহাত্ম গান্ধী বার বার জিন্নাহর সাথে আলোচনা করে তাঁকে ভারত ভাগ না করার জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি মোহাম্মদ আলী

---

৫৫. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭-২০৭
৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪
৫৭. বিস্তারিতি দ্র : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২-২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

জিন্নাহকে অখণ্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু জিন্নাহ এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। বৃটিশ সরকার ও ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। তিনি অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বৃটিশ শাসকগণও ভারতের অখন্ডতা বহাল রাখার পক্ষে ছিলেন। ভারতের ভাইসরব ভারত ভাগ করতে চাননি। ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্ট ব্যাটেন বলেন-

> Partition is sheer madness and no one would ever induce me to agree to it were is not for this fantastic communal madness that has seized everybody and leaves no other course open. The responsibility for this mad decision, he wrote, must be placed squarely on Indian shoulders in the eyes of the world, for one day they will bitterly regret the decision they are about to make. ["দেশ বিভক্তি পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। আমাকে দেশভাগে কেউ সম্মত করাতে পারতো না, যদি না তা অদ্ভুত সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার জন্য না হতো। এ পাগলামি সকলকে পেয়ে বসেছে এবং অন্য কোনো পথ খোরা নেই। এই পাগলামি সিদ্ধান্তের দায়িত্ব অবশ্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে ভারতীয়দের ওপর পড়বে। এই সময় তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছে তার জন্য একদিন তাদের অনুতপ্ত হতে হবে।"][৫৮]

পরিশেষে বৃটিশ সরকার ভারত বিভাগ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে মহাত্মাগান্ধী হিন্দু-মুসলমানদের শান্তি স্থাপনের জন্য আনশন পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি উগ্রপন্থী হিন্দুরা গান্ধীজীকে দিল্লিতে হত্যা করে। হত্যাকারী- নাথুরাম গডসে। বিচারে গান্ধীর খুনীদের ফাঁসি হয়েছিল। তার অহিংসনীতির জন্য তিনি বিশ্বে শান্তির অবতার হিসেবে বিখ্যাত। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন বলেন- Mahatma Gandhi will go down in history on a par with Buddha and Jesus Ghrist., [মহাত্মা গান্ধী ইতিহাসে বুদ্ধদেব এবং যিশু খৃষ্টের সাথে একই সারিতে অবস্থান করবেন]।[৫৯]

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৮৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জিন্নাহ পুনজা এবং মাতার নাম মিথিবাই। তারা খোজা সম্প্রদায়ের লোক এবং ইসমাইলিয়াদের শিষ্য। জিন্নাহ এন্ট্রাস পাস করে ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডন গমন করেন। ১৮৯৬ সালে ১১ মে তিনি লিংকন থেকে ব্যারিস্টার হিসেবে সনদপ্রাপ্ত হন। ১৮৯৬ সালে বোম্বে হাইকোর্ট যোগদেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৪ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদেন। তিনি কংগ্রেস নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং ফিরোজসহ মেহতার সান্নিধ্যে আসেন। জিন্নাহ একাধিকবার বোম্বে থেকে আইন সভার সদস্য হন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯১৬ সালে লখনৌ শহরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে লখনৌ চুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তি সম্পাদনে জিন্নাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে তাঁকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের দূত

---

৫৮. Larry Collins and Dominique Lapiere, *Freedom at Midnight*, Op. Cit., P. 120
৫৯. *Ibide*

বলা হয়। ১৯১৮ সালে তিনি পার্শি স্যার দিনশাপেটির কন্যা ১৮ বছর বয়স্ক রুটিকে বিয়ে করেন। তখন জিন্নাহর বয়স ছিল ৪২ বছর। তাঁদের একমাত্র কন্যা ছিল দীনা জিন্নাহ। রুটি ১৯২৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। দীনা জিন্নাহর অমতে এক পাশী যুবককে বিয়ে করেন। জিন্নাহর সাথে তার কন্যার কোনো দিন মিলন হয়নি। জিন্নাহর ছোট বোন ফাতেমা জিন্নাহ চিরদিন ভাইয়ের সেবাযত্ন করেছেন। জিন্নাহ ১৯৩০ সালে লন্ডনে প্রথম গোলটেবিলে বৈঠকে যোগদেন। ১৯৩৪ সালে তিনি মুসলিম লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করে দলকে সংগঠিত করেন। ১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবে পূর্বাঞ্চলে একটি এবং পশ্চিম অঞ্চলে একটি মুসলিম এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি ছিল। জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি করেন। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সভায় লাহোর প্রস্তাবের একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রবর্তন করে একমাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব পাস হয়। জিন্নাহ স্টেটস (States) এর পরিবর্তে State সংশোধন করে আসাম-বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রস্তাব বাতিল করেন।

কংগ্রেস অখণ্ড ভারত দাবি করে। জিন্নাহ ভারত ভাগ করে পাকিস্তান চান। বৃটিশ সরকার ও ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেন অখন্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু জিন্নাহর অনমনীয় দাবি- পাকিস্তান চাই- দাবির নিকট কংগ্রেস, ইংরেজ সরকার নতি স্বীকার করে। তারা পাকিস্তানের দাবি মেনে নেয়। জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে ১৯৪৬ সালে কলকাতা, বিহার ও নোয়াখালীতে দাঙ্গা হয়। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান নিহত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগকালে ভারতের সর্বত্র দাঙ্গা শুরু হয়। বৃটিশ সরকারের ধারণা ছিল, দেশ ভাগ হলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা প্রমাণিত হল। ১৯৪৭ সালে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে একমাত্র পাঞ্জাবে ৫ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নিহত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হল। পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত, বেলুচিস্থান এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান শিখের এক সাগর রক্ত পেরিয়ে জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। কোটি কোটি সর্বহারা মানুষের নিকট Independence day was a tragedy. স্বাধীনতা দিবস ছিল বিয়োগান্তক ঘটনা। জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব উপমহাদেশে চিরদিনের জন্য হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও দাঙ্গা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে গান্ধী হলেন শান্তির দূত। তার রাজনীতি ছিল অসাম্প্রদায়িক ও অখন্ড ভারত।

Mr. Jinnah claimed that there was only one solution- ‘surgical operation on India, otherwise India would perish altogether.’[৬০]

কংগ্রেস ও মহাত্ম গান্ধীর সিদ্ধান্ত- ভারত ভাগ হবে না। ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকলে এক জাতি- ভারতীয়। জিন্নাহ গর্জে উঠে বলেন, মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি হিন্দুদের থেকে পৃথক। তিনি আরো দাবি করেন যে, ভারতের ১০ কোটি মুসলমান মুসলিম লীগের

৬০. Ibid, P. 442

নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। তারা তাদের পৃথক আবাসভূমি চায়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর একঘেয়েমীর কারণে ভারত ভাগ হল। কিন্তু ১০ কোটি মুসলমানদের মধ্যে ৪ কোটি মুসলমান ভারতে থেকে যায়।

জিন্নাহ বাংলাকে অবিভক্ত ও স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন। ভাইসরয় জিন্নাহকে বাংলা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন, He said, without any hesitation, I should be delighted, what is the use of Bengal without Calcutta, they had much better remain united and independent. I am sure that they would be on friendly terms with us.'[৬১]

কোনো দ্বিধা না করে তিনি বলেন, আমি আনন্দিত হব। কলকাতা ব্যতীত বাংলা দিয়ে কি হবে এবং তারা একত্রিত এবং স্বাধীন থাক। আমি নিশ্চিত যে তারা আমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট দু'টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন। তিনি চেয়েছিলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার ঘোষণার ফলে পূর্ব বাংলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জাতীয়তাবদী আন্দোলন শুরু হয়। মুললমান সম্প্রদায় জিন্নাহকে কায়েদে আজম উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ করাচিতে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতের শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে, পাকিস্তান ২৫ বছরের বেশি স্থায়ী হবে না্ তার ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়িত হল।

পাকিস্তান সৃষ্টির ২৪ বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র অবস্থায় কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালে মেট্রিক পাস করে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। তিনি বেকার হোস্টেলে থাকতেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসরিম লীগ রাজনীতিতে যোগদেন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারের তিনি ফরিদপুর জেলার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গা বিরোধী। ১৯৪৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা দাবি করেন। শেখ মুজিব এর-সমর্থক ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলে ভারত পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য কলকাতায় অবস্থান করেন। এ সময় গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন।

---

৬১. Stanley A. Wolpert, *Jinnah of Pakistan,* London : Oxford University Press, 2005, P. 317

তিনি ১৯৪৭ সালে বিএ পাস করে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা ও ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে দেয়ার অভিযোগে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।[৬২]

তিনি বারো বছর কারাজীবন ভোগ করেন। ১৯৪৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গটিত হয়। তিনি ছিলেন দলের যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫২ সালে জেলে আটক থাকা অবস্থায় তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। ১৯৫৪ সালে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে তাঁকে সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালি জাতির বাঁচার দাবি ৬ দফা পেশ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হয় তা পূর্ণতা পায়-৬ দফা দাবি ঘোষণায়। ১৯৬৮ সালে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রধান আসামী করা হয়। আগরতলা মামলার ৩৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হয় সরকার বাধ্য হয়ে আগরতলা মামলা তুলে নেয় এবং ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি জনতা তাঁকে 'বঙ্গবন্দু' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি মুক্ত মানুষ হিসেবে লাহোর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। শেখ মুজিব ৬-দফা পেশ করেন। আইয়ুব খান ৬-দফা গ্রহণ না করায় বৈঠক ভেঙ্গে যায়। আন্দোলন চলতে থাকে। অবশেষে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ পদত্যাগ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসন দখল করেন। ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু মহাত্মগান্ধীর ন্যায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ৭ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতির ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহন করে প্রধানমন্ত্রী হলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ভারত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেন এবং এক কোটি শরনার্থীদের আশ্রয় দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী ঢাকায় আত্মসর্ম্পন করে। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব

৬২. Ibid, P. 444

গ্রহণ করেন। Zulfi Bhutto of Pakistan গ্রন্থের লেখক বিখ্যাত ঐতিহাসিক Stanley Wolpert- বঙ্গবন্ধুকে বলেছেন- the nation-savior hero of Bangladesh- বাংলাদেশের জাতি রক্ষা বীর।[৬৩]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু গান্ধীর ন্যায় একাধিকবার করাবরণ করেন। বঙ্গবন্ধু গান্ধীর অহিংসনীতি ও নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর সংগ্রামী চেতনায় প্রভাবিত ছিলেন। সুভাস চন্দ্র বসু সশস্ত্র যুদ্ধ করে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সংগ্রামে সফল হতে পারেন নি। বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের শত্রু মুক্ত করেন। উপমহাদেশের দুই সংগ্রামী নেতার সংমিশ্রন বঙ্গবন্ধুর মধ্যে ঘটেছিল। নিউজ উইক তাঁকে 'poet of politics' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জনক ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত বিভাগকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান নিহত হয়েছে। প্রায় দেড় কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এত বড় বাস্তুত্যাগ ও হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে-জিন্নাহর এ যুক্তি বাস্তবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আজও উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছে। অসংখ্য দাঙ্গা হয়েছে। কয়েকবার পাকভারত যুদ্ধ হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন করে ইংরেজদের ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তিনি যুদ্ধ না করে অহিংস আন্দোলন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করেন। ভারতবাসী ভালোবেসে তাঁকে মহাত্মা উপাধি দেন। তিনি বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তার অহিংসনীতি বিশ্বের শান্তির পথ দেখাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙ্গালি জাতি ৯ মাস যুদ্ধ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। দু'মাথা বিশিষ্ট পাকিস্তান ২৪ বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধর্ম ভিত্তিক পাকিস্তান নামে রাষ্ট্র পৃথক হয়ে ভাষা ভিত্তিক বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মুক্তি দূত হিসেবে চিরদিন বেঁচে থাকবেন।[৬৪]

বঙ্গবন্ধু বিশ্বের মহান রাষ্ট্রনায়কের সাথে সহঅবস্থান করছেন। রাশিয়ার লেলিন, চীনের মাও সেতুং, ইন্দোনেশিয়ার সুকার্নো, আফ্রিকার লুবুম্বা, কিউবার ফিডেল কাস্ট্রো প্রমুখের সাথে তিনি তুলনীয়। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ভিন্নতর। অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়কগণ নিজের দেশে অবস্থান করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান না করেও তার নামে সমগ্র যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে।

---

৬৩. Ibid, P. 442
৬৪. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড, মামলার রায় ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট

দেশে চলমান পরিস্থিতি এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তায় পরিবর্তন আনে। বঙ্গবন্ধু দেশ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি দূরীকরণ ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে অধিকার সংরক্ষণে দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসঙ্গে বললেন, 'প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে যদি আপনাকে অধিকার ভোগ করতে হয় অন্যের অধিকারকেও রক্ষা করতে হবে; If you have liberty, you have responsibility এ কথাটি ভুললে চলবে না। কিন্তু রেসপনসিবিলিটি নেবে না আর সেখানে যেয়ে সরকারি কর্মচারীর মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবে!' তিনি স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ hot bed of internationa clique -এ পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, '২৫ বছর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারো নাই।' তিনি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপে ও দেশজুড়ে ভয়াবহ বন্যায় দেশীয় অর্থনীতি ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করেন। বাংলার দুঃখী মানুষের কাছে শিক্ষিত সমাজের ঋণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তোমরা পেয়েছো শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা পেয়েছো [তা] বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কি ফেরত দিয়েছো বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরে যায়?' শিক্ষিত সমাজই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত উল্লেখ করে তিনি আবারো বলেন, 'আমরা যে ৫% শিক্ষিত সমাজ, আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে করাপ্ট পিপল।' দুর্নীতিবাজদের অপতৎপরতার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, যে কোনো মূল্যে বাংলার মাটি থেকে এদের উৎখাত করতে হবে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য শাসনতন্ত্রের সংশোধন করেছেন উল্লেখ করে তিনি বলে, 'যারার জীবনভার সংগ্রাম করেছে, একথা যদি কেউ মনে করে যে, জনগণের ভোটের অধিকার আমরা কেড়ে নিয়েছি, আজ এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারদের জনগণ দ্বারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।' দেশে সুষ্ঠু শাসন কায়েমের জন্য, জনগণকে অনাচার থেকে রক্ষা করে শান্তিময় জীবনদানের জন্য এটা তাঁর 'secon revolution' উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, এই Revolution এর অর্থ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এর অর্থ অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।' নতুন বিপ্লব শুরু করার জন্য তিনি জনগণের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন: 'নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে মোবিলাইজ করতে হবে। মানুষ ভালো। বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মতো মানুষ আর কোথাও নাই। বাংলার গরিব, বাংলার কৃষক ভালো, বাংলার শ্রমিক ভালো।[১]

দ্বিতীয় বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল-দারিদ্র্য দূরীকরণ, দুর্নীতি দমন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ সমবায় প্রতিষ্ঠা। তিনি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন প্রশাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে এনে জনগণকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন তখন জাতির শত্রুরা দেশ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল।[২]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতি চলছে। উপাচার্য আব্দুল মতিন চৌধুরী তার প্রাক্তন ছাত্রকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ব্যাপক আয়োজন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালও অনুষ্ঠান আয়োজনে সারারাত সতীর্থদের সাথে ব্যস্ত ছিলেন। উপাচার্য আব্দুল মতিন চৌধুরী শেখ হাসিনাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু তিনি জার্মানি যাবেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। ২৯ জুলাই শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

কিছু রাজনীতিবিদ ও সামরিক কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কয়েকজন মেজর চরম ডানপন্থী, সাম্প্রদায়িক সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুকে হত্যায় অগ্রণী হিসেবে কাজ করে। তারা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে এবং তারা এ ষড়যন্ত্র প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা ১৫ আগস্টের নির্মম ঘটনার ষড়যন্ত্রকারী ছিলো।[৩]

পনেরই আগস্টের ষড়যন্ত্রকারীরা

১. খন্দকার মোশতাক আহমেদ, জন্ম- দাউদকান্দি, কুমিল্লা। তিনি বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের ফেডারেশন গঠন করার জন্য ভারতের মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগাযোগ করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকায় তার জানাজা হতে পারেনি।

২. তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। খন্দকার মোশতাক আহমেদের ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সিআইএ ও খুনীদের সাথে সমন্বয় করেছেন। জেলহত্যা মামলায় বন্দী আছেন।

৩. মাহবুবুল আলম চাষী, জন্মস্থান চট্টগ্রাম। তিনি পাকিস্তান পররাষ্ট্র সার্ভিসের সদস্য ও খন্দকার মোশতাঁকের গনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর

---

১. আতাউর রহমান, *বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৮৮-৮৯

২. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বাংলাদেশ গড়লো যারা*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ. ১৭৬-৭৭

৩. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা তদন্ত প্রতিবেদন চার্জশিট [বিস্তারিত দ্র : সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১, পৃ. ৭৪৫-৭৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি একাডেমীতে ষড়যন্ত্রকারীদের সভার আয়োজন করেন। তিনি সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

৪. মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান- সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ ছিলেন। তিনি স্বজ্ঞানে খুনী আর্মি অফিসারদের উৎসাহিত করেছেন। তার সমর্থন ব্যতীত খুনীরা এতবড় জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারত না। তার পৈতৃক নিবাস বগুড়া। তিনি ১৯৮১ সালের ৩০ মে সেনা অভ্যুত্থানে চট্টগ্রামে নির্মমভাবে নিহত হন।[৪]

৫. ফারুকুর রহমান-বেঙ্গল ল্যান্সারের মহ-অধিনায়ক ছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অপারেশনের অধিনায়ক ছিলেন। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড মামলার রায়ে ফাঁসির আদেশ হয়েছে। কারাগারে বন্দী আছেন।

৬. মেজর খন্দকার আব্দুর রশীদ-সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির অধিনায়ক ছিলেন। তিনি খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও কর্নেল ফারুকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। বর্তমানে ফাঁসির আসামী। বিদেশে পলাতক।

৭. মেজর নূর চৌধুরী-পাকিস্তান ফেরত এবং সেনাবাহিনী থেকে পদচ্যুত অফিসার ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

৮. মেজর বজলুল হুদা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ কামাল, ব্রিগেডিয়ার জামিলসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অনেককে হত্যা করে। ফাঁসির আসামী। বর্তমানে কারাগারে আটক।

৯. কর্নেল রাশেদ চৌধুরী-মন্ত্রী আব্দুর রব সেনিয়াবাত ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে।

১০. রিসালদার মোসলেমউদ্দিন শেখ ফজলুল হক মনি ও তার স্ত্রী আরজু মনিকে হত্যা করে।

১১. মেজর শরিফুল হক ডালিম-চাকরিচ্যুত সেনা কর্মকর্তা, বেতার-টিভিতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সংবাদ দেয়। ফাঁসির আসামী। বিদেশে পলাতক।[৫]

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাবৃষ্টি ও বন্যার কারণে দেশে খাদ্য ঘাটতি ঘটে। ষড়যন্ত্র করে খাদ্য আমদানিতে বিলম্ব করা হয়। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। চরমপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো হত্যা, ব্যাংক লুট করে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত কয়েকজন মেজর আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। কর্মরত সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা ও তাদের অধীনস্থ সৈন্য ১৫ আগস্টের ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়। ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে আযানের সময় মেজর ফারুক, মেজর খন্দকার আব্দুর রশীদ, মেজর নূর চৌধুরী, মেজর বজলুল হুদা, মেজর মহিউদ্দিন ল্যান্সার ও আর্টিলারির একদল সৈন্য নিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভসনে আক্রমণ করে। বঙ্গবন্ধু সরকারী প্রেসিডেন্ট ভবন-বঙ্গভবনে না থেকে নিজস্ব ভবনে বাস করতেন। তিনি

৪. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬-৭৪৭

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গভবনে বাস করলে খুনীরা এত সহজে প্রবেশ করতে পারত না। বাড়িতে অল্পসংখ্যক রক্ষী ছিল। তাদের সাথে প্রথমে গুলি বিনিময় হলে একজন পুলিশ অফিসার নিহত হয়। গোলাগুলি শুনে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের সদস্যগণ ঘুম থেকে উঠে যান। বঙ্গবন্ধু প্রথমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ, সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকে ঘটনা অবহিত করেন। কর্নেল জামিল বঙ্গবন্ধুর বাসার দিকে ছুটে যান। শেখ কামাল নিচতলায় নেমে আসেন। মেজর বজলুল হুদার গুলিতে তিনি লুটিয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধু শেখ কামালের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে এসে মেজরদের ধমক দিলে পিছিয়ে যায়। এ মুহূর্তে মেজর নূর চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে স্টেনগান দিয়ে পর পর অনেকগুলো গুলি করে। গুলি বুকের ভিতর দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লে ঘাতক দল উপরে উঠে যায় এবং বেগম মুজিব, শেখ কামাল ও তার স্ত্রী সুলতানা, শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজি, বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসেরকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর ১০ বছরের শিশুপুত্র শেষ রাসেলকে ধরে ফেলে। ভয়ে রাসেল অনুরোধ জানায় যে, তাঁকে না মেরে যেন তার মায়ের নিকট নিয়ে যায়। খুনীরা শিশু শেখ রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৬]

খুনীরা যখন জঘন্য হত্যাযজ্ঞে নিয়োজিত তখন মেজর রশীদ বিমানবাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতের বাসভবনে যান এবং তাঁকে মিগ বিমান নিয়ে তৈরি থাকার জন্য বলেন। লিয়াকত সাহসের সাথে বলেন যে, বিমানবাহিনী প্রধানের আদেশ ব্যতীত তিনি কোন কাজ করতে পারবেন না। শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রে বিমান ও নৌবাহিনীর কেউ অংশগ্রহণ করেননি। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে তারা ভেঙ্গে পড়েন। নবম ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার ঢাকায়। নবম ডিভিশনের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়াত জামিল হত্যার ঘটনা শুনে মর্মাহত ও রাগান্বিত হন। তিনি জেনারেল শফিউল্লাহ্‌র সাথে কথা বলে জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসভবনে গমন করেন এবং জিয়াকে দাড়ি কামাতে দেখেন। সাফায়াত জামিল জিয়াকে বলেন, 'প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে। আপনার নির্দেশ কি?' জিয়া অত্যন্ত শান্ত ছিলেন। মনে হলো যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। জিয়া উত্তর দিলেন, "যদি প্রেসিডেন্ট না থেকে থাকেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান এবং সেখানে অপেক্ষা করুন।" উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাগণ জিয়া ব্যতীত সকলেই গভীর শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন। তারা চিন্তা করেন যে, বঙ্গবন্ধু এখন মৃত, বাধা দিলে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে এবং অনেক রক্তপাত হবে। মেজর ডালিম দ্রুত বেতার কেন্দ্রে চলে যায় এবং ঘোষণা করে-স্বৈরাচার শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ে।[৭]

সকাল ৭.৩০ মিনিটে মেজর রশীদ খন্দকার মোশতাকের বাসভবনে গমন করে এবং তাঁকে নিয়ে রেডিও অফিসে যায়। সেনাবাহিনীর তিন প্রধানকেও রেডিও অফিসে উপস্থিত করা হয়। খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন এবং সকাল ১১.১৫ মিনিটে রেডিওতে ভাষণ দেন।

৬. সাক্ষাতকার- আ ফ ম মহিতুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বাদী [বিস্তারিত দ্র : সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৫-৭৪৮]

৭. Antony Mascarenhas, *Bangladesh- A Legacy of Blood,* London, Sydney, Auckland, Toronto : Hodder and Stoughton, P. 74-75

Dhaka University Institutional Repository

শাসনতন্ত্র ভঙ্গ করে খুনীরা তাঁকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে। তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। একমাত্র ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং এইচএম কামরুজ্জামান খুনীদের মন্ত্রিসভায় যোগদানে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তাঁদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করা হয়। জেনারেল শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনী হতে পদচ্যুত করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হয়। বিমানবাহিনীর প্রধান এ.আর. খন্দকারকে পদচ্যুত করে তার স্থলে বিদেশে কর্মরত এম.জি. তোয়াবকে বিমান বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যার ফলে যারা সরাসরি লাভবান হয়েছেন তারা হলেন-খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও জিয়াউর রহমান। তাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ব্যতীত মেজরদের পক্ষে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভব হত না।[৮]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যাঁরা নিহত হয়েছেন-

	নাম	বয়স
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	৫৫ বছর
২.	বেগম ফজিলাতুন্নেসা- স্ত্রী	৪৫ বছর
৩.	শেখ নাসের- ভাই	৪৭ বছর
৪.	শেখ কামাল- জ্যেষ্ঠ পুত্র	২৭ বছর
৫.	শেখ জামাল- দ্বিতীয় পুত্র	২১ বছর
৬.	শেখ রাসেল- কনিষ্ঠ পুত্র	১০ বছর
৭.	সুলতানা কামাল- কামালের স্ত্রী	২২ বছর
৮.	রোজি- জামালের স্ত্রী	১৮ বছর
৯.	আব্দুর রব সেরনিয়াবাত- মন্ত্রী, ভগ্নিপতি	৫৪ বছর
১০.	শেখ ফজলুল হক মনি- ভাগ্নে	৩৬ বছর
১১.	আরজু মনি- শেখ মনির স্ত্রী	২৬ বছর
১২.	নূরুন্নেসা বেবী- সেরনিয়াবাতের কন্যা	১৩ বছর
১৩.	আরিফ- সেরনিয়াবাতের পুত্র	১২ বছর
১৪.	কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমদ	৪২ বছর
১৫.	সুকান্ত বাবু- সেরনিয়াবাত- নাতি	৫ বছর
১৬.	শহীদ- সেরনিয়াবাত- ভ্রাতুষ্পুত্র	৩৫ বছর
১৭.	আবু নঈম রেন্টু- আত্মীয়	২০ বছর

আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের স্ত্রী আমেনা বেগম এবং তার পুত্র হাসানাত আব্দুল্লাহর স্ত্রী সাহানারা বেগম, কন্যা হামিদুন্নেসা বিউটি এবং পুত্র আবুল খায়ের আব্দুল্লাহকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে। তাঁদের আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। চিকিৎসার পর তারা বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধু

৮. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতীত সকল নিহতকে ঢাকার বনানী কবরস্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গোসল ও জানাজা ব্যতীত ১৬ আগস্ট রাতে কবর দেয়া হয়।[৯]

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ ১৫ আগস্ট সকাল থেকে ১৬ আগস্ট ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল। খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল জিয়া সেনাপ্রধান হলেন; কিন্তু তারা বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহের যত্ন বা কবর দেয়ার ব্যাপারে চরম অশ্রদ্ধা দেখান। খুনীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বঙ্গবন্ধুকে টুঙ্গিপাড়ায় কবর দেয়া হবে। ঢাকায় তাঁকে কবর দিতে খুনীরা ভয় পেল। কারণ বঙ্গবন্ধুর কবরকে কেন্দ্র করে খুনীদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ হতে পারে।[১০] ১৬ আগস্ট বিকেলে দুজন মেজর বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ হেলিকপ্টারে টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যায়। তাঁকে গোসল ও জানাজার জন্য অল্প সময় দেয়া হয়। কাপড় কাচার সাবান দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গোসল ও রেডক্রসের কাপড় পরানো হয়। ভয়ে লোকজন পালিয়ে যায়। মাত্র কয়েকজন লোক জানাজায় অংশ নেয়। বঙ্গবন্ধুর শরীরে ২৯টি ক্ষত ছিল। বুকে ২৪টি গুলির আঘাত এবং একটি বুলেট পিছন দিয়ে ঢুকে বের হয়ে যায়।[১১]

১৫ আগস্টের ঘটনা সমগ্র জাতিকে আঘাত করেছে। জাতির ইতিহাসের ধারাকে ব্যাহত করেছে। এ ঘটনা ব্যক্তি বিশেষের অথবা একটি পরিবারের করুণ পরিণতি নয়- এ ছিল একটি জাতিকে;

---

৯. Ibid, P. 104

১০. আশরাফ হোসেন, *বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : উত্তরণ, ২০১৪, পৃ. ৩২৫

১১. বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারী

১. লেঃ কর্নেল (বরখাস্ত) সৈয়দ ফারুকুর রহমান
২. লেঃ কর্নেল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) খন্দকার আব্দুর রশীদ
৩. লেঃ কর্নেল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শাহরিয়ার রশীদ খান
৪. তাহেরউদ্দিন ঠাকুর (প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী)
৫. মেজর (অব) বজলুল হুদা
৬. লেঃ কর্নেল (অব) একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ
৭. লেঃ কর্নেল (অব) এসএইচএসবি নূর চৌধুরী
৮. লেঃ কর্নেল (অব) মহিউদ্দীন আহমেদ
৯. লেঃ কর্নেল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শরিফুল হক ডালিম
১০. লেঃ কর্নেল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) এ এস রাশেদ চৌধুরী
১১. লেঃ কর্নেল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) আবদুল আজিজ পাশা
১২. ক্যাপ্টেন অনারারি (অব) আব্দুল ওহাব জোয়ারদার
১৩. রিসালাদার মোসলেমউদ্দিন
১৪. মেজর (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) আহমদ শরফুল হাসান
১৫. ক্যাপ্টেন (অব) লিসমত হাশেম
১৬. ক্যাপ্টেন অনারারি (অব) নাজমুল হোসেন আনসারী
১৭. ক্যাপ্টেন (অব) আব্দুল মাজেদ
১৮. দফাদার মারফত আলী শাহ
১৯. এ্যাসিস্ট্যান্ট ল্যান্স দফাদার আবুল হাশেম মৃধা
২০. খন্দকার মোশতাক আহমেদ
২১. মাহবুবুল আলম চাষী
২২. রিসালদার সৈয়দ সারওয়ার হোসেন
২৩. ক্যাপ্টেন এম মোস্তফা আহমেদ

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে হত্যার ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যার কাহিনী সমগ্র বিশ্বের বিবেককে আহত করেছে। তাই তার প্রতি সকল জাতির মমত্ববোধ গভীর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গবন্ধুর খুনীদের কোন শাস্তি না দিয়ে জেনারেল জিয়া তাদের পুরস্কৃত করেছেন এবং বিভিন্ন দূতাবাসে তাদের চাকরি প্রদান করেন। খন্দকার মোশতাক এক আদেশ জারি করেন যে, ১৫ আগস্টের ঘটনার অভিযোগে তাদের অভিযুক্ত ও শাস্তি দেয়া যাবে না। খন্দকার মোশতাকের এ আদেশ ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘন। মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত করে খুনীদের সর্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করে হত্যার ২১ বছর পর্যন্ত খুনীদের কোন বিচার করা হয়নি। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাচনে জয় লাভ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহন করার পরে খুনীদের বিচারের ব্যবস্থা করেন। বিচারে খুনীদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে।[১২]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার

১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুস্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামির আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ ১৬ জনকে ঘাতকরা হত্যা করে।[১৩]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার।

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে জাতির জনকের আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়।[১৪] পরবর্তীতে সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করে। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ

---

১২. বিস্তারিত দ্র. : আশরাফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়। ১২ নভেম্বর ১৯৯৬ জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। ১ মার্চ ১৯৯৭ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। ৮ নভেম্বর ১৯৯৮ জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ১৪ নভেম্বর ২০০০ সালে হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে দুই বিচারক বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক দ্বিমতে বিভক্ত রায় ঘোষণা করেন। এরপর তৃতীয় বিচারপতি মোঃ ফজরুল করিম ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। এরপর পাঁচজন আসামি আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে। ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০০৭ সালের শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পর ১৯ নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণায় আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহার রাখেন। ২০১০ সালের ২ জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিন দিন শুনানি শেষে ২৭ জানুয়ারি চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করেন। এদিনই মধ্যরাতের পর ২৮ জানুয়ারি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঘাতকদের একজন বিদেশে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে এবং ছয়জন বিদেশে পলাতক রয়েছে।[১৫]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলার রায়

মুজিব হত্যার প্রায় ২১ বছর পর রুজুকৃত এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ মামলার ঘটনা সম্পর্কে তদন্তপূর্বক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারা মোতাবেক ঢাকার জেলা ও দায়রা জজের আদালতে বর্তমানে মৃত খন্দকার মোস্তাক আহমদ, মাহবুবুল আলম চাষী, ক্যাপ্টেন মোস্তফা ও রিসালদার সৈয়দ সারোয়ার হোসেনসহ উপস্থিত (১) লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, (২) লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, (৩) লে. কর্নেল মহিউদ্দিন (আর্টিলারি), (৪) অনারারি ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব জোয়ারদার, (৫) তাহেরউদ্দিন ঠাকুর (প্রাক্তন তথ্য প্রতিমন্ত্রী), (৬) জোবায়দা রশিদ এবং (৭) পলাতক লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশিদ, (৮) পলাতক মেজর বজলুল হুদা, (৯) পলাতক লে. কর্নেল এ এইচ এম বি নূর চৌধুরী, (১০) পলাতক লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, (১১) পলাতক লে. কর্নেল মোঃ আজিজ পাশা, (১২) পলাতক লে. কর্নেল এম এ রাশেদ চৌধুরী, (১৩) পলাতক মেজর এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার), (১৪) পলাতক রিসালদার মোসলেহউদ্দিন ওরফে মোসলেমউদ্দিন, (১৫) পলাতক মেজর আহমেদ শরিফুল হোসেন, (১৬) পলাতক ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হাসেম, (১৭) পলাতক ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন, (১৮) পলাতক ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ, (১৯) পলাতক দফাদার মারফত আলী শাহ ও (২০) পলাতক এলডি আবুল হাশেম মৃধার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০বি/৩০২/১৪৯/৩২৪/৩০৭/২০১/৩৮০

---

১৫. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, *এলবাম জাতির জনক*, ৩য় প্রকাশ, ১৭ মার্চ, ২০১০ থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

/২১০/ ধারার অপরাধের অভিযোগপত্র/চার্জশিট দাখিল করে জীবিতদের বিচারের জন্য সোপর্দ করে।[১৬]

আদালত প্রসিকিউশনসহ সকল আসামিপক্ষের বিস্তারিত বক্তব্য শ্রবণ ও মামলার নথিভুক্ত কাগজপত্র/তথ্যাবলি ১৯৯৭ সালের ৭ই এপ্রিল ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫(ঘ) ধারা মোতাবেক জীবিত ২০ জন আসামির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০বি/৩০২/৩৪/২০১ ধারার অপরাধের ৩ দফাবিশিষ্ট অভিযোগ বা চার্জ গঠন করা হয়।

আসামি জোবায়দা রশিদ রিভিশন মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

অতঃপর এই মামলার অবশিষ্ট ১৯ জন আসামির বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণের পর ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বরে প্রদত্ত রায়ে বলা হয়ঃ

> "এই মামলায় প্রাপ্ত মৌখিক, দালিলিক, তথ্যগত, অবস্থানগত, সাক্ষ্য ও আলামত পরীক্ষা/পর্যালোচনা ও বিচার বিশে- ষণে আদালত এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীতি হয় যে, এই মামলায় আসমি (১) লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, (২) লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, (৩) লে. কর্নেল মহিউদ্দিন (আর্টিলারি), (৪) পলাতক লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশিদ, (৫) পলাতক মেজর বজলুল হুদা, (৬) পলাতক লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, (৭) মেজর শরিফুল হোসেন ওরফে শরফুল হোসেন, (৮) পলাতক লে. কর্নেল এম এ রাশেদ চৌধুরী, (৯) লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার), (১০) পলাতক লে. কর্নেল এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, (১১) পলাতক লে. কর্নেল মোঃ আজিজ পাশা, (১২) ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হাসেম, (১৩) ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, (১৪) ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ, (১৫) রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ওরফে মোসলেহউদ্দিন প্রমুখ ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট অনুমান ভোর ৫টার সময় ধানমন্ডি অবস্থিত নিজ ৬৭৭ নম্বর বাসভবনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু, তাহার পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যকে ষড়যন্ত্র ও পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক গুলি করিয়া হত্যা করার অপরাধে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪ এবং দণ্ডবিধি ১২০-ক ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাদের কৃত অপরাধের জন্য তাহাদের প্রত্যেককে দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪ ধারার মতে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত হইল। তাহাদেরকে উক্ত চরম দণ্ড প্রদানের পর ১২০-ক ধারার অভিযোগে কোন শাস্তি প্রদান করা হইল না।
>
> "আসামি (১) তাহের উদ্দিন ঠাকুর, (২) আনারারি ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব জোয়ারদার, (৩) দফাদার মারফত আলী ও (৪) এলডি আবুল হাশেম মৃধার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এই মামলায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই বিধায় তাহাদিগকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হইল।

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

"এই মামলায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আসামি (১) লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, (২) লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, (৩) লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদ (আর্টিলারি), (৪) পলাতক আসামি লে. কর্নেল আবদুর রশিদ, (৫) পলাতক মেজর বজলুল হুদা, (৬) পলাতক লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, (৭) মেজর শরিফুল হোসেন ওরফে শরফুল হোসেন, (৮) লে. কর্নেল এম এ রাশেদ চৌদুরী, (৯) লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার), (১০) লে. কর্নেল এস. এইচ. এম. বি. নূর চৌধুরী, (১১) লে. কর্নেল আব্দুল আজিজ পাশা, (১২) ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হাশেম, (১৩) ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, (১৪) ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ, (১৫) রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ওরফে মোসলেহউদ্দিনকে দন্ডবিধি ৩০২/৩৪ ধারার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হইল। একটি ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রকাশ্যে তাহাদের প্রত্যেকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ রইল।

"নির্দেশ মোতাবেক তাহাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করিতে কর্তৃপক্ষের কোন অসুবিধার কারণ থাকিলে প্রচলিত নিয়মানুসারে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ রহিল।

কাজী গোলম রসূল
জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা।"[১৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যাকাণ্ড

হত্যা শব্দটিকে আরবীতে কতল বলা হয়। "কোন কিছুর আঘাতে, অস্ত্রের সাহায্যে, পাথর নিক্ষেপে, বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের প্রাণনাশকে কতল বা হত্যা বলা হয়।"[১৮] অথবা "মানবদেহ হতে প্রাণের সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেওয়ার কাজকে কতল (হত্যা) বলে।"[১৯]

হত্যা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– "যে ব্যক্তি প্রাণ হত্যা করল কোন প্রাণ হত্যার বদলা ও পৃথিবী পৃষ্ঠের ফাসাদ করা ছাড়াই, তখন সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি একটি প্রাণ বাঁচালো সে যেন সকল মানুষকে জীবিত রাখলো।"[২০]

শিরকের অমার্জনীয় অপরাধের পর ইসলামে মানব হত্যা সর্বাধিক মারাত্মক অপরাধ। হত্যা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন-

১. কতলে আমদ,
২. কতলে শিবহি আমদ,
৩. কতলে খাতা,
৪. কতলে জারী মাজরায়ে খাতা ও
৫. কতলে বিততাসাব্বুব।[২১]

---

১৭. আব্দুল রহিম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের পর,* ঢাকা : জাডিক্যাল এশিয়া পাবলিশেনস, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৩-১৮৫
১৮. আবুল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন মুকরিম (ইবন মানযূর), *লিসানুল আরব*, খ. ৫, কায়রো : দারুল মা'আরেফ, ১৯৭৮, পৃ. ৩২৮
১৯. মুহাম্মদ ওয়েয যাদাহ আল-খুরাসানী, *আল-মুজামুল ফি লুগাতিল কুরআন ওয়া সিররি বালাগাতিহি,* মাশহাদ (ইরান): মাজমাআতুল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫৭
২০. *আল-কুরআন*, ৫ : ৩২
২১. *আল-মুজামুল ফি লুগাতিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত ৫ প্রকার হত্যার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করা ইসলামের দৃষ্টিতে 'কতলে আমদ'-এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। আর 'কতলে আমদ' বলতে বুঝায় ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাকে, "কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হত্যার উদ্দেশ্যে কেউ এমন কার্য করে যার দ্বারা সেই ব্যক্তির প্রাণনাশ হয় তখন তার সেই কার্যকে কতলে আমদ বলে।"[২২] এবং এর জন্য কিসাস বাধ্যতামূলক হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে অস্ত্র বা অনুরূপ কিছুর সাহায্যে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে হত্যাকাণ্ড ঘটালে হত্যাকারীর কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াও কতলে আমদ সংঘটিত হতে পারে। যেমন– 'পানিতে ডুবিয়ে, শ্বাসরুদ্ধ করে, বিষ পান করিয়ে বা উচ্চস্থান হতে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হলে তাও কতলে আমদ হিসেবে গণ্য হবে।'[২৩] এবং কিসাস বাধ্যতামূলক হবে। নিম্নোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে কিসাস বাধ্যতামূলক হয়। এর কোন একটার অবর্তমানে কিসাস রহিত হয়ে যায়:

ক. হত্যাকারী বালেগ (বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন) এবং স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও সরাসরি হত্যাকাণ্ড ঘটালে।

খ. নিহত ব্যক্তি হত্যকারীর অংশ নয়, অংশ বলতে পিতা, মাতা ও তাদের ঊর্ধ্বতনগণকে বুঝায় এবং নিহত ব্যক্তি মাসুদুদদাম। মাসুদুদদাম বলতে সে যেই রাষ্ট্রে নিহত হয়েছে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক অথবা নিরাপত্তা লাভকারী।

গ. নিহতের ওয়ারিসগণকে কিসাসের দাবিদার হতে হবে। হত্যাকারী বালেগ, বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন হলেই তার উপর কিসাস কার্যকর করা যাবে। নাবালেগ বা মস্তিষ্ক বিকৃত হলে তার উপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না। যে স্বেচ্ছায় ও সরাসরি হত্যা করেছে এবং যাকে হত্যা করা লক্ষ্য ছিল তাকেই হত্যা করেছে। এ রকম হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে।[২৪]

নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর অংশ অর্থাৎ পুত্র বা কন্যা নয়। কারণ পুত্র বা কন্যার হত্যার জান্তা পিতা বা মাতা হলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু তাযীরের আওতায় হত্যাকারী শাস্তিযোগ্য হতে হবে অর্থাৎ "সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী অথবা নিরাপত্তা লাভকারী হতে হবে। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ কিসাসের দাবি না করলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে।"[২৫]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআনে হত্যার বিচারের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে ১৯৭৫-এর পনেরোই আগস্ট ভোরে ঘাতক হায়নার হাত থেকে নিষ্পাপ শিশুরাও সেদিন রেহাই পায়নি।

---

২২. ড. ওয়াহাব বিন মুস্তফা আয-যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু*, দামেস্ক : দারুল ফিকর, ২০১১, খ. ৬, পৃ. ২২১

২৩. আবু বকর ইবনুল আরাবী আল-মালিকী, *আহকামুল কুরআন*, বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪হি., ২০০৩খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৯৯

২৪. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

২৫. *আহকামুল কুরআন*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯-৩০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘাতকদের নিকট বার বার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল বঙ্গবন্ধু সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ১০ বছরের নিষ্পাপ শিশু রাসেল। রাসেলের চিৎকারে সেদিন আল্লাহর আরশও কেঁপে উঠেছিল; কিন্তু ঘাতকদের হাত সেদিন কাঁপেনি। আর তাইতো তাদের বুলেটে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল শিশু রাসেলের নরম শরীর।[২৬]

কিন্তু কেন এই হত্যা? যাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, যিনি জন্মের পর থেকে বাঙালির জন্য সংগ্রাম করেছেন, বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বের দরবারে, কেন তাকে এমন নির্মমভাবে স্ব-পরিবারে প্রাণ দিতে হল? আমরা জানি:

– যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারি করেছিলেন।

– প্রাথমিক শিক্ষকদের চাল-ডালসহ পূর্ণাঙ্গ রেশন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

– পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পোশাক প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

– বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ঘোষণা দিয়েছিলেন।

– স্বাধীনতা পরবর্তী ৪৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ১৫ হাজার নতুন বিদ্যালয় সরকারিকরণ করেছিলেন।

---

২৬. ১৯৭৫-এর মর্মান্তিক ঘটনায় সেদিন যারা শাহাদত বরণ করেছেন তারা হলেন–
১. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
২. বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।
৩. বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামাল।
৪. বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল।
৫. বঙ্গবন্ধুর দশ বছরের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল।
৬. শেখ কামালের নব বিবাহিতা পত্নী সুলতানা কামাল খুকি।
৭. শেখ জামালের নব বিবাহিত স্ত্রী রোজী জামাল।
৮. বঙ্গবন্ধুর একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসের।
৯. বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী সভার সদস্য আব্দুর রব সেরনিয়াবত।
১০. বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি।
১১. জনাব সেরনিয়াবতের তের বছরের কিশোরী কন্যা বেবী।
১২. জনাব সেরনিয়াবতের চার বছরের শিশুপুত্র আরিফ।
১৩. জনাব সেরনিয়াবতের চার বছরের দৌহিত্র বাবু।
১৪. শেখ মণির স্ত্রী বেগম আরজু মণি।
১৫. কর্ণেল জামিল।
১৬. ডি.এস.পি নূরুল ইসলাম।
১৭. শহীদ সেরনিয়াবাত
১৮. আব্দুন নঈম খাঁন রিন্টু এবং
১৯. তিনজন অতিথি ও চারজন গৃহভৃত্য।

গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন বেগম আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, বিউটি সেরনিয়াবাত, বেগম শাহানারা হাসনাত আব্দুল্লাহ ও আবুল খায়ের আব্দুল্লাসহ অনেকে। [অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০, পৃ. ৯৩-৯৪]

Dhaka University Institutional Repository

- বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করেছিলেন।
- ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।
- রিক্সা শ্রমিকদের সমবায় পদ্ধতিতে অটোরিক্সা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।
- বঙ্গবন্ধু বাস্তুহারা পুনর্বাসনের জন্য টঙ্গী, মিরপুর, ভাসানটেক ও ডেমরাসহ বিভিন্ন এলাকায় খাস জমি বরাদ্দ করেছিলেন।
- ইসলাম বিরোধী কাজ বিবেচনা করে রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় বন্ধ করে ময়দানটিকে উদ্যানে পরিণত করেছিলেন। এখন এটিরই নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
- ভিক্ষাবৃত্তি ও দেহ ব্যবসা অসম্মানজনক ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী কাজ হওয়ায় বঙ্গবন্ধু ভিক্ষুক ও পতিতাদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।
- আইন করে সরকারি পর্যায়ে মদ তৈরি, বিক্রয় ও আমদানি নিষিদ্ধ করেছিলেন।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- টঙ্গীতে বিশ্ব এজতেমার জমি বরাদ্দ করেছিলেন।
- সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ পালনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।
- বেতার ও টেলিভিশনে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসীর প্রচার শুরু করেছিলেন।
- মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন।
- শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে আদালত পুনর্গঠন করেছিলেন।
- হকারদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে হকার মার্কেট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ এবং ১০০ বিঘা জমির সিলিং ধার্য করেছিলেন।
- মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ ১ কোটি লোককে পুনর্বাসন করেছিলেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ২৫০টি ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ এবং বিধ্বস্ত কল-কারখানা ও রাস্তাঘাট পুনঃনির্মাণ ও মেরামত বঙ্গবন্ধুর সময়েই হয়েছিল।
- সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধু।
- ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৭২ সালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

– দেশের উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধু যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাপান সরকারের কাছে সেতু নির্মাণের প্রস্তাব দেন এবং তখনই এর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়।

উল্লেখ্য ২৩ জুন ১৯৯৮ জাপানসহ বিভিন্ন বিদেশী সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন।[২৭] তবু ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল বাঙালির স্বপ্নপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হানাদার পাকিস্তানিরা যাকে তিন তিনবার ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিয়ে পাশে কবর খুড়েও শেষ পর্যন্ত হত্যা করতে সাহস করেনি। অথচ তার দেশের কতিপয় উচ্চাভিলাসী সামরিক বাহিনীর একটি অংশ তাঁকে হত্যা করল। যার জন্ম না হলে বাঙালিরা স্বাধীন দেশ পেত না। যিনি পাকিস্তানি শোষণের ২৩ বছরের পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়েছেন; কিন্তু বাঙালির সাথে কোনদিন বেঈমানী করেননি। তাকেই কিনা হত্যা করল তার দেশের মানুষ! কি বিচিত্র সেলুকাস এই দেশ! আর তাইতো সেদিন সমগ্র বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত হয়েছিল জাতির জনকের হত্যার সংবাদ শুনে।

জাতির জনকের হত্যায় সঙ্গতকারণেই সেদিন বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষ আশা করেছিল উক্ত বর্বর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে। কিন্তু বিশ্ববাসী সেদিন অবাক হলো যখন তারা দেখল, হত্যার বিচারতো দূরের কথা, হত্যাকারীদের হত্যার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য ১৯৭৫-এর ২৬ সেপ্টেম্বর খুনী মুশতাক চক্র জারি করল মানবতা ও ইসলাম বিরোধী কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। পরবর্তিতে এটিকে সংবিধানে স্বীকৃত-করণের চেষ্টা করা হয়। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারির পর ৩ নভেম্বর একই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৫ আগস্টের খুনীদের হাতে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মমভাবে নিহত হন জাতির জনকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী অস্থায়ী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, মন্ত্রী এম. মনসুর আলী এবং মন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান।[২৮]

অনেক দেরীতে হলেও আবহমান বাংলা ও বাঙালির প্রাণের দাবি জাতির জনকের হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধকারী মানবতাবিরোধী কুখ্যাত কালো আইন, "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" বর্তমান জাতীয় সংসদে বাতিল করা হয়েছে। অথচ প্রধান বিরোধীদল বি.এন.পি ও তার নেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক অদৃশ্য কারণে সেদিন সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন। যে কালো আইনটি বাতিলের মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ রক্তের বিনিময়ে অর্জিত জাতীয় সংসদের পবিত্রতা ফিরে এসেছে। বহির্বিশ্বে কলংকের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি অথচ সে আইনটি পাশের দিন একটি গণতান্ত্রিক দেশের জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া

২৭. আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *শেখ হাসিনার অসামান্য সাফল্য*, ঢাকা : (প্রকাশক) মোঃ আব্দুল কাদের, ১৯৯৯, পৃ. ৪৫

২৮. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুপস্থিত। অথচ যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন বিগত জাতীয় সংসদেই উক্ত কুখ্যাত "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" বাতিলের ওয়াদা করেছিলেন।[২৯] এ ব্যাপারে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু তারপরও খালেদা জিয়া তার ওয়াদা ভঙ্গ করেছিলেন এবং অজ্ঞাত কারণে সেদিন "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" বাতিল করা হয়নি। আমরা বর্তমান জাতীয় সংসদের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। যারা জাতীয় সংসদের "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" বাতিল করে বাঙালি জাতিকে কালিমা মুক্ত করেছেন। তাদের এ কালিমা মুক্ত অধ্যায়টি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ একুশটি বছর। বাংলার জমিনেই আজ বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার শুরু হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে একথাই প্রমাণিত হয় ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করে না। যদিও এদেশের মানুষের প্রাণের দাবি ছিল বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করা অথবা সামরিক আইনে ঘাতকদের বিচার করা। কারণ সেদিন সামরিক বাহিনীর কতিপয় দুস্কৃতকারী সামরিক আইন অমান্য করে, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছিল। তবু সাধারণ আইনে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করার মাধ্যমে সরকার হয়ত সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে আইনের স্বচ্ছতাকেই প্রমাণ করতে চাচ্ছে। আইনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকলেই কেবল এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। যে দলের নেতা কর্মীরা ২১টি বছর লড়াই সংগ্রাম করে শত সহস্র নেতা কর্মীর আত্মত্যাগ, লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মীর জেল, জুলুম নির্যাতন ভোগ করে ক্ষমতাসীন হয়েছে। যে দলের নেত্রী মা, বাবা, ভাই, বোন সবকিছু হারিয়ে একুশটি বছর দেশে বিদেশে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার দাবি করেছেন। সে নেত্রী এখন আজ জনগণের রায় নিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তিনি যখন আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তখন নিজেকে সংযত রেখে নিজের পিতার, জাতির জনকের হত্যার বিচার বিশেষ ট্রাইবুন্যালে না করে সাধারণ আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একমাত্র শেখ হাসিনার মতো বিশাল হৃদয়ের মানুষের পক্ষেই সম্ভব।[৩০]

বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করা ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু বৈধই নয়; বরং একান্ত কর্তব্য। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার না করা ইসলাম আইনে চরম অবমাননাকর। শুধু তাই নয়, যারা "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের" নামে হত্যার বিরুদ্ধে আইন পাশ করেছে তারা চরমভাবে ইসলামী আইনকে অগ্রাহ্য করেছে। ইসলাম এ ধরনের কোন আইন তৈরির সমর্থন করে না। মহান আল্লাহ হত্যাকাণ্ডের বিচার কি হবে তার স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ফরয যে, যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের খুনের বদলা নেবে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী।"[৩১]

---

২৯. *প্রাগুক্ত*

৩০. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৮*

৩১. *আল-কুরআন*, ২ : ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি তাওরাতের মধ্যে তাদের উপর বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম।"[৩২]

অন্যদিকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণই কিসাসের অধিকারী, অন্য কেউ নয়। ওয়ারিসগণ কিসাসের দাবি করলে তা কার্যকর হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত বলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি এর প্রতিশোধের অধিকার দিয়েছি; অতঃপর এ ব্যাপারে সে যেন সীমাতিক্রম না করে, অবশ্যই সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে।"[৩৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড কুরআনের দৃষ্টিতে 'কতলে আমদের' সংজ্ঞাভুক্ত। কতলে আমদের ন্যূনতম বিচার মৃত্যুদণ্ড।

---

৩২. *আল-কুরআন*, ৫ : ৪৫

৩৩. *আল-কুরআন*, ১৭ : ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের পরিচিতি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিটার বা ৫৬৯৭৬ বর্গমাইল। বাংলাদেশ নদী বিধৌত এক দেশ। দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয় উপ-মহাদেশে অবস্থিত তিন দিক ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দেশ। আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর ৯৩তম দেশ।[১]

ভৌগোলিক অবস্থান

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ ২০°-৩৪′ থেকে ২৬°-৩৮′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮°-০১′ থেকে ৯২°-৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি ও আসাম, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ দিকের বঙ্গোপসাগর বাদ দিলে বাংলাদেশের অপর তিনটি প্রান্ত ভারতের নানা রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ, আসাম, উত্তর পূর্বের কোণ ঘেষে রয়েছে মায়ানমারের কিয়াদংশ।[২]

সীমানা

আজকের বাংলাদেশের সীমানা বলতে আমরা যা বুঝি, প্রাচীন যুগে সে সব এলাকা, বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। মোটামুটিভাবে প্রাচীন বাংলার সীমানা এভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে ঃ

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈল শ্রেণী এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ। এ চতুর্সীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই সাধারণত প্রাচীন বাংলা নামে পরিচিত।[৩] স্বাধীনতাত্তোর কালে এর সীমানায় তিন দিকেই ভারত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার (বার্মা), পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।

আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার বয়স খুব বেশী না হলেও এর অতীত ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। সেজন্য বাংলাদেশ নামটি কখনও পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ, কখনও বাংলা কখনও পাকিস্তান (পূর্ব) ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে।[৪] তাই প্রায় আড়াইশত বছরের অতীত ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়,

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০, পৃ. ১৫
২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৯
৩. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১১১
৪. আব্দুল্লাহ আল মুতি, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬, পৃ. ২৭

নানা সংঘাত, বিবর্তন, উত্থান পতনের বেড়াজাল পেরিয়ে এদেশের আয়তন ও সীমা বার বার বদলেছে। এক সময় বাংলাদেশ বিহার উড়িষ্যা আসাম আর পশ্চিম বাংলা জুড়ে অবস্থিত ছিল।

১৯৪৭ খৃ. ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র দেশের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তান তৎকালীন পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ ছিল, যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। যদিও পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার। তবুও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা এতদূর থেকে এদেশটিকে শাসন করত (১৯৪৭-১৯৭১ খৃ.)। ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানে বাংলাদেশের সীমান্তরেখা স্থলভাগ ও সমুদ্র উপকূলসহ মোট ৩১৬১ মাইল। এর মধ্যে ভারতের সাথে এই সুদীর্ঘ সীমান্তের অধিকাংশই নদী বা পর্বতের দ্বারা বেষ্টিত হলেও প্রকৃত সীমান্ত রেখার বেশীর ভাগ অংশ কোন প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা চিহ্নিত নয়।[৫]

ভূপ্রকৃতি অনুসারে এদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক. পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল;
খ. উপকূলীয় অঞ্চল ও
গ. নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল।

ক. পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল

ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়, সিলেটের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়, চট্টগ্রামের হুমাই,ত পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরো পাহাড়িয়া অঞ্চল (বাংলাদেশের একদশমাংশ) সহ অন্যান্য পাহাড়িয়া অঞ্চলকে বুঝানো হয়।[৬]

খ. উপকূলীয় অঞ্চল

বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা নিয়ে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চল বুঝানো হয়। দেশের সীমান্তে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত বিধায় তীরবর্তী সকল জেলাই হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল। ছোট বড় অনেকগুলো দ্বীপ এ অঞ্চলেই অবস্থিত। ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, বোয়ালখালী, মহেশখালী, নিঝুম দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমাহার ও অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য সুখ ও দুঃখের লীলাভূমি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।[৭]

গ. নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল

দেশের উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলোর অধিকাংশ স্থান জুড়ে এ সমভূমি অবস্থিত। হিমালয় পর্বতমালা হতে নদীবাহিত পলল দ্বারাই এ অঞ্চল গঠিত। তিস্তা আত্রাই করতোয়া প্রভৃতি নদীবাহিত পলি

৫. বিস্তারতি দ্র : মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ. ২২-৩১

৬. মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

৭. *প্রাগুক্ত*

জমা হয়ে এ ঢালু ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে এ অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার (১০০ ফুট)। বর্ষাকালে এর সামান্য অংশ পানিতে প- াবিত হয়।

এছাড়া বাংলাদেশের ভূমিকে প্রকৃতগতভাবে আরও কয়েকটি ভাগ করা যায়। যেমন, প- াবন সমভূমি, বদ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমি, সক্রিয় বদ্বীপ, মৃতপ্রায় বদ্বীপ, স্রোতজ সমভূমি ইত্যাদি।

এসব অঞ্চল সমূহের মধ্যে বনাঞ্চলের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার একর। যা মোট ভূমির শতকরা ১৬.১২ ভাগের সমান। সুন্দরবন বাংলাদেশের বড় বনাঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও অন্যান্য জেলায়ও অনুরূপ বনাঞ্চল রয়েছে।[৮]

জনসংখ্যা

বাংলাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে পনের কোটি। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান, শতকরা ১৫ ভাগ হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনবসতিপূর্ণ দেশ। রাষ্ট্রীয় ভাষা 'বাংলা'। অধিবাসীদের অধিকাংশ কৃষিনির্ভর। সে অনুযায়ী অর্থনীতির মেরুদন্ড হচ্ছে কৃষি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটার ৭৫৫ জন। মাথাপিছু আয় ১০৪৪ মার্কিন ডলার। মুসলিমে বিশ্বে জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় মুসলিম রাষ্ট্র। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশী। ১৯৬১ খৃ. থেকে ১৯৭৪ এদেশে ২.৭০% হারে ১৯৭৪ খৃ. থেকে ১৯৮৪ খৃ. পর্যন্ত বার্ষিক ২.৩১ জন। তবে ১৯৯১ খৃ. বৃদ্ধির হার ২.০৬%।[৯] আর ২০১২ খৃ. বিশ্ব জনসংখ্যা রির্পোট ১.৩%।

প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশে ৭টি বিভাগ রয়েছে। বিভাগগুলো হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট রংপুর ও বরিশাল। ৬৪টি জেলা, ৪৮৮টি উপজেলা, ৫০৩টি থানা রয়েছে। ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৯৪৮, পৌরসভার সংখ্যা ১৯৫টি। বাংলাদেশের মোট গ্রামের সংখ্যা ৮৬০৩৮টি।[১০]

জলবায়ু

বাংলাদেশের গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল ঠান্ডা ও শুষ্ক। এখানকার জলবায়ু পুরোপুরি মৌসুমী। এদেশে ছয়টি ঋতু আছে। ঋতুগুলো হচ্ছে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ– ২৫৪ সেন্টিমিটার (বর্ষাকাল) অন্যান্য ঋতুতে– ২০৩ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। স্থলভূমির শতকরা ২০ ভাগ নদী। ভারতের অধিকাংশ নদী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি প্রবাহের মূল উৎসস্থল ভারতে। ভারত থেকে প্রবাহিত নদীগুলো বাংলাদেশে প্রবেশের পর নানা নামে নামকরণ

---

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৯. *বিশ্ব জনসংখ্যা রির্পোট ২০১২ জাতিসংঘ জনসংখ্যা বিভাগ* (ইউএনএফপিএ) ও বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো, *আদমশুমারী রিপোর্ট*, ১৯৯১

১০. মাহবুবুর রহমান মোরশেদ, *বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮৬, পৃ. ৭৮

করা হয়েছে। দক্ষিণের সাগরাভিমুখে প্রবাহিত বড় নদীগুলো হচ্ছে– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী। এছাড়া আরও অনেক নদী বিভিন্ন নামে প্রবাহমান আছে। ব্রহ্মপুত্র নদী ভারত থেকে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করতে ১০০০ হাজার মাইল অতিক্রম করতে হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে নদ-নদীর পরিমাণ বেশী। দেশে মোট ২৩০ ছোট বড় নদ-নদী রয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. লাল মাটিতে গঠিত প্রাচীন ভূমি;
২. পলি মাটিতে গঠিত মোটামুটি প্রাচীন ভূমি
৩. পলি মাটিতে গঠিত নিম্নভূমি।[১১]

শিক্ষা

বর্তমানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে গড় শিক্ষার হার ৬৮.০১% বয়স্ক শিক্ষার হার ৫৬%।[১২] বাংলাদেশে শিক্ষা একটি সংবিধান স্বীকৃত ব্যবস্থা। শিক্ষা সম্পর্কে সংবিধানের বর্ণিত ধারাটি নিম্নরূপঃ

ক. একই পদ্ধতির গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা করিবেন।

খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা থাকিবে।

গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[১৩]

নামকরণ

মোঘল সম্রাট আকবরের সভাসদ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল ফজল তার আইনে আকবরী গ্রন্থে বাংলা নামটির উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, বঙ্গ নামটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই চালু ছিল। এই বঙ্গ শব্দের সঙ্গে ‘আল’ বা চিহ্ন যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা হয়েছে। ‘আল’ দ্বারা কৃষিক্ষেত্রের ‘আল’ বা চিহ্নকে বুঝানো হয়েছে। কিংবা ‘আল’ দ্বারা বাঁধকেও বুঝানো হয়। অর্থাৎ সমতল ভূমি ও পাহাড়ি এলাকার সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষি নির্ভর ভূমির দেশ হওয়ার কারণে এই ‘আল’ শব্দাংশকে ‘বঙ্গ’ এর সঙ্গে মিলিয়ে বাঙ্গালা নামকরণ করা হয়েছে।[১৪]

---

১১. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের পত্নসম্পদ*, ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৮
১২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *Statistical Year Book-2002*, ঢাকা : পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৩, পৃ. ২৩১
১৩. *বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ- ১৭
১৪. ড. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

সেমিটিক ভাষায় আল শব্দের অর্থ আওলাদ বা সন্তান সন্ততি বা বংশধর। এ অর্থে (বা+আল) বাঙ্গাল বা বঙল অর্থাৎ বং এর আওলাদ বা বংশধর। শব্দের উৎপত্তিটাকেও হিসাবে আনা দরকার। রিয়াদুস সালাতিন, গ্রন্থ প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসায়েন সলীম তাঁর গ্রন্থে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিহাসে এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন। হযরত নুহ (আ.) এর সাথে তাঁর অনুসারী মুষ্টিমেয় মুসলমানরা রক্ষা পেয়ে যান। পরবর্তী কালে তাদের সাহায্যেই পুনরায় দুনিয়ার বুকে মনুষ্য বসতি স্থাপনে মনস্থ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রদের দিকে দিকে প্রেরণ করতে থাকেন। হামের প্রথম পুত্র 'হিন্দ', দ্বিতীয় জনের নাম 'সিন্দ', তৃতীয় জনের নাম 'হাবাস', চতুর্থ জনের নাম 'জানায', পঞ্চম জনের নাম বার্বার এবং ষষ্ঠ জনের নাম 'নিউবাহ'। যে সকল এলাকায় তারা জনবসতি স্থাপন করেন তাঁদের স্ব স্ব নামানুসারেই সে সব অঞ্চলের নামকরণ করা হয়।

হিন্দের জৈষ্ঠ পুত্র ছিল 'পূরব'। তার বিয়াল্লিশ জন পুত্র সন্তান ছিল। অল্প কালের মধ্যে এদের বংশ বৃদ্ধি পায় ও তারা বিভিন্ন দেশে বসতি গড়ে তোলেন। যখন তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে যায় তখন তাঁরা সমগ্র এলাকা পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নিযুক্ত করেন। হিন্দের পুত্র 'বং' (বঙ্গ) এর সন্তানেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। এই সূত্র ধরে 'বং' এর সঙ্গে আল্ যুক্ত করে বঙ্গাল বা বাঙালা শব্দটার উৎপত্তির বিষয়টি বাদ দেয়া যায় না। বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বা এর পূর্ব থেকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দেশটির অবস্থান ছিল সমুদ্রের নিকটবর্তী। হতে পারে এ দেশের অধিবাসী বঙ্গ এর যথার্থ আওলাদ বা বংশধর হওয়ার দাবীদার ছিল।[১৫]

'বঙ্গ' বা বং এর সাথে 'আল' কেন যুক্ত করা হলো, এর অন্য একটি চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় 'আল' অর্থ বাঁধ। বন্যার পানি যাতে বাগানে বা আবাদী জমিতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জমির চারদিকে 'আল' বা বাঁধ দেওয়া হতো। প্রাচীনকালে বাংলার প্রধানেরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে দশ হাত উচু ও কুড়ি হাত চওড়া স্তুপ তৈরী করে তার উপর বাড়ী নির্মাণ ও চাষাবাদ করতেন। লোকেরা এগুলোকে বলতো 'বাঙ্গালা'। সেজন্য প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশের লীলাভূমির কারণেই বাংলা নামকরণের যথার্থতা নির্ধারণ করা যায়।[১৬]

স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে, আমাদেরকে প্রথমেই ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের ইতিহাসকে সামনে আনতে হয়। পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম লাভ করার পেছনে মূল কারণ ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ। হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠির জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াই মুসলিম জনসাধারণ অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পাকিস্তান স্বাধীনতা

---

১৫. আব্দুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

১৬. গোলাম হোসাইন সলিম, *রিয়াদুস সালাতিন (অনুদিত)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ. ৫০-৫১

লাভ করে। ১৯৪০ খৃ. 'দুই জাতি মতবাদের' উপর ভিত্তি করে ঐ সনের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের অধিবেশনে এক প্রস্তাব পাশ করা হয়, যা লাহোর প্রস্তাব হিসেবে খ্যাত। তারই রূপরেখায় অনেক আন্দোলনের পর ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। বলা যায়, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও তৎকালীন নেতৃবৃন্দের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপে বিনা রক্তপাতে বিনা যুদ্ধে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র তার মানচিত্র নিয়ে বিশ্ব পরিবারে স্থান করে নেয়।[১৭]

পাকিস্তানের শাসকবর্গ দু'টি ভিন্ন প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একই নজরে দেখতে ব্যর্থ হওয়ার ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানের ভূখন্ডটির স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন করতে এদেশের মানুষ বাধ্য হয়।[১৮] শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক শ্রেণী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা, কৃষ্টি, কালচার সকল দিক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে বিমাতা সুলভ আচরণের ফলে ১৯৫২ খৃ. প্রথমে এদেশের আপামর মানুষ বিশেষ করে ছাত্র জনতা দ্বারা ভাষা আন্দোলন নামে একটি 'রাষ্ট্র ভাষা' আন্দোলন বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার দাবীতে দানা বেঁধে উঠে। কেননা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ভাষা উর্দূ ঘোষণা করেন এবং তিনি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গণ্য করতে সরাসরি অস্বীকার করেন।[১৯] ফলে ১৯৫২ খৃ. ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনে শরীক হয়ে সালাম, বরকত, রফিক প্রমুখ ছাত্রগণ মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার মহান ত্যাগ স্বীকার করে শাহাদাৎ বরণ করেন। যদিও
পাকিস্তানী শাসকবর্গ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়, তথাপিও এদেশের মানুষের মধ্যে ভাষার মত অপরাপর বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের চেতনা ক্রমেই বিকশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের সব স্তরের জনসাধারণ ১৯৭০ খৃ. এক সাধারণ নির্বাচনের রায়ে এ অঞ্চলের স্বাধীনতার পক্ষে আগাম পরোক্ষ সমর্থন প্রকাশ করে।

পাকিস্তানী শাসকরা একে অস্ত্রের ভাষায় মোকাবিলা করতে চাইলে বাংলার দামাল ছেলেরা নয় মাস সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠিকে পরাজিত করে। অবশেষে ১৯৭১ খৃ. ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে পৃথক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ভৌগোলিক অবকাঠামো এবং মানচিত্র নিয়ে বিশ্বের দরবারে স্বাধীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তান নামক যে ভূখন্ডটি ১৯৪৭ খৃ. সালের পাক-ভারত বিভক্তিতে চিহ্নিত হয়, তাই ১৯৭১ খৃ. ৩০ লক্ষ শহীদানের রক্তের বিনিময়ে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, অসংখ্য মা বোনের ত্যাগের বিনিময়ে 'বাংলাদেশ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা লাভ করি গর্বের বাংলাদেশ, আমরা লাভ করি প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ১৯৭২ খৃ. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়।

---

১৭. সুব্রত বড়ুয়া, *আমাদের বাংলাদেশ*, ঢাকা : আহমেদ পাবলিশার্স হাউজ, ১৯৯০, পৃ. ২৮

১৮. মোঃ জাকারিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

১৯. আব্দুল মোমিন চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন্ পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন্ মনোনীত করিলাম।"[২০] মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান অনুমোদন করেছেন তা-ই ইসলাম। আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলামই গ্রহণযোগ্য দীন[২১] এবং অন্য কোন দীন বা জীবন বিধান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[২২] কিন্তু যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে। শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতার ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল লক্ষ্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব জাতির সর্বস্তরে শান্তি স্থাপন করা। এই শান্তি স্থাপনের মাধ্যমেই পারলৌকিক শান্তি লাভের প্রচেষ্টাই ইসলামের মূলকথা। মহানবী (স.) মানব জাতির জন্য এই ইসলাম প্রচার করেছেন। সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী আল্লাহ্ জানেন তাঁর সৃষ্টি মানুষের মঙ্গলে সর্বকালের জন্য কোন বিধান হবে পরম কল্যাণময়। তিনি আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন স্পষ্ট প্রমাণসহ যাতে সে-আলোকে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভুল-নির্ভুল ও ন্যায়-অন্যায় পৃথক করতে পারে।[২৩] "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘনকে।"[২৪] একটি সম্পূর্ণ সংযুক্ত অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে আল্লাহ্ এ বিশ্বজগতকে সৃজন করেছেন। প্রতিটি প্রজাতি পরস্পর যুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ধর্ম ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের তাৎপর্য বহনকারী এবং সে দীনকে তাঁর ফিতরাত অনুযায়ী সাজিয়েছেন। সে জন্যই মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহার সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[২৫]

'ইসলাম'-এর শাব্দিক অর্থ শান্তি; সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ হলো ইসলাম।[২৬] অপর অর্থে শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পণে আল্লাহর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে একাত্মভাবে অনুভূতিতে সাম্যনীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত শান্তির পথে আল্লাহ ও মানবাত্মার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মানবতার উন্নয়নে সৎকাজ করা এবং মানুষের অকল্যাণ ও

২০. *আল-কুরআন*, ৫ : ৩
২১. *আল-কুরআন*, ৩ : ১৯
২২. *আল-কুরআন*, ৩ : ৮৫
২৩. *আল-কুরআন*, ৪২ : ২৭
২৪. *আল-কুরআন*, ১৬ : ৯০
২৫. *আল-কুরআন*, ৩০ : ৩০
২৬. *আল-কুরআন*, ২ : ১১২

অন্যায় থেকে বিরত থাকাই হলো মুসলমানের মূলনীতি। তাদের সম্পর্কেই আল-কুরআনে বলা হয়েছে : "হ্যাঁ, যে কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।"[২৭]

শান্তিই ইসলামের মূলকথা। এর অন্যতম মৌলিক নীতি আল্লাহর একত্ববাদ ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তির সাক্ষ্য বহন করে। ব্যাপক অর্থে ইসলামের তাৎপর্য দুটি আল্লাহর একত্ব ও মহানবী (স.)-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এভাবে একজন শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই মুসলমান এবং আর একজন আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই নিজের বাসনা ও কামনাকে বিসর্জন দিয়ে মুসলমান।[২৮]

মানবজাতির সৃষ্টির সঙ্গেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। হযরত আদম (আ.) ছিলেন এ-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নয়, হযরত আদম (আ.)-এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন তাঁদের সকলেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শেষ প্রচারক এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করে। এ-ধর্মের কোন প্রচারকের নামানুসারে এর নাম হয়নি। এর নাম হয়েছে ইসলাম।

হযরত আদম (আ.)-এর পর যত নবী-রাসূল আল্লাহর মহান বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। এ-প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন: "তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।"[২৯]

মুসলমানগণ শুধু তাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)- কে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলদের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এ-প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন : "আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।"[৩০] মুসলমানমাত্রই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-সহ সকল নবী-রাসূলকেই বিশ্বাস করেন। ইসলাম কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না; কোন ধর্মনেতাকেও অশ্রদ্ধা করে না। বিশ্বের সকল ধর্মের মহামিলন ঘটেছে এই মহান ধর্মে। বিশ্ব সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর তাকেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে; মানব সভ্যতার যা কিছু মহান তা–ই ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২৭. *আল-কুরআন*, ২ : ১১২

২৮. কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা : আলি পাবলিকেশনস, ১৯৮৭, পৃ. ১

২৯. *আল-কুরআন*, ২ : ১৩৬

৩০. *আল-কুরআন*, ৩৫ : ২৪

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো মানুষকে সবচেয়ে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করা। প্রকৃতির সব কিছুর মতো মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষকে তাই কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এবং এরূপ নিয়ম-কানুন প্রদান করাই হলো ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান করেছে এবং তার দ্বারা সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে যা মানুষকে পূর্ণতা ও মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

ইসলামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা। আল্লাহ্ বলেছেন : "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি– স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি, উহাদিগকে উত্তম রিযক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।"[৩১] এজন্যই মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা বলা হয়।[৩২] সৃষ্টির সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং স্বীয় সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা মানুষের কর্তব্য। মানুষ যদি প্রকৃতি তাড়িত হয়ে অন্য কোন শক্তির নিকট মাথা নত করে তা তার অবনতির কারণ হয় এবং আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে তা মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, মানুষ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর নিকট সাহায্য ও দয়া প্রার্থনা করবে এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ্ বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহোক ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"[৩৩] এভাবেই আল্লাহ্ নির্দেশিত পথের অনুসরণের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের তথা মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

ইসলামের তৃতীয় লক্ষ্য মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন। ইসলাম শুধু আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের কথা বলে না, পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার কথাও বলে যার মূলমন্ত্র হলো মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ। এই মূলনীতির আলোকেই মানুষ একজন অপরজনের কাছে নিরাপদ থাকবে। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করবে। কোন জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার কেউ হবে না। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে না। যুদ্ধক্ষম নয় যথা; অপ্রাপ্তবয়স্ক, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, মঠ-মন্দিরাশ্রয়ী সাধু তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ অথবা তাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা যাবে না। বিনা উস্কানিতে এককভাবে শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না। "যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চুক্তি

৩১. *আল-কুরআন*, ১৭ : ৭০
৩২. *আল-কুরআন*, ২ : ৩০
৩৩. *আল-কুরআন*, ৪ : ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ভঙ্গকারীদিগকে পছন্দ করেন না।"[৩৪] যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং যতক্ষণ তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে না দেওয়া হয়, ততক্ষণ তাকে আঘাত করা যাবে না।"[৩৫] "উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ যদি তজ্জন্য শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়।"[৩৬] যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করতে হবে।

পরিবার ও সমাজে বসবাসরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। এ সকল নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্য সমাজে শান্তি স্থাপন করা ও তা বজায় রাখা।

সুতরাং ইসলাম যেমন একদিকে স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে নির্ণয় করে অপর দিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে সৃষ্টজগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্ক সজ্ঞায়িত করে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সমগ্র জীবনকে বেষ্টন করে আছে ইসলাম। ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। মানব জীবনের প্রতিটি দিক ইসলামে মিশে গেছে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে। বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে ঐশীবাণী এলেও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআনেরর মাধ্যমেই মানব জাতির জন্য এ-জীবন বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৩৭] মানব জাতির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই কুরআন পাক থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। এ-কিতাবে কোন কিছুই অবহেলিত হয়নি। ইসলাম প্রদত্ত জীবন বিধান সর্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জীবনের অপরাপর স্তরগুলির এক অবিভাজ্য পরিপূর্ণ ও পরিকল্পিতরূপ। ইসলাম পার্থিব এবং অপার্থিব জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ইসলাম ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে। কুরআন অনুসৃত নীতিমালার বিপরীতে কোন মৌলিক আইন প্রণয়নের সুযোগ থাকে না কারো হাতে। ইসলামই সরকার, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে নৈতিক মূল্যবোধের অধীনস্থ করেছে। সাধারণ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম অখণ্ডতা, পবিত্রতা ও নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে ইসলাম শাসক ও শাসিতের বিচার সমানভাবেই করে। এমনকি রাসূল (স.)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। এভাবে ইসলাম সকল দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সুষ্ঠু সমাজ সৃষ্টি করেছে।[৩৮]

ইসলাম দেশ-কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। তাওহীদভিত্তিক ধর্ম বলে ইসলাম কখনো আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কিংবা ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। ইসলাম জীবনকে দেখেছে সার্বিক ও সর্বাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে।

---

৩৪. *আল-কুরআন,* ৮ : ৫৮

৩৫. *আল-কুরআন,* ৯ : ৬

৩৬. *আল-কুরআন,* ৮: ৭২

৩৭. *আল-কুরআন,* ৫ : ৩

৩৮. এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, *ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ, সৌদী আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন,* ঢাকা : ১৯৯১, পৃ ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইন-কানুনও প্রণীত হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এবং জগৎ ও জীবনের মৌল স্বভাবের পথনির্দেশ করে পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখ নিয়ে যাদের জীবন সেই সাধারণ মানুষকেও।[৩৯]

বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভেতরের সাথে বাইরের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। বহির্জাগতিক সমস্যাবলীও যে মানুষের আন্তর জীবন, আধ্যাত্মিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার চরিত্রে ও আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, ইসলাম সে-সম্পর্কে অবহিত।[৪০] ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা যেকোন যুগের উপযোগী, জীবনের যে কোন গতিশীল অবস্থার নীতিসমুহের বিস্ময়কর উপযোগিতা, প্রজ্ঞার আলোকের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সঙ্গতি, মনুষ্য হৃদয়ের সহজাত মৌলিক সত্যকে ঘিরে আবেগময় অজ্ঞতার ছাপ ফেলে এমন রহস্যঘন মতবাদের অনুপস্থিতি-এসব প্রমাণ করে যে ইসলাম আমাদের জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের বিকাশের চূড়ান্ত রূপের পরিচয়বাহী।[৪১] তিনি আরো বলেছেন : "ইসলাম শুধু একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমানকালে জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সৎচিন্তা ও সত্য কথনের ধর্ম। এটা ঐশীপ্রেম, সর্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[৪২]

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে সে-বিষয়ে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।[৪৩] যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশের আলোকে তার সমস্ত কাজ ও সমস্যার মীমাংসা না করে তাহলে অবশ্যই সে একজন কাফির, জালিম, ফাসিক ছাড়া আর কিছু নয়। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৪৪] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা, আংশিক বর্জন করা এবং মধ্যপথ ধরে চলাও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী একজন কাফিরের কাজ বলে বিবেচিত এবং তার জন্য অপমানজনক শাস্তির বিধান রয়েছে।[৪৫] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা অবাধ্যতার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে : "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা এইরূপ করে তাহাদিগের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।"[৪৬]

---

৩৯. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা : বংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ২৫

৪০. ড. রশীদুল আলম, *সুমলিম দর্শনের ভূমিকা*, বগুড়া ও ঢাকা : সাহিত্য কুটির, ১৯৮৬, পৃ. ১১

৪১. Sayed Amir Ali, *The spirit of Islam*, Delhi, Madras, Calcutta : Kessinger Publishing, 2003, P. 175

৪২. Ibid, P. 175

৪৩. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ৩৬

৪৪. *আল-কুরআন*, ২ : ২০৮

৪৫. *আল-কুরআন*, ৪ : ১৫০-৫১

৪৬. *আল-কুরআন*, ২ : ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তার

ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় পতাকা বহন করে নিয়ে আসেন। আরব মুসলমানদের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিল তারও পূর্ব থেকে। প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক সূত্রে আরব বণিকগণ এদেশে আগমন করেছিলেন। বহু পূর্বেই আরবগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশে গমন করেছিল। এ জন্যই আরবগণ সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে পৃথিবীর সেরা জাতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরব বণিকগণ সমুদ্রপথে চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, সুমাত্রা যাওয়ার পথে চট্টগ্রামের যাত্রা বিরতি করতেন এবং এখানে ব্যবসায়িক আদান-প্রদান হত। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে এবং হিজরী প্রথম শতকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায়ই সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে দক্ষিণ চীনে এবং বাংলাদেশের সূচনা ঘটে। ৭১২ খৃ. আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে স্থায়ী আরব-মুসলিম বসতি স্থাপনের ফলে ভারতে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়।[৪৭]

মহানবী (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এবং সপ্তম শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে পর্যন্ত কোন আরবীয় বণিক এদেশে এসেছিলেন বলে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্যাপক গবেষণায় এমন তথ্য প্রমাণিত পাওয়া যায়, যাতে সম্পূর্ণভাবে অনুমান করা যায় যে, ইসলাম পূর্বযুগে বঙ্গদেশের সাথে আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। অতঃপর প্রথম হিজরী এবং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশের সাথে আরব মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে।[৪৮] আরব মরু অঞ্চল বিশিষ্ট হওয়ায় সেখানে কৃষিযোগ্য জমির অভাব ছিল এবং সেজন্য আরবগণ-বাণিজ্য করে আসছিল। আরব বণিকদের উটের বহন সকল পার্শ্ববর্তী দেশে চলাচল করত। প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই আরবগণ নাবিক হিসেবে সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর সামুদ্রিক জীবনের কর্মকাণ্ডেও তাঁদের ধর্মীয় ও আত্মিক জীবনের ন্যায় ঢেউ লাগে এবং তারা পৃথিবীর সকল অংশে দুঃসাহসিক অভিযাত্রা শুরু করেন।[৪৯] কারণ আরবদের সমুদ্র পথে অন্যান্য বড় দেশের সাথে যাতায়াত সহজ ছিল। ভারত ও আরবদের মধ্যে রয়েছে ভারত মহাসাগর। আরবের একটি অংশের সাথে নদীর দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে ইরানের একটি অংশ। এক সময়ে আরবদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশাল কেন্দ্র আবিসিনিয়াও সমুদ্র পথেই আরবদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। চীন দ্রব্যসামগ্রী চীন সাগর ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আরব দেশে এসে পৌঁছাত। আরবরা সিরিয়া হয়ে ভূ-মধ্যসাগরে এসে পৌঁছে রোমীয় ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এসেছিল। ইয়ামেন, ওমান, হাজরামাউত, ইয়ামামা, বাহরাইন, ইত্যাদি উর্বর ও শস্য-শ্যামল

---

৪৭. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, সাতাশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ. ১৬৭

৪৮. সৈয়দ সুলায়মান নদভী (অনু. হুমায়ুন খাঁন) *আরব নৌবহর*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, [ভূমিকা], পৃ. ২

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

এলাকাসমূহ সবই সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। ভূ-প্রকৃতিগত কারণেই সমুদ্রগামী জাতিতে পরিণত হয় আরবরা। পালতোলা জাহাজে পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াত তারা বিশ্বের দেশে দেশে।[৫০]

ইসলাম প্রচার শুরুর এক শতাব্দীর মধ্যে (অর্থাৎ... ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) মুসলমানদের আধিপত্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে ভারত সীমান্ত এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে উত্তর আফ্রিকা (মিসর) পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এতে অনুমান করা যায় যে, ইসলাম পরবর্তী আরবের সাথে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মত ভারতের সাথেও যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন সৈয়দ সুলায়মান নদভীর গ্রন্থ 'আরব- আওর হিন্দ কে তা'আলুকাত' গ্রন্থের সূত্র ধরে লিখেন–"আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে-পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর, এবং আমাদের চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম পূর্ব কয়েক শতাব্দী আগ থেকেই গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। আরবদেশ থেকে বছরে অন্তত দুবার এসব উপনিবেশ নৌবহর এসে নোঙ্গর করত। ফলে, বাণিজ্য পণ্যের যেমন আদান-প্রদান হতো তেমনি সংবাদাদিরও আদান-প্রদান চলত"।[৫১] যেহেতু বণিকরা বছরে অন্তত দু'বার বাংলাদেশের উপকূলে জাহাজের বহর নোঙ্গর করত, সেহেতু নিশ্চিত বলা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ভারত উপমহাদেশে ইসলামের বিকাশ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

আরব দেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিধায় এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যের চাবিকাঠি ছিল আরবদের হাতের মুঠোয়। তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল ভারতীয় উপকূলীয় বাণিজ্যে। যে সকল ভারতীয় বন্দরে আরবদের যাতায়াত ছিল তার একটি ধারণা পাওয়া যায় সৈয়দ সুলায়মান আলী নদভীর একটি জোরালো বর্ণনার মাধ্যমে–"আরবরা কাশবাতে আসত পারস্য উপসাগরের পারস্য উপকূল ধরে এবং তারপর তায়েজ নামক বেলুচিস্তানের একটি বন্দরে প্রবেশ করত। তারপর তারা সিন্ধুর বন্দর থাথ এ আসত, তারপর গুজরাট ও কাথিওয়ারের বন্দর সমূহে ভিড়ত। যথা ঃ খানা, খামরায়াত, সানবারা, চেমুর, বাহরোচ, ভারহুত, গান্ধার, ঘোঘা, সুরাট, অতঃপর যেত মাদ্রাজ প্রদেশের বন্দর সমূহে, যথা ঃ মালাবার, করমণ্ডল, কেপকেমোরিন (কুমার), ত্রাভাঙ্কুর (কুলুম), ম্যাঙ্গালোর, চালইয়াট, পিন্ডারানী, চান্দ্রাপুর, হানুর, দেফাতান, কালিকট ও মাদ্রাজ এবং তারপরে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করত। এখানে তাদের কেন্দ্র ছিল সিলেট। একে তারা বলতো সিলাহাত। তারপর তারা যেত চট্টগ্রাম, একে বলতো সাদজাম, এখানে থেকে শ্যাম হয়ে চীন সাগরে প্রবেশ করত। তাদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল গুজরাট ও সিন্ধু। বাহরোচ থেকে তারা লাক্ষা ও নীল নিত। মাদ্রাজে তৈরী পোষাক তারা মিসরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত"।[৫২]

---

৫০. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)*, পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯

৫১. মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন, "বাংলাদেশে ইসলাম ঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪৫

৫২. সৈয়দ সুলায়মান নদভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

পারস্য উপসাগরে একটি প্রাচীন বন্দর ছিল। এর নাম ছিল 'ওবুল্লা'; এটি ছিল পারস্যের নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র। এই বন্দর থেকে মালামাল ও বাণিজ্য ও সম্ভার নিয়ে জাহাজ যেত হিন্দুস্তান ও চীনে।[৫৩]

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং সেসময় যদি আমি জীবিত থাকি তবে অবশ্যই আমার ধন সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হব না। আমি সেখানে নিহত হ লে শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করবো আর যদি নিরাপদে ফিরে আসি, তবে নিষ্কৃতি পাব জাহান্নাম থেকে।[৫৪]

মহানবী (স.) এর সময়ে আরব মুসলমানগণ ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর বক্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবগত ছিলেন। তিনি 'হিন্দ' বা 'সিন্দ' এর বর্ণনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন।

যেমন ভারতের আদর্শিক বিজয় সম্পর্কে হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করিম (স.) বলেছেন–"আমার উম্মতের মধ্যে দুটি সেনাদলকে আল্লাহ্ তায়ালা জাহান্নামের আগুন তেকে নিস্কৃতি দিবেন। তারমধ্যে একটি হিন্দু অভিযানকারী সেনাদল। আরেকটি মরিয়ম তনয় হযরত ঈশা (আ.) এর সহযোগী সেনাদল"।[৫৫] সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, এ সময় ভারতবর্ষ ও আরবদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ধর্ম ও বাণিজ্য।

ডঃ তারাচাঁদ 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব' গ্রন্থে আরব, ফিলিস্তিন ও মিসর প্রভৃতি পশ্চিমী দেশসমূহের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটি প্রাচীন পটভূমি তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন–"সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব এবং একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অধীনে তাদের ঐক্য ইসলাম-পূর্ব কাল থেকে সূচিত সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় তীব্রতা সঞ্চার করে। মুসলিম বাহিনী দ্রুত সিরিয়া ও পারস্য দখল করে এবং ভারত সীমান্তে অভিযান শুরু করে। মুসলিম বণিকরা অনতিবিলম্বে পারসিকদের নৌ-বাণিজ্যের উত্তরাধিকারে প্রবেশ করেন এবং আরব নৌ-বহর ভারত সাগরে দ্রুত ধাবিত হয়। আরব নৌ-বহর লোহিত সাগরের উপকূল থেকে অথবা দক্ষিণের উপকূলে যাত্রা শুরু করত। তাদের লক্ষ্য থাকত সিন্ধু নদের মুখে অথবা উপকূল ধরে এগিয়ে ক্যাম্বে উপসাগরের অথবা মালাবার উপকূলে মাল খালাস করা যাতে কৌলমসহ সরাসরি অন্যান্য বন্দরে পৌঁছে যেত। খলিফা উমর (রা.) এর শাসনামলে ৬৩৬ খৃ. মুসলিম নৌ-বহর ভারতীয় পানি

---

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৫৪. নাসাঈ শরীফ, *কিতাবুল জিহাদ*, ঢাকা : কুতুবখানা রশিদিয়া, তা. বি., পৃ. ৫২

৫৫. মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আলবানী, *সহীহ সুনানুন নাসাঈ*, খ.২, রিয়াদ : মাকতাবুত তারাবিয়াতুল আরাবী লিদুয়ালিল খালিজ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খ্রিঃ) পৃ. ৬৬৮

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় উপনীত হয়। তখন বাহরায়েন ও ওমানের শাসন (গভর্ণর) ছিলেন উসমান শফিকী। তিনি সমুদ্র পথে তানাতে সৈন্য প্রেরণ করে খলিফা কর্তৃক তিরস্কৃত হয়।"[৫৬]

আরবরা ভারতে আগমনের উদ্দেশ্যে স্থলপথ আবিষ্কারের বহু তথ্য সংগ্রহ করে খলিফা উমর (রা.) এর শাসনামলে, যা শেষ পর্যন্ত অষ্টম শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। এ সময় ভারতের সাথে আরবের নৌ-বাণিজ্য অব্যাহতভাবে চলছিল। ভারতের দক্ষিণ উপকূলের তিনটি শহরে এবং সিংহলে মুসলমানগণ তাদের বসতি স্থাপন করেন এবং ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিত সূত্রে আবদ্ধ হন। এ ধরনের বসতি ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন মালাবার উপকূলেই খুব ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য। অবস্থা দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, বিদেশী বণিকদের বন্দর এলাকায় বসতি স্থাপনের উৎসাহদানের নীতির অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। যেমন– সিংহলের রাজা উপহার স্বরূপ হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে কতিপয় মুসলিম বালিকা প্রেরণ করেন যারা তাঁর দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিল। এসব অনাথ বালিকা ছিল সেখানকার মৃত মুসলিম বণিকদের কন্যা।"[৫৭] খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয় নৌবহর ব্রোচ ও কাথিওয়ার উপকূল বন্দর আক্রমণ করে। তাঁদের বসতি ও বাণিজ্য স্থাপন ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। এর পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দ্রুত তাঁদের প্রভাব বাড়তে থাকে। নবম শতাব্দী সমাপ্তির পূর্বেই তাঁরা ভারতের পশ্চিম উপকূলের সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হন।

ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে সে সময় বিভিন্ন ধর্মের মতাদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। নব হিন্দু মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই চলছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাথে। রাজনৈতিকভাবেও সেটা ছিল উত্থান পতন ও স্থিতিহীনতার যুগ। চের রাজবংশ ক্ষমতা হারাচ্ছিল আর নতুন রাজবংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছিল। স্বভাবতই জনসাধারণের মানসিক অবস্থা অস্থিরতায় পূর্ণ ছিল। নতুন মতাদর্শ গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মানসিকতার উন্মুখ হয়েছিল। দৃশ্যপটে এ সময় আগমন ঘটে ইসলামের। ইসলামের সরল বিশ্বাস, অনাবিল আদর্শ ও মানবতার মুক্তির সওগাত জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করে। ফলে এর প্রভাব দেখা যায় অতি চমৎকার। চেরুমল পেরুমল বংশীয় শেষ রাজা নতুন ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন। বলা হয় যে, তিনি এ স্বপ্ন দেখে এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন– যেন চন্দ্র দুই খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এর কিছুদিন পর সিংহল থেকে আগত একটি ইসলাম ধর্ম প্রচারক দলের সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটে। দলের নেতা শায়খ সিককে উদ্দিন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। রাজাকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন এবং তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান সামরী। দীক্ষা নেয়ার পর রাজা মালাবার ত্যাগ করেন এবং আরব শহরে উপনীত হন। চার বছর পর তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন। সেখান হতে শরীফ বিন মালিক, মালিক বিন দীনার, মালিক বিন হাব্বি ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে পত্র দিয়ে মালাবার প্রেরণ করে। সেই পত্রে তিনি তাঁর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা এবং কিভাবে

৫৬. তারাচাঁদ (অনু. এস. মুজিবউল্লাহ), *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, পৃ. ২৯

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

মুসলমানদেরকে সংবর্ধনা দিতে হবে তার নির্দেশ দেন।[৫৮] অধিকন্তু আলী রাজা নামের একটি মুসলিম পরিবার কোলাত্তিবি রাজাদের মন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতিরূপে উপনিবিষ্ট ছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তী সময়ে সেখানে ইসলামের প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাসুদী, সুলায়মান, আবুল ফিদা, ইব্‌ন বতুতা প্রমুখ মুসলিম পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদের বর্ণনায় এ সম্পর্কে জানা যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলমানগণ একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদেই দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের আগমন ঘটেছে। দশম শতাব্দীতে তা পূর্ব উপকূল এবং তুলনামূলকভাবে অতি স্বল্প সময়ে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশাল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এক পর্যায়ে তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় শাসকদের মন্ত্রী, নৌ-সেনাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রদূত ও রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদার হন, অন্য পর্যায়ে অনেক লোককে তাঁরা নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন। নিজেদের ধর্মমত প্রচারের সাথে সাথে তাঁরা মসজিদ ও সমাধি স্তম্ভ তৈরি করেন যেগুলো পরবর্তীকালে সূফী দরবেশ ও ধর্ম প্রচারকদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। কাজেই দেখা যায় যে, মহানবী (স.) এর জীবদ্দশায়ই সমুদ্র আগত বণিকদের দ্বারা ইসলাম ভারত উপমহাদেশে পৌঁছে এবং তাঁর জীবদ্দশায় ইসলাম আরবের বাইরে বিস্তার লাভ করেনি'– এমন ধারণা পোষণ করার তেমন কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই।

শুধু জলপথ নয়, স্থলপথেও এ উপমহাদেশে মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের আগমন ঘটে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে তারা এদেশে প্রবেশ করে। খলিফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে হিজরী ১৪/৬৩৭-৩৮ খ্রিঃ মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক বালাজুরীর 'ফুতুহুল বুল্‌দান' গ্রন্থের সূত্র ধরে আব্দুল গফুর লিখেছেন, "উসমান ইব্‌ন আবুল আবী সাকাফী তাঁর ভ্রাতা মুগিরা সাকাফী, হারিস বিন মুররি আবদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধুর সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন। ৪৪ হিজরীতে (৬৬৬ খৃ.) মু'আবিয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইব্‌ন আবু সুফুরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী 'বানা' ও 'আহ্‌ওয়াজ' নামক স্থানে পৌঁছেন। মুহাল্লাবের পরে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাওয়ার, রাশিদ ইবনে আমর জাদিদি, সিনান ইবনে সালামাহ্, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুনইজর ইবনে জারুদ আবদি কয়েকবার সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন।[৫৯]

খলিফা ওয়ালিদের সময় ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ সুদক্ষ তরুণ যোদ্ধা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু অভিযানের আয়োজন করেন। এই সেনাপতি বীর বিক্রমে সমুদয় বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সিন্ধু জয় করেন। অতঃপর মুলতান জয় করে আরব সাম্রাজ্যভুক্ত করার পর তাঁর অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এ সময় তিনি চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যের সাহায্য পান। তিনি যখন ব্রাহ্মণবাদী শক্তিকে পরাস্ত করেন, তখন তার পক্ষে

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৫৯. আব্দুল গফুর, "মহানবীর যুগে উপমহাদেশ", *অগ্রপথিক*, সীরাতন্নবী সংখ্যা, ই.ফা.বা.- ১৯৮৮, পৃ. ৪৯-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

'সারওয়ান্দার মুসলিম অধিবাসিগণ যোগ দিয়েছিলেন।[৬০] মুহাম্মদ বিন কাসিম নতুন জনপদ জয় করে সেখানে একজন শাসক নিয়োগ করেন। তিনি দেবল (বর্তমান করাচি) জয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে চার হাজার মুসলমানের বসবাসের সুব্যবস্থা করেন। তাদের অনেককে জায়গীরও প্রদান করা হয়।[৬১]

মুসলিম বণিকরা যেখানেই বসতি নির্মাণ করেছেন পক্ষান্তরে মুসলিম সেনারা যেখানেই অভিযান পরিচালনা করেছেন সেখানেই মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ হাজির হয়েছেন। আবু হিকাম বিন সাহিব আল আদাবী আল বসরী সিন্ধু আসেন এবং সিন্ধুতেই তিনি ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মনসুর হাল্লাজ নৌ-পথে ভারতে আসেন খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। তিনি স্থলপথে উত্তর ভারত ও তুর্কিস্থান হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। খ্রিষ্টীয় একাদশ সহযাত্রী একদল সূফী দরবেশ নিয়ে বাবা রিহান বাগদাদ থেকে ব্রোচে আসেন। নূর-আলদীন (১০৯৪-১১৪৩ খৃ.) গুজরাটের কুনবী, খাবভাস ও কোরীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। 'কাশ্‌ফুল মাহ্‌যুব' গ্রন্থের প্রণেতা আলী বিন উসমান হুর্যাবরী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ ভ্রমণ করে লাহোরে যান এবং সেখানেই ইন্তোকাল করেন। শায়খ ইসমাইল বোখারী আসেন একাদশ শতাব্দীতে। বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুনতিক্‌-উত্‌-তায়িব' ও তাজকিরাতুল আউলিয়া'র লেখক ফরিদ উদ্দিন আসেন খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। ১১৯৭ খৃ. আজমীর শরীফ আসেন খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (রহ.) এবং ১২৩৬ খৃ. সেখানেই ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীকালেও মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের ভারতে আগমন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

ইসলাম একটি প্রচারমূলক ধর্ম। ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি মুসলমান এক একজন প্রচারক। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার করে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা ও কৌলিন্যের অভিশাপ থেকে মানব সমাজকে মুক্ত করে ইসলামের মূলনীতি ও তাওহীদের আওতায় সমগ্র মানব সমাজকে এক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃত্ত্ব সমাজে পরিনত করা। মূলত আদর্শের প্রেরণায় উজ্জিবিত হয়েই আরব মুসলমানগণ নবী করিম (স.) এর ইন্তেকালের পরপরই নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে বিশ্বের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এবার মূল কথায় ফিরে যাক। ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরসমূহে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের সময় বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলেও ইসলামী ভাবধারার প্রসার ঘটে। কারণ আরবীয় বণিকদের চট্টগ্রাম বন্দরে যাতায়াত ছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগর ছিল আরবদের সমুদ্রপথে যাতায়াতের একমাত্র পথ। আরব বণিকদের মাধ্যমে এদেশে মসলা, মিহি, সূতী, রেশমী বস্ত্র, হাতির দাঁত ও নানাবিধ রত্ন সামগ্রী চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এশিয়ার অন্যত্র ও ইউরোপে রপ্তানী হতো।[৬২] ইসলামের আবির্ভাব

---

৬০. খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন (অনু.), *ইবনে বতুতার সফর নামার (উর্দু) অনুবাদ আজায়েবুল আসফার*, খ.২, দিল্লী : ১৯১৩, পৃ. ৫২

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

৬২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) প্রাচীন যুগ*, ঢাকা : জেনারেল, ১৯৯৬, পৃ. ৫২

সমগ্র আরবে একটি দারুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এমন একটি সাড়া জাগানো খবর বণিক মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিশেষত ভারতের আরবীয় উপনিবেশগুলোতে যে পৌঁছে থাকবে তা সহজেই অনুমেয়। বাংলাদেশেও যে এখবর পৌঁছেছিল তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। ঐতিহাসিক বুযুর্গ বিন শাহরিয়ার বলেন, "আরবে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে সরন্দ্বীপ বাসীরা রাসূল (স.) এর কাছে দূত পাঠান। কিন্তু এ দূত মদীনায় পৌছান হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফত কালে। হযরত উমরের সাথে সে দূতের সাক্ষাত হয়। ইসলাম ও ইসলামের নবী এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে আলোচনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফেরার পথে ঐ দূত বেলুচিস্তানের কাছে মাকরান এলাকায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর হিন্দু সাথী সরন্দ্বীপ পৌঁছে তাঁদের অভিজ্ঞতা জানান। বিস্তারিত জেনে সরন্দ্বীপের জনগণের মাঝে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ফিরিশ্তার মতে, ঐ সময় সরন্দ্বীপের রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

যাহোক, এটা নিশ্চিত যে, এসব ঘটনা থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন ছিল না। কারণ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের মতই বাংলাদেশের সাথে আরবদের প্রাচীনকাল থেকেই সম্পর্ক ছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতেই আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হন। অতঃপর অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। আরব বণিকদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা বাণিজ্যের সাথে সাথে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে নবীর সুন্নাহ বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। আর বণিকগণ মনে করেছিলেন যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র স্থলে ইসলাম প্রচার করতে পারলে অপরাপর অঞ্চলে তা আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়বে। এরূপ যখন পরিস্থিতি তখন দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তদসংলগ্ন অঞ্চলে আরবীয় বণিকদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে স্থানীয় কিছু লোকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়, তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর দরবেশ ও সূফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচার কল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[৬৩]

ইসলাম প্রচারে তাঁরা ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ইসলাম প্রচার কার্যে তাঁদের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই জাতি, বর্ণ ও ধর্মভেদ জর্জরিত এদেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনসমাজের সম্মুখে নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ক্রমে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আলো। এতে নীরবে ইসলাম প্রচারের জন্য গড়ে ওঠে এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ।[৬৪]

৬৩. মুহম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮, পৃ. ১৪-২০

৬৪. কাজী দীন মুহম্মদ, "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশ ঃ কিছু ভাবনা", *অগ্রপথিক*, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৮৯, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই বাংলাদেশের সাথে আরবীয় মুসলমানদের যে প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়– ১। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, ২। আরবের ভৌগলিক বিবরণ এবং ৩। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পরস্পরাগত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ দু'টি আরবীয় মুদ্রা আবিষ্কার করেছেন। একটি রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে এবং অন্যটি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে। ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটি আব্বাসীয় খলিফা হারুন-আল-রশিদ কর্তৃক আল-মুহাম্মদীয়া টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল।[৬৫] ময়নামতিতে প্রাপ্ত মুদ্রাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই খননের বিস্তারিত বিবরণ অদ্যাবধি প্রকাশ করেনি। তথ্যের অভাবে মুদ্রাটি সনাক্ত করা যায়নি। আমার মনে হয় এ মুদ্রাটিও আব্বাসীয় যুগের। ডঃ এনামুল হক পাহাড়পুরের মুদ্রাটির ওপর ভিত্তি করে অনুমান করেন যে, প্রাথমিক যুগের আরব ধর্ম প্রচারকগণ বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। এনামুল হক বলেন, 'হিন্দু প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমাদের বিশ্বাস, এমন কোন ইসলাম প্রচারক বা বণিকগণ কর্তৃক পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে এ মুদ্রা আনীত হয়। সম্ভবত যিনি এই মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে তথায় প্রচার করতে গমন করে তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তাঁর মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল। যেরূপেই হউক, পাহাড়পুরের আব্বাসীয় খলিফার এই মুদ্রাটি অন্তত খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গের সাথে ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করছে।"[৬৬]

আরব বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে তাঁদের উপর অর্পিত ইসলাম প্রচারের দায়িত্বও পালন করে যেতেন। আর এ কাজকে তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করতেন।

রংপুর জেলার গদ নামে একটি ফার্সি 'শিলালিপি' আবিস্কৃত হয়েছে যা' থেকে উত্তর বাংলায় মুসলমানদের বসতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬৭] তবে ডঃ আব্দুল করিম বলেন, 'শিলালিপির নির্ভুল পাঠ থেকে জানা যায় যে, 'প্রকৃতপক্ষে এটি মোঘল আমলের শেষ দিকের। ফলে ঐ প্রাচীন যুগের অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে রংপুর মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল বা উত্তর বাংলায় মুসলমানদের কোন বড় বসতি ছিল, এ সকল প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য একথা প্রমাণ করে না'।[৬৮]

খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে বড় ধরনের কোন মুসলিম বসতি রংপুরে ছিল না, প্রাসঙ্গিক কারণেই এ মন্তব্য মেনে নেয়া যায় না। কারণ রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে ১৯৮৬ সালে লালমনির হাট সদর 'থানার' পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার 'মজদের আড়া' নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ৬৯ হিজরীতে পাওয়া গেছে। যেটি এ যাবৎ প্রাপ্ত বাংলাদেশে ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। নানা রকম ফুল, নকশা বিশেষ ধরনের ইটগুলোতে

---

৬৫. K.N. Dikshit, *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 55, Delhi : Superintendent Government Printing, 1940, P. 87

৬৬. মুহম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৬৭. মেহরাব আলী, *একশ তেইশ হিজরীর শিলালিপি*, দিনাজপুর : যাদুঘর, ১৯৯৯, সিরিজ নং-৪, পৃ. ৬

৬৮. A. Karim, *Social History of the Muslim in Bengal*, Chittagong : 1985, P. 27

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে এবং আরবী অক্ষরে কালিমা তায়্যিবাসহ ৬৯ হিজরী সন লেখা রয়েছে। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে এই মসজিদকে কেন্দ্র করে এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠেছিল আর এ এলাকাটি 'মজদের আড়া' নামে সুপরিচিত।[৬৯] ধারণা করা হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে উত্তর বাংলা তথা রংপুর মুসলমানদের শাসনাধীনে না আসলেও মুসলমানদের বড় রকমের একটা বসতি গড়ে ওঠেছিল তাতে কোন সংশয় নেই।

আরবের ভৌগলিক বিবরণ

আরব মুসলিম ভৌগোলিকদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান আরব বণিকের বাণিজ্যপথ কিংবা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে সুলায়মানের নাম উল্লেখযোগ্য। 'সিলসিলাতুত-তাওয়ারীখ' গ্রন্থ ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়।[৭০] এ বিষয়ে সুলায়মানের পর আরও কয়েকজন ভৌগোলিক বিবরণ দেন। কিন্তু সকলেই সুলায়মানের 'সিলসিলাতুত তাওয়ারীখ' এর ওপর নির্ভরশীল। ইবনে খুরদাদবিহ্ (মৃত. ৯১২ খৃ.) তাঁর 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক' নামক গ্রন্থে সর্ব প্রথম আরবদেশ থেকে চীন দেশ পর্যন্ত মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য পথের বর্ণনা দেন। তাছাড়া আল-মাসুদী (মৃ. ৯৫৬ খৃ.) এবং আল-ইদ্রিসী (জন্ম–একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে) প্রমুখ ভৌগোলিকগণ ইবনে খুরদাদবিহ্ কে অনুসরণ করে আরব বণিকদের বাণিজ্য পথের বিবরণ দেন।[৭১]

তাদের বিবরণ মতে, আরাকান থেকে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী বিকীর্ণ অঞ্চলটি খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে আরব বণিকদের কর্ম তৎপরতায় সরগরম হয়ে উঠেছিল।

আরব ভৌগোলিক ও পর্যটকগণ তাদের বর্ণনায়, 'রুহমী' বা 'রাহমী' 'সুরতন' প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। আরব ভৌগোলিকদের প্রদত্ত বর্ণনা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি বাংলারই উপকূল অঞ্চলে কোন একটি বন্দর ছিল।

যাহোক, সমুদ্রোপকূলবর্তী শহর চট্টগ্রাম আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব এমনকি বর্তমানেও লক্ষ্য করা যায়। তাদের ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে না সূচকত শব্দের ব্যবহারও আরবী ভাষায় প্রভাবের ফল। তাঁদের অনেক পরিবার নিজদেরকে আরব বংশোদ্ভুত বলে দাবী করেন। চট্টগ্রামের একাধিক কদম-রসূলের অস্তিত্ব দেখা যায়। চট্টগ্রামের লোকের মুখাবয়ব আরবদের অনুরূপ বলেও অনেকে ধারণা করেন। এছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন – আলকরণ, সুলুক, বহর, বাকলিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে।[৭২]

---

৬৯. *দৈনিক বাংলা*, (২০ এপ্রিল-১৯৮৬), পৃ. ৪

৭০. Sir H.M. Elliot and Professor John Dowson, *The History of India, as told by its own Historians*, Vol. 1, Kitab Mahal : Allahabad, 1964, P. 2

৭১. মোঃ জয়নুল আবেদীন, *দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর অবদান*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪, পৃ. ১৮

৭২. আবদুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০, পৃ. ১৯

ইসলামের আবির্ভাব কালের পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মহানবী (স.) এর জীবদ্দশায়ই তাঁর মাতুল সাহাক্ষী আবু ওয়াক্কাস (রা.) যিনি ইসলাম গ্রহণকারী নবম ব্যক্তি) সমুদ্র পথে বাংলাদেশে আগমন করেন। খলিফা আল ওয়ালিদের আমলে ৭২১ খৃ. মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের উপনিবেশ ও বসতি গড়ে উঠে। এ সময় কয়েকজন ইসলাম ধর্মপ্রচারক বাংলাদেশেও আসেন। এদের নেতা ছিলেন মাহমুদ ও মুহায়মিন। দ্বিতীয় বার প্রচার করতে আসেন হযরত আবু তালিব (রা.)। এভাবে পরপর পাঁচটি দল বাংলাদেশে আসেন।[৭৩] তাঁদের প্রচার পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, এদেশের চলতি ভাষার মাধ্যমেই তাঁরা ধর্ম প্রচার করতেন। তাঁরা গ্রামে গ্রামে সফর করে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজকে প্রাধান্য দিতেন।

কিংবদন্তী ভিত্তিক প্রমাণ

বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন সূফী-সাধকদের জীবন সম্বন্ধে বিকীর্ণভাবে প্রচলিত কাহিনী ও কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে কোন কোরন পন্ডিত অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ-বিজয়ের বহু আগেই যে সকল সূফী-সাধক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছিলেন। বিক্রমপুরের রাজা বল্লাল সেনের সময় (১১৫৮-১১৭৯ খৃ.) ক্ষাবা আদম শহীদ এদেশে আসেন। শাহ সুলতান রুমি ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে নেত্রকোনার মদনপুরে এসেছিলেন বলে দলিল দাবি করা হয়েছে।[৭৪] সৈয়দ সূর্যখুল আনতিয়াহ আসেন ১০৫৩ খ্রিঃ, শাহ সুলতান মাহী সাওয়ার, মাখদূম শাহদৌলা শহীদ, মাখদূম শাহ মাহমুদ গজনবী, শাহ নিয়মাতুল্লাহ বুতশিকন, শাহ্ মাখদূম রুপোশ, হযরত বায়েজিদ বিস্তামী প্রমুখ সূফী-সাধক বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। বাংলাদেশে আগমন এসকল সূফী-সাধক সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। এ সকল কাহিনীতে সূফী-সাধকদের অনুশীলিত কারামতি ক্ষা অতি মানবীয় শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই আধুনিক পণ্ডিতদের নিকট এ সকল রহস্যময় কাহিনীগুলো গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তবে বর্তমানেও এসকল সূফী-সাধকদের মাযার শরীফের সাড়ম্বর উপস্থিতি এবং জনসাধারণের বিশ্বাসের গভীরতা দেখে এটা নিশ্চিত বলা যায় যে, বিভিন্ন সূফী-সাধকগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

এ পর্যন্ত মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা এ সম্পর্কিত আভাস, ইঙ্গিত ও অনুমান ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু এতটুকুতে সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া অন্য আর গত্যন্তরও নেই। তবে পাকভারত অভিমুখে মুসলমানদের অভিযান মুহাম্মদ বিন কাসিম হতেই শুরু হয়নি; খলিফা উমর (রা.) এর যুগ হতেই এর সূচনা হয়েছিল। আরব বণিক, নাবিক ও ধর্ম প্রচারকগণ দ্বারা বাংলাদেশেও ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। কারণ ভারতে আরব মুসলমানদের অভিযানের কারণগুলোর মধ্যে ধর্ম প্রচারের বিষয়টি ছিল অগ্রগণ্য।

---

৭৩. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

৭৪. *Bengal District Gazetteers*, Mymensingh: 1917, P. 52

কাজেই দেখা যায় যে, খ্রিস্টীয় ৭ম হতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা কিভাবে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন তার সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ এখনো জানা যায় না। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও একাদশ শতকের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।[৭৫]

ব্যবসা বাণিজ্যই এসব বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে বাণিজ্যিক পণ্যের সাথে তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে ইসলামের আদর্শ ও নবীর সুন্নাহ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাচ্যের দেশগুলিতে, বিশেষত, জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও সুদূর চীন দেশে। ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় বাংলাদেশের দিকে তারা মনে করেছিলেন প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ইসলাম প্রচার করতে পারলে দেশের অপরাপর অঞ্চলেও তা আপনাআপনি ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় কোন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাগত ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি এবং এ দেশের নিজস্ব অধিবাসীদের অনার্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ হয়েছিল বহুদিন ধরেই। কিন্তু তাদের সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবন ও সমাজ সৃষ্টি হয়নি। ছিল গ্রাম্য সভ্যতা; যেখানে আপন ধারায়, বহু বিচিত্র আচার-ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সমাজ চালু ছিল। এই গ্রাম্য সমাজের কর্তা ছিল হিন্দুগণ। সমাজের মধ্যে বর্ণবৈষম্য প্রচলিত ছিল। সেন আমলে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি হওয়ায় তা নূতন ও আদর্শ সমাজ সংগঠনের পথে প্রবল বাধা ও অন্তরায় ছিল। সেখানে জাত্যাভিমান ও বহিরাগত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং যুক্তিহীন আত্মসর্বস্বতা তাদের জীবনকে অধিকার করেছিল এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের উপর প্রভূত্ব করত।

সবক্ষেত্রে সমাজের জনসাধারণকে বঞ্চিত ও পদানত করে রাখার প্রচেষ্টা চলত। কঠোরতার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ বরাবরই অবহেলিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের জনমানস ও চিন্তাধারায় যখন এমন একটা শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয় তখন অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগীয় উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হন। খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলে আরবীয় বণিক ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তা এ দেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর দরবেশ ও সূফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ছিলেন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এবং সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ইসলামের প্রচারকাজে তাঁদের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই জাতি, বর্ণ ও ধর্মভেদ জর্জরিত এ দেশের জনসমাজের সম্মুখে এক নব দিগন্তের উন্মোষ ঘটে। ক্রমে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে নিরবে ইসলাম প্রচারের জন্য এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠে।

---

৭৫. *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবীয় মুসলমানদের যে প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-অষ্টম শতাব্দীতে বহু আরব বণিক দলে দলে বাণিজ্যপোত চালনা করে বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করতেন এবং এভাবে ভারতের সঙ্গেও তাঁদের ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে উপনিবেশ গড়ে তোলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজশাহী জেলার গদ গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন ফার্সী শিলালিপি-ই তার প্রমাণ।

ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠন

বাংলার মুসলিম সমাজ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। এ দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে যাদের দ্বারা মুসলিম সমাজ গঠিত হয়, তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন তুরস্ক, পারস্য ও আরব বংশোদ্ভূত।[৭৬] তারা অব্যাহত ধারায় বিজেতা, শাসক ও ভাগ্যান্বেষী হিসাবে এ অঞ্চলে আসেন।[৭৭] এঁদের সকলেই ছিলেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী ও আদর্শের বাহক। তাদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ক্রমে এদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আগত এবং স্থানীয় মুসলিমদের সমন্বয়ে বাংলার মুসলিম সমাজ গঠিত হয়।[৭৮]

তেরো শতকের প্রথমদিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের পর বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলিমরা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন। সে সময়ে বাংলায় ধর্মান্তরিত মুসলিমদের চাইতে তারা ছিল সংখ্যায় বেশী। বাংলায় এ মুসলিম অভিবাসীদেরকে কেন্দ্র করেই মুসলিম সমাজ নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে থাকে। বখতিয়ার খলজীর অনুগামী সৈন্যসংখ্যা কত ছিল তা নিরূপণ করা কঠিন। মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী' থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ার খলজী বিহার বিজয়ের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে খলজী বংশের বহু ভাগ্যান্বেষী লোক তাঁর সংগে যোগ দেয়।[৭৯] 'তবকাত-ই-নাসিরী' থেকে আরও জানা যায় যে, বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানের প্রাক্কালে তাঁর তিনজন ঘনিষ্ট সহচর মুহাম্মদ শীরন খলজী, হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজী ও আলী মর্দান খলজীকে রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম, এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করেন। অতঃপর তিনি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিব্বত অভিযানে বের হন।[৮০] তাই যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে, বখতিয়ার

---

৭৬. আবু উমর মিনহাজুদ্দীন উসমান বিন সিরাজুদ্দীন আল জুজানী, *তবকাত-ই-নাসিরী*, কলকাতা : দিব্য প্রশাকন, ১৮৬৪, পৃ. ১৪৭, ১৫৭, ১৫৯-১৬০

৭৭. রফিউদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), *ইসলাম ইন বাংলাদেশ*, ঢাকা : ১৯৮৩, পৃ. ৩১

৭৮. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন *আহমদ*, *বেঙ্গল আন্ডার দি রুল অব দি আর্লি ইলিয়াস শাহী ডাইন্যাস্টি*, অপ্রকাশিত থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭, পৃ. ২৮০

৭৯. *তবকাত-ই-নাসিরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭, ১৫২

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

খলজীর অধীনে বেশ কয়েক হাজার সৈন্য বাংলায় এসেছিল। এবং তারা বাংলার বসতি স্থাপন করেছিল।[৮১]

উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মোঙ্গলরা মধ্য এশিয়া ও ইরানে নির্বিচারে আক্রমণ ও লুণ্ঠন শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে বহু পরিবার বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যবসায়ী, পণ্ডিত, কারিগর ও শ্রমশিল্পী আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে উত্তর ভারত ও বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের অব্যবহিত পরে মধ্য এশিয়া ও ইরান থেকে বেশ সংখ্যক মুসলিম পণ্ডিত, সূফী সাধক ও পেশাজীবি বাংলায় এসে বসবাস করেন।[৮২] বখতিয়ার খলজী লখনৌতিতে মুসলিম রাজ্য স্থাপন করে তাদের প্রয়োজনে মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকাহ তৈরি করেন। এভাবে বাংলায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বখতিয়ার খলজীর পর তাঁর তিন ঘনিষ্ঠ সহচর বাংলায় নিজ নিজ শক্তিবৃদ্ধিকল্পে বাইর থেকে অধিক সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেন।[৮৩]

বাংলায় মুসলিমশাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে যে সকল ধর্মপ্রচারক বাংলায় আসেন, তাঁদের মধ্যে শেখ জালাল মুহম্মদ তবরীজী ছিলেন অন্যতম।[৮৪] তিনি পারস্যের তবরীজ শহরের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর মুরশিদ ছিলেন বিখ্যাত সূফী শেখ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী। শেখ জালাল দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে বাংলায় আসেন (১২১০-১২৩৬ খৃ.)।[৮৫] বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়া শহরের বিভিন্ন অট্টালিকা, সমাধিসৌধ ও জামে মসজিদের অস্তিত্ব থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বহু অনুসারী ছিল এবং তিনি তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন।[৮৬] তাঁর নাম অনুসারে দেওতলা এলাকায় তবরীজাবাদ শহর গড়ে ওঠে।[৮৭] এখানে জালালিয়া তরীকার বহু সূফীও বসবাস করতেন।[৮৮] এখানে তাঁদের অনেকেরই সমাধি রয়েছে। বাংলায় ক্ষমতা দখলের পর মুসলিমদের ওপর রাজা গণেশের অত্যাচার শুরু হলে, দেওতলার সূফীদের অনুরোধে শেখ নূর কুতুব আলম জৌনপুরে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানান।[৮৯] এতে বোঝা যায় যে,

---

৮১. এম. এ. রহিমের মতে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে প্রায় ৪০,০০০ খলজী বংশীয় তুর্কি পুরুষ, মহিলা ও শিশু বাংলায় বসতি স্থাপন করেছে।

৮২. Abdul Karim, *Social History of Mustims in Bengal*, Chittagong : Baitush Sharaf Islamic Research Institute, 1985, P. 761

৮৩. মুহম্মদ মোহর আলী, *হিস্টরি অব দি মুসলিম ইন বেঙ্গল*, খ.১ বি, রিয়াদ : ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৫, পৃ. ৭৬১

৮৪. তিনি পারস্যের তবরীজ শহরের অধিবাসী

৮৫. আবদুল হক, *আখবার-উল-আখিয়ার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৮৬. মুহম্মদ মোহর আলী, *হিস্টরি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৩

৮৭. প্রাগুক্ত।

৮৮. *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, ভলুম-২, সিরিয়াল নয়-১৩৮, ১৯৪৮, পৃ. ৩৫-৩৬

৮৯. মুহম্মদ মোহর আলী, *হিস্টরি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

মুসলিম শাসনামলে দেওতলা একটি মুসলিম এলাকা ছিল। তবরীজাবাদ সম্পর্কে তথ্যাদি সম্বলিত চারটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।[৯০]

শাহ সফীউদ্দীন বাংলায় মুসলিম ভুবাসনকারীদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন। জানা যায় যে, তিনি ছিলেন দিল্লী দরবারের অমাত্য বরখুরদানের পুত্র। তিনি বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে (১৩০১-১৩২২ খ্রি.) বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন।[৯১] তিনি এখানে স্থানীয় এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে বাংলার সুলতান তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর স্বজনেরা আরও কয়েকটি যুদ্ধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্বজনেরা তাঁকে পান্ডুয়ায় সমাধিস্থ করে পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই পান্ডুয়ায় তাঁর বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৯২]

সমসাময়িক আরেক জন ধর্মপ্রচারক জাফর খান গাজীর নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউস ও শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে (১২৯৮-১৩১৩ খৃ.) হুগলি অঞ্চলে মুসলিম বসতি বিস্তারে সচেষ্ট হন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ (৬৯৭ হি./১২৯ খৃ.) ও একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।[৯৩] প্রায় একই সময়ে শেখ জালালের নেতৃত্বে সিলেটের মুসলিম ও বসতি স্থাপিত হয়। শাহ জালাল ছিলেন একজন বিখ্যাত সূফী-সাধক। সিলেট ও উত্তর পূর্ববঙ্গে ইসলাম বিস্তারের কৃতিত্ব তাঁরই। শিলালিপিতে ও 'গুলজার-ই-আবরার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শাহ জালাল ছিলেন তুরস্কের (এশিয়া মাইনর) কুনিয়া শহরের অধিবাসী।[৯৪] আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের পর তিনি তাঁর মুরশিদ সৈয়দ আহমদ ইয়াসভীর-এর অনুমতি নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু অনুসারীসহ কুনিয়া ত্যাগ করেন। দিল্লিতে পৌছে তিনি শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। অতঃপর তিনি ৩১৩ জন অনুসারীসহ বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে সিলেটে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজা গৌরগবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হন। আরও জানা যায় যে, শাহ জালাল মুসলিম সেনাপতি সিকান্দর খান গাজীকে সিলেট বিজয়ে সাহায্য করেন। সিলেট বিজয়ের পর শাহ জালাল সেখানেই ধর্মপ্রচারে ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় উক্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়। সিলেটে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ-এ বহু সূফী-সাধক, পরিব্রাজক ও দুস্থ মানুষের সমাগম হয়। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে ভক্তি করত এবং নানা প্রকার সামগ্রী উপহার দিত। এগুলো সমবেত লোকজন ও অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যবহৃত হতো।[৯৫] তাঁর প্রচেষ্টায়ই সিলেট অঞ্চল বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত হয়।

সিলেটের শাহ জালাল (র)-এর কাছাকাছি সময়ে শেখ আতা দিনাজপুর অঞ্চলে মুসলিম সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে শেখ আতার সমাধি আছে।

---

৯০. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৪, পৃ. ২৯৬

৯১. বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট্ গেজেটিয়ারস, হুগলি, ১৯১২, পৃ. ২৯৭

৯২. *প্রোসিডিংস্ অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৮৭০, পৃ. ১২৩-১২৫

৯৩. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৮৭৩, পৃ. ২৮৭-২৮৮।

৯৪. গাউসী মুহম্মদ, *গুলজার-ই-আবরার*, ১০২২ হি./১৬১৩, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পাণ্ডুলিপি-২৫৯

৯৫. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৯২২, পৃ. ৪১৩

শিলালিপির তথ্যাদি অনুসারে শেখ আতা ছিলেন একজন মহান সূফী দরবেশ এবং তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। শিলালিপি থেকে আরও জানা যায় যে, সুলতান সিকান্দর শাহ ও শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ উভয়েই শেখ আতাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।[৯৬]

উত্তর বঙ্গে মুসলিম সমাজ গঠনে মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন পাবনা জেলার শাহজাদপুরে একশ মুরীদসহ তাঁর সমাধি রয়েছে। জানা যায় যে, মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ বহু সংখ্যক মুরীদ ও আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে সুদূর ইয়ামন থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন এবং শাহজাদপুরে বসতি স্থাপন করেন।[৯৭] কিংবদন্তী অনুসারে মখদুম শাহ তুর্কি আক্রমণের পূর্বে বাংলায় এসেছিলেন। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে তিনি তুর্কি আক্রমণের পরে বাংলায় এসেছিলেন। এতে মনে হয়, তিনি তেরো শতকের শেষ দিকে কিংবা চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় আসেন।[৯৮]

ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরস্থ রামপালেও মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাবা আদম শহীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামপালে তাঁর সমাধি আছে। তাঁর সমাধির সাথে একটি মসজিদের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। বাবা আদম শহীদ মক্কা থেকে বিপুল সংখ্যক মুরীদসহ বাংলায় আসেন এবং রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। তখন থেকে থেকে রামপালে মুসলিম বসতির সূচনা হয়।

বাবা আদম শহীদের সমাধির নিকটে অবস্থিত মসজিদটি বাবা আদম শহীদের মসজিদ বলে পরিচিত। জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে মালিক কাফুর নামে তাঁর একজন আবিসিনিয়ান কর্মচারী ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে (রজব, ৮৮৮ হি.) এ মসজিদ নির্মাণ করেন। রামপালের পাশাপাশি গ্রামে আরও দুটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।[৯৯] এতে অনুমিত হয় যে, নবম হিজরির (পনেরো শতকে) শেষের দিকে রামপাল একটি সমৃদ্ধ এলাকা ছিল। এভাবে ধর্মপ্রচারকদের সহায়তায় বাংলার আরও অনেক স্থানে মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়। এ সব ধর্মপ্রচারকের মধ্যে শাহ সুলতান মাহিসাওয়ার, খান জাহান, মজলিস সাহেব, বদর সাহেব, পীর বদরুদ্দীন, শাহ জালাল দকিনী, শাহ আলী বাগদাদী, শাহ মোয়াজ্জম দানিশমান্দ (শাহ দৌলাহ) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাহ সুলতান মাহিসাওয়ার বলখের যুবরাজ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনেও অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু রাজকীয় জাঁকজমক ও আরাম আয়েশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে সূফী মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর মুরশিদ দামেস্কের শেখ তওফীকের নির্দেশে তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য সমুদ্র পথে সন্দ্বীপ হয়ে বাংলায় আসেন। তিনি বাখরগঞ্জ জেলার হরিরাম নগরে উপস্থিত হলে সেখানকার হিন্দু রাজা বলরাম তাঁকে বাঁধা দেন। যুদ্ধে বলরাম নিহত হলে তাঁর মন্ত্রী

---

৯৬. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৮৭৩, পৃ. ২৯০

৯৭. মুহম্মদ মোহর আলী, *হিস্টরি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, ভল্যুম-১বি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৮

৯৮. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৫৯-৬০

৯৯. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ঢাকা : এশিয়েটিক সোসাইটি, ১৮৭৩, পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি অগ্রসর হয়ে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় যান। সেখানে রাজা পরশুরাম ও তার ভগ্নী শিলা দেবী তাঁকে বাঁধা দেন। যুদ্ধে রাজা পরশুরাম নিহত হন এবং শিলা দেবী করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[১০০] শাহ সুলতান মাহিসাওয়ারের সমাধি মহাস্থানগড় আছে। কথিত আছে যে, তিনি মাছের পিঠে চড়ে বাংলায় আসেন। এ জন্য তাঁকে মাহিসাওয়ার বলা হয়।

ঐতিহ্য (tradition) থেকেও আভাস পাওয়া যায় যে, মাহিসাওয়ারের সময়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে বেশ সংখ্যক যুবরাজ পরিব্রাজন করে বাংলায় আসেন। পরবর্তীই সময়ে ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রদত্ত সনদে মাহিসাওয়ারের দরগাহ সংলগ্ন লাখেরাজ সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সনদে শাহ সুলতান মাহিসাওয়ারের জমির কোন ক্ষতি সাধন না করার জন্য কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়।[১০১]

খানজাহান বাংলার মুজাহিদ দরবেশদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বাংলায় মুসলিম শাসন সম্প্রসারণ ও ইসলাম ধর্ম বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২-১৪৫৯ খৃ.) খুলনা জেলায় মুসলিম বসতি গড়ে তোলেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাগেরহাটে সমাহিত আছেন এবং তাঁর সমাধির উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

জানা যায় যে, বদর সাহেব ও তাঁর ভাই মজলিস সাহেব ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন।[১০২] দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে পীর বদর আলমের সমাধি আছে। সে সময়ে সে অঞ্চলের রাজা ছিলেন মহেশ। কথিত আছে যে, মহেশের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পীর বদর আলম সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের নিকট সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠান। সুলতান তাঁকে সাহায্য করেন। ফলে হিন্দু রাজা মহেশ পরাজিত হন। এরপর বিনা বাঁধায় পীর বদর আলম হেমতাবাদে মুসলিম উপনিবেশ গড়ে তোলেন।[১০৩]

শাহ জালাল দকিনী পনেরো শতকে (নয় হিজরী) ইসলাম প্রচারের জন্য বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে বাংলায় এসে ঢাকার মতিঝিল এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। একই সময়ে শাহ আলী বাগদাদীও এদেশে এসে ঢাকার মিরপুরে বসতি স্থাপন করেন। ঢাকার মতিঝিল ও মিরপুরে উভয়ের মাজার রয়েছে।[১০৪]

---

১০০. এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, কলকাতা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ১৯৩৫, পৃ. ১৪০-১৪১

১০১. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ঢাকা : এশিয়েটিক সোসাইটি, ১৮৭৮, পর্ব-১, নং-১ পৃ. ৯২-৯৩

১০২.এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩

১০৩. *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস*, দিনাজপুর : ১৯১২, পৃ. ২০

১০৪. এ. এইচ. দানী, *প্রগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

রাজশাহী জেলার বাঘায় সমাহিত আছেন শাহ মুয়াজ্জম দানিশমান্দ। তিনি 'শাহদৌলাহ্' নামে সমধিক পরিচিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি খলিফা হারুন-অর-রশিদের বংশধর।[১০৫] তিনি সুলতান নুসরত শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-১৫৩২ খৃ.) বাগদাদ থেকে প্রথমে রাজশাহীর বাঘার নিকটবর্তী মখদুমপুরে আসেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে প্রভাবশালী আমীর আলা বখশ বরখুরদার লস্করীর কন্যাকে বিয়ে করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাঘায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি একটি খানকাহ নির্মাণ করেন। সুলতান নুসরত শাহ বাঘায় একটি খানকাহ নির্মাণ করেন। ফলে ক্রমান্বয়ে বাঘা প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। বাঘায় শাহদৌলাহর সমাধির নুসরত শাহের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।[১০৬]

পরবর্তী সময়ে বাঘা অঞ্চলের প্রতি মুসলিম শাসকদেরও সুনজর ছিল। কথিত আছে যে, গৌড়ের রাজা শাহদৌলাহকে লাখেরাজ জমি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শাহদৌলাহ এ দান গ্রহণ করেন নি। পরে শাহদৌলাহর পুত্র হামিদ দানিশ মান্দ গৌড়ের আর এক রাজার নিকট থেকে বাইশটি গ্রাম দান হিসেবে গ্রহণ করেন। মুগল সম্রাট শাহজাহান হামিদ দানিশমান্দের পুত্র আবদুল ওয়াহাবকে বিয়াল্লিশটি গ্রাম দান করেছিলেন।[১০৭] ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে পরিব্রাজক আবদুল লতিফ বাঘায় আসেন। তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে জানা যায় যে, হাওদা মিয়া নামে জনৈক দরবেশ বাঘায় একটি বড় মাদ্রাসা পরিচালনা করেন এবং সেখানে বংশধর ও শিক্ষার্থীগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি প্রদান করা হয়েছিল।[১০৮] খানকাহ, মাদ্রাসা ও মসজিদকে কেন্দ্র করে বাঘা দ্রুত উন্নতি লাভ করে।

হযরত শাহজালাল (র) এর সাথে জগতবরেণ্য তাপস হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া ইসলামের অমীয় বাণী প্রচারে হযরত শাহ্ জালাল (র) তাঁর খলিফাদের (অধ্যাত্মিক নেতাদের) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রেরণ করে। তন্মধ্যে সৈয়দ জাফর, সৈয়দ আব্দুল গফুর, সৈয়দ ইব্রাহিম, সৈয়দ ইসমাইল, সৈয়দ মৌলভী রৌশন আলীসহ আরো কনেককে ত্রিপুরায় প্রেরণ করেছিলেন। ঢাকায় প্রেরণ করেছিলেন মাওলানা হাফিজ আহমদ শাহ হাফীজুল্লাহ্, শাহ্ মুহাম্মদ দাইম, হারুন শাহ্, ইনায়ত কমরবস্তা, মাহবুব শাহ্, মিয়া সাহিব, বাগদাদী প্রমুখকে ইসলাম প্রচার কার্যে ও আধ্যাত্মিককতা প্রসারে প্রেরণ করেছিলেন নোয়াখালীতে।[১০৯]

এ সময়ের এদেশের অন্যতম সূফি সাধক হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ (র) বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী (র) -এর পোতা এর আদেশে বাংলাদেশে আসেন এবং কঠোর ও প্রগাঢ় সূফি সাধনায় বিশেষ অবদান রাখেন। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ্ বুখারা থেকে বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে (মৃ. ১৩৮০ খৃ.) আস্তানা স্থাপন করেন এবং তিনি ইসলাম প্রচার কার্যের পাশাপাশি

---

১০৫. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৯০৪, নং-২ পৃ. ১১৩

১০৬.প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

১০৭. প্রাগুক্ত

১০৮. *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, ভল্যুম-৩৫, পর্ব-২, ১৯২৮, পৃ. ১৪৩-১৪৬।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

‘ইরশাদাত তালিবীন’ ‘মাআদাল উলামা আল আযীফা’ প্রভৃতি সূফিতত্ত্বমূলক পুস্তক রচনা করেন।[১১০]

শায়খ নূরুল হক নূর কুতুবুল আলম (র.) ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ। তিনি তার পিতা শায়খ আলাউদ্দিন হক (র) মুরীদ ছিলেন এবং সিদ্ধি লাভ করে কুতুবুল আলম উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৪৪৭ খৃ. পাণ্ডুয়াতে ইন্তিকাল করেন এবং নূরী তরীকার সূচনা করেন।[১১১] এ সময়কার অন্য একজন সূফি দরবেশ হযরত সৈয়দ খায়েরুদ্দিন ওরফে শাহ্ সাদেক চিশতী। তিন ‘চিশতীয়া নিজামিয়া’ তরীকা অনুযায়ী মুরীদদের সবক দিতেন। ১৫৭৭ খৃ. তিনি বাংলাদেশের ঢাকায় আগমন করেন। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ওলীয়ে কামেল সূফি সাধক হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র.)। তিনি মিরপুরে খানকা স্থাপন করেন এবং তাঁর ভক্তদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেন। এ একই সময় বিখ্যাত সূফী সাধক হযরত খান জাহান আলী বাংলাদেশের তাশরীফ আনেন। তিনি দক্ষিণ বঙ্গের দুর্গম অঞ্চলে (বাগেরহাট) ইসলামের অমীয় বাণী প্রচার করেন।

হযরত শাহ্ সাদেক আলীর (র.) বাংলাদেশেস্থ খলীফা হযরত শাহ্ মিসকীন আলী চিশতী (র) ছিলেন শহীদ তিতুমীরের সমসাময়িক এবং তিতুমীরের অন্যতম আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং তিতুমীরের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ্বস্ত সহচর ও উপদেষ্টা। তিনি কলিকাতায় কড়েয়াতে ইন্তিকাল করেন। তিনি একখানী ‘দেওয়ান’ রচনা করেন। সারা বাংলায় (উভয় বাংলায়) তিনি হেদায়েত কার্য পরিচালনা করেন এবং তিনি চিশতিয়া তরীকায় নিজামিয়া শাখার মধ্যে মিসকিনিয়া আখার প্রবর্তন করেন। শাহ্ মিসকীন আলী (র.) সে যুগের তাপসশ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল।[১১২]

সমসাময়িক কালে মেদিনীপুর থেকে আগত হযরত শাহ্ সৈয়দ মুরিশদ আলী কাদিরী (র) এর নাম উল্লেখযোগ্য। এরপর হযরত খাজা মাহ আবদুর রশীদ চিশতী নিজামী (মৃ. ১৩৪৭ বাং) একজন শ্রেষ্ঠ সাধাক ছিলেন। তিনি ‘জ্ঞান সিন্ধু’, দিওয়ান রশীদ’ ও ‘অন্ধের চক্ষুদান’ নামের তিনখানা উঁচুস্তরের সূফিতত্ত্বমূলক পুস্তক রচনা করেন।[১১৩]

মাওলনা হাজী শরীয়াতুল্লাহ্ (১৭৮০-১৮৩৯) এ দেশের ঝিমিয়ে পড়া মুসলমানদের ইসলামী চেতনাকে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। তিনি মুর্শিদ তাহের চোম্বলের দরবারে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভের পর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কথিত আছে রসূলে পাক (স.) -এর রওজা পাকের কাছে অবস্থানকালে তিনি মহানবী (স.) -কে তিনবার স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁকে ইসলামের বাণীকে এদেশে প্রচার করার নির্দেশ দেন।[১১৪]

---

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১১১. প্রাগুক্ত।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১১৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, *বাংলাদেশে কতিপয় সংগ্রামী আলেম ও পীর মাশায়েখ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে, ১৯৮৮, পৃ. ২০

১১৪. ড. ফকির আবদুল রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

অষ্টাদশ শতাব্দীর থেকে সূফি জগতে ওজুদিয়ে ও শহুদিয়ে দু' বিপরীত দলের ঝগড়া-বিবাদ বাংলাদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এ সময় শহুদিয়া দরের অগ্রনায়ক ছিলেন হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র) (মৃ. ১৯৩৯ খৃ.)। তিনি মুজাদ্দিদ-ই-আল ফিসানী (র) -এর প্রবর্তিত মুজাদ্দাদিয়া তরীকার অনুসারি ছিলেন। মাওলানা রুহুল আমীন (১৮৯২-১৯৪৫ খৃ.) হযরত মুজাদ্দিদ-আলফিসানী তরিকায় হযরত আবু বকর সিদ্দিকীর (র.) অন্যতম খলিফা ছিলেন। তিনি 'তাসাউফ তত্ত্ব' নামে শহুদিয়া দৃষ্টিভঙ্গির একখানা পুস্তক রচনা করেছিলেন। তৎকালীন উভয় বাংলায় তাঁর সমভাবে পদচারণা ছিল।[১১৫]

দক্ষিণ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাধক হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফি নেছারুদ্দিন আহমদ (১৮৭৩-১৯৫২ খৃ.)। তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.)-এর দরবারে একদিন হাজির হন। পীর সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা আপনি মুরিদ হতে এসেছেন।" উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ। পীর সাহেব তাকে মুজাদ্দেদিয়া তরিকায় ছবক কৃলবে বসালেন। জনশ্রুতি আছে তিনি মাগরিব হতে ইশার নামায পর্যন্ত একইভাবে মোবাকাবায় বা ধ্যানে মগ্ন ছিলেন এবং পীর সাহেব তাকে ডেকে সে কঠিন ধ্যান ভঙ্গ করান।[১১৬]

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র.) (১৯০০-১৯৭২ খৃ.) ছিলেন একজন জ্ঞান তাপস ও একনিষ্ঠ আবেদ। তিনি মহামনীষী শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভীর দর্শনের ভাবশিষ্য ছিলেন। ইজতিহাদের উপর তার জ্ঞানগর্ভ গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ রয়েছে।[১১৭]

ফেনীর হযরত শাহ্ সৈয়দ আমির উদ্দিন (র) ওরফে পাগলা মিয়া (জন্ম ১২৩০-মৃত ১২৯৭ খৃ.) তিনি কাদরিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। জনশ্রুতি আছে, ফেনী শহরের বাজার জমে উঠেছিল না। তাঁর উপস্থিতিতে বাজারটি জমে উঠেছিল।[১১৮]

উনবিংশ শতাব্দীর (উপমহাদেশে) শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ও সূফি সাধক মাওলানা সামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৫-১৯৬৮ খৃ.) ছিলেন সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।[১১৯] 'তাসাউফ' বা সূফিবাদ সম্পর্কে মাওলানা ফরিদপুরীর লিখিত 'তাসাউফ তত্ত্ব' নামক বইখানা একটি মূল্যবান গ্রন্থ। পুস্তকটির বৈশিষ্ট্য হলো, তাসাউফকে কেন্দ্র করে যে সব স্বার্থপরতা চলছে সে সব বিষয় তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং খাঁটি অখাঁটি তাসাউফ চেনার জন্য চমৎকার মানদন্ড নির্বাচন করেছেন।[১২০] তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার একটি দিক ছিল তিনি ২৪ তালীম ও তালকীন দিতেন। ফজর বাদ কিতাব লিখতেন। ৮.০০ টার পর আগত লোকদের সাক্ষাত করতেন। বেলা

---

১১৫. মুহম্মদ শাহজাহান খান, *তাজকিরাতুল আউলিয়া*, ঢাকা : বিসমিল্লাহ বুক ডিপো, ২০০৫, পৃ. ৪৬৫

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

১১৮. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

১১৯. মুহম্মদ শাহজাহান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭২

১২০. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১

১১.০০ টায় গোসল করে একটু বিশ্রাম নিতেন। বাদ জোহর আম মজলিসে বসতেন এবং বাদ আসর বিবিধ লোকদের সাক্ষাত দিতেন।[১২১]

বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ও সাধক পীর মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর (১৯০০-১৯৮৭ খৃ.)। তিনি শিক্ষা সমাপ্তির পর মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর নিকট বায়াত হন ও আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ লাভ করেন। একাধারে প্রায় ছয় মাস তার কাছ থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন।[১২২] কথিত আছে তিনি ছয় মাস আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে 'ফানা ফিশ্‌শাইখ' 'ফানা ফিল্লাহ' তথা সুলুকের স্তরে 'মাকামে আবদিয়াত' লাভে ধন্য হয়েছিলেন।[১২৩]

আঠার শতকের বিখ্যাত দরবেশ বদিউদ্দীন শাহ্-ই-মাদার (র) যিনি পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে বাংলাদেশ এসেছেন। তিনি মাদারিয়া তরীকায় প্রতিষ্ঠাতা। মাদারীপুর শহরটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে।

এছাড়া সারা বাংলায় আরো অগনিত সূফি সাধক বিদ্যমান ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত শাহনুর নিয়ামতুল্ল্যাহ, হযরত কবীর শাহ্, হযরত ঝুনঝানী শাহ, হযরত বন্দেনী শাহ্, হযরত শাহ্ শরীফ জিন্দানী, শাহ মহসীন আওলিয়া শাহ্ ওমর, শাহ্ আমানুল্লাহ্, শাহ্ আবুল হোসেন, হযরত মিরান শাহ্, পীর আযম শাহ, হযরত শাহ্ দাউদ, হযরত শাহ পালোয়ান আনসারী, দেওয়ান গরীব শাহ্, হযরত কুতুব শাহ্, হযরত মাওলানা নাফিসুর রহমান হক্কোন নূরী, দরবেশ শাহ্ ইয়ারউদ্দীন, শাহ মালেক ইয়েমেনী, মীর সৈযদ আলী তাবরেজী, হযরত শাহ্ কামাল, হযরত শাহ কাসেমুদ্দীন, হযরত শাহ্ আব্দুল খালেক বোখারী (র) প্রমুখ সূফি সাধক কঠোর সাধনা করে চলে গেছেন।

১২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৩
১২২. মুহম্মদ শাহজাহান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫
১২৩. ড. ফকির আবদুল রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি

বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামের প্রভাব

ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন ধর্মভীরু মুসলমান। তার পূর্ব পুরুষ শেখ আউয়াল ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এ দেশে আগমন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন শেখ আউয়ালের সপ্তম অধঃস্তন বংশধর।[১] বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার সুফি চরিত্রের মানুষ। তাঁর পিতা পবিত্র কুরআনের সুরা হুদ এর পঞ্চম রুকুর শেষ আয়াতে 'মুজিব' শব্দের অনুসরণে তার জেষ্ঠ্য পুত্রের নামকরণ করেছিলেন। 'মুজিব' মানে প্রত্যুত্তর। 'মুজিবুর রহমান' নামের শাব্দিক অর্থ তাই রহমান বা স্রষ্টার প্রত্যুত্তর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ বাঙালিদের স্বাধীনতার আর্তি ও করুণ ফরিয়াদের প্রত্যুত্তর হিসেবেই জন্ম হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তাঁর নামের সার্থকতা প্রমাণ করে গেছেন। কেবলই তাই নয়, তার পূর্ব পুরুষ শেখ আওয়ালের মত তিনিও বাংলাদেশে ইসলামের অনন্য সেবা করে গেছেন।[২]

মহানবী (স.) এর বাণী- "তুমি অত্যাচারিতের দু'আ (অভিশাপ) -কে ভয় কর কেননা, অত্যাচারিতের দু'আ এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।"[৩] এর বাস্তব অনুসারী হিসাবে ইসলামের পতাকাতলে নিজেকে সপেঁ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। জালিমের প্রতিরোধ, জুলুমের অবসান, মজলুমের পক্ষাবলম্বন প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধকে সারা জীবন লালন করে এর প্রচার ও প্রসারে অনবদ্য অবদান রেখেছেন তিনি।

উপমহাদেশে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে পবিত্র ইসলামের নামে বাঙ্গালিদের ওপর অত্যাচার, শাসন, শোষণ, নির্যাতন করা হত। জুয়া, চুরিসহ সকল প্রকার অনৈসলামিক কাজ চালু ছিল। ভাগ্য নিয়ে খেলা হত ছিনিমিনি। ২৪ বছরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙ্গালি জাতি ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বা চারটি ধর্মের অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত। মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ- এ চারটি সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সবার লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে সবার নিকট একটি গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা। যাতে পাকিস্তান আমলের মত কোন সম্প্রদায়ের ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা না হয়। অন্য তিনটি

---

১. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ইসলামী খিদমত*, পিরোজপুর : সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ২

২. প্রাগুক্ত

৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, দেওবন্দ : আল মাকতাবা, আররহীমিয়া ১৩৪৫হি. বাদাউল ওয়াহী অধ্যায়, হাদীস নং- ১৪৯৬

সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে দেশের নামের আগে ‘ইসলাম’ শব্দটি সংযোজন করলে, তা হত তাদের প্রতি অবজ্ঞা ও বিশ্বাসঘাতকতা। যা ইসলামে বৈধ নয়।[৪]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী এক ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, “ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারও নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হল ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়া-চুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বে-ঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার এই বাংলাদেশের মাটিতে চলছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।”[৫]

ইসলাম বিবেকের স্বাধীনতার প্রতি অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, “দ্বীন সম্পর্কে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।”[৬] মহান আল্লাহ আরও বলেন, “আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলে অবশ্যই ইমান আনত; তবে কি আপনি মু’মিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন?[৭] পরমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে (প্রতিমাদেরকে) তারা ডাকে, সেগুলোকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালজ্ঘন করে অজ্ঞতাবসত আল্লাহকেও গালি দিবে; এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সু-শোভন করেছি।”[৮]

আমিরুল মু’মীনিন হযরত ওমর (রা.)-এর এক অমুসলিম কৃতদাস ছিল। কয়েকজন সাহাবী তাকে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ করেন। সে অসম্মতি প্রকাশ করে। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করা হয়। তিনি বলেন, “তার এরূপ বলার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।”[৯] দীনের দাওয়াতের বোলায়, ইসলাম গ্রহণের আহবানের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) সর্বদাই মহান আল্লাহর বাণী- “দীন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।”[১০] এ

৪. মওলানা আবদুল আউয়াল, *বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ১৬
৫. *প্রাগুক্ত*
৬. আল-কুরআন, ২ : ২৫৬
৭. আল-কুরআন, ১০ : ৯৯
৮. আল-কুরআন, ৬ : ১০৮
৯. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *আত-তারিকুল ইসলামী*, ঢাকা : ১৯৮৮, পৃ. ১৭৬-৭৭
১০. আল-কুরআন, ২ : ২৫৬

আয়াতের অনুসরণ করতেন। পরমতের প্রতি উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রতি ইসলাম সর্বদা উৎসাহ প্রদান করে আসছে।

বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরমতসহিষ্ণুতাকে বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি গ্রহন করে কুরআন-সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ-ই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকৃত স্বাধীনতার শরীরে গ্রথিত হয়েছে সত্য ও সুন্দরের নতুন পালক।

বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি জীবনে একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। ইসলামী আদর্শ, আকীদা, তাহযীব, তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। পবিত্র ইসলাম ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারকারী একটি শ্রেণী সবসময় অপপ্রচার করে আসছে বঙ্গবন্ধু "ইসলাম বিরোধী" ছিলেন। তাদের মতে, পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা ছিল, ইসলামের বিরোধিতা। মাঝে মধ্যে বঙ্গবন্ধুও তাদের এসব অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে নভেম্বরে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান বেতারে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন-

> আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে যে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম মহানবী (স.)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে, ন্যায় ও সুবিচারের আমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে আমাদের সংগ্রাম সেসকল মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাশের সম্ভাবনা ভাবতে পারেন তারাই। ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা শায়েস্তা করার জন্য।[১১]

এখানেও বঙ্গবন্ধু ধর্ম বিষয়ে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের পাশাপাশি স্বাধীনতার সুক্ষ্ম স্বরূপ দেশবাসীর সামনে অত্যন্ত আবেগঘন হৃদয়গ্রাহীরূপে পেশ করেছেন। তিনি অত্যাচার ও শোষণ-বঞ্চনাকে ধর্মহীনতা ও পরাধীনতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তরকালে বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে তারা চারদিকে প্রচার শুরু করে যে, পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে এদেশে ইসলামের নাম-গন্ধও থাকবে না। তারা হানাদার পাকবাহিনীর হত্যা, নারী নির্যাতন, লুণ্ঠন ইত্যাদিকে ইসলাম রক্ষার নামে জায়েজ বলে ফতোয়া প্রদান করে। নিজেরা রাজাকার, আল-বদর ইত্যাদি সেজে এদেশের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অত্যাচার সহ্য করেন নি। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিযুদ্ধের তুলনায় সবচেয়ে স্বল্পতম সময়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পর বিশ্ববাসী এমনকি অপপ্রচারকারীরা দেখতে পেল এদেশ থেকে ইসলাম উঠে যায়নি। মূলত এরা ধর্মের দোহাই দিলেও অধর্ম করেছে চূড়ান্তভাবে। কারণ নারী নির্যাতন, লুণ্ঠন-ব্যাভিচার কোনভাবেই ধর্মের অংশ হতে পারেনা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বরখেলাপ করে তারা যেমন

---

১১. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২৩-২৪

পরাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে তেমনিভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে পবিত্র ইসলামকেও কলুষিত করেছে।[১২]

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে ভারতের পালাম বিমান বন্দরে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি.গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রতি বঙ্গবন্ধুকে শুভেচ্ছা জানান। বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেনঃ "আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্য কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ তৃপ্তি নিয়ে যে, অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে, অবিবচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভর বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে।"[১৩]

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলার ইতিহাসে বৃহত্তম জনসমাবেশে অশ্রুসিক্ত নয়নে দৃপ্ত ঘোষণা করেন-

> আজকের এই শুভলগ্নে সর্বপ্রথমে আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সেই বীর শহীদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানীদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম। গত ৭ মার্চ এ ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলুন। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনার বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, একজন বাঙ্গালীর প্রাণ থাকতেও আমরা এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে তারা বীরের জাতি, তারা নিজের অধিকার অর্জন করে মানুষের মত বাঁচতে জানে।[১৪]

উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেন- "বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বে-ইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না।"[১৫]

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এই ঘোষণার মাধ্যমে ধর্মের আলোকে নারী স্বাধীনতা ও ইসলাম সুরক্ষার নীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কতটা আন্তরিক ও সুদৃঢ় মনের অধিকারী ছিলেন- সে সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বর্ণনা দিয়েছেন "বঙ্গবন্ধু, যে রকম দেখেছি" প্রবন্ধে। এখানে তার উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হল:

---

১২. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

১৩. ডা. শাহাদাত হোসেন, *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৯, পৃ. ৭০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

১৫. প্রাগুক্ত

> তৎকালীন টেলিভিশনের মহাপরিচালক জামিল চৌধুরী আমাকে দিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা রেকর্ড করিয়ে নিল। এগুলো ছিল জীবনযাপনের ন্যায়নীতি সংক্রান্ত কথা। সে আমাকে জানালো, যেহেতু বাংলাদেশ এখন ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, সুতরাং রেডিও-টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের শুরুতে কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হবে না, তার পরিবর্তে কিছু আদর্শগত বাণী পাঠ করা হবে। এই বাণী বোধহয় একদিন কি দু'দিন টেলিভিশন থেকে পাঠ করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এ বাণী শুনে ভয়ানক রুষ্ট হয়ে জামিল চৌধুরীকে ডেকে পাঠান। সেখানে এম. আর. আক্তার মুকুল এবং আরও কয়েকজন ছিলেন। সম্ভবত আওয়ামী লীগের নেতা টাঙ্গাইলের আবদুল মান্নান সেখানে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু জামিল চৌধুরীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, "একজন মুসলমানের বাড়িতে সকাল বেলা কিসের শব্দ শোনা যায়, গানের না হরিবোলের?" সবাই তখন তটস্থ হয়ে গেছে। তিনি তখন নিজেই উত্তর দিলেন, "মুসলমানের ঘরে কুরআন শরীফের আওয়াজ শোনা যায়। আজ থেকেই রেডিও-টেলিভিশনে অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি কুরআন শরীফের আওয়াজ শুনতে চাই।" তিনি অবশ্য অবিকল এ ভাষায় বলেন নি। তাঁর একটা দেশজ ভঙ্গি ছিল সেটা সকলেই জানেন। তাঁর বলার ভঙ্গিতে একটা স্বাভাবিক বলিষ্ঠ প্রত্যয় ধরা পড়ত।[১৬]

তিনি (সৈয়দ আলী আহসান) আরো বলেন-

> এর মধ্যে একদিন চানখাঁরপুলের আওয়ামী লীগের যুবককর্মীরা আমাকে (সৈয়দ আলী আহসানকে) সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে গেল। তাদের আবেদন, তিনি যে সুস্থভাবে পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছেন সেজন্য তারা একটি উৎসব করবে। উৎসবের জন্য কিছু টাকা প্রয়োজন। তিনি তাদেরকে বলেন, "পাবি, টাকা আমি দেব, তবে কি করবি?" ওরা সমস্বরে বলল, "আমরা বাজি পোড়াব, গানবাজনা করব।" তিনি তাঁর অনবদ্য ক্রোধের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ মুসলমানরা খুশী হইলে বাজি পোড়ায় না মিলাদ পড়ায়? যা, মিলাদের ব্যবস্থা কর। আর সৈয়দ সাহেবকে দিয়ে মিলাদ পড়াইয়া দে।" আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, "আমি মিলাদ পড়াতে জানিনা।" তিনি একটি ছদ্ম রাগ দেখিয়ে আমাকে বললেন, "মিথ্যা কথা কন ক্যান, আপনি পড়াইবেন, যান।" যাই হোক মিলাদের অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং সেজন্য মৌলভী সাহেব আনা হয়েছিল। মিলাদের পর তেহারী খাওয়া হয়েছিল এবং একেবারে শেষে কিছু বাজিও পোড়ানো হয়েছিল।[১৭]

উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন-

> এই সময় ঢাকা শহরে বুদ্ধিজীবী মহল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কয়েকটি বিবৃতি কাগজে বের করা হয়। আমি নিজে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলাম না, কিন্তু আমি মাদ্রাসা শিক্ষার সংশোধন চেয়েছিলাম। কিছুটা চাপে পড়ে আমিও এরকম একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলাম। কাগজে আমার নাম দেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ এসহাক আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং দুঃখ করে বলেন যে আমার এ বিবৃতিতে সই করা উচিত হয়নি। আমি আমার ত্রুটি বুঝতে পারি এবং কি করে ওটা দূর করা যায় তা চিন্তা করতে থাকি। শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলীর সঙ্গে দেখা করলে সে আমাকে জানায় যে ড. মল্লিক মাদ্রাসার জন্য সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেবার একটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিচ্ছেন। ইউসুফ আমাকে জানালো যে বঙ্গবন্ধু যাতে এ ফাইল অনুমোদন না করেন সে ব্যবস্থা সে করবে। বঙ্গবন্ধু ফাইলের উপরে লিখেছিলেন যে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য যে বরাদ্দ এতদিন ছিল সেটাই থাকবে। তবে ভবিষ্যতে এ বরাদ্দ বাড়ানো যায় কিনা এবং কতটা বাড়ানো যায় তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ইউসুফ পরে

১৬. সৈয়দ আলী আহসান, "বঙ্গবন্ধু, যে রকম দেখেছি", *অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইফাবা, আগষ্ট- ২০১০, পৃ. ২৭
১৭. প্রাগুক্ত

> আমাকে জানিয়েছিল, বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষকে জানেন এবং এদেশের মানুষ যে মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে তাও তিনি জানেন। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করবেন, এটা কল্পনাই করা যায় না।[১৮]

এর কিছুদিন পর বঙ্গবন্ধু সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার এক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং অনবদ্য এক ভাষণ দান করেন। সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান বলেন-

> "আলিয়া মাদ্রাসার অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি একটি অনন্যসাধারণ ভাষণ বলে আমার মনে হয়েছিল। তিনি তাঁর ভাষণে এক পর্যায়ে বলেছিলেন, "আমাদের দেশে পাকিস্তান আমলে ইসলাম বিরোধী বহু কাজ হয়েছে। রেসের নামে জুয়াখেলা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ছিল, আপনারা আলেম সমাজ কোনদিন এর প্রতিবাদ করেননি। ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সাহায্যে প্রকাশ্যে জুয়াখেলা চলত, এগুলো বন্ধ করার কোনও আন্দোলন আপনারা করেননি। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবার কথা বারবার বলেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় জুয়া এবং মদকে যে হারাম ঘোষণা করতে হয় সেটা আপনারা জানতেন, কিন্তু আপনারা এগুলোর বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। আমি ক্ষমতায় এসে প্রথমেই ঘোড় দৌড় বন্ধ করে দিয়েছি, পুলিশকে তৎপর হতে বলেছি শহরের আনাচে-কানাচে জুয়াড়ীদের আড্ডা ভেঙে দিতে। আমি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ম বিরোধিতা নয়। আমি মুসলমান, আমি ইসলামকে ভালোবাসি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, দেখবেন, এদেশে ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ড কখনই হবে না।"[১৯]

ইসলামের বিধানের প্রতি জাতির জনকের অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাশের বিপক্ষে তাঁর অনমনীয় ও সুদৃঢ় অবস্থানের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যে। তাঁর এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে ইসলামের চিরন্তন কল্যাণকামী বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর এ ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (স.)- এর ইসলাম, ইসলামের সুমহান শিক্ষা; অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইসলামের আপোষহীন অবস্থান; প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও মুনাফিকির বিরুদ্ধে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি তাঁর সুদৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মূলে ছিল এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের নিরলস প্রচেষ্টা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যেমন একজন খাঁটি বাঙালি, তেমনি ছিলেন একজন ঈমানদার মুসলমান। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের স্বল্পকালীন শাসনামলেও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ বা ধোঁকাবাজির রাজনীতি করতেন না । বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে, পাকিস্তানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও হিমাদ্রিস্পর্শী এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি যদি তাঁর অতীতের সকল অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে নতুনভাবে সব কাজ শুরু করতেন, তবু তাঁর বিরুদ্ধে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াবার সাহস পেত না। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি কখনই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। বঙ্গবন্ধু জীবনে একটিবারের জন্যও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নি। এ দৃঢ় মানসিকতার জন্য তাঁকে সারা জীবন জেল-জুলুম ও অত্যচার

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
১৯. সৈয়দ আলী আহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯

নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। ৭০ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে শতকরা ৯৫ জন মুসলমানের দেশে ইসলাম-বিরোধী কোনো আইন পাস করা হবে না বলে তিনি যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে ছিলেন, তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি।

স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধু

বিশ্বের সকল অঞ্চলে, সকল মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সহজাত; স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ এবং আকুতি স্বতঃস্ফূর্ত। এ কারণে মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীনতা প্রিয়। পরাধীনতাকে মানুষ মুহূর্তের জন্যও বরদাস্ত করতে রাজি নয়। তাই তার প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা ছাড়া মানব বিপন্ন হবার উপক্রম হলেই সে সর্বস্ব দিয়ে রুখে দাঁড়ায়। যে কোন মূল্যে সে স্বাধীনতা ছাড়া মানব জীবন কল্পনা করা যায় না। এক কথায় মানুষ শত বছর গোলামীর গ্লানিময় জীবনের চাইতে একদিনের স্বাধীন জীবনকে বেশি মূল্য দেয়। মানুষ জন্মগত এবং প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীনতা প্রয়াসী। এজন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির স্বাধীনতার জন্য মানুষের নিজের জীবন কুরবানী দিতেও কুণ্ঠিত নয়। মানুষের মুক্তির ধর্ম ইসলামে স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বাধীনতা মানুষের স্বভাবের দাবি স্ব-উপলব্ধিতে তা দেদীপ্যমান। সব সমাজ ব্যবস্থায় স্বাধীনতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা বিষয়টি মানব স্বভাবের সাথে এমনভাবে জড়িত এবং মানুষের মানবতাবোধ ও উপলব্ধির সাথে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যে, কোন সময় তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী হয় না। স্বাধীনতা শব্দের ভেতরেই লুকিয়ে আছে এর প্রকৃত অর্থ। নীল আকাশে মুক্ত বিহঙ্গ উড়ে যাওয়া, হৃদয়ের গভীরে আনন্দের ছোঁয়া, স্বদেশ ভূমিতে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে স্ব-চিন্তায় কর্ম করার নামেই মুক্ত জীবনযাপন। মোট কথা ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন বাঁধা মুক্ত থাকা। স্বাধীনতার অর্থ মুক্ত জীবন হলেও, স্বাধীনতা তখন সঠিক বলে বিবেচিত হয়, যখন তা হয়ে উঠে সামগ্রিক। স্বাধীনতা শব্দটির সাথে আত্মবিশ্বাস কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীনতার অর্থ একদিকে শৃঙ্খল মুক্তি, অন্যদিকে পরনির্ভরশীলতা থেকেও মুক্ত হওয়া।[২০] সুতরাং যার নিজের প্রতি বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই, সে কখনো একটি জাতির বিকাশের জন্যে দায়িত্ব পালন, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতার চেতনায় অবিচল থাকতে পারে না।

প্রতিটি মানব শিশুর আবির্ভাব যে কোন ধর্ম, সংস্কৃতির পরিমণ্ডলেই হোক না কেন, সে সত্য ধর্ম ইসলামকে ধারণ করেই তার আবির্ভাব ঘোষণা করে।[২১] পারিবারিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আবহাওয়া শিশুটিকে একটি ধর্মের আবর্তে টেনে নেয়। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন জীবনবোধ ও দর্শনে দীক্ষা নেয়। মানুষ যখন শিশু অবস্থায় থাকে তখন তার মধ্যে

২০. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০, পৃ. ৫৪-৫৫

২১. এটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত বুখারী শরীফের একটি হাদীসের ভাবার্থ। হাদিসটির জন্য দেখুন- মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, দেওবন্দ : আল-মাকতাবা আল-রহীমিয়া, ১৩৪৫হি., বাদাউল ওয়াহী অধ্যায়, হাদিস নং- ১৩৮৫

বোধের উন্মেষ ঘটে না, তখন সে ফিতরাত বা প্রাকৃতিক স্বভাবের অনুগামী। আর শিশুমাত্রই প্রাকৃতিক ও স্বভাবগতভাবে স্বাধীন। শিশু যখন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে থাকে তখন তার মাঝে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বা তার সহজাত বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হয়।

আর এ বিপ্লবী কার্য সম্পাদন করার জন্যই দুনিয়াতে ইসলামের আগমন। একথাও ঠিক যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভেতরে জাতি, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি প্রশ্নে বহু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, বাহ্যিক পার্থক্য যত প্রকটই হোক না কেন, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে অতিরিক্ত এমন কতগুলো সাদৃশ্য ও ঐক্য রয়েছে, যা প্রত্যেক মানুষের ভিতরে সমানভাবে প্রযোজ্য এবং মানবীয় অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এইগুলো হচ্ছে মুখ্য এবং অধিক গুরুত্ববহ। ইসলাম সর্বপ্রথম দুনিয়ার বুকে এ বাণী উচ্চারণ করেছে। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে এমন একটি সমাজ গঠন করা, যা মানুষের স্বাভাবিক বৈষম্য ও আপেক্ষিকতার প্রাচীরকে চূর্ণ করে তাদের মানসিক চিন্তাধারার মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধন করবে। এই মৌলিকত্ব; বরং একই অনিবার্য প্রভাবে ফিরে আসবে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা।[২২]

ইসলামের পরিভাষায় মানব চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে 'ফিতরাত' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই ফিতরাত অর্থাৎ স্বভাবজাত অভিপ্রায়, চেতনা, অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত এবং ভারসাম্যপূর্ণ স্ফুরণ মানুষকে প্রকৃত মানুষের মর্যাদায় বিকশিত করে। মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিজগত অনুপম সুশৃংখলতায় নিখুঁত ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। সেখানে অল্প একটু অসুবিধা ঘটলেই মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে। এখানেও সেই ফিতরাতের কুদরতী মহিমা আমরা প্রত্যক্ষ করি। মানুষ এই ফিতরাতের অদৃশ্য ইশারায় চালিত হয় বলেই একে বাধাগ্রস্থ বা শৃঙ্খলিত করতে গেলে প্রতিবাদের ভাষা ফুটে ওঠে, দেখা দেয় নানা বিশৃঙ্খলা, বিক্ষোভ বিদ্রোহ। মানুষ যখন কোন রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার শরীর নামক যন্ত্রটির স্বাভাবিক 'সিস্টেম' ব্যাহত হয় বলেই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। অনুরূপ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই স্বাভাবিকতার দাবি অপরিহার্য।[২৩] এই দাবিকে অগ্রাহ্য করে অস্বাভাবিক পন্থায় নানা পদক্ষেপ গৃহীত হওয়ার ফলে নানা অপতৎপরতার শিকড় বিস্তৃত করেছে। ফলে পৃথিবীতে যত অশান্তি, হানাহানি, রক্তারক্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে। অথচ আল্লাহ পাক যে, ফিতরাতের অনন্য বৈশিষ্ট্য মহিমান্বিত করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখতে পারলে কোন সমস্যাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য বা ফিতরাতের মধ্যেই স্বাধীনতার মহিমা লুক্কায়িত। মানুষ যেহেতু জন্মগত এবং স্বভাবগতভাবে স্বাধীন থাকতে পছন্দ করে, তাই এই পছন্দের যে চেতনা, তার সঙ্গে ভারসাম্য বা পরিমিত বোধ সংযুক্ত হলে স্বাধীনতা সত্যিকারভাবে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। ব্যাপারটিকে আরও স্পষ্ট করে এভাবে বলা যায় যে, শৃঙ্খলাহীন, ভারসাম্যহীন যথেচ্ছাচার ফিতরাত যথার্থ স্বাধীনতার ঐশ্বর্যময় চেতনাকে প্রতিভাসিত করে না। স্বাধীনতা চেতনা মুক্ত হয়েও সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি ও ভারসাম্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ইসলামের দ্বীন ফিতরাত বা মানুষের স্বভাব ধর্ম।

---

২২. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান প্রমুখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

"ইসলাম মানুষের এই প্রকৃতিগত স্বভাব তথা সৃষ্টি জগৎ ফিতরাতকে সুষমভাবে বিকশিত করার পন্থা নির্দেশ করে। এটা মানুষের স্বভাবকে রুদ্ধ করে না; বরং সর্বতোভাবে পরিস্ফুটিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। যে কোন রকম অন্যায় সীমালংঘন, অনাচার, যথেচ্ছাচার স্বাধীনতার সুমহান চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে, বিপর্যস্ত করে। "নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[২৪] পবিত্র কুরআনের এই উক্তি স্বাধীনতার যথার্থ শক্তিকে চমৎকারভাবেই চিহ্নিত করেছে। সুতরাং স্বাধীনতার পরিপূর্ণ আদলকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, এটা–

১. মানব চেতনার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ।
২. জোর-জবরদস্তিমুক্ত পরিবেশের সুযোগ।
৩. ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ, কাজকর্ম।
৪. অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ।

স্বাধীনতার এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করলে যে একটি একীভূত চিত্র পাই, ইসলামী আদর্শ ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তা একেবারেই অভিন্ন। বস্তুত ইসলাম মানুষের জন্য যে কল্যাণময়, ভারসাম্যপূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত, ফিতরাত, জীবনের নিশ্চয়তা বিধান অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা চিহ্নিত করে দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেই আদর্শ স্বাধীনতার ব্যঞ্জন ভাস্কর। একদিকে জোর-জবরদস্তি, ক্ষমতাশালীর নিপীড়ন, নির্যাতন, সন্ত্রাস, অন্যদিকে নিরীহদের নীরবে সেগুলো সহ্য করা এর কোনটাই মানবাধিকারের মধ্যে তথা স্বাধীনতার গণ্ডির মধ্যে পড়ে না।

ইসলাম স্বাধীনতার মূলচেতনা ও প্রাণশক্তিকে ব্যাপক বিস্তারিত পটভূমিকায় দেখতে চায় বলেই তার ভারসাম্যপূর্ণ, কল্যাণকামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই তাকে ধারণ করেছে নিখুঁতভাবে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলামী জীবনধারা এবং জীবন প্রক্রিয়ার মধ্যেই যথার্থ স্বাধীনতা চেতনা ক্রিয়াশীল। যেখানে ফিতরাত আছে, ভারসাম্য আছে কিন্তু জবরদস্তি ও যথেচ্ছাচারের কোন সুযোগ সেখানে নেই।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী এই সীমারেখা অতিক্রম করে যতবার অবিচার ও জোর-জবরদস্তির আশ্রয় নিয়েছিল, ততবারই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়েছে, প্রতিবাদের এ প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে স্বাভাবিক (ফিতরাত) ও ভারসাম্য বিনষ্টকারী শাসক চক্রের বিরুদ্ধে। বলা বাহুল্য, এই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলা, এটাই ছিল এদেশবাসীর স্বাভাবিক মানবিক অধিকার। আল্লাহ তআলা বলেন, "আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।"[২৫]

এই শাশ্বত বাণী দীপ্ত সূর্যের ন্যায় বাস্তবে পরিণত হলো, ১৯৭১ সালের দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে। অন্যায়কারীদের আল্লাহ সাহায্য করেন না। তিনি সাহায্য

২৪. আল-কুরআন, ২ : ১৯০
২৫. আল-কুরআন, ২ : ১৯০

করেন ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারীদের। বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি জিহাদ এবং দুনিয়ার সকল ন্যায় যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধও ছিল সন্দেহাতীতভাবে একটি ন্যায়যুদ্ধ। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ও লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা। এটা আমাদের জন্য আল্লাহর এক বড় নি'মাত। মহান স্বাধীনতা অর্জনের এই ঐতিহাসিক শুভক্ষণে আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন হবে যে, শুধু রাজনৈতিক বা ভৌগোলিকভাবে স্বাধীন হলেই সব কিছু অর্জিত হয়ে যায় না। স্বাধীনতাকে ফলপ্রসূ ও অর্থবহ করতে হলে সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, ভারসাম্য ও স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। জীবন এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে এই ভারসাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যায়, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা, নৈতিক অবক্ষয় প্রভৃতির চির অবসান ঘটবে। আর এ সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা তো ইসলামই দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা আল্লাহ প্রদত্ত এক মহা নি'মাত। আর পরাধীন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ্ পাকের আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষের আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের স্বার্থে স্বাধীনতা এত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় এ স্বাধীনতা তাঁর পছন্দের অনুকূলে না হলেও তিনি তার অবকাশ দেন। সার্বভৌম শক্তির আধার অসীম ক্ষমতাধর হয়েও তিনি চান না মানুষকে ধরে বেঁধে জোরপূর্বক তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রতি নতি স্বীকার করাতে। ইসলাম আল্লাহর একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।[২৬] আর এই ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার। সুতরাং ইসলামের বাইরে যত ধর্ম এখন প্রচলিত, তা আল্লাহ অনুমোদিত নয় এবং জীবনাচার পদ্ধতি ও সংস্কৃতি যারা অনুসরণ করেছে তা স্পষ্টই আল্লাহর প্রদত্ত জীবন ও আত্মাকে অপবিত্র করেছে। আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু তারপরও আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মানুষের বিবেক ও তার স্বাধীনতা হরণ করেন নি। হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্য মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়ার পর যে কেউ সত্য বা মিথ্যাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন। এর অর্থ হচ্ছে বেহেশত বা দোযখ যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ব্যাপারেও মানুষ স্বাধীন। আল্লাহ তাঁর নবীকে এমন অধিকার দেননি যাতে তিনি জবরদস্তি করে কাউকে ইসলামে দাখিল করাতে পারেন। হিদায়াতের এখতিয়ার তো আল্লাহরই হাতে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ বলেছেন, 'সতর্ককারী' ও 'সু সংবাদদাতা'।[২৭] উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেন না। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আর কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা হয়েছে—

"যার মন চায় সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমকে স্বীকার করবে। আর যার মন চায় সে কুফরী করবে অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করবে।"[২৮] মানুষের ইচ্ছাশক্তির এই যে স্বাধীনতা আল্লাহরই দান। তিনি চান মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করুক এবং গোটা বিশ্বের যিনি শ্রেষ্ঠ মহান স্রষ্টা তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় খুঁজে বের করুক। তিনি তাঁর প্রিয় সৃষ্টি, সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের কাছে কি চান, অতঃপর সে তার মহাস্রষ্টার ইচ্ছার

২৬. আল-কুরআন ৩ : ১৯
২৭. আল-কুরআন ৪৮ : ৮
২৮. আল-কুরআন ১৮ : ২৯

কাছে আত্মসমর্পণ করুক। এতেই তার কল্যাণ আর এর ভেতরেই রয়েছে তার আত্মবিকাশের মূলসূত্র। এটিই তাঁর স্বাভাবিক ফিতরাত। আর এই ফিতরাতের অনুকূলে অগ্রসর হলেই কেবল তার অগ্রগতি আসবে। আসবে তার নিশ্চিত প্রগতি। আর উল্টোটি করলে স্বীয় প্রকৃতির সঙ্গেই কেবল যুদ্ধ করা হবে। এতে করে মানুষের অগ্রগতি সাধিত হবে না।

ইসলামে ব্যক্তির পরিমণ্ডল থেকে শুরু হয় স্বাধীনতার যাত্রা। তাওহীদবাদীদের আকীদার আলোকে প্রথমে সে জড় ও সৃষ্ট বিশ্বের সকল কিছুর গোলামী থেকে ব্যক্তিকে স্বাধীন করে তোলে। এই আদর্শবাদ ও আকীদাকে গ্রহণ করার পর সে তখন আর মানব কল্পিত বর্ণ ও ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, কৃষ্টি ও রীতি, আদর্শ ও মতবাদ, প্রকৃতি ও পরিবেশ, আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটন, শক্তি ও উপযোগিতা, আঞ্চলিকতা ও ভৌগলিকতা সব ধরণের জড় সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে উর্ধ্বে তুলে মুক্ত করতে পারে। তবে বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতার নাম স্বাধীনতা নয়। তাই তাওহীদের আকীদা অনুসারী একজন মানুষ সকল কিছুর গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আত্মসমর্পণ করে এক আল্লাহর মহিময়তার কাছে, এটা তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়া নয়; বরং এই তার চরম পূর্ণতা আর এই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া। এমনকি এই ক্ষেত্রে "ইসলাম অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই"।[২৯] এ কথার ঘোষণা দিয়ে মানুষের বিবেককে পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছে। সে নিজেই তার ক্রিয়াকর্মের পরিণাম চিন্তা করে গ্রহণ করবে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকে। ইসলাম প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি জাতির নিজ নিজ বিশ্বাস ও স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারে বিশ্বাসী। ইসলাম স্বাধীনতার অর্থে আত্মনির্ভরশীলতা বুঝতে চায় বলেই আল-কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতির তার নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে এগিয়ে না আসে।"[৩০] এই আয়াতে পরিস্কারভাবে বুঝা যায়, ইসলাম চায় প্রত্যেক জাতি তার নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে অর্থাৎ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসুক। ইসলাম পথ দেখিয়ে দেয় মাত্র, তা গ্রহণের দায়িত্ব মানুষের নিজের। এক ও একক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বিশ্বাস এবং তাঁরই ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নামই হলো ইসলাম। তাওহীদের মূলবাণী "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" এই বাণী সেই সার্বভৌম অসীম ক্ষমতার মালিকের নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অন্য যাবতীয় শক্তির গোলামী থেকে মানুষকে মুক্ত করে। এই বাণী একদিকে আল্লাহর প্রতি অনুগত রেখে তাকে সমস্ত দুনিয়ার বুকে অজেয় হিসেবে মাতা তুলে দাঁড়াবার শক্তি জোগায়।

মানুষকে এ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং দেয়া হয়েছে অনেকখানি স্বাধীনতা, যা ফেরেশতাদেরও দেয়া হয়নি।[৩১] মানুষকে যে "আশরাফুল মাখলুকাত" বা সৃষ্টির সেরা বলা হয় সেটা তখনই স্বার্থক হয় যখন মানুষ আল্লাহর বিধান অমান্য করার যে শক্তি তাকে দেয়া হয়েছে, তার মোহে অহমিকাগ্রস্ত না হয়ে তার শক্তিকে আল্লাহর বিধান পালনের কাজে ব্যবহার করে। আল্লাহর দেয়া শক্তি ও স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে, সে যদি আল্লাহর দেয়া

২৯. আল-কুরআন ২ : ২৫৬
৩০. আল-কুরআন ১৩ : ১১
৩১. আল-কুরআন ২ : ৩০-৩৩

বিধানের গণ্ডির মধ্যে তা ব্যবহার করে, তাহলে সে যেন সেরারূপে গণ্য হয়। সৃষ্টির সেরা অবস্থায় মানুষ ফেরেশতারও উপরে উন্নীত হয়, এর কারণ আল্লাহর বিধান অমান্য করার কোন শক্তি ফেরেশতাদের দেয়া হয়নি। তাদেরকে নাফরমানি করার শক্তি দেয়া হয় নি, শুধু শক্তি দেয়া হয়েছে আদেশ মান্য করার। যাকে মান্য অমান্য দুই কাজেরই শক্তি দেয়া হয়েছে। সে যদি আল্লাহর বিধান মান্য করে, তবে অবশ্যই তার মর্যাদা অধিক হতে বাধ্য। এ কারণেই আল্লাহর প্রতি সর্বাবস্থায় আনুগত্যশীল মানুষের স্থান ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে খিলাফতের মর্যাদাপ্রাপ্তির সঙ্গে তার স্বাধীনতার নিবিড় যোগসূত্র আছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুগে যুগে নবী রাসূলগণ বিভিন্ন দেশে মানব জাতির স্বাধীনতা নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে এই পবিত্র সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। নবী রাসূলগণের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারারই চূড়ান্ত স্তরে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের বুকে মুক্তি পতাকাবাহী এক অনন্য সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেন, যা খুলাফায়ে রাশেদার আমল পর্যন্ত চালু থাকে। খুলাফায়ে রাশিদার পরও মানুষের স্বাধীনতার এই চিরন্তন সংগ্রাম বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন পর্যায়ে এগিয়ে গেছে এবং এগিয়ে চলেছে।[৩২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রিওয়ায়াত করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "দুইটি কারণে চোখ কখনো জাহান্নামে যাবে না। একটি হলো আল্লাহর ভয়ে যে কাঁদে, আর অপরটি হলো আল্লাহর রাস্তায় প্রহরায় যে জাগে।"[৩৩] হযরত সাহল ইবন সা'দ বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহর পথে একদিনের জন্য পাহারাদারী করা পৃথিবী ও তার সবকিছু থেকে উত্তম।"[৩৪]

কেউ যদি এই স্বাধীনতা হরণ করতে আসে, তবে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মুসলমান জান দিতে পারে, শহীদ হয়ে যাওয়ার মধ্যে সে তার যিন্দেগী পায়। স্বাধীনতার জন্য তার রক্তবিন্দুকে অপ্রতুল মনে করে। আল-কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন:

"আল্লাহর পথে তোমরা যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।"[৩৫]

স্বাধীনতা মানুষের জন্য কতটুকু কল্যাণকর তার একটি দিক-নির্দেশনাও আল্লাহ পাক তাঁর নবী রাসূলদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এই নির্দেশনা তাঁর ফিতরাতের প্রতিকূল তো নয়ই; বরং তাঁর প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূলে। এ দিক-নির্দেশনা তার স্বাধীনতার পরিপূরক। আমরা বিশ্বাস করি, একমাত্র প্রকৃত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলেই শুধু দূর হতে পারে অন্যায়, শোষণ, জুলুম, ধর্মহীনতা ও ধর্মের অপব্যবহার। তা শুধু মুসলমানদের জন্যই পরম কল্যাণ বয়ে

৩২. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান প্রমুখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

৩৩. আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, *জামি'উত্ তিরমিযী*, দিল্লী : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রি., আল-হারছু ফি ছাবিলিল্লাহি অধ্যায়, হাদীস নং- ১৬৩৯

৩৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, দেওবন্দ : আল মাকতাবা, আররহীমিয়া ১৩৪৫হি., বাদাউল ওয়াহী অধ্যায়, হাদিস নং- ২৮৯২

৩৫. আল-কুরআন ২ : ১৯০

আনবে তা নয়; বরং তা সকল ধর্মের বর্ণের মানুষের জন্যও প্রদান করবে নিরাপত্তা ও মুক্ত জীবনের নিশ্চয়তা। তা হলেই স্বাধীনতার মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখানো হবে।

ইসলাম তাই তার অনুসারীর জন্য পরাধীনতাকে আল্লাহর গযব হিসেবে অভিহিত করেছে এবং সর্বশক্তি দিয়ে এর মোকাবিলা করতে মুসলমানদেরকে আহ্বান জানিয়েছে। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্মমূলে এ আহ্বান বিবৃত। স্বাধীনতা বিপন্ন মুসলিমদের উদ্ধার করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয করা হয়েছে। এর সমর্থনে আল্লাহ পাক বলেন, "আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না? দুর্বল সেই সব পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে-যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকর অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও।"[৩৬]

নিজের জন্য জান-মাল, ইজ্জত-আবরু রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করাও ইসলামের দৃষ্টিতে শাহাদাতের মর্যাদায় সম্মানিত। মহানবী (স.) বলেন: "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ, আর যে ব্যক্তি পরিবার, জীবন ও ধর্ম রক্ষায় নিহত হয়, সেও শহীদ।"[৩৭]

স্বাধীনতাকে আল্লাহ পাক আল কুরআনে বিরাট এক নিয়ামাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বনী ইসরাঈলকে ফিরাউন গোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্তিদানের বিষয়টি আল্লাহ পাক এক মহান পুরস্কার হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেন, "হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার সেই নিয়ামত যা দ্বারা আমি তোমাদের অনুগ্রহ করেছিলাম।"[৩৮] আরও বলা হলো, "স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম ফিরআউনের গোষ্ঠীর কবল থেকে।"[৩৯] মুসলমানদের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ তাদের আত্মসচেতনতা, আর তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতভিত্তিক জীবন দর্শনের মাঝে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় বিধৃত। মুসলমানদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, কেবল এতটুকু অসচেতনতা তাদেরকে পরাধীনতার অন্ধকার তিমিরে নিক্ষেপ করবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে– Eternal vigian is the price of liberty. সার্বক্ষণিক সতর্কতাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল চাবিকাঠি। রাজনীতি ও কূটনীতিতে আজীবন বন্ধু বলে কোন কথা নেই। আজ যে বন্ধু কাল শত্রুও হতে পারে আবার হয়ও বটে। আবার কাল যে শত্রু পরশু সে মিত্রও হতে পারে। কে শত্রু কে মিত্র তা নির্ণীত হবে জাতির সামগ্রিক স্বার্থের নিরিখে।

ইসলাম সামগ্রিকভাবে একটি জীবন বিধান। এখানে স্বাধীনতা হলো সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাধীনতা। ইসলামের পার্থিব, আধ্যাত্মিক ধর্ম প্রচার ও পার্থিব ধর্ম প্রচার দুটোই অবিচ্ছেদ্য। স্বাধীনতার এ নিয়ামত রক্ষা এবং পবিত্র আমানতের হিফাযতও মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের

---

৩৬. আল-কুরআন, ৪ : ৭৫

৩৭. সুলাইমান ইবনে আশআস আস-সিজিসতানি, *সুনানে আবু দাউদ*, বায়রুত : মাওকেউল ইসলাম, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৮৮, হাদীস নং- ৪১-৪২

৩৮. আল-কুরআন, ২ : ৪৭

৩৯. আল-কুরআন, ২ : ৪৯

অন্তর্গত। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের মিলিত আত্মার সমুচ্চারিত ঘোষণা ছিল আল্লাহই মানুষের প্রভু, অভিভাবক, আইনদাতা ও রিযকদাতা। মানুষের মাঝে পদস্খলন ও বিদ্রোহের প্রবণতা সক্রিয় আছে বলেই মানুষকে নিজের সাথে যুদ্ধ করা ও সেই যুদ্ধে জয়ী হবার প্রয়োজন দেখা দেয়। যার দরুন একবার যুদ্ধে জয় করে ফেরার পথে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- "আমরা ছোট যুদ্ধ শেষ করে বড় যুদ্ধের দিকে যাচ্ছি।" সাহাবীরা জানতে চাইলেন বড় যুদ্ধ কোনটি? তিনি বললেন, "রিপু- কুপ্রবৃত্তিকে জয় করার যুদ্ধ।"[৪০]

তাই বলা হয়ে থাকে, যে নিজেকে চিনতে পারে না, সে আল্লাহকেও চিনতে পারে না। নিজেকে চেনার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ মানুষের সত্তার যেসব গুণবাচক বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন তার আবিষ্কার, উদ্বোধন ও রূপায়নে নিজের সাথে চেনা হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালঅ বলেন, তিনি তাঁর রঙে আশরাফুল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন। সে কারণেই মানুষকে সর্বোত্তম আদর্শের অনুসারী হতে হয়।

আল্লাহকে চেনার নিয়ম হচ্ছে এই যে, "মানুষ তাই পায়, সে যা করে। তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে। বস্তুত মানুষ যে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল অবশ্যম্ভাবীরূপে লাভ করবে, তা এক অনস্বীকার্য সত্য এবং তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।"[৪১]

আল্লাহ তা'আলা, মানুষকে তাঁর খলীফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।[৪২] আর এ জন্য অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষের উপর দায়িত্ব ও ন্যস্ত হয়েছে সর্বাধিক। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য তাঁর অধীন করে পাঠান ও মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও বিচার বিবেচনা শক্তি দান করেছেন। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষ তার বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগ করে ভাল পথে চলবে, আল্লাহ তা'আলা এই চান। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য এই স্বাধীন ইচ্ছা মানব জাতির ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেননি। এখানে লক্ষণীয়, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা এই যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা মানুষের ওপর তাঁর প্রগাঢ় আস্থার প্রতিফলন। সুতরাং এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাশক্তির কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমেই মানুষের স্বাধীনতা নিহিত। মানুষ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হয়ে স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার দ্বারা ন্যায় ধর্ম পালন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওয়াক্কুল এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারি। কারণ ঈমান আমাদের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ। এ প্রসঙ্গে

---

৪০. আলাউদ্দীন আলি ইবন মুহাম্মদ আল-বাগদাদী, *তাফসীরে খাযেন*, বায়রূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৭, খ.৫, পৃ. ২৯

৪১. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩৯-৪১

৪২. আল-কুরআন, ২ : ৩০

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর অমোঘ বাণী- "তোমরা নিজেদেরকে হেয় ভেব না এবং ভীত ও শঙ্কিত হয়ো না, পরিণতিতে তোমরাই সফল হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।"[৪৩]

তিনি আরো বলেছেন, "মুমিনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।"[৪৪]

আল্লাহপাক বলেন, "হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্য্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং আর তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে এক সহস্র কাফিরদের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।"[৪৫]

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, "আল্লাহর হুকুমে কত ছোট দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৪৬]

ওপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সমরাস্ত্র কিংবা বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য টাকাই যথেষ্ট কিন্তু টাকায় পাওয়া যায় না কেবল ঈমান, মনোবল আর ইচ্ছাশক্তি। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দুই শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন কোন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে? তাঁর অনুসারীগণ রোম ও পারসিক সাম্রাজ্যকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করেছিল কোন অস্ত্র শক্তিতে? তাঁদের কাছে কি উন্নতমানের অঢেল সমরাস্ত্র, বিশাল সেনাবাহিনী ছিল? দামেস্ক ও বাগদাদের খিলাফত সংখ্যা শক্তিতে লঘিষ্ঠ হয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে বলীয়ান শক্তিতে উপর্যুপরি পরাজিত করেনি কি? রডারিকের বিরুদ্ধে তারিকের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল? বিশাল ক্রুসেডের বিরুদ্ধে সালাহউদ্দিন কি যুদ্ধ করে জয়ী হননি? রাজা দাহিরের সঙ্গে মুহাম্মদ বিন কাসিমের যুদ্ধ, সোমনাথ বিজয়, পানিপথের তিন তিনটি মহাসমর কি একথা প্রমাণ দেয় না যে, যুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য অপরিহার্য নিয়ামক শক্তি কেবল অস্ত্র আর বিশাল সেনাবাহিনী নয়, নিয়ামক হল জাতির প্রয়োজন অনমনীয় অদম্য মনোবল আর সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। আহমদ শাহ আবদালী যে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মাত্র ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে ২ লক্ষাধিক মারাঠা সৈন্যকে পর্যুদস্ত করেছিলেন তা কি ঈমান আর তাঁর ইচ্ছাশক্তির জন্য নয়?[৪৭]

এখন আমরা যদি আমাদের দেশের কথা বলি, তাহলে দেখতে পাবো সেই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় নানা রকম অনাচারের পোকা ঢুকেছে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এমন কি ধর্মীয় জীবনে আমরা এই সর্বনাশা পোকার আক্রমণ দেখতে পাই। সেখানে ইসলামের শাশ্বত আদর্শ শিক্ষা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় আমরা অহরহ লক্ষ্য করছি। একদিকে 'ধর্মহীনতার' অনুসারী, অন্যদিকে কিছু স্বার্থন্বেষী মহলের ধর্মের অপব্যবহারের মাধ্যমে আপন স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টা-এ

৪৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৩৯
৪৪. আল-কুরআন, ৩০ : ৪৭
৪৫. আল-কুরআন, ৮ : ৬৫
৪৬. আল-কুরআন, ২ : ২৪৯
৪৭. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান প্রমুখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

দুয়ের টানাটানির কারণে ইসলামী মূল্যবোধ তথা স্বাধীনতার ভারসাম্যপূর্ণ, কল্যাণকামী শুভ্র-সমুজ্জ্বল চেতনা বিপর্যস্ত হচ্ছে। শুধু তাই যে বাঙালিদের উপর অর্থনৈতিক শোষণ চিরস্থায়ী করতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ও চেষ্টা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ। পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাঙালিদের সীমাহীনভাবে শোষণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তান থেকেই বেশি রাজস্ব আদায় করত। অথচ সরকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানেই অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ দিত। বাঙালিরা নির্মম অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়।[৪৮]

অন্যদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হঠাৎ স্থগিত করে দিলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। সব শ্রেণীর মানুষ রাজপথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গড়ে তুলে। এ অবস্থায় ১৯৭১ সালে ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাক সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানান। বাঙালিরা এ আহ্বানের প্রতি অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। পূর্বপাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের বেসামরিক শাসন প্রায় অচল হয়ে পড়ে।[৪৯]

এদিকে ৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১০ মার্চ বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জেড. এ. ভুট্টোসহ ১২ জন নেতার প্রতি আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সেনাবাহিনীর গুলীতে অনেক বাঙালি হতাহত হবার ঘটনার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন।[৫০]

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনায় পূর্বশর্ত হিসেবে চারটি দাবি ঘোষণা করেন। শর্তগুলো হল–

ক. সামরিক আইন প্রত্যাহার,

খ. অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া,

গ. সেনাবাহিনীর সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করা এবং

ঘ. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

তিনি সেদিনের সভায় লাখো লাখো বাঙালির সমাবেশে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[৫১]

---

৪৮. ড. জিল্লুর রহমান খান, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪, পৃ. ৫৮

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৫০. ড. জিল্লুর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

৫১. খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ২০০০, পৃ. ৩৬

এদিকে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানের বেসামরিক শাসন নিজের হাতে তুলে নেন। এর মধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া রাজনৈতিক সংকট মীমাংসার প্রয়াসের আড়ালে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পূর্বপাকিস্তানে পাকিস্তানী সৈন্যদের শক্তি বাড়াতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৬ মার্চ ঢাকায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট নিয়ে আলোচনায় মিলিত হন। জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারাও এ আলোচনায় যোগ দেন। কিন্তু আলোচনায় কোন ফল অর্জিত হয়নি। অবশেষে ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বাঙালি জনগণের বিরুদ্ধে পাক সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে হঠাৎ ঢাকা ত্যাগ করেন।[৫২]

২৫ মার্চের রাতে বাঙালিদের জন্য “কালোরাত” হিসেবেই চিহ্নিত হয়। সে রাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও লুটপাটে লিপ্ত হয়। বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পাকিস্তানী বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৫৩]

বাঙালি জাতি পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে আশা করেছিল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রাতৃসুলভ সৌহার্দ্য নিয়ে বসবাস করবে কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালিদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠীই সব ক্ষমতা করায়ত্ব করে। আইয়ূবী শাসনামলে বাঙালিদের রাজনৈতিক দাবী-দাওয়ার প্রতি চরম উপেক্ষা করা হয়। তখন বাঙালিদের জাতীয়তাবোধ প্রবল হয়ে দেখা দেয়, অথচ আইয়ুব সরকার বাঙালিদের স্বায়ত্বশাসনের দাবী অগ্রাহ্য করে দাবিয়ে রাখতে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। এসব কারণে পাকিস্তানের প্রতি বাঙালিদের মমত্ববোধ ও সংহতিবোধে ফাটল ধরে। বাঙালিরা নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র কায়েমের কথা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। যার নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের অভ্যুদয় আধুনিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ “স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।[৫৪]

একই বছর ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কুষ্টিয়া জেলার (বর্তমান মেহেরপুর জেলা) মুজিবনগরে গণপরিষদ গঠন করে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন। এ ঘোষণাপত্র বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়।[৫৫]

বঙ্গবন্ধুর বর্ণিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল বাঙালীর স্বাধীনতার জন্য। অন্যায়, অবিচার, বৈষম্য দূর করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শ।

---

৫২. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০, পৃ. ৪৩০

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬

৫৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৫৪

মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশের সকল মানুষই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দান করেছিল। অবশ্য কিছু ধর্মান্ধ ব্যক্তি ও তাদের দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে দেশের সর্বত্র পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, সাবেক ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ ও বিভিন্ন দলের কর্মীরা পাক-বাহিনীর অগ্রগতি রোধে সচেষ্ট হয়।

মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী গেরিলা রণকৌশল অবলম্বন করে। মুক্তিবাহিনীর চোরাগোপ্তা হামলার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের গতিরোধের চেষ্টা করে। হানাদারদের সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন করাও ছিল ঐসব হামলার অন্যতম লক্ষ্য। এসব হামলায় অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। গেরিলা বাহিনীর হামলায় পাক-সৈন্যদের মনোবলও বিনষ্ট হয়।[৫৬]

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা জোরদার করার পাশাপাশি কোন কোন এলাকায় পাক-সৈন্যদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পাকসৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর হামলায় টিকতে না পেরে সীমান্ত এলাকা, গ্রামাঞ্চল ও ছোট ছোট শহর ছেড়ে দিয়ে ঢাকা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে জড়ো হয়। এভাবে মুক্তিবাহিনী দেশের বেশির ভাগ এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি প্রায় একলাখ ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যসহ ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে।[৫৭] এভাবে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রাম ছিল বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। তাই দেশের মুক্তিকামী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এতে যোগ দেয়। অবশ্য এ সংগ্রামের সব রাজনৈতিক দলের সমান ভূমিকা ছিল না। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই মুক্তি সংগ্রামে আওয়ামী লীগকেই সবচেয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ এ মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠন করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। মুক্তির সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করতে মুজিবনগর সরকারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।[৫৮]

---

৫৬. Lt. Gen. A. A. K. Niazi, *The Betryal of East Pakistan*, Karachi : Oxford University Press, 1988, P. 46

৫৭. Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan - The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, Dhaka : The University Press Limited (UPL), 2001, P. 190-191; *Surrender at Dacca, Birth of a Nation*, Dhaka : UPL, 1997, P. 141-142

৫৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

মুজিবনগর সরকারকে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনায় পরামর্শ দেয়ার জন্য ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমদ আওয়ামী লীগের দু'জন প্রতিনিধি ছাড়াও মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, শ্রী মণি সিং এবং কংগ্রেস দলীয় শ্রী মনোরঞ্জন ধরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তবে কতগুলো ডানপন্থী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীতা করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি সমর্থন জোগায়। এ সব দলের মধ্যে ছিল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, পি.ডি.পি. ইত্যাদি। এসব দলের নেতা ও কর্মীরা বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ করার জন্য পাক সৈন্যদের সর্বতোভাবে সাহায্য করে। এসব দলের নেতা ও কর্মীরা অনেক বাঙালিকে হত্যা করে।

পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ ইসলামের নামে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসের সহযোগিতায় এদেশের নিরপরাধ জনগণকে নির্বিচারে হত্যা, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ঘৃণ্য অপরাধ করেছিল। এগুলো সমস্তই ছিল ইসলামবিরোধী তৎপরতা। এ তৎপরতার মাধ্যমে তারা ইসলামের ইতিহাসে কালিমা লেপন করেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে এ সমস্ত কলঙ্ক থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য।[৫৯] মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অপপ্রচার হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ ছিল দেশ স্বাধীন করার জন্য। সেখানে ইসলামের কথাটি কি করে আসে? জবাবে স্পষ্টভাবে বলছি যে, আমাদের যুদ্ধ ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য।

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেন, "যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফির তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে, সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল দুর্বল।"[৬০]

আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন কয়েকটি ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য। তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, "তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর যার অধিবাসীরা অত্যাচারী আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে কোন অভিভাবক করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পাঠাও সাহায্যকারী।"[৬১]

মদীনায় হিজরতের পর কিছু সংখ্যক মুসলমান নরনারী ও শিশু মক্কায় অবস্থান করছিল, যাদেরকে রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল। মক্কা বিজয়ের মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের এ সংগ্রামের সফলতা আসে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের ঐ উক্তির যৌক্তিকতা খুবই প্রযোজ্য লক্ষ্য করা যায়। দেশের অভ্যন্তরে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল দেশের সর্বস্তরের মানুষের। সে কাজে দেশের মানুষ অগ্রসর হয়েছিল, যুদ্ধ কৌশল প্রশিক্ষণ নিয়ে এ দেশকে শত্রুমুক্ত করতে।

---

৫৯. মিজানুর রহমান মিজান (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু ভাষণ*, ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন, ১৯৮৯, পৃ. ২১
৬০. আল-কুরআন, ৪ : ৭৬
৬১. আল-কুরআন, ৪ : ৭৫

মুক্তিযোদ্ধাদের এ কাজটি ছিল ইসলাম অনুমোদিত একটি ন্যায়যুদ্ধ। সুতরাং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যে ইসলাম সমর্থিত এতে কোন সংশয় প্রকাশ করার সুযোগ নেই।

সৈয়দ আলী আহসান ১৯৭১-এর জুলাইয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে "ইসলামের দৃষ্টিতে" নামক কথিকায় বলেছিলেন, "মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন অথবা যে স্বভাবের হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা কতকগুলো বিষয় থেকে তাকে কখনও বঞ্চিত করে না। একজন মানুষ অবিশ্বাসী হতে পারে, নাস্তিক বা কাফির হতে পারে কিন্তু তবুও মানুষ হিসেবে তার কতগুলো অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। সেসব অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোরই নেই। এ অধিকারগুলো হচ্ছে আলো, বাতাস, পানি ও মৃত্তিকার অধিকার। আল্লাহ তা'আলা চরম পাপীকেও এ সমস্ত অধিকারের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন। সেখানে পৃথিবীর কোন প্রবল শক্তিরই অধিকার নেই সেই কল্যাণ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার। আর পাকিস্তানীরা ইসলামের নামে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, মাতৃভাষা ইত্যাদির অধিকার হরণ করায় সেদিন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতাকামী জনগণ। নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি কাজ তারা বাংলার উপর চালায়। আর এসব কাজ কর্ম যারা করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৭৫নং আয়াতের দ্বারা নির্দেশ পাওয়া যায়। এ বাণীতে যারা দুর্বল, নির্যাতিত তাদের সাহায্যের জন্য যুদ্ধে শামিল হওয়া ফরয করা হয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের আর্তনাদের কথা স্মরণ করতে পারি। তারা পাকিস্তানীদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য আর্তনাদ করে বলত, আমাদের রক্ষা করুন। আর ঠিক এই কারণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে জুলুমের শিকার, ব্যথায় জর্জরিত সকল মানুষের (আর্তনাদে হয়ত বা আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল) মুক্তির জন্য বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিব তবুও বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।"[৬২]

বঙ্গবন্ধুর শেষোক্ত 'ইনশাআল্লাহ' উক্তির দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, তার ঈমানী শক্তি কত মজবুত ছিল। সে কারণে পাকবাহিনী আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয় এবং বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল, ইসলামের ও ঈমানের শক্তির মোকাবেলায় অন্য কোন শক্তি টিকে থাকতে পারে না।

পাকিস্তানীরা ইসলামের নামে যে অপকর্ম করেছিল তা থেকে প্রমাণিত হয়, তারা লেবেল-সর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী। ইসলামের সুমহান আদর্শে বিশ্বাসী নয় বলেই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল হত্যা, নারী ধর্ষণ, নির্যাতন, জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার। ইসলামের মহান আদর্শে বিশ্বাসীদের দ্বারা ঐ সমস্ত গর্হিত কাজ করা সম্ভপর নয়; বরং এর প্রতিবাদ করা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। ঠিক একই কারণে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে

৬২. মিজানুর রহমান মিজান, (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

মরণপণ লড়াই করে বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে এদেশে কোন মুনাফিক শ্রেণীর মুসলমানের স্থান নেই।[৬৩]

১৯৭০ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বেতার-টেলিশিনে ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। একথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য-লেবেল সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাশের কথা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করে দুনিয়াটা উপভোগ করার কাজে।"[৬৪]

বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের সময় ইসলামের বিধানের প্রতি জাতির জনকের অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ এবং ইসলাম ও সুন্নার পরিপন্থী কোন আইন পাশ না করার অঙ্গীকারের দৃষ্টান্ত হিসেবেই এই স্মরণীয় উক্তির উদ্ধৃতি। এটা তাঁর ইসলাম-প্রীতিরই একটি অনন্য নজীর হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার অনেক আগেই বঙ্গবন্ধু বিদগ্ধ আলেমদের সমন্বয়ে গঠন করেছিলেন আওয়ামী উলেমা পার্টি। উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে ইসলাম সম্পর্কে যাতে উলেমায়ে কিরামের সুচিন্তিত অভিমত ও সুপারিশ পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে অনেকেই ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস ছিল ইসলামের মহান নবী মুহাম্মদ (দ.) এর ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদ'। প্রয়াত কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিশ্বনবী' থেকে উক্ত সনদ-এর অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি:

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
>
> রসুল মুহাম্মদ বিশ্ববাসীদিগকে এবং যারাই তাঁর সাথে যোগ দিবে সকলকেই এই সনদ দিচ্ছেন। মদিনার ইহুদি নাসারা পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউই বিনা অনুমতিতে কারও সহিত যুদ্ধ করবে না। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে আল্লাহ ও রসুলের মীমাংসার উপর সকলকে নির্ভর করতে হবে। বাইরে কোন শত্রুর সাথে কোন সম্প্রদায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। মদিনা নগরীকে পবিত্র মনে করবে এবং যাতে তা কোনরূপ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। যদি কোন শত্রু কখনো মদিনা আক্রমণ করে, তবে তিন সম্প্রদায় সমবেতভাবে তাকে বাধা দেবে। যুদ্ধকালে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের ব্যয়বার নিজেরা বহন করবে। নিজেদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী হলে অথবা শত্রুর সাথে কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তার সমুচিত শাস্তি বিধান করা হবে- সে যদি আপন পুত্র হয়, তবু তাকে ক্ষমা করা হবে না। এই সনদ যে ভঙ্গ করবে সে বা তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।[৬৫]

---

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৬৪. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-২৪
৬৫. গোলাম মোস্তাফা, *বিশ্বনবী*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৭, পৃ. ৫৬

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল সমাবেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তি থাকবে।"[৬৬]

গণপরিষদে দেশের খসড়া সংবিধানের উপর ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালনে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে তার সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে ৪ঠা অক্টোবর ১৯৭২ আবারো ঘোষণা করেন ঃ "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার সবার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানেরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যভিচার- এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র অধিকার খর্ব করা হয়েছ, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।"[৬৭]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গবন্ধু ইসলামের চেতনা ও মূল্যবোধ এবং ইসলামের নবীর (দ.) - এর আদর্শে একটি সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। কেবল ঘোষণা বা বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি।

নবী করিম (দ.) বিদায় হজ্বের ভাষণে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার উপদেশ দেন। নবী করিম (দ.) এর মদিনা সনদ, বিদায় হজের ভাষণ এবং আল্লাহর পাকের কালাম থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুও একইভাবে বিভিন্ন সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আগেই বলেছি ব্যক্তি জীবনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। তিনি বাংলাদেশে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইসলামের বিধানের পরিপন্থি মদ-জুয়া তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বঙ্গবন্ধুর আর একটি অমরকীর্তি। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারের জন্য মাদ্রাসা বোর্ডও তিনি গঠন করেছিলেন। পবিত্র হজ্বের পর মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ তাবলীগ জামাতের জন্য তিনি ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে জমি প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত এ জমিতেই দেশ-বিদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উপস্থিতিতে

---

৬৬. আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *স্বাধীনতার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান*, (প্রকাশক মোঃ আব্দুল কাদের, ১৬ কবি জসীম উদ্দীন রোড, উত্তর কামলাপুর), ঢাকা : ১৯৯৬, পৃ. ৭৩

৬৭. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বছর সগৌরবে তাবলীগ জামাতের 'বিশ্ব এস্তেমা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর পর স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রেডিও-টেলিভিশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পবিত্র কুরআন ও তাফসির প্রচার শুরু হয়। তিনি প্রথম বাংলাদেশকে ইসলামী উম্মার অঙ্গীভূত করার মানসে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা OIC সম্মেলনে যোগদান করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে এই সংস্থাভুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর সময়ে হজ্বব্রত পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৮]

৬৮. বিস্তারিত দ্র. : অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ইসলামী খিদমত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৭

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামে মাতৃভূমি, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

আরবীতে প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ হচ্ছে "হুব্বুল ওয়াতানি মিনাল ঈমান"– দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। মুসলিম সমাজ যুগে যুগে দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম প্রীতির যে অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে উক্ত প্রবাদটি হচ্ছে তার বাস্তব প্রতিফলন। এ গুরুত্ববহ প্রবাদটি ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয়-মন জুড়ে এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাদের কেউ কেউ এটিকে হাদিস বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী বলেও অভিহিত করেছেন। প্রবাদটি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বা কোন সাহাবীর উক্তি নয়, তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। তাই বলে প্রবাদটি ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষার ব্যতিক্রমও নয়, নয় আড়াআড়ি বিপরীতও। প্রয়োজনের তাগিদে দেশত্যাগ মাতৃভূমির ভালবাসাকে ছিন্ন করে না। দেশত্যাগ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে এবং ওই সব লোক যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে নি তাদের দায়দায়িত্ব তোমাদের নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপর অপরিহার্য; কিন্তু এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, তোমাদের সাথে যাদের চুক্তি রয়েছে এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখছেন।"[১]

মূলত এ আয়াতটির মধ্যে রয়েছে একটি জাতির পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি এবং তাদের মহৎ দেশপ্রেমের উজ্জ্বল হিদায়াত। একটি দেশের মুসলিমদের জন্য হিজরতের আবশ্যকতা তখনই দেখা যায়, যখন তার দেশে ঈমান নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তে লক্ষ্য করা যায়, মহানবী (স.)-এর মহান আল্লাহ্ নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার ঘটনায়। মুমিন জীবনে এ হিজরত বা দেশত্যাগের বিধান হচ্ছে একটি মৌলিক ভিত্তি, যা তাকে দেশপ্রেমে উৎসাহিত করে। একজন মুমিন সহজেই বুঝতে পারে তার ঈমান নিয়ে তাকে তার দেশে, তার সমাজে বেঁচে থাকতে হবে। ঈমান নিয়ে স্বদেশে বেঁচে থাকার জন্য তিনি যেন দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হিফাযতে প্রহরীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, তার দেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হলে তিনিও আক্রান্ত হবেন না, আক্রান্ত হবে না ঈমানও।

সুতরাং ঈমান ও ইসলামকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে স্বদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখতে হবে। একজন মুমিনের জন্য দেশত্যাগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তার ঈমান পরিত্যাগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে।

---

১. আল-কুরআন, ৮ : ৭২

Dhaka University Institutional Repository

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে দেশপ্রেমের এতই গুরুত্ব যে, ঈমানহারা হয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত স্বদেশকে আঁকড়ে থাকতে হবে। আল্লাহ্পাক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেশত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে এ ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, ঈমানের দাবির মত দেশপ্রেমও মুমিনের অস্তিত্বের অংশ। তবে দেশে টিকতে না পারলে তার ঈমানের ডাকে সাড়া দিতে হবে দেশত্যাগ করে হলেও। এটা প্রমাণ করে দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসা ঈমান ও আদর্শ ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। ঈমান ও আদর্শ বিমুখ উগ্র ভালবাসা দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। মুমিনদের জন্য তাদের দেশ তাদেরই সম্পদ। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।"[২]

এতে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় না যে, মুমিনের প্রাণ ও সম্পদের কোন মূল্যই নেই; বরং প্রমাণিত হয় যে, মুমিনদের প্রাণ ও সম্পদ এতই মূল্যবান যে, তা জান্নাতের বিনিময় হতে পারে। এরূপ ঈমানের জন্য দেশত্যাগের কথা বলার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, দেশের প্রতি ভালবাসার কোন মূল্যই নেই; বরং প্রমাণিত হয় যে, দেশপ্রেমের এত বেশি গুরুত্ব যে, তা কেবল ঈমানের স্বার্থেই ত্যাগ করা যায়।

দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসা মানুষের সহজাত। মানুষমাত্রই তার পরিবার ও সমাজকে জন্মগতভাবে ভালবাসে। একজন মানুষ মুমিন ও মুসলিম হওয়ার পরে তার এ স্বভাবজাত ভালবাসা নিস্প্রভ হয়ে যায় না, দুমড়ে-মুচড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না; বরং তা দিন দিন বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত হয়। যেমনটি ঘটেছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনে। তাঁর প্রতি সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। ওহী নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ওহী নাযিলের প্রাক্কালে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বুকে টেনে নিয়ে তিনবার সজোরে চাপ দেন। শেষবার জিবরাঈল (আ.) বলেন, আপনি পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে পড়ুন, আপনার রব মহিমান্বিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।[৩]

নবী করীম (স.) বলেন, অবশেষে তাঁর ভয় দূর হল। তখন তিনি হযরত খাদিজা (রা.)-এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশঙ্কাবোধ করছি। খাদিজা (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ, কখনো না, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, অতিথির আতিথেয়তা করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদিজা (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফিল আবদিল আসাদ ইবন আবদিল ওযযার কাছে গেলেন। যিনি জাহিলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং

---

২. আল-কুরআন, ৯ : ১১১
৩. আল-কুরআন, ৯৬ : ১-৫

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা (রা.) তাকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ভাতিজা! তুমি কী দেখ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাকে বললেন, ইনি সেই দূত যাঁকে আল্লাহ মুসা (আ.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম, আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতীতে যিনি তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন।[৪]

এখানে লক্ষণীয় যে, মহানবী দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা শুনে হতচকিতত হয়ে পড়েন। তিনি প্রথমে ভাবতেই পারছিলেন না, যে ভূখণ্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে জীবনযাপন করছেন, সেই ভূখণ্ড ছেড়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। যেই ভূখণ্ডের মানুষের জন্য জীবন বাজি রেখে তিনি এত কিছু করেছেন সেই অনুগ্রহপ্রাপ্ত উপকার ভোগকারী মানুষই কি তাকে দেশছাড়া করবে।

মাকে ভালবাসার কথা যেমন উপদেশ দিয়ে বুঝাতে হয় না, তেমনি মাতৃভূমির প্রেমের প্রসঙ্গও বাইরের চাপ প্রয়োগ করে জাগাতে হয় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হৃদয়মন জুড়ে বয়ে যায়। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রেম অবাধে দানা বেঁধে ওঠে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নবুয়ত লাভের পর এক যুগের অধিককাল ধরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মভূমি মক্কায় অতিবাহিত করেন। তিনি দেশবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে চড়াও হয়ে ওঠে। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য মাতৃভূমিতে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও তাঁর স্বদেশ প্রীতি তাঁকে যেন বারবার বাধা দেয়। তাঁর প্রাকৃতিক মন তাঁকে নিজ আবাসভূমিতে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁকে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "বলুন, হে আমার রব! আমাকে কল্যাণের সঙ্গে প্রবেশ করান, আমাকে কল্যাণের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত করুন। আর আপনার নিকট থেকে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।"[৫]

দেশবাসীকে ছেড়ে যাওয়া বড় কষ্টের বিষয়। দেশবাসী যতই অত্যাচার-অবিচার করুক, তাদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করা তো বড়ই কঠিন। তাই মহান আল্লাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৪. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০, পৃ. ২১-২২

৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৮০

ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "লোকে যা বলে তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্য সহকারে ওদেরকে পরিহার করে চলুন।"[৬]

ধীরে ধীরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এক সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। অশ্রুসজল নয়নে একথা বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারার দিকে পাড়ি জমালেন। মদীনার শিশু-কিশোর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই তাঁকে সদার সম্ভাষণের ব্যাপক আয়োজন করেন। তবুও জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা তাঁকে বিচলিত করে তুলে বারবার। আল্লাহ্তা'য়ালা তার মনের বেদনাহত অবস্থার কথা জানতে পেরে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই আপনার প্রতি যিনি কুরআনকে বিধান করেছেন তিনি (আল্লাহ্) আপনাকে প্রত্যাবর্তনস্থল (জন্মভূমি) মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। বলুন, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।"[৭]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়াসরিবে (মদিনায়) বসবাস শুরু করেন। তাঁর শুভাগমনে ইয়াসরিবের নামকরণ করা হয় মদীনাতুন্নবী বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনা (নগর)। কালের পরিক্রমায় এই মদীনা মুনাওয়ারাই হয়ে ওঠে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবাসভূমি। এই মদীনাকেই কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তোলেন বিরাট এক ইসলামী সমাজ। মদীনাকে ভিত্তি করেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সুবৃহৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সুদীর্ঘ ৫৩ বছর যাবত যেই মক্কার কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য তাঁর অক্লান্ত সাধনা অব্যাহত ছিল, সেই মক্কার সংযোগ স্থাপন দরকার এই নতুন আবাসভূমি মদীনার সঙ্গে। আর মদীনার সংযোগ হওয়া দরকার মক্কার সঙ্গে। শুধু মক্কা-মদীনাই নয়, তাঁর অবস্থানের চতুষ্পার্শ্বে সকল এলাকাই হবে তাঁর দাওয়াতের ক্ষেত্র, তাঁর রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে বিশ্বে প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদের ভিত্তিতে। তাঁর প্রবর্তিত মদীনা সনদে ইয়াসরিব বা মদীনা রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি চির দেদীপ্যমান।[৮]

---

৬. আল-কুরআন, ৭৩ : ১০

৭. আল-কুরআন, ২৮ : ৮৫

৮. ধারাগুলো এরূপঃ

১. তারা সবাই (অর্থাৎ ইয়াসরিববাসী) মুমিন, মুশরিক ও ইয়াহুদী মিলে অন্যান্যদের মুকাবিলায় এক উম্মত, এক জাতি।

২. ইয়াসরিব (মদীনা রাষ্ট্র) উপত্যকা এই চুক্তিনামার (মদীনা সনদের) সকল পক্ষের লোকের কাছে পবিত্রভূমি বলে গণ্য হবে।

৩. এ চুক্তি সকল পক্ষের লোক ইয়াসরিব আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পরস্পর সহযোগিতা করবে।

৪. এ চুক্তিনামা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে এমন কোন নতুন সমস্যা বা বিরোধ সৃষ্টি হয়, যা থেকে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মীমাংসার্থে উত্থাপন করতে হবে।

৫. এই চুক্তিনামায় যা কিছু রয়েছে তার প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহ্র কাছে অধিক পছন্দনীয়। [ইবনে হিশাম (অনু. আকরাম ফারুক), *সিরাত ইবনে হিশাম*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১২, পৃ. ২৬]

Dhaka University Institutional Repository

নতুন আবাসভূমি মদীনা মুনাওয়ারায় আশ্রয় নিয়ে অনেক সাহাবায়ে কিরামই মদীনার আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। নতুন জায়গায় এলে অনেকেরই প্রথম অবস্থায় কিছুটা অস্বস্তিভাবের সৃষ্টি হয়।

হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত বিলাল (রা.) মদীনাতে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন। হযরত আয়শা (রা.) বলেন, আমি তাঁদের দু'জনের কাছে গেলাম (তাঁদের হাল-হাকীকাত জানার জন্য)। আমি আমার পিতা হযরত আবু বকর বলেন, যখনই হযরত আবু বকর (রা.) জ্বরাক্রান্ত হতেন তিনি বলতেন "প্রত্যেক মানুষই চায় তার প্রভাত যেন হয় তার পরিবারে, তার আপনজনদের মাঝে, আর মৃত্যু তো জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।"[৯]

হযরত বিলাল (রা.)-এর অবস্থা ছিল এরূপ যে, যখনই তিনি জ্বরাক্রান্ত হতেন তখনই উচ্চস্বরে কবিতা বললেন, "হায়! আমি যদি জানতাম! আমি এ উপত্যকায় (মক্কায়) পুনরায় রাত যাপন করতে পারব কি না, যেখানে ইযখীর ও জলীল ঘাস আমার চারপাশে বিরাজ করত! আমি জানি না মাজান্না নামক স্থানে পুনরায় পৌঁছাতে পারব কিনা, আর শামা ও তাফিল পাহাড় আমার দৃষ্টিগোচর হবে কিনা।"[১০] হযরত আয়শা (রা.) বলেন, আমি তাদের এই অবস্থা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে জানালাম। তিনি তখন দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে হুবহু মদীনা বা মদীনা প্রেম দান কর যেমন আমাদের হুবহু মক্কা বা মক্কা প্রেম দান করেছেন। কিংবা মক্কা প্রেমের চেয়েও অধিক প্রেম দান কর মদীনার প্রতি; আর এই নগরীকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখ এবং ফল-ফসলে আমাদেরকে বরকত দান কর। এই নগরীর রোগ-শোক (জ্বর) তুমি অপসারন করে দাও এবং (ইয়াহুদী বসতি অঞ্চল) জুহফায় তা পৌঁছে দাও।"[১১]

সহীহ বুখারীতে বিবৃত এই ঘটনাটিতে হযরত আবু বকর (রা.) ও মহানবী (স.)-এর দেশপ্রেমের যে বাস্তব নমুনা পাওয়া যায় তা সত্যিই যেকোন মানুষের বিস্ময়ের উদ্রেক করে তোলে। হযরত আবু বকর (রা)-এর উপরিউক্ত পংক্তিটি তাঁর হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত দেশ প্রেমের আবেগাপ্লুত বহিঃপ্রকাশ। হযরত বিলাল (রা) তাঁর মাতৃভূমি মক্কাকে এবং মক্কার ঘাস, বৃক্ষ ও পাহাড়কে যে কি পরিমাণে ভালবাসতেন তা স্বতঃস্ফূর্ত মূর্তিতে পরিস্ফূটিত হয়ে উঠেছে তাঁর দেশপ্রেম সম্পর্কিত উপরের হাদীসে।

দেশপ্রেমের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখা, দেশের সীমান্ত অটুট ও সুদৃঢ় রাখার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাদানী জীবনের দিকে তাকালে তাঁর দেশপ্রেমের এই কর্তব্যধারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতোই পরিস্ফূটিত হয়ে ওঠে। তিনি ছোট বড় যতগুলো যুদ্ধ করেছেন তার সিংহভাগই ছিল উপরোক্ত

৯. উদ্বৃত: অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান প্রমুখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
১০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, ১১ খণ্ড, বায়রুত : ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৮৭, পৃ. ৩৭১১
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১১

Dhaka University Institutional Repository

চেতনায় সমৃদ্ধ। বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করার পরে মক্কার কুরায়শ কাফিররা ইসলাম ও মুসলমানদের দেশ মদীনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলে মহানবী মদীনা ও মদীনাবাসীকে অক্ষত রাখার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ঐতিহাসিক ওহুদের যুদ্ধে। খন্দকের যুদ্ধকে তো বলা যায়, ইসলামী দেশ বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখার কালজয়ী এক দৃষ্টান্ত। এভাবে ইসলামের সকল যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক। দেশ ও জাতির নিরাপত্তার স্বার্থে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দেশের সীমান্ত পাহারায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর সাহাবা-ই কিরামকে এ কাজে যুগপৎ উৎসাহিত করে তুলেছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য এ পর্যায়ে যে বিধান রেখে গেছেন তা হচ্ছে মুমিন-মুসলিমরা যে দেশে, যে রাষ্ট্রে বসবাস করবে, সে দেশের সীমান্ত অটুট রাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। নিজেদের দেশের সীমানা যদি সীসাঢালা প্রাচীরের মতো মজবুত না থাকে তবে সেই দেশের অধিবাসীদের জান ও মাল রক্ষা করবে কিভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্‌র পথে একদিন দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়ার ওপর যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম। আর (এ কাজের বদৌলতে) তোমাদের কেউ যদি জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পায়, তাহলে তা দুনিয়াও দুনিয়ার উপরে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম।"[১২]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় একদিন ও একরাত দেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া একমাস ধরে সিয়াম পালন করা ও সালাত আদায় করার চেয়ে বেশি মূল্যবান। এই দায়িত্ব পালনকালে যদি সে মারা যায় তাহলে কবরের আযাব ও কবরের বিপদ (পরীক্ষা) থেকে সে নিরাপদ থাকবে।"[১৩]

হযরত ফুদালাহ ইবন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া তা মাসভর রোযা রাখা ও ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। এ অবস্থায় সে যদি মারা যায়, সে কবরের আযাব ও কবরের বিপদ (পরীক্ষা) থেকে রেহাই পাবে এবং তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে।"[১৪]

হযরত উসমান (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন যে, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর পথে একদিন দেশের সীমান্ত পাহরা দেয়া হাজার দিনের অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর চেয়ে মূল্যবান।"[১৫]

এ হাদীসগুলোর সারমর্ম দাঁড়ায় যে, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মতো ফযীলত ও বরকত অন্য কোন ইবাদত বন্দিগীতে নেই।

---

১২. আবু-ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত্ তীরমীযী, *সুনানুত্ তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড (অনুবাদ), ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮, পৃ. ১৮৮

১৩. *মুসনাদে ইবন আবিশ শায়বা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮

১৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*, খ.১, কায়রোঃ মাতবা'আ আশ-শারকিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫, পৃ. ৬৫

১৫. *মুসনাদে শামীইন*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

দেশপ্রেম বলতে যদি দেশের মানুষের প্রতি অর্থবহ দেশপ্রেম বুঝায়, দেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বুঝায়, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা বিজয়ের ঘটনায় দেশপ্রেমের মৌলিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। মাতৃভূমি মক্কার যেসব লোক তাঁকে নিপীড়ন করেছে, নির্যাতন করেছে, দেশ থেকে উৎখাত করেছে, সেই ঘোর শত্রুদের প্রতি তাঁর আবেগাপ-ুত সহমর্মিতার ঘোষণা, "ওহে মক্কাবাসী! তোমাদের প্রতি আজ আমার কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন প্রতিশোধ ভাব। তোমরা মুক্ত মানুষ।"[১৬] মানবতার মহান প্রেম জগতে দেখাতে পেরেছেন একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। দেশপ্রেম বলতে যদি দেশের ভবিষ্যত ও সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণ বুঝায়, তাহলে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার চেয়ে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নির্দশন নাই। দেশের মানুষের সকল প্রকার কল্যাণ সাধন ও উন্নতি বিধানের গ্যারান্টি দেয় ইসলাম। ইসলামই দেশ ও জাতিকে রক্ষা করে সর্বপ্রকার ধ্বংস ও পতনের রাহুগ্রাস থেকে। ইসলামেই নিহিত রয়েছে দেশপ্রেমের সার্থক ও সাবলীল রূপ।

দেশের প্রতি ভালবাসার একমাত্র সাবলিল ইসলামী রূপটির যথার্থ বাস্তবায়নই করতে বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর সাক্ষাত প্রমাণ মিলে তাঁর ভাষণে। যেমন বঙ্গবন্ধু একটি ভাষণে বলেছিলেন-

> আজ থেকে ২৪ বছর আগে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার আশায় বুক বেঁধে এমনি করেই একদিন জনগণ ভোট দিয়েছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে, কিন্তু দিন না যেতেই দেখেছেন পাকিস্তানের জন্মলগ্নে জনগণের দেয়া সুস্পষ্ট ম্যান্ডেটের প্রতি এদেশের এক শ্রেণীর নেতার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সব স্বপ্ন তাদের ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছে। কেবল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষই নয়, সারা দেশের বারো কোটি মানুষই আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নিজ দেশে পরবাসী। পরাধীন আমলেও এ চেহারা এদেশের মানুষের ছিল কি-না তা জনগণই তার বিচার করবেন। স্বাধীনতা উত্তর জীবনে বিগত ২৩টি বছর ধরে সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন লাঞ্ছণা, গঞ্জনা, শোষণ ও বঞ্চনা এদেশের মানুষকে পোহাতে হয়েছে, তার সাক্ষী কেবল আমি বা আমার দলই নয়, সাক্ষী প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ। তাঁদের সন্তান ছালাম-বরকত বুকের রক্ত ঢেলে রাজপথে যে সংগ্রামী চেতনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিল, তারই সূত্র ধরে এদেশের আরও শত শত সোনার সন্তানের আত্মদানের পরে হাজার হাজার ছাত্র শ্রমিক রাজনৈতিক কর্মীর অপরিসীম নির্যাতন ভোগের ফলে এদেশের মানুষের এইবারই সর্বপ্রথম দেশের আপামর মানুষের মতামত নিয়ে তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণেরই মতামত নিয়ে পাকিস্তানের বুকে শোষণহীন, ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগী একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে সুযোগ আজ এসেছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের উপরই এদেশের আপামর জনসাধারণের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।[১৭]

মাতৃভূমির ও জনগণের মুক্তির জন্য আমরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। বঙ্গবন্ধু বলেন "ব্যক্তির কৈফিয়ত হিসেবে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার বক্তব্য: নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি

---

১৬. সিরাত ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১৭. মিজানুর রহমান মিজান (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের ভাবি নাগরিকের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করে যেতে পারি, তাহলেই আমার সংগ্রাম সার্থক মনে করব।"[১৮]

তিনি ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মাতৃভূমি ও তাঁর অধিবাসীদের মুক্তি কামনা ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যু অবধি সংগ্রাম করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। তবু আমার প্রতিপক্ষেরা আমাকে এ অপবাদ দিয়ে চলেছেন। বিগত ২৩ বছর ধরে ক্ষমতার আসন আমি কবে কখন আঁকড়ে ধরেছি তার বিবরণ তারা দেন না। বিগত গোলটেবিল বৈঠকের সময় আমাকে প্রধামন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। আমি তা দু'পায়ে ঠেলে দিয়েছি। এতে আমার প্রতিপক্ষের বন্ধুদের অনেকে রুষ্টও হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভ বা স্বার্থের বখরায় শরীক হয়ে দেশবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া আমার রাজনীতির লক্ষ্য কোনদিন ছিল না, আজও নাই। তাই রুষ্ট হলেও প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রলোভনের মুখে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থের প্রশ্নে নিজ বিবেককে আমি বিকিয়ে দিতে চাই না। তাদের দৃষ্টিতে এ আমার হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় দেশবাসীর দৃষ্টিতে নয়।"[১৯]

তিনি আরো বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশ কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার দেশের মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ী, রেল চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্ণমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে সবকিছু–আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তোমরা আর গুলী করবার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।"[২০]

তিনি সকলের মুক্তকণ্ঠের আওয়াজের প্রত্যাশা করেন তার কণ্ঠে "ভুললে চলবে না যে, পাকিস্তানে এবারই সর্বপ্রথম জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মূল সম্পদ শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে। বাংলাকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে এদেশের বারো

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৯. প্রাগুক্ত
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

কোটি মানুষকে সত্যিকার মুক্তির সন্ধান দিতে হলে চাই মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ সে আওয়াজ তুলতে হবে। বাংলারই জনপ্রতিনিধিদের।"[২১]

বঙ্গবন্ধু বলেন, কথা তোলা হয়েছে যে, নির্বাচনী ঐক্যজোটে সম্মত না হয়ে আমরা বাংলার স্বার্থেরই ক্ষতি করছি। এর উত্তর হল : বাংলা স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমরা নির্বাচনী ঐক্যজোটে আর বিশ্বাসী নই। অতীতে বহুবার, এমনকি ১৯৫৪ সালে ঐক্যজোট গঠনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। বারংবার মানুষ গভীর আশায় বুক বেঁধে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করেছিল কিন্তু আমরা দেখেছি যুক্তফ্রন্টের নাম নিয়েই আওয়ামীলীগ সদস্যরা ছাড়া আর সব অঙ্গ দলের সদস্যরাই কেন্দ্রের সেই ধিকৃত দলটিতেই ভিড়ে গিয়েছেন, যে দলকে দুদিন আগে বাংলার আপামর মানুষ বাংলা মাটি থেকে সমূলে উৎখাত করেছে। ফলত সর্বনাশ হয়েছে বাংলা আর বাঙালির, সর্বনাশ হয়েছে এদেশের কোটি মানুষের। তাই এবার আর আমরা ভিন্ন চিন্তাদর্শের মানুষের সাথে ঐক্যজোট গঠন করে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে। এবার আমাদের কথা হল কর্মসূচী থেকে থাকলে তার ভিত্তিতে জনগণের দরবারে যান, জনগণ আপনাকে গ্রহণ করলে জাতীয় পরিষদে গিয়ে প্রয়োজন হলে আপনার সাথে ঐক্যজোট গঠন করবো, এখন নয়।"[২২]

তিনি আরো বলেন, "এদেশের আপামর তথা সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়ার বাসনাকে সার্থকরূপ দেওয়ার যে বিরাট গুরুদায়িত্ব আজ আমাদের সামনে, সে দায়িত্ব আজ আমাকেই স্কন্ধে তুলে নিতে হচ্ছে। এদেশের ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্য প্রণয়নের দায়িত্ব বাংলার মাটি হতে অঙ্কুরিত আওয়ামীলীগকেই গ্রহণ করতে হবে। আমি ও আমার দল সে দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কেবল প্রয়োজন জনগণের দোয়া আর শুভেচ্ছা যা কি-না আমাদের এবারের চলার পথে একমাত্র পাথেয়।"[২৩]

তিনি বলেন, "নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি এদেশের মানুষ মনের পটে যে সুখী জীবনের ছক এঁকেছিল সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের পথ কিছুটাও যদি প্রশস্ত করে যেতে পারি তাহলেই আমার সংগ্রাম সার্থক মনে করব।"[২৪]

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমরা সব সময়ই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে আসছি। সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকদের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। আইনের সমান রক্ষাকবচ সর্বক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতোই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এজন্য উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।[২৫]

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী যাতে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রয়োজন : ৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে- সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মত আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোন কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না।[২৬]

পররাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে-আজ বিশ্ব জুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার আমরা কোনমতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এজন্য আমাদের সত্যিকারের স্বাধীন এবং জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হবে।[২৭]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি যখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।[২৮]

পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে।[২৯]

আজ দেশের অবস্থান সম্বন্ধে আপনাদের জানা দরকার। ত্রিশ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে। ২৫ মার্চ রাত্রে ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী আমার উপর আক্রমণ চালায়। সেদিন রাত্রে আমার অবস্থা যে কেমন ছিল সেটা কেবল আমিই জানি। আমি জানতাম ঘর থেকে বের হলেই আমাকে গুলী করে মারবে। রাত্র ১১টার সময় আমার সমস্ত সহকর্মীকে, আওয়ামীলীগের নেতাদের হুকুম দিলাম 'বের হয়ে যাও। যেখানে পার এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। খবরদার, স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো।'[৩০]

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

আমার দেশ স্বাধীন দেশ। ভারত হোক, আমেরিকা হোক, রাশিয়া হোক, গ্রেট বৃটেন হোক, কারো এমন শক্তি নাই যে, আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকি, ততক্ষণ আমার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।[৩১] রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লা।[৩২]

বঙ্গবন্ধু একজন প্রকৃত মুসলমান ছিলেন বলেই তিনি তিনি প্রিয় নবীর (স.) জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে এদেশকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবেসেছিলেন। তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সব সময় এদেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন, এদেশকে ভালবেসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাও আপত্তি নাই। তবে তোমাদের প্রতি অনুরোধ আমার লাশটি আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলায় পাঠিয়ে দিও।"[৩৩] মৃত্যুকে অবধারিত জেনেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রতি তার অগাধ ভালবাসার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তাতেই বোঝা যায় যে, তিনি কত বড় মাপের একজন দেশ প্রেমিক ছিলেন। কত বড় একজন দেশপ্রেমিক হলে একথা বলা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা ও বঙ্গবন্ধুর অবদান

এই বিশ্ব জগতের সবকিছু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর এ বিশাল সৃষ্টির পেছনে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, নিখুঁত বৈজ্ঞানিক কৌশল ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। ফলে বিশ্বজগতের সব কিছু যথানিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি স্ব স্ব সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসরমান। এ বিশ্বে অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষ অন্যতম। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বা "আশরাফুল মাখলুকাত।" বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গভীর পর্যালোচনার পর বিজ্ঞ ব্যক্তিরা একমত পোষণ করেছেন যে, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনায় মানুষ শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছেন।

আদি মানব হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহপাক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হল ভাষা, অর্থাৎ আল্লাহ ভাষার মাধ্যমে আদম (আ.)-কে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতএব ভাষার আদি স্রষ্টাও আল্লাহ। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "রহমান, তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী রয়েছে।"[৩৪]

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের পবিত্র এ বাণীতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির পর মানুষের মনের ভাব প্রকাশের পদ্ধতি ও তার মাধ্যম ভাষা আল্লাহই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং ভাষা

---

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩৪. আল-কুরআন, ৫৫ : ১-৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর দান। আল্লাহর অন্যান্য নি'মাতের মতো ভাষাও একটা গুরুত্বপূর্ণ নি'মাত। সন্দেহ নেই যে আদম (আ.)-এর ভাষা ছিল একটা কিন্তু পৃথিবীতে আদম সন্তানের বংশ বিস্তারের সাথে সাথে আদি মানুষের আদি ভাষাও স্বভাবত কারণে নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। ফলে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজ হাজার হাজার ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এ বৈচিত্র্যময় বিশ্বে বিভিন্ন জনপদে নানা ভাষা, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত মানুষ আল্লাহর অসীম কুদরত ও মহান তাৎপর্যময় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তাঁর (আল্লাহ) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রংয়ের বিভিন্নতা। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[৩৫]

আল্লাহপাক নিজেই মানুষের ভাষাকে তাঁর সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেছেন। এখানে ভাষা বলতে কোন নির্দিষ্ট ভাষার কথা বলা হয়নি। স্থান, কাল, বর্ণ, গোত্র, মানব সমাজের অসংখ্য বিচিত্র ভাষাও তেমনি আল্লাহর নিদর্শন হিসেব গণ্য। সেই হিসেবে পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার মর্যাদা সমান। এ সম্পর্কে মহানবী (স.) হাদীস শরীফের মধ্যে বলেন, "তিনটি কারণে আমি আরবী ভাষাকে ভালবাসি। কেননা, আমি আরবী ভাষাভাষী, কুরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাতের ভাষাও হবে আরবী।"[৩৬] এ হাদীসে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল (স.)-এর মাতৃভাষা আরবী হওয়ার কারণে তিনি সে ভাষাকে ভালবাসার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষা কোন না কোন মানুষের মাতৃভাষা। কোন না কোন ভাষা ছাড়া যেমন মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না, তেমনি মানুষ ছাড়া কোনো ভাষার অস্তিত্বও অকল্পনীয়।

প্রত্যেক মানুষের নিকট তার নিজ মাতৃভাষা অতিশয় প্রিয়। আল্লাহর কাছে তাঁর প্রতিটি বান্দাই যেমন সমান, সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে যেমন কোন বিভেদ নেই, ভাষার মর্যাদার ক্ষেত্রেও তেমনি কোন প্রভেদ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের কাছেই তার মাতৃভাষার চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন ভাষা নেই। মাতৃজীবের অস্তিত্ব লাভের পর মায়ের রক্তে সে অস্তিত্বের ক্রমবিকাশ ঘটে। ভূমিষ্ট হবার পর মাতৃস্নেহে বেড়ে উঠে এবং ধীরে ধীরে মায়ের ভাষা শিখে আস্তে আস্তে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। তাই মা, মাতৃভাষা, আমাদের অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটাকে অস্বীকার করা নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আল্লাহপাক প্রত্যেক মানুষকেই স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দিয়েছেন। এ প্রকাশের পদ্ধতি দ্বিবিধ। প্রথমে মুখের দ্বারা, দ্বিতীয়ত লেখনীর দ্বারা। মহান আল্লাহপাক যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন। এ সব সম্মানিত বার্তাবাহক যিনি যে এলাকার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, সে এলাকার ভাষাই ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষার কথা বলেছেন, প্রচার করেছেন এবং প্রেরিত কিতাবসমূহও আল্লাহতা'য়ালা নবী-রাসূলদেরকে মাতৃভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, "আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট

৩৫. আল-কুরআন, ৩০ : ২২
৩৬. উদ্বৃত: অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান প্রমুখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। অতঃপর আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন যাকে চান এবং পথ দেখান যাকে চান, তিনি মহা সম্মানিত, প্রজ্ঞাময়।"[৩৭]

অন্যত্র আল্লাহপাক বলেন, "আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সু-সংবাদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।"[৩৮]

মহান-আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর মহা অনুগ্রহ হয়েছে মুমিনদের উপর-তাদের মধ্যে থেকে তাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, এবং তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন এবং তারা নিশ্চয়ই পূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে ছিল।"[৩৯]

মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, "এভাবে আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করেন সমস্ত শহরের মূল মক্কা ও তার চতুর্দিকে জনগণকে এবং আপনি সতর্ক করবেন কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে যাবে একদল দোযখে।"[৪০]

আল-কুরআন পৃথিবীর সর্বকালের সমস্ত মানব জাতির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ। এ মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে চিরস্থায়ীরূপে সংরক্ষণের দায়িত্বও স্বয়ং বিশ্ব নিয়ন্তার হাতে। এ মহাগ্রন্থও যে মহামানবের নিকটে অবতীর্ণ তা তাঁর মাতৃভাষা আরবীতে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, "নিশ্চয় আমি সেটাকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।"[৪১]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "আমি সেটাকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।"[৪২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "এক কিতাব বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআন, বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।"[৪৩]

মহান আল্লাহ বলেন, "এরূপে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি যাতে তারা ভয় করে কিংবা তাদের অন্তরে কিছু চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি করে।"[৪৪] মহান আল্লাহ বলেন, "আরবী ভাষায় কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।"[৪৫]

---

৩৭. আল-কুরআন, ১৪ : ০৪
৩৮. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৪
৩৯. আল-কুরআন, ৩ : ১৬৪
৪০. আল-কুরআন, ৪২ : ৭
৪১. আল-কুরআন, ১২ : ২
৪২. আল-কুরআন, ৪৩ : ৩
৪৩. আল-কুরআন, ৪১ : ৩
৪৪. আল-কুরআন, ২০ : ১১৩
৪৫. আল-কুরআন, ৩৯ : ২৮

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ জেনে শুনে যাতে হিদায়াত লাভ করতে পারে, অসত্য পথ থেকে বিরত থেকে ন্যায় ও কল্যাণ সমর্থ হতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই কুরআন মহানবী (স.) ও তাঁর স্বদেশবাসীর মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মক্কা ও তার চারপাশের জনগণ ছিল আরবী ভাষাভাষী, তাই তাদের মাতৃভাষায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (স.) যাতে তাঁর নিজের জন্মভূমির অধিবাসীদের কাছে মাতৃভাষায় অতি সহজভাবে আল্লাহর দীন প্রচার করতে পারেন। এর দ্বারা অন্য কোন ভাষার প্রতি অবজ্ঞা করা হয়নি। অতএব আল-কুরআন থেকে এটা সুস্পষ্ট হল- মাতৃভাষার গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম। তা যে ভাষাই হোক না কেন। ইসলাম কোন স্থান-কাল-সম্প্রদায়ের জন্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই ইতরবিশেষ নয়। সকল মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদাই সমান। তবে পৃথিবীতে সকল মানুষ যেমন সমান নয়, সকল ভাষাও তেমনি সমান উন্নত নয়। মানুষ নেক আমলের দ্বারা যেমনি মহৎ ও মর্যাদাবান হতে পারে, ভাষাও তেমনি চর্চা ও অনুশীলনের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।[৪৬] পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে যে কোন ভাষা মর্যাদার স্থান অধিকার করতে পারে। ফলে উন্নত ভাষার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা করার ঘোষণা দেয়। অথচ উর্দু পাকিস্তানের কোন এলাকার মাতৃভাষা ছিল না। মূলত উর্দু ভাষা দিল্লীর মুসলিম শাসকদের আমলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী, ফার্সি, তুর্কি এবং স্থানীয় বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে পাকিস্তানের জনগণ কিছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বাংলার পাশাপাশি উর্দুকেও তারা পূর্বপাকিস্তানের অন্যতম ভাষা করার দাবি মেনে নিয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৫ জন অধিবাসীর মাতৃভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণা দেওয়ায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের এ অবাস্তব ও অযৌক্তিক ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নিজের মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নিজের মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্যের ভাষার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা করেনি।[৪৭]

মানুষের মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে মাতৃভাষা অন্যতম। মাতৃভাষা ছাড়া মনের ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার। পৃথিবীতে কোন কবি বা লেখকই তার মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় অমর সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামের মাইকেল মধূসুদন দত্তের ন্যায় বিরাট প্রতিভা আজন্ম ইংরেজি ভাষা চর্চা করা সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন নি। অবশেষে যে মাতৃভাষাকে চরম অবজ্ঞা করতেন, সেই মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চা করেই খ্যাতিমান হতে পেরেছেন। মূলত অন্য ভাষা

৪৬. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান প্রমুখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
৪৭. ড. জিল্লুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা করলেও অন্য ভাষার কোন কিছু বোঝার জন্য মাতৃভাষায় তা অনুবাদ করার মাধ্যমেই আমরা তা বুঝে থাকি। কোন কিছু বুঝার জন্য মাতৃভাষার অনুষঙ্গ তাই একান্ত আবশ্যক। এজন্য মাতৃভাষাকে ভালবাসা মানুষের এক সহজাত প্রবণতা। এ সহজাত প্রবণতাকে অস্বীকার করা কেবল অবাস্তবই নয়, আত্মঘাতির নামান্তর। ইসলাম সর্বক্ষেত্রে এ সহজাত প্রবণতারই সপক্ষে। তাই ইসলামকে বলা হয় ফিতরাতের (স্বভাবের) ধর্ম। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে যে প্রকৃতি বা স্বভাব দান করেছেন, তাকে সে স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যেই মানায়। বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলে ‘ল অব নেচার’। এই নিয়ম মানার ব্যতিক্রমহীন পদ্ধতিই সব সৃষ্টির জন্য ইবাদত অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালন। আল-কুরআনের ভাষায়, “সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট কক্ষ পথে এটা মহাপরাক্রান্ত, সর্বজ্ঞের (আল্লাহর) নিয়ন্ত্র এবং চাঁদের জন্য আমি নির্বাচন করেছি বিভিন্ন মঞ্জিল, অবশেষে তা শুষ্ক, বক্র পুরাতন খেজুর শাখার ন্যায় হয়ে গেল, সূর্যের পক্ষের সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।”[৪৮]

মানুষ ইচ্ছা করলে সেসব ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রে নয়। জন্ম, মৃত্যু, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ব্যাপারে সে অবশ্যই প্রকৃতির নিয়মের অধীন। মানুষ যেমন ফিতরাতের দাবি অনুযায়ী আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে চলতে পারে, আবার বিধান অস্বীকার করে নাফরমান বান্দার মতো জীবন যাপন করার ইখতিয়ারও তার রয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক কাজে লাগানোর প্রয়োজন রয়েছে। আর এগুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো হলো আখিরাতে সে ব্যাপারেই মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। এ স্বাধীনতার জন্য জবাবদিহিতার প্রশ্ন রয়েছে। অন্য কোন সৃষ্টির জন্য এ জবাবদিহিতার প্রশ্ন অবাস্তব। কারণ তাদের কারও এ স্বাধীনতা নেই। প্রকৃতির বিধান মেনে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করে চলছে।

মাতৃভাষার প্রতি মানুষের অনুরাগ সহজাত। স্বকীয় প্রতিভা বিকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম মাতৃভাষা। কিন্তু তাই বলে অন্য কোন ভাষা শেখা বা চর্চা করা যাবে না এমন নয়; বরং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য অন্য যে কোন ভাষা সাধ্য অনুসারে শেখা যেতে পারে। মনীষীরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য সুদূর চীন দেশ অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন দেশে যাবার উপদেশ দিয়েছেন। ভাষা শিক্ষা ছাড়া জ্ঞানের তালিম সম্ভব নয়। জ্ঞান অন্বেষণে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে গিয়ে যে কোন ভাষা শেখার জন্য ইসলাম উৎসাহ প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অতিশয় উদার ও বিশ্বজনীন। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সাথে সাথে অন্য ভাষার প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব প্রদর্শন ইসলামের চিরন্তন শিক্ষা। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, ইসলাম মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদানের শিক্ষা দেয়।

৪৮. আল-কুরআন, ৩৬ : ৩৮-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষা রক্ষা ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান:

বাংলাভাষায় কথা বলে, সে হিসেবে এটা পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম ভাষা। মাতৃভাষার জন্য আমরা দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে পৃথিবীর ভাষাসমূহের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছি। মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছিল মূলত হাজার বছর আগে এ ভাষার জন্মলাভের অব্যবহিত পরেই। বিভিন্ন যুগে এ সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ ও বৈচিত্র্য ঘটেছে। এ সংগ্রামের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পর্যায় হলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। কিন্তু এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়কেই যারা আমাদের ভাষা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস বলে গণ্য করেন তাদের ইতিহাস জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

বৌদ্ধ পালরাজাদের আমলে বাংলাভাষার উৎপত্তি।[৪৯] বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ সকলেই তখন এ ভাষায় কথা বলত। এটাই ছিল তাদের মাতৃভাষা। পাল রাজাদের পরাস্ত করে আর্য ব্রাহ্মণ সেনগণ বাংলার রাজশক্তি অধিকার করে নেবার পর বাংলাভাষার চরম দুর্দিন শুরু হয়। আর্য ব্রাহ্মণ্য শক্তি বৌদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম, স্থাপত্য, সংস্কৃত ও প্রচলিত বাংলাভাষার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে।[৫০] বৌদ্ধদের ব্যাপকহারে হত্যা করা হয় অথবা ধর্মান্তরিত করা হয়। প্রাণভয়ে কিছু লোক সমতল ভূমি থেকে বাংলাদেশের প্রান্তবর্তী পাহাড়ী অরণ্য এলাকা অথবা প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার, চীন, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম, স্থাপত্য ও সংস্কৃতিও সমূলে ধ্বংস করা হয়। বৌদ্ধ আমলে প্রচলিত বাংলা ভাষাকে ম্লেচ্ছ ও ইতরজনদের ভাষারূপে আখ্যায়িত করা হত। এ ভাষায় কথা বললে রৌরব নামক নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।[৫১]

বাংলা ভাষার তখন ছিল চরম দুর্দিন। এ ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ঐ তমস্য। যুগের নিকষ কারো অন্ধকাররাশি বিদূরীত করে মৃতপ্রায় বাঙালি সমাজ ও বাংলা ভাষাকে নতুন জীবন দান করেছিল ইসলামের সার্বজনীন উদার ও শাশ্বত মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ বহিরাগত তুর্কি মুসলমানগণ, সুদীর্ঘ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বক্ষেত্রে চরম উন্নতি সাধিত হবার সাথে সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন প্রাণবেগে পূর্ণ হয়ে উৎকর্ষ লাভ করে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে এটা 'স্বর্ণযুগ' নামে অভিহিত।[৫২] যদি এ ধারা অব্যাহত থাকতে পারত, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের রূপ ও পরিচয় আজ সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে দেখা দিত। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধান এক চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। পলাশী প্রান্তরে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হবার সাথে সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে বাংলা ভাষার উপরও কষাঘাত পড়ে।[৫৩] একদিকে বেনিয়া ইংরেজ অন্যদিকে

৪৯. ড. আর.সি. মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, খ.১, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা : জেনারেল, ১৯৯৬, পৃ. ১১
৫০. আসকার ইবন শায়খ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮, পৃ. ৩২
৫১. বিধান ছিল: "অষ্টাদশ পুরানাকি রাষণ্য চরিতানিক ভাষা রং মানবা শ্রুত্বা রৌর রং নরকংব্রজ্যে।" (লৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পুরান ও রাম চরিত্র ইত্যাদি যে মানব গুণকে তার ব্যবস্থা রৌরং নরকে)।
৫২. ড. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৮৬
৫৩. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান প্রমুখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার সমাজে ঘাপটি মেরে থাকা ক্ষয়িষ্ণু আর্য-ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রতিভূরা তাদের নতুন প্রভু ইংরেজদের সহযোগিতা ও যোগসাজসে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। রাজ ভাষা হয় ইংরেজি। বাঙালিদেরকে ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। বাংলা ভাষা হয় অপাঙক্তেয়, অনাদৃত। ফলে ইংরেজ আগমনের দীর্ঘ প্রায় একশো বছর পর্যন্ত বাংলা ভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্র গ্রন্থই রচিত হয়নি। ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী হবার সাথে সাথে বাঙালি সমাজও নানা বিপর্যয় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক ধরনের স্থিতি লাভ করে। এ পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় নানা কূট-কৌশলে আর্য ব্রাহ্মণরা হয় এদেশের ইংরেজদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। ইংরেজদের সহযোগিতায় তারা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এক অভিনব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সেন আমলে ব্রাহ্মণরা বাংলা ভাষাকে সমূলে উৎখাত করে বৈদেশিক ভাষা-সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে পরিবর্তিত পরিবেশে তারা বাংলাকে সমূলে উৎখাত করা অসম্ভব বিবেচনা করে, বাংলাকে তারা সংস্কৃতায়ন অর্থাৎ বাংলা ভাষার অবয়বে দুরূহ দুর্জেয় সংস্কৃত শব্দরাজির প্রয়োগ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের কণ্টকাকীর্ণ নিয়ম-পদ্ধতির দ্বারা বাংলা ভাষার আসল পরিচয় মুছে ফেলা এবং এর স্বাভাবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করার সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা ভাষার রূপ বহুলাংশে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয় এবং ইংরেজ পূর্ব আমলে রচিত বাংলা সাহিত্যের এক বিশাল অংশকে “পুথি সাহিত্য” বা “বটতলার সাহিত্য” নামে আখ্যায়িত করে তা অপাঙক্তেয় করা হয়।[৫৪] দীর্ঘ অনাদর অযত্নে ধীরে ধীরে তাই বাংলা এক রকম বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। আমরা আমাদের সমৃদ্ধ সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হই।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সর্বশেষ ষড়যন্ত্র চলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে। এবার বাংলা ভাষাকে উৎখাত বা অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু বাংলাভাষীদের উপর বিদেশী ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলে। বাংলার মানুষ এটা মেনে নেয়নি। ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক সকলেই এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। দীর্ঘ আপোসহীন সংগ্রাম এবং চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার এ মর্যাদা আরও সুদৃঢ় ও তাৎপর্যময় হয়ে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশ এবং সর্বোপরি এর যথার্থ মর্যাদা লাভের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তাক্ত ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে আমরা যথার্থই আবেগাপ-ুত ও উদ্দীপ্ত হই।[৫৫]

১৯০৫ সালে তদানিন্তন বঙ্গদেশকে দু’ভাগে বিভক্ত করে ঢাকাকে রাজধানী করে একটি পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। **১৯১১** সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার ফলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারায়। আবার **১৯৪৭** সালে **১৪** আগস্ট ভারত বিভক্তির পর ঢাকা পুনরায় পূর্ব বঙ্গের রাজধানী হয়।

---

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পরপরই পূর্বপাকিস্তানের মানুষ এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, তারা ব্রিটিশের থেকে মুক্তি পেলেও পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসক গোষ্ঠীর খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। আর তা অচিরেই স্পষ্ট হয়ে যায় ভাষার প্রশ্নে। বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানি শাসক চক্র আক্রমণ করলো, শুধু ভাষাই নয় এদেশের সংস্কৃতির উপরও তারা কৌশলে হামলা করল।

১৯৪৭ সালে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী সম্মেলনে তদানিন্তন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাব উত্থাপন করেন, “মাতৃভাষা হবে শিক্ষার বাহন এবং পূর্ববঙ্গে আইন আদালতে ভাষা হবে বাংলা।”[৫৬]

১৯৪৭ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দাবি নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। আরো কয়েকটি সংগঠন পরবর্তীতে এ আন্দোলনে যুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠার পরপর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার দাবিতে প্রথম সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট সফল করার জন্য সচিবালয়ের প্রথম গেইটে পিকেটিং করাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তির ফলে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য ছাত্রনেতাগণ ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে গমন করে ৮ দফা চুক্তি পর্যালোচনা করে ঘোষণা করেন যে, যেহেতু “এ ৮ দফা চুক্তিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা দাবী স্বীকৃত হয়নি সেহেতু এ চুক্তি তিনি মানেন না।” ১৬ মার্চ ৮ দফা চুক্তির বিরুদ্ধে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের “বেলতলাতে” তিনি এক সভা আহ্বান করেন। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তিনিই ছিলেন সেদিনের সভায় একমাত্র বক্তা। সভাপতির বক্তৃতাকালে তিনি ৮ দফার চুক্তিপত্র ছিড়ে ফেলে মিছিল সহকারে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভবন ঘেরাও করেন এবং দাবী উত্থাপন করেন যে, “বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে না পারলে গণপরিষদ থেকে পূর্ববঙ্গের সকল সদস্যকে পদত্যাগ করতে হবে। সেদিন ১৬ মার্চ এ মিছিলে লাঠিচার্জ করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য ছাত্রনেতার উপর নির্যাতন চালায়। ২১শে মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে তিনি লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল সমাবেশে এবং ২৪ শে মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবার কথা ঘোষণা করলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ সমাবেশেই এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।[৫৭] এখান থেকেই ভাষা আন্দোলন নতুন রূপ ধারণ করে। এর চরম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য জীবন দেন

৫৬. ড. জিল্লুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ সালাম, বরকত, রফিকসহ নাম না জানা আরো অনেকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি হয়ে উঠে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাইল ফলক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকালে বঙ্গবন্ধু কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ৫২ ভাষা আন্দোলনের নেতা জনাব গাজীউল হক, জনাব জিল্লুর রহমান, ডাঃ গোলাম মওলা এবং সামসুল হক চৌধুরীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং আন্দোলন সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। এ সময় তিনি রাজবন্দীদের মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে জেলে অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট করা এবং মিছিল করে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালি জাতি যখন ক্ষত-বিক্ষত তখনই বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[৫৮]

শত শহীদের রক্তাক্ত আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে অবশেষে ১৯৭১ এর ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো লাখো বিক্ষুব্ধ জনতার সমাবেশে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তাঁর সারগর্ভ ভাষণ দেন। সে দিনের বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একদিকে তিনি যেমন প্রকারান্তে স্বাধীনতার প্রকাশ ঘোষণা দিয়েছেন, অন্যদিকে তিনি যে একজন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মুসলমান তারও দৃষ্টান্ত রেখেছেন। যেমন, তিনি তার ভাষণে বলেছেন, “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক।” তিনি আরো বলেছিলেন “রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, তবুও এদেশ মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।”[৫৯]

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের শেষোক্ত ‘ইনশা’ল্লাহ’ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বা ঈমান ছিল। “ইনশাল্লাহ” অর্থ হলো, যদি আল্লাহপাক চান। মানুষ যা কিছু করতে চায় তা হওয়া না হওয়া সবকিছু আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। আর যারা এ মতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় মুমিন বলা হয়। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। এজন্য তার ভাষণে দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো এ উক্তির সঙ্গে “ইনশাল্লাহ” শব্দটি যোগ করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য উদিত হয়। ফলে আল-কুরআন ও হাদীসসহ বহু ইসলামী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়। ফলে গোটা জাতি আজ কুরআন-হাদীসসহ সকল ইসলামী গ্রন্থ খুবই সহজে মাতৃভাষায় তার মর্মবাণী বুঝতে সক্ষম হচ্ছে। আর ভাষা আন্দোলন না হলে বা মাতৃভাষার প্রতি জাতির জনকের গভীর ভালবাসা না থাকলে এটা হয়তো বা সম্ভব হত না। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তার যে ভালবাসা তারই প্রকাশ ঘটেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে “প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।” বাংলাকে শুধু রাষ্ট্রভাষা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি,

---

৫৮. ড. জিল্লুর রহমহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
৫৯. মিজানুর রহমান মিজান (সম্পা.) *প্রাগুক্ত*, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণ থেকে, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। আজ জাতিসংঘে বাংলা ভাষা একটি স্বীকৃত ভাষা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আপন মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন কিন্তু অন্য কোন ভাষাকে তিনি হেয় প্রতিপন্ন বা ছোট করেন নি; বরং এটা ছিল তাঁর ঈমানের, ইনসাফের, ইসলামের, আদর্শের দাবী।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারক দল গিয়েছেন। তারা যে অঞ্চলে বা যে দেশে গিয়েছে প্রথমে সেখানকার মানুষের ভাষা তারা আত্মাস্থ করেছে এবং সেখানকার ভাষাতেই সাল্লাম লোহিত সাগরের ওপারে অবস্থিত আবিসিনিয়ায় একদল সাহাবী প্রেরণ করেন। এই দল প্রেরণের পূর্বে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)-কে আবিসিনিয়ার ভাষা আয়ত্ত করতে নির্দেশ দেন। অত্যন্ত মেধার অধিকারী হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) কয়েক দিনের মধ্যে আবিসিনিয় ভাষা শিখে ফেলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিযরতকারী দলের সঙ্গে গমন করেন। আবিসিনিয়ায় পৌছে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর দরবারে তিনি যে বক্তব্য তুলে ধরেন তা আবিসিনিয় ভাষায়।[৬০]

পারস্য দেশের একটি প্রতিনিধি দল প্রিয়নবী (স.) এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা দেশে ফিরে যাবার প্রস্তুতিকালে কুরআন মজীদের কিছু অংশ তাঁদের মাতৃভাষা ফারসীতে অনুবাদ করে দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে হযরত সালমান ফারসী রাদি আল্লাহু তাআলা আনুহু সূরা ফাতিহাকে ফারসী ভাষায় তরজমা করে দেন। ফারসী ভাষী অঞ্চলে ইসলামের দ্রুত প্রসারের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, ইসলামের কিতাবাদি ফারসী ভাষায় অনুবাদের ফলেই ত্বরিত ইসলাম সেখানে বিস্তৃত হয়।[৬১] বড় বড় কবি, সাহিত্যিক ফারসী ভাষায় ইসলামের নানা বিষয়ে বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেন। কবি শায়খ সাদী, জালালুদ্দীন রুমী, হাফিজ, জামী, আনওয়ারী, ফেরদৌসীসহ আরও অনেকেই ইসলাম বিষয়ক লেখালেখি করে অমর হয়ে আছেন।

আমদের বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয় ইসলামের দ্বিতীয় খালীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফত কালের মধ্যভাগ ৬৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। বাংলাদেশে যাঁরা ইসলাম প্রচার করতে সুদুর আরব, ইয়েমেন, পারস্য, তুরস্ক, মিসর, খোরাসান প্রভৃতি ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে আসেন, তাঁরা এখানকার ভাষাকে আত্মস্থ করে এখানকার ভাষাতেই ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান করেন।[৬২] ইসলামে মাতৃভাষার প্রতি কদর দেবার নির্দেশ থাকায় এবং প্রিয়নবী (স.) অন্য দেশের ভাষা শিক্ষা করবার হুকুম দেয়ায় মুসলিমদের মধ্যে নিজ মাতৃভাষার প্রতি যেমন দরদ রয়েছে, তেমনি অন্যের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মানসিকতা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষা দারুণ অবহেলিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ছিল। এ ভাষায় জ্ঞানচর্চা করলে রৌরব নামক নরকে যেতে হবে

---

৬০. দৈনিক জনকণ্ঠ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

৬১. প্রাগুক্ত

৬২. Dr. M.A Rahim, *Social & Cultural History of Bangal Karachi*, Karachi : Pakistan Historical Society, 1964, P. 216

Dhaka University Institutional Repository

এমনতর কঠোর ও ভীতিপ্রদ বিধানও জারি করা হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক শ্রেণী দ্বারা । মূলত বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ফলে এ দেশের মানুষের সার্বিক অনুভবে যেমন স্বস্তির হাওয়া প্রবাহিত হয়, তেমনি এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার পথে হাঁটতে শুরু করে। আপন সত্তাকে প্রকৃত শান্তির দ্বারা আপ-ুত করার পথ পরিক্রম লাভ করতে থাকে, তাদের মাতৃভাষা দিয়ে আপন ভুবন নির্মাণের সুযোগ লাভ করে। আর তা এখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে সম্ভব হয়েছিল।[৬৩]

ইসলাম মাতৃভাষার প্রতি যত্নবান হবার জোর তাগিদ দিয়েছে। জ্ঞান চর্চার সর্বোত্তম মাধ্যমই হচ্ছে নিজের ভাষা বা মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করলে অতি সহজেই তা আয়াত্তে আনা সম্ভব হয় এবং দেশের মানুষের সামনে তা তুলে ধরা সম্ভব হয়। সভ্যতার চরম বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন যুগের সভ্যতা গোঁজ আকৃতির বিশেষ ধরণের লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতাকে লেখার জগতে নিয়ে আসে। ইরাকের তথা মেসোপটেমিয়ার সুমেরদেও দ্বারা উদ্ভাবিত সেই গোঁজ আকৃতির লেখার ভাষা ছিল সুমেরদেও মাতৃভাষা। এমনিভাবে মিসরের ছবি অক্ষর দ্বারা লিখন পদ্ধতি এবং ফিনিশীয়দের আলফা বায়ত বা এলফাবেট ব্যবহারের ভাষাও ছিল তাঁদের মাতৃভাষা।

যা হোক, ইতিহাসের খোলা দৃষ্টিতে দেখা যায়, শুধু পাকিস্তানিরা নয়, সেন আমলে ব্রাহ্মণ প্রভাবিত হিন্দু শাসকেরাও বাংলাভাষায় কথা বলা, ধর্মকর্ম ও সাহিত্যচর্চাকে পাপ মনে করতেন। সেন যুগের ব্রাহ্মণেরা বাংলা চর্চাকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য বলেছিলেন, “বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে, ধর্মকর্ম করে তারা নিশ্চিত রৌরব নরকে জ্বলবে।[৬৪]

নরকে জ্বলার ভয় দেখিয়েও বাংলার প্রসার নিবৃত করা যায়নি। দীর্ঘ হাজার হাজার বছর পর পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসরদের কাছে বাংলা আবার ধর্মহীনতার প্রতীক হয়ে ওঠে। তারা বলে ওঠে হঠাৎ, “বাংলা হিন্দুয়ানি ভাষা, মুসলমানদের বাংলা চর্চা করা ইসলামের পক্ষে অকল্যাণকর।” তাদের এ ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বঙ্গবন্ধু পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই বলেছিলেন “আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয় শিক্ষালাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমে করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাদের দালালেরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিস্কার করেছেন।[৬৫]

ভাষার জন্য সংগ্রাম নিছক কোন সাধারণ সংগ্রাম নয়। ইসলামি আদর্শ ও চেতনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি জিহাদও বটে। কারণ ভাষা মানুষের কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি পবিত্র আমানত। যারা জোর পূর্বক আল্লাহ্ প্রদত্ত এ আমানত খেয়ানত করতে চায় তারা দস্যু। ভাষা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নিয়ামতগুলোর অন্যতম। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ পৃথক ভাষা নির্ধারণ

---

৬৩. Ibid, P. 217

৬৪. মোহাম্মদ আমীন, *বাংলা সাহিত্যের অ আ ক খ*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনি, ২০০২,

৬৫. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), “আমাদের বাঁচার দাবি ছয়-দফা কর্মসূচী”, *বাঙালির কণ্ঠ*, ৪ চৈত্র, ১৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

করে দিয়েছেন। যারা আল্লাহর নির্ধারিত এ নিয়ামতকে জাতি বিশেষের অধিকার হতে কেড়ে নিতে চায় চায় তারা ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী। ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পবিত্র জিহাদ। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "আঞ্চলিক পরিবেশ ও জনগণের ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। ধর্মের নামে ভাড়াটিয়া সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া মানুষের আত্মার স্পন্দনকে পিষে মারার শামিল।"[৬৬]

পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিদের উপর ভাড়াটিয়া সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে আত্মার স্পন্দনকে পিষে মারার চেষ্টা করেছিল। ইসলাম ধর্মে এরূপ অত্যাচারীদের জালিম বলা হয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাংলাভাষা বিধ্বংসী চক্রান্তের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

নবাব আমলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফারসি। ফার্সি ভাষার সাথে আরবি ভাষার মিল আছে। আরবি কুরআনের ভাষা। তাই বলে হিন্দুরা কিন্তু ফারসি শিক্ষা হতে হাত গুটিয়ে রাখেনি। যখন শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি করা হল তখন মুসলমান সম্প্রদায় ধর্মান্ধদের প্ররোচনায় ইংরেজিকে বিধর্মীর ভাষা আখ্যায়িত করে। তারা প্রচার করে, "ফারসি ছেড়ে ইংরেজি শিখলে ইসলাম বিপন্ন হবে।"[৬৭] গোঁড়াদের এ ফতোয়া ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে ইংরেজি শিক্ষা হতে দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ এ ফতোয়া ছিল ইসলামি আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্ এরকম মোল্লাদের উদ্দেশ্যে কুরআনে আক্ষেপ করে বলেছেন, "অতএব তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ উপার্জনের জন্য।"[৬৮]

রাষ্ট্রীয় ভাষাজ্ঞানের কারণে মুসলিম সম্প্রদায় আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয়। শিক্ষার আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা নিজেদের ঐতিহ্য, ধর্মীয় অতীত ইত্যাদির মধ্যে কাল্পনিক জলে অবগাহনে করে তৃপ্তির ঢেকুর ও যুক্তির সন্ধান করতে করতে কুসংস্কারের চোরাবালিতে ডুবে যেতে থাকে। এই ফতোয়াবাজরাই এক সময় নজরুলকে কাফির ফতোয়া দিয়েছিল।

কুরআনের অপব্যাখ্যাকারীদের দাবি ছিল, আরবি আল্লাহর ভাষা। উর্দু যেহেতু আরবি ভাষার কাছাকাছি সেহেতু উর্দুই ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে। বাংলা বিধর্মীদের ভাষা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত হবে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তিনি এ জন্যই আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন যাতে আরবি ভাষাভাষী সম্প্রদায় সহজে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। ভিন্ন ভাষায় কুরআন নাযিল করা হলে তা তারা বুঝতে পারতেন না।[৬৯]

৬৬. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সম্মানে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পী সমাজ আয়োজিত ভাষণের অংশ বিশেষ।
৬৭. সৈয়দ আবির, *ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : *জাগৃতি প্রকাশনী*, ২০০৬, পৃ. ১১৬
৬৮. আল-কুরআন, ২ : ৭৯
৬৯. আল-কুরআন, ২৬ : ১৯৮-১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

অতএব এটি স্পষ্ট যে, আরবি আল্লাহর ভাষা বলে নয়, আরবি ভাষার প্রতি আল্লাহর অতিরিক্ত গুরুত্ব কিংবা ভালোবাসার জন্য নয়, বরং আরবদের ভাষা আরবি তাই আল্লাহ্ তা'আলা আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। বাংলাদেশে কুরআন নাযিল হলে হয়হ কুরআনের ভাষা বাংলা হত। এটি পাকিস্তানি শাসকেরা না বুঝলেও বঙ্গবন্ধু ঠিকই বুঝেছিলেন। আরবি মুসলমানদের ভাষা ছিল না, ছিল মূর্তিপূজকদের ভাষা। কুরআন নাযিলের পর তারা মুসলমান হয়েছে।

ইসলাম বিরোধী অপবাদ দিয়ে যারা বাংলাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। বাংলার মানুষ মুসলমান নয়, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নেই-এ ধরনের অভিযোগ দিয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে ২৩ বছর ধরে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে।"[৭০]

মাতৃভাষা বিষয়ে কুরআনের ঘোষণা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তাই জিন্নাহর বাংলা ভাষা বিরোধি ঘোষণা শোনার পর বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন একজন খাঁটি মুমিনের কাছে মাতৃভাষা আল্লাহর একটি পবিত্র আমানত। মাতৃভাষা দিয়ে মানুষ আল্লাহর বাণীসমূহ অনুধাবন করেন, আল্লাহর প্রশংসা করেন। আল্লাহও মাতৃভাষার মাধ্যমে তার বাণীসমূহ উম্মতের কাছে প্রেরণ করেন। তাই পাকিস্তানিদের বাংলাভাষা বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু যে সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন তা ইসলামের দৃষ্টিতে ফরজের মত অত্যাবশ্যক ছিল।

যারা বাংলাকে ইসলাম ধর্ম বিরোধি কিংবা মুসলমানদের ঐক্যনাশী ভাষা আখ্যায়িত করেছে তারা আল্লাহর আয়াতকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অপমানিত করেছে। আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তাদের মঙ্গল হবে না।"[৭১]

এরূপ অমঙ্গলকারীদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আন্দোলন করে ইসলামি মূল্যবোধকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হয়েছে, হরফ সংস্কার, বানান সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আন্দোলন করে তা বুঝেছি।[৭২]

পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনের ইংরেজি এবং উর্দুতে কার্যবিবরণী লেখা হত। তো ইংরেজি কি আরবির কাছাকাছি অনুরূপ ভাষা? ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু স্পিকারের আপত্তি উপেক্ষা করে বাংলার ভাষণ দিয়েছিলেন, "Honourable Deputy Speaker, Sir, I have to speak in Bengali and I am very sorry

---

৭০. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সম্মানে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পী সমাজ আয়োজিত ভাষণের অংশ বিশেষ।
৭১. আল-কুরআন, ১৬ : ১১৬
৭২. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সম্মানে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পী সমাজ আয়োজিত ভাষণের অংশ বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

that you do not understand it but still I have to speak" [৭৩] প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। তবে কার্যবিবরণীতে তা ইংরেজিতে রেকর্ড করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর পরই পশ্চিম পাকিস্তানের পীর আলী মোহাম্মদ রাশদি সিন্ধি-ভাষায় বক্তব্য প্রদানের অনুমতি চাইতে কোন তরফ হতে প্রতিবাদ বা নিরুৎসাহের আভাষ আসার পূর্বেই বঙ্গবন্ধুর বলে ওঠেন, "Yes, If you please."[৭৪]

নিজের ভাষার প্রতি যাদের দরদ নেই তাদের অন্য ভাষার প্রতিও দরদ থাকে না। মাতৃভাষাকে যারা ভালবাসেন তারা বোঝেন অন্যের মাতৃভাষার কদর। বস্তুতঃ যাদের কোন স্বকীয়তা নেই, নেই প্রণম্য ঐতিহ্য কেবল তারাই অন্য জাতির মাতৃভাষাকে ধ্বংস করার কথা চিন্তা করতে পারে।

ভাষা আন্দোলনের ফলে সরকার অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজিকে স্বীকৃতি দিলেও গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় বক্তব্য দেয়াকে নিরুৎসাহিত করা হত। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধুর বাংলায় প্রদত্ত বক্তব্যকে ইংরেজি ভাষায় রেকর্ড এবং বাংলা ভাষায় কার্যদিবসের রেকর্ড সংরক্ষণ না করায় পরবর্তী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন-

> Sir, in the Rules of procedure of the Constituent Assembly of Pakistan under Rule 29, the official languages of the Assembly have clearly been mentioned as three: English, Bengali and Urdu. But as you know, Sir, the orders of the Day are circulated in English and Urdu and not in Bengali... why it has been done and why Bengali has been excluded?[৭৫]

কোন উত্তর দিতে পারেননি স্পিকার।

আল্লাহ্ বলেছেন, এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে আমি ওহি প্রেরণ করিনি। আল্লাহ যতটি সম্প্রদায়ের কাছে ওহি প্রেরণ করেছেন ততটি সম্প্রদায়ের ভাষাকে ওহির ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা মাধ্যমে হেদায়েতের নির্দেশ দিয়েছেন। সুরা রা'দ এর ৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক এরশাদ করছেন, "আমি মুসাকে নির্দেশাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলো দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহর দীনসমূহ স্মরণ করান।"[৭৬]

স্বজাতিকে জাগ্রত করার জন্য বিজাতীয় ভাষার ব্যবহার মূর্খতার নামান্তর। যারা এরূপ দাবি করেন তারা ইসলামের দৃষ্টিতে পাপিষ্ঠ। বাংলাকে যারা ইসলাম বিরোধি ভাষা এবং উর্দুকে পাকিস্তানি ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছে তারা সত্যি নিকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যাদের

---

৭৩. মিজান রহমান (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ৩২২

৭৪. *Karachi*, Wednesday, The 9th November, 1955

৭৫. Idib, 17th January, 1956

৭৬. আল-কুরআন, ১৩ : ৫

Dhaka University Institutional Repository

জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন এবং তাদেরকে সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হবে।[৭৭]

বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর মহানবী (স.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রভাব আরও সম্প্রসারিত হয়। বিশ্বে ইসলামের জয়ডঙ্কা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স.) জায়েদ বিন সাবিদকে ডেকে হিব্রু ভাষা শেখার নির্দেশ দেন, যাতে তিনি মহানবী (স.) এর সাথে ইহুদিদের যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হন।[৭৮]

যে সময় মুহাম্মদ (স.) হিব্রুভাষা শেখার নির্দেশ দেন সে সময় ইহুদিরা ছিল ইসলামের চরম শত্রু। এরূপ চরম অবস্থাতেও ইহুদিদের ভাষা শেখার জন্য আল্লাহর নবীর নির্দেশ এটাই প্রমাণ করে যে, কোন ভাষাই অনৈসলামিক নয়। প্রকৃতির মতই ভাষা আল্লাহর একটি পরম নেয়ামত। যারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে, অবমাননা করে তারা পক্ষান্তরে আল্লাহকে অবমাননা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলাম ছড়িয়ে আছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, চীন, জাপান, ফিলিপাইন, আফ্রিকাসহ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশে কম-বেশি মুসলমান রয়েছে। তারা নিজেদের স্থানীয় ভাষায় কথা বলে, ধর্মকর্ম করে। ওখানকার ধর্ম প্রচারকেরা কখনও বলেননি যে, আরবি ছাড়া অন্য ভাষা অনৈসলামিক। তাহলে পাকিস্তানিরা কেন বাংলাকে এরূপ বলল? আল্লাহর ভাষায় বলা যায়, "তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, তাই বিফল মনোরথ হয়েছে।"[৭৯]

পাকিস্তানিরা ভাষা বিষয়ে বাঙালিদের তেজদীপ্ত জয়ের পরও বাংলাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেনি। সংবিধানের খসড়ায় উর্দুকে ইসলামি ভাষা আখ্যায়িত করে বাংলার উপরে তার মর্যাদা রাখা হয়। রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় ভাষা, প্রাদেশিক ভাষা ইত্যাদি ভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে সংবিধান রচনাকালে বাংলাভাষা নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল। সে ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশনে খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনায় বঙ্গবন্ধু ইসলামি ভাষার নামে কূপমণ্ডুকতার জবাব দিয়েছিলেন-

> What is the language of Islam, Sir, Arabic, Urdu, Persian or Bengali. What is the language of the Mussalmans, who will judge it? My friend says Urdu. I would say Benglali. Persians will say Persian. Turks will say Turkish, Indonesians will say Indonesian. Other people will say their own language.[৮০]

বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছেন, "আমি যদি একে (কুরআন) অনারব ভাষায় নাযিল করতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কী আশ্চর্য যে, কিতাব অনারবভাষী আর রসুল আরবভাষী। বলুন এটা

৭৭. আল-কুরআন, ১৬ : ৬২
৭৮. আবু জাফর, *রসুল মুহাম্মদ (স.)*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০২, পৃ. ১৫০
৭৯. আল-কুরআন, ২০ : ৬
৮০. মোনায়েম সরকার, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়।”[৮১]

আরবি ভাষায় কেন কুরআন নাযিল করা হয়েছে তা এ আয়াতের মাধ্যমে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মাতৃভাষা শুধু সহজপাঠ্য নয়, সহজবোধ্যও বটে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “আমি একে করেছি কুরআন, আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বোঝ।”[৮২]

বুঝা ছাড়াও মাতৃভাষা স্মরণে রাখার জন্যও অধিক সহায়ক। এটিও আরবি ভাষায় আরব সম্প্রদায়ের কাছে কুরআন নাযিলের আরেকটি কারণ। আল্লাহ বলছেন, “আমি আপনার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে।”[৮৩]

কুরাআন-হাদীসের বর্ণিত ভাষ্যের আলোকে বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষাকে ভালবেসেছেন, এর মর্যাদা রক্ষা করেছেন এবং এর উন্নয়নে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যা অভূতপূর্বভাবে সফল হয়েছে। এর ফলোশ্রুতিতেই আমরা পেয়েছি মাতৃভাষার সম্মান ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

৮১. আল-কুরআন, ৪১ : ৪৪
৮২. আল-কুরআন, ৪৩ : ৩-৪
৮৩. আল-কুরআন, ৪৪ : ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধু গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ইসলাম প্রচার-প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থাপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ কিছু দেশী-বিদেশী লেখক, সাংবাদিক তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো নিয়ে কোন ধর্মীয় বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা আজ অবধি করা হয়নি। যার ফলে ব্যাপক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী বিশেষ করে যারা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধিতা করেছিল, তারা বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে তাঁর ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন ও অপরিহার্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু বাংলাভাষী সকল মানুষের কাছে স্বীকৃত। কিন্তু এটাই তাঁর গৌরবোজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবনের শেষ নয়; বরং তিনি একজন ভাল মুসলমানও ছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানগুলো মূল্যায়ন করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় ব্রিটিশ-ভারতে। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র জীবন থেকেই অংশগ্রহণ করেন। সেই সূত্র ধরেই তিনি মুসলিম লীগের ব্যানারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। যেদিন থেকে মুসলিম লীগের ব্যানারে পাকিস্তানের বাংলাভাষী পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মুখের ভাষা থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে জাতিগত নিপীড়নের স্টীমরোলার চালানো শুরু হয়েছে, তখন থেকেই তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ আবার তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ’৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পূর্ব থেকে ’৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল।[১]

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগ সরকারকে পরাস্ত করে যখন ক্ষমতায় এল তখন পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীসহ কেউ কেউ এ দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এ বিজয়কে সহজে মেনে নেয়নি। তাই তারা নতুনভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। সে ষড়যন্ত্রের পথ ধরে ১৯৫৮ সালে পাক সামরিক চক্র আইয়ুব খানের নেতৃত্বে পুনরায় পাকিস্তানের রাজনীতি আবির্ভূত হয়। সে সময়েই পাক সামরিক গোষ্ঠীর নেতা আইয়ুব খাঁন তৎকালীন প্রতিবাদী কণ্ঠ বঙ্গবন্ধুসহ অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করে। তা সত্ত্বেও তিনি ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আইয়ুবের

---

১. আশরাফ হোসেন, *বাঙ্গবন্ধু, তাঁর রাজনীত ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : উত্তরণ প্রকাশন, ২০১৪, পৃ. ৩৩-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

গণবিরোধী সামরিক আইনকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রাম চালিয়ে যান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রতিভার কাছে পাক সামরিক গোষ্ঠী পেরে ওঠে নি। তিনি সব নির্যাতন উপেক্ষা করে বাংলার মানুষের প্রাণের দাবিগুলো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সে দাবিগুলোকে একটি সূত্রে গেঁথে বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ ৬ দফা প্রণয়ন করেন।[২]

৬ দফা প্রকাশিত হওয়ার পর পাক সামরিক গোষ্ঠীর ভিত কেঁপে উঠে। লৌহমানব বলে কথিত আইয়ুব খান দিশেহারা হয়ে সেদিন গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী বাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমস্ত উস্কানিকে উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সামরিক জান্তা তাঁর অগ্রযাত্রাকে ঠেকানোর জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে।[৩] সেদিনও বাংলার অবিসংবাদিত নেতার পক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠে সমগ্র বাঙালি জাতি।

১৯৬৯ সালে ছাত্র গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। সে অভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব সামরিক জান্তার ক্ষমতার ভিত্তিমূল উৎপাটিত হয় এবং তারা বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সে সময় পাকিস্তানের ক্ষমতায় মসনদে নতুন করে আবির্ভূত হয় নতুন সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খান। অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে নির্বাচন।[৪] সে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ একক দল হিসেবে এবং বাঙালির একচ্ছত্র নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলামী চেতনায় যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের তথা আজকের বাংলাদেশের মানুষের কাছে তৎকালীন পাক শাসকগোষ্ঠীর কার্যকলাপের ফলে তার অবদান সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়। জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের কাছে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো না; উপরন্তু বিভিন্ন টালবাহানা করে কালক্ষেপণের মধ্যে দিয়ে নিরস্ত্র বাঙালির উপর সমস্ত পাক সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হল তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রাম।

বাংলার দামাল ছেলেরা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অপরদিকে পাক হানাদার এদেশীয় দোসর জামায়াত ও তাদের সমমনা অন্যান্য দলের সমন্বয়ে গঠিত "রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস" প্রভৃতি ঘাতক গোষ্ঠী দেশের সাথে বেঈমানী করে পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করে।

ইসলামের নামে অত্যাচার আর জুলুমে জর্জরিত হয়ে বাঙালিরা সেদিন আর্তনাদ করে উঠেছিল। আর সে আর্তনাদে হয়তোবা আল্লাহর আরশও কেঁপে উঠেছিল। সে সময় বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে এই বলে ডাক দিয়েছিলেন যে "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম

---

২. শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের রণাঙ্গন*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮২, পৃ. ৫৫
৩. শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৬৪
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার সংগ্রাম"[৫] এবং তিনি এও বলেছিলেন যে, "বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা'ল্লাহ"।[৬] তাঁর ভাষণের এ সকল উক্তি দ্বারা তার দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, মানবতাবোধ, ঈমানী চেতনা ও আল্লাহর ওপর অগাধ ভরসার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এবং বুঝা যায় তার ঈমানী শক্তি কত মজবুত ছিল।

শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেই ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে এক নির্দেশে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।[৭] এতে প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গবন্ধু ছিলেন আল্লাহর শক্তিতে বলীয়ান। কারণ, ঐ মুহূর্তে এরূপ একটি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি ক্ষমতায় আসার পর একদিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে হাত দিলেন, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধর্মের নামে ব্যবসা চিরতরে বন্ধের লক্ষ্যে শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে জ্ঞানী আলিমদের সম্পৃক্ত করার জন্য এক অর্ডিন্যান্সবলে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন" গঠন করেন।[৮]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধু গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন

১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ[৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারী করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[১০] একই বছর জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এ অধ্যাদেশটি অনুমোদন করে অ্যাক্ট বা আইনে রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই এটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।[১১]

---

৫. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
৭. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেনী, ৭১ *এর দশমাস*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৩১
৮. "*স্মরণিকা*" শোক দিবস সংখ্যা, ১৫ আগস্ট ১৯৯৩। ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত।
৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে দু'ধরনের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চের উল্লেখ করা হয়, আবার কোথাও কোথাও ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রতি ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ তারিখে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রপতির উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী অধ্যাদেশটি সরকারিভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ২৮ মার্চ, ১৯৭৫। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত বাংলা পিডিয়ার ১ম খন্ডের ৪৪১ নং পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে- "১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ বায়তুল মুকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমীকে একীভূত করে এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট প্রণীত হয়।"
১০. এম রুহুল আমীন, *বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩
১১. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা নং- ১৯১৭, পৃ. ২; মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' নামক তৎকালীন দু'টি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এই ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। প্রথরোক্ত দুই সংস্থার সমুদয় সম্পদ, দায়-দায়িত্ব এবং কর্মসূচি নবগঠিত এই ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত হয়।[১২]

এ দেশের একমাত্র সরকার পরিচালিত জাতীয় দীনি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীদের ঈমানী চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এই প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করে চলেছে। সারাদেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত এর শাখা অফিসসমূহের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার প্রসারসহ দারিদ্রবিমোচন এবং আর্থ সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে দেশের ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এমনটি সব সময় ছিল না। এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জাতির সামনে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।

ঢাকায় একটি বৃহত্তর মসজিদ স্থাপন এবং এর আওতায় একটি ফতোয়া সংগঠন, হিফয্খানা, ইসলামী পাঠাগার পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে "বায়তুল মুকাররম সোসাইটি" গঠন করা হয়।[১৩] বায়তুল মুকাররম মসজিদের নির্মাণ ও প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য বায়তুল মুকাররম মার্কেট স্থাপন করা হয়। ১৯৬০ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি বায়তুল মুকাররম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

এ কমিটি মসজিদ ও মার্কেটের নির্মাণ কাজ এবং হিফয্খানা, পাঠাগার পরিচালনাসহ সীমিত পরিসরে ধর্মীয় দিবসসমূহ উদযাপন করে। এ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে "ইসলামী একাডেমী" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় এবং ১৯৬০ সালের ২৮ নভেম্বর প্রধান রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ আবুল হাশিমকে এর প্রথম পরিচালক হিসেবে মনোনীত করা হয়।[১৪]

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকার কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও উৎসাহী বুদ্ধিজীবি ১৯৫৯ সালে ঢাকায় দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) প্রতিষ্ঠা করেন। এই দারুল

---

১২. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ", *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫১

১৩. উল্লেখিত বায়তুল মুকাররম সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়–

জনাব জি.এ. মাদানী	-	চেয়ারম্যান
জনাব হানিফ আদামী	-	কোষাধ্যক্ষ
জনাব এ.জেড. রেজাই করিম	-	সদস্য
জনাব এ. রাজ্জাক	-	সদস্য
জনাব স. সাত্তার মানিয়া	-	সদস্য
জনাব কাইসার এ সান্নু	-	সদস্য
জনাব এ. রশীদ	-	সদস্য
জনাব ওয়াই এ বাতায়ামী	-	সদস্য [এম. রুহুল আমিন, *বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩]

১৪. বজলুল হক, "ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২০:১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

উলুম (ইসলামিক একাডেমী) ১৯৫৯ সালের ১২ই আগস্টে চট্টগ্রাম জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সাথে ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট-২১ অনুসারে রেজিস্ট্রি করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিন ভাইস চ্যান্সেলন বিচারপতি হামুদুর রহমান এ.টি.এম. আবদুল চেয়ারম্যান ও ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্স এর ডিরেক্টর জনাব এ.টি.এম. আবদুল মতিন অবৈতনিক পরিচালক নির্বাচিত হন। ঢাকার বয়েজ স্কাউট ভবনের উপর তলায় এর কার্যালয় স্থাপন করা হয়।[১৫]

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে করাচীতে কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন।

এই সময় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমানের উদ্যোগে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ জনাব আবুল হাশিমের সাথে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মরহুম মুহাম্মদ আইয়ুব খানের এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। এই সাক্ষাৎকারের সময় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় আলোচনা প্রসঙ্গে করাচীতে নব প্রতিষ্ঠিত এই সাক্ষাৎকারের সময় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় আলোচনা প্রসঙ্গে করাচীতে নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইসলামিক গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর অনুরূপ ঢাকায় একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপনের অপরিহার্যতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই আলোচনার ফলশ্রুতিস্বরূপ কেন্দ্রীয় ইসলামিক ইনষ্টিটিউট এর পরিচালক ডঃ আই এইচ কোরেশী ঢাকায় আগমন করেন এবং দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) এর চেয়ারম্যান বিচারপতি হামুদুর রহমান, জনাব আবুল হাশিম ও জনাব এ.টি.এম. মতিনের সাথে সাক্ষাৎ করে দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী)-কে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ইসলামিক গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর শাখারূপে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব মুতাবিক দারুল উলুমের (ইসলামিক একাডেমী) অবৈতনিক পরিচালক ১৮ই জুলাই ১৯৬০ দারুল উলুমকে কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনষ্টিটিউটের শাখারূপে স্বীকৃতি দানের জন্য একটি পত্র পাঠান। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের কার্যকরী পরিষদের দ্বিতীয় সভায় এই প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

ডঃ আই এইচ কোরেশী ঢাকার চেয়ারম্যান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে পত্রযোগে এই অনুমোদনের কথা অবহিত করেন। কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক স্বীকৃতি দানের প্রাক্কালে সাবেক গঠনতন্ত্রের আমুল সংশোধন করা হয়। সংশোধিত গঠনতন্ত্রে ঢাকা দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) এই নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা' এই নামকরণ করা হয় এবং ইসলামিক একাডেমী ঢাকাকে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করা হয়। একাডেমীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বোর্ড অব গভর্নরস গঠনের বিধান দেয়া হয়। এ বিধান অনুযায়ী স্থির হয় যে ইসলামিক একাডেমী- ঢাকার ডিরেক্টরদ্বয়, ঢাকা ও রাজশাহী

১৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদ্বয়, একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক তৎকালনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ ও একজন ধর্মবেত্তা এবং একাডেমীর সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে বোর্ড অব গভর্নরস গঠিত হবে। বছরে দুবার বোর্ড অব গভর্নরসের সভা অনুষ্ঠিত হবে। অন্তবর্তীকালীন কার্য-নির্বাহের জন্য একাডেমীর চেয়ারম্যান, পরিচালক এবং বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কর্ম-পরিষদ গঠিত হবে।[১৬]

সাবেক দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী)-এর চেয়ারম্যান ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা-এর চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকবেন এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বয়ং প্রথম পরিচালক নিয়োগ করবেন। সংশোধিত গঠনতন্ত্র অবলিম্বে কার্যকরী হয় এবঙ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাবেক দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) এর চেয়ারম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি হামুদুর রহমান ইসলামিক একাডেমী ঢাকা-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। অতঃপর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৮/১১/১৯৬০ তারিখে জনাব আবুল হাশিমকে একাডেমীর প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর লেঃ জেনারেল আজম খান শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রাদেশিক শিক্ষা পরিচালক জনাব শামসুল হক ও ধর্মবেত্তা হিসেবে ডঃ সানাউল্লাহ ব্যারিষ্টার এট-ল-কে বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন। এরপর সাবেক দারুল উলুম (ইসলামী একাডেমী)-এর যে সব সদস্যের সদস্য পদ নয়াব্যবস্তা কার্যকরী করার দিন পর্যন্ত বহাল ছিল তারা এক সভায় মিলিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সিরাজুল হক, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ ও জনাব এ.টি.এম আবদুল মতিনকে বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য নির্বাচিত করেন। ফলে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড অব গভর্নরস গঠিত হয়।[১৭]

১. বিচারপতি হামুদুর রহমান
২. ডঃ ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী
৩. ডঃ মাহমুদ হোসেন
৪. ডঃ মমতাজ উদ্দিন
৫. ডঃ সিরাজুল হক
৬. অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ
৭. জনাব এ.টি.এম. আবদুল মতীন
৮. জনাব শামসুল হক
৯. ব্যারিষ্টার জনাব সানাউল্লাহ এবং
১০. জনাব আবুল হাশিম।

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
১৭. বজলুল হক, "ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

জনাব আবুল হাশিম ২৮/১১/১৯৬০ তারিখে একাডেমীর কার্যভার গ্রহণ করেন এবং সাবেক দারুল উলুম থেকে যে সম্পদ বুঝে নেন, তার মধ্যে ছিল নগদ তহবিল ৯৫৬.৩১ টাকা, সাতশত টাকার মাসিক ভাড়ার চারটি প্রশস্ত কামরা, সাড়ে সাতশত পুস্তকের একটি লাইব্রেরী, একান্নখানা চেয়ার, দুইটি আলমারী, একটি শেলফ ও একটি র‍্যাক, একটি মাত্র মৌলিক গ্রন্থ (অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম) একটি বিদেশী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় প্রকাশিত তিন-চারখানা অনুবাদ পুস্তক ও আল্লামা নদভীর রহমতে আলম পুস্তকের একটি অনুদিত পান্ডুলিপি। এ সময় অফিসের কর্মচারী ছিলেন একজন পিওনসহ মাত্র তিনজন। তাদেরকে নিয়ে নব-নিযুক্ত পরিচালক জনাব আবুল হাশিম কাজ শুরু করেন এবং ঢাকার ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র ও তরুণদের প্রতি একাডেমীর কাজে সাহায্য করার আহ্বান জানান। তাঁর এ আহ্বানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উৎসাহী কর্মী ও তরুণদের মধ্যে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সরকারী মহল থেকে প্রথম সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো। তারা চারটি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের জন্য আটশত টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ঐ আর্থিক সালের অবশিষ্টাংশের খরচ মেটানোর জন্য পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এই সাহায্য একাডেমীতে এসে পৌঁছে ১৯৬১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি।

জনাব আবুল হাশিমের আহ্বানে ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলও সাড়া দেন। ১৩ই জানুয়ারি, ১৯৬১, একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এক চা-চক্রে ঢাকার সুধী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ অনুষ্ঠানে যারা যোগদান করেন তাদের মধ্যে ছিলেন মরহুম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মীর্জা নুরুল হুদা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ হাবিবুল্লাহ, বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আবদুল হাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নাট্যকার জনাব নূরুল মোমেন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান, ডঃ সিরাজুল হক, কবি আবদুল কাদির, জনাব আবদুল মওদুদ প্রমুখ। তারা একাডেমীর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর আগ্রহের সাথে আলোচনা করেন ও তাদেরই পরামর্শক্রমে ইসলামিক একাডেমীর মুখপাত্র হিসাবে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবঙ এর নামকরণ করা হয় 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা'।

এই নয়া কর্মসূচির মধ্যে ছিল অব্যাহতভাবে সাপ্তাহিক মাহফিল, পাক্ষিক যুব সেমিনার ও বড় আকারের মাসিক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান এই কর্মসূচির অধীনে ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ কার্জন হলে প্রথম সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী বিষয়ের রীডার ডঃ ফাতেমা সাদেক 'Islamic way of life in modern world' (আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জীবন পদ্ধতি) বিষয়ের উপর দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হোসেন, ডঃ আন্দালব সাদানী, ডঃ সিরাজুল হক, অধ্যাপক হাসান জামান, ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। এ অনুষ্ঠানে বৈদেশিক দূতাবাসের সদস্যসহ সরকারী ও

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী মহলের প্রায় পাঁচশত সুধী শ্রোতা যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠান ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পক্ষাধিককাল পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত থাকে।

ইসলামিক একাডেমীর নয়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নবগঠিত বোর্ড অব গভর্নরসের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৯শে এপ্রিল, ১৯৬১ সালে। একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক সাবেক পাকিস্তানের তদানীন্তন লেঃ জেঃ আজম খান আনুষ্ঠানিকভাবে এ সভা উদ্বোধন করেন। সভায় ডঃ মাহমুদ হোসেন, ডঃ সিরাজুল হক ও জনাব শামসুল হক-কে একাডেমীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয়।

উপরিউক্ত সাংগঠনিক বিবর্তনাদি সত্ত্বেও ইসলামিক একাডেমীর কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের খুবই অপ্রতুল অনুদান হতে কোন ক্রমে একাডেমীর ব্যয় নির্বাহ হত। পুস্তক বিক্রয় ইত্যাদি সূত্রে অর্জিত একাডেমীর নিজস্ব আয় ছিল অকিঞ্চিৎকর। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা এবং সভা সেমিনার, গ্রন্থ সাময়িকীর মাধ্যমে গবেষণা প্রসূত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার ছিল মূলত ইসলামিক একাডেমীর কর্মসূচী। ১৯৭৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল- কুরআনুল করীম শিরোনামে প্রকাশিত কুরআনের একটি প্রামাণিত এবং প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, দি ক্রিড অব ইসলাম ইত্যাদি কয়েকখানি ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ, ত্রৈমাসিক ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা ও সবুজ পাতা নামক একটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা ও আরবী শিক্ষার একটি কোর্স পরিচালনা। এতদ্ভিন্ন একাডেমী বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ও বিষয়ে সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করত।

অপরপক্ষে বায়তুল মুকাররম সোসাইটিও এর কর্মসূচি বাস্তবায়নে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে সমর্থ হয়নি। মসজিদ ভবন এবং বিপণি কেন্দ্র উভয়ের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকে। গবেষণা, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদিতে সোসাইটি মোটেই অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৭০-৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে সোসাইটির কর্মকর্তাগণ স্থানচ্যুত হলেন। বিপণিকেন্দ্রে বহু দোকান পরিত্যক্ত হয় এবং বহু ক্ষেত্রে সেইগুলি অনধিকার প্রবেশকারীদের কবলে পড়লে তারপর সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটি পূণর্গঠিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিত্যক্ত দোকানগুলির পত্তন হতে পারল না। বরং এতে নানা বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। ফলে বিপণিকেন্দ্রের আয় কমে গেল। সুতরাং বায়তুল মুকাররম মসজিদ পরিচালনের মধ্যেই সোসাইটির কর্ম প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে।

এক রক্তাক্ত সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বায়তুল মুকাররম কমিটিতে রূপান্তরিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন রাজনীতিবিদ ভাষা সৈনিক মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ এবং সদস্য সচিব ছিলেন তৎকালীন সহকারী ওয়াকফ প্রশাসক ও বায়তুল মুকাররম কমিটির সেক্রেটারি জনাব আব্দুল কুদ্দুস। সোসাইটিকে কমিটিতে রূপান্তরিত করার পর এর কর্মকাণ্ড ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হয়। এ কমিটির আওতায় মসজিদ ও মার্কেটের আওতাধীন সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন 'পাকিস্তান সীরাত মজলিসকে বাংলাদেশ সীরাত মসলিস'-এ রূপান্তরিত করা হয়। নব গঠিত বাংলাদেশের সীরাত মজলিসের চেয়ারম্যান ছিলেন মরহুম মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ। ভাইস চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ও প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মহিউদ্দিন শামী এবং সদস্য হিসেবে ছিলেন মাওলানা খোন্দকার নাসির উদ্দীন প্রমুখ। অফিস সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আব্দুল কুদ্দুস। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক "বাংলাদেশ সীরাত মজলিস" প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত দেশের আলিম সমাজকে জনরোষ ও নিগৃহীত দশা থেকে মুক্ত করে সমাজে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা।

এ কমিটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সীরাত মজলিসের উদ্যোগে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে রবিউল আওয়াল মাসে 'পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স.)' মাহফিল জাতীয় পর্যায়ে উদযাপন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স.) মাহফিলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিদেশে চিকিৎসাধীন থাকায় ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।[১৮]

বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধন ও এর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বায়তুল মুকাররম মসজিদ যে জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এ তিন একর জমি মসজিদের নামে বরাদ্দসহ নিলামীতে রেজিস্ট্রি করে মসজিদের নামে ওয়াক্ফ্ করে দেওয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি বায়তুল মুকাররম মসজিদের নকশা পরিকল্পনা অনুযায়ী এর স্থান নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সরকারি কাজের অন্তর্ভূক্ত করে সমাপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ইসলামিক একাডেমী এবং বায়তুল মুকাররম কমিটির কর্মকাণ্ড একই কম্পাউন্ডের এবং একই প্রকৃতির হওয়ায় দুটি সংস্থাকে একীভূত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এছাড়া সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার অবাধ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সদস্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের অবমূল্যায়ন নিরসনকল্পে বায়তুল মুকাররম সোসাইটি ও ইসলামিক একাডেমীকে একীভূত করে বৃহত্তর পরিসরে জাতীয় পর্যায়ে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে "১৬ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ" গঠন করা হয়। "বোর্ড অব ট্রাস্টিজ" এর সদস্যগণের মধ্যে দু'জন সম্মানিত সংসদ সদস্য ও তিনজন ছিলেন সরকারের সচিব, সম্ভবত তৎকালীন বাংলাদেশে এটিই ছিল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও ইসলাম চিন্তাবিদ

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়ে গঠিত সবচেয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। পরবর্তীতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। অধ্যাদেশ বিধৃত কর্ম পরিকল্পনাসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

১. মসজিদ, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, একাডেমী, ইনস্টিটিউট ইত্যাদি, স্থাপন, পরিচালনা, সংরক্ষণ, এগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান ও এগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটানো।

২. সংস্কৃত ঃ বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা।

৩. সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের ব্যবস্থা করা।

৪. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান, আলোচনা, বক্তৃতা, বিতর্ক, সভা সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন, গবেষণা ও আলোচনা প্রসূত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ, অনুবাদ সংকলন, সাময়িকী ও পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি।

৫. উপরোক্ত কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রকল্প রচনা, সম্পৃক্ত প্রাতিষ্ঠানিক দিক প্রকল্প প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা সাহায্য দান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার প্রসার ও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে মহান ইসলামের কল্যাণময় স্রোতধারায় সঞ্জীবিত করার মহান লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। "বায়তুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমী নামক তৎকালীন দু'টি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এই ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। প্রথমোক্ত দুই সংস্থার সমুদয় দায়িত্ব এবং কর্মসূচি নব গঠিত ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত করা হয়।[১৯]

১৯. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫

(১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইন)
(১৯৮৫ সালের ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫
বিষয়সূচ, প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদসমূহ

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রারম্ভ
২. সংজ্ঞা
৩. ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা
৪. প্রধান কার্যালয়
৫. সাধারণ নির্দেশনা
৫ ক. মহাপরিচালক
৬. বোর্ড
৭. বোডের বৈঠক
৮. নিয়োগ কমিটি
৯. ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দ
৯ক. সদস্যদের সভা
১০. অফিসার নিযুক্তি, ইত্যাদি
১১. কার্যাবলী
১২. তহবিল
১৩. হিসাব
১৪. বাজেট
১৫. হিসাব পরীক্ষা
১৬. রিপোর্ট, ইত্যাদি
১৭. ক্ষমতা অর্পণ
১৮. বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৮ক. রেগুলেশন প্রণয়নের ক্ষমতা
১৮ক. ফাউন্ডেশন সম্পত্তির ভাড়া নির্ধারণ
১৯. কার্যক্রম গুটাইয়া ফেলা
২০. বায়তুল মুকাররম ও ইসলামী একাডেমীর অবলুপ্তি
২১. রহিতকরণ ও সাপেক্ষ বিষয়

১৯৭৫ সালের সতের নম্বর আইন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্দেশ্যে আইন

যেহেতু দেশে মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও সেইগুলিকে সহায়তাদান, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সমপর্কে গবেণষা চালানো, ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, পরমত সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের মত মৌলিক আদর্শাবলী

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, আইন ও বিচারব্যবস্থার উপর গবেষণার প্রসার ঘটানো এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন প্রয়োজন ও সমীচী; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নোক্ত আইন বিধিবদ্ধ করা হইল:

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রারম্ভ ঃ

(১) এই আইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন ১৯৭৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ১৯৭৫ সালের ২৮ শে র্মা হইতে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২. সংজ্ঞা ঃ

এই আইনের বিষয়ে বা প্রসঙ্গে পরিপন্থী কিছু না থাকিলে-

(ক) "বোর্ড" অর্থ ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব[২০] (গভর্নরস);

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ এই বোর্ডের চেয়ারম্যান;

[২১][(খখ) "মহাপরিচালক" অর্থ ৫ক অনুচ্ছেদ বলে নিয়ুক্ত মহাপরিচালক;]

(গ) "ফাউন্ডেশন' অর্থ এই আইন বলে গঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন;

[২২][গগ] "গভর্নর" অর্থ বোর্ডের একজন সদস্য;]

[২৩][(ঘ) "নির্ধারিত" অর্থ বিধিবলে "নির্ধারিত";]

৩. ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ঃ

(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর আইনের উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নের জন্য সরকার যথাশীঘ্র সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবেন।

(২) ফাউন্ডেশন হইবে একটি কর্পোরেট সংস্থা যাহার স্থায়ী উত্তরাধিকার ও অভিন্ন সীলমোহর থাকিবে। ফাউন্ডেশনের স্থাবর অস্থাবর উভয় ধরণের সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও বিক্রয় করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে। ফাউন্ডেশন তাহার উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে এবং তাহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে।

৪. প্রধান কার্যালয় ঃ

(১) ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় হইবে ঢাকায়।

(২) ফাউন্ডেশন তাহার বিবেচনায় যতগুলি শাখা স্থাপন এবং যে সমস্ত এলাকায় স্থাপন উপযুক্ত মনে করিবে ততগুলি শাখা সেই সমস্ত স্থানে স্থাপন করিবে।

---

২০. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশ বলে "ট্রাস্টিস" শব্দটির পরিবর্তে বসানো হইয়াছে।
২১. ১৯৭৬ সালের ৬৪ নং অধ্যাদেশের ২ নং অনুচ্ছেদবলে এই নতুন ধারা (খখ) সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।
২২. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশ বলে এই নূতন ধারা (গগ) সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।
২৩. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ২নং অনুচ্ছেদ বলে মূল ধারা (ঘ) -এর পরিবর্তে ধারা (ঘ) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সাধারণ নির্দেশনা ঃ

ফাউন্ডেশন সাধাণ পথ নির্দেশনা ও কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্বটা বোর্ড অব [গভর্নরস]-এর হাতে ন্যস্ত থাকিবে। বোর্ড অব গভর্নরস ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রয়োগ ও সম্পাদিত হইতে পারে এমন যাবতীয় ক্ষমতার প্রয়োগ এবং যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবে।

[২৪][৫ক. মহাপরিচালক

(১) ফাউন্ডেশনে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন মহাপরিচালক থাকিবেন এবঙ তাঁহার নিয়োগের শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) মহাপরিচালক হইবেন ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্ত। বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করাই হইবে তাঁহার দায়িত্ব এবং তিনি বোর্ডের সচিব হিসাবে কাজ করিবেন।

[২৫][৬. বোর্ড ঃ

(১) বোর্ডে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা গভর্নর হিসাবে থাকিবেন যথা ঃ

(ক) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক বিভাগ, পদাধিকারবলে; তিনি একই সঙ্গে বোর্ডের চেয়ারম্যানও থাকিবেন;

(খ) চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ, পদাধিকারবলে;

(গ) সচিব, শিক্ষা বিভাগ, পদাধিকারবলে;

(ঘ) উপাচার্য, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, পদাধিকারবলে;

(ঙ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, পদাধিকার বলে;

(চ) বিধিবিধানে নির্দেশিত পন্থায় ফাউন্ডেশনের সস্যদের মধ্য হইতে সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত তিন ব্যক্তি;

(ছ) বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ও ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পাঁচ ব্যক্তি;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দু'জন সংসদ সদস্য; এবং

(ঝ) মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে; ইনি একই সঙ্গে বোর্ডের সদস্য সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) পদাধিকার বলে যিনি গভর্নর তিনি বা তাঁহার ব্যতীয় অন্যান্য গভর্নররা তিন বছর মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন। তাবে শর্ত থাকে যে, পদাধিকার বলে

---

২৪. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশ বলে এই নতুন অনুচ্ছেদ ৫ক সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

২৫. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশ বলে মূল অনুচ্ছেদ ৬ বদলানো হইয়েছে এবং পরবর্তী ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৩নং অনুচ্ছেদ বলে সংশোধন করিয়া উপরোক্ত অবস্থায় আনা হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিযক্তি গভর্নর ব্যতীত অন্য যে কোন গভর্নর তাঁহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর উত্তরসূরী দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ততক্ষণ তিনি স্বপদে বহাল থাকিয়া যাইবেন।

(৩) পদাধিকার বলে নিযুক্ত গভর্নর ব্যতীত অপর যে কোন গভর্নর চেয়ারম্যানকে চেয়ারম্যানকে সম্বোধন করিয়া লিখিত নোটিশ দিয়া পদত্যাগ করিতে পরিবেন।

(৪) পদাধিকারবলে নিযুক্ত গভর্নর ব্যতীত অপর যে কোন গভর্নরের ক্ষেত্রে সরকাররের যাদি একথা মনে করিবার কারণ ঘটে যে,- (ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করিতে অপারগ; কিংবা (খ) তাঁহার গভর্নর পদে বাহাল থাকিয়া যাওয়া ফাউন্ডেশনের স্বার্থে সহায়ক নয় তাহা হইলে সরকার সেই গভর্নরের পদটি শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(৫) বোর্ডের কোন গভর্নরের আসন শূন্য আছে কিংবা বোর্ডের গঠন ত্রুটিপূর্ণ এই যক্তিতে বোর্ডের কোন পদক্ষেপ বা কার্যক্রমই অসিদ্ধ বা অকার্যকর হইয়া যাইবে না কিংবা সেইগুলি নিয়া কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।]

৭. বোর্ডের সভা ঃ

(১) বোর্ডের সভা নির্দেশিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, সময় ও স্থানের ব্যাপারটি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এইসব সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ডের সভা কোরাম হওয়ার জন্য অন্ততপক্ষে পাঁচজন [গভর্নরের] উপস্থিতি থাকিতে হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় যাবতীয় প্রশ্ন সভায় উপস্থিত ও ভোটদানরত সংখ্যাগরিষ্ঠ [২৬][গভর্নরের] দ্বারা মীমাংসিত হইবে।

(৪) বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন বোর্ডের [২৭][চেয়ারম্যান, কিংবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত] একজন [২৮][গভর্নর]।

৮. কমিটি নিয়োগ ঃ

বোর্ড তাহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাহাকে সহায়তা দানের জন্য যেরূপ কমিটি উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপ কমিটি বা কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবে।

---

২৬. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশ বলে "ট্রাস্টিস' শব্দের পরিবর্তে এই শব্দটি বসানো হইয়াছে।
২৭. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৪ নং অনুচ্ছেদবলে "উপস্থিত গভর্নরবৃন্দ কর্তৃক ঐ উদ্দেশ্যে নির্বাচিত" শব্দগুলির পরিবর্তে এই শব্দগুলি বসানো হইয়াছে।
২৮. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশ বলে "ট্রাস্টিস' শব্দের পরিবর্তে এই শব্দটি বসানো হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

[29][৯. ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দ ঃ

(১) ফাউন্ডেশনের নিজস্ব পৃষ্ঠপোষক, ফেলো, আজীবন সদস্য ও সদস্য থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে তাহাদের নির্ধারিত কার্যদায়িত্ব ও অধিকার থাকিবে।

(২) নিজ কার্যদায়িত্ব ও অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া পৃষ্ঠপোষক ও ফেরোদের আজীবন সদস্যের অনুরূপ কর্মদায়িত্ব ও অধিকারও থাকিবে।

(৩) বোর্ড-

(ক) ফাউন্ডেশনের আমন্তণক্রমে যাহারা পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মতি জানাইবে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে; এবং

(খ) ইসলামী শিক্ষা ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান আছে এমন ব্যক্তিরা ফাউন্ডেশনের ফেলো হইতে ইচ্ছুক বা সম্মত হইলে ফাউন্ডেশনের ফেলো হিসাবে তাহাদের নাম এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত বইপত্রে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৪) ফাউন্ডেশনের কোন পৃষ্ঠপোষক বা ফেলো তাঁহার এই বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে তিনি আজীবন ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষক বা ফেলো থাকিয়া যাইবেন।

(৫) বোর্ড ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্ধেশ্যের প্রতি আগ্রহশীল যে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ও নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্য বা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

৯ক. সদস্যদের সভা ঃ

(১) বোর্ড প্রতিবছর ফাউন্ডেশনের সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করিবেন যাহার উদ্দেশ্য হইবে০ (ক) সভায় ফাউন্ডেশনের পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রমের উপর মহাপরিচালকের প্রদেয় বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করা; (খ) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী ও কর্মতৎপরতার ব্যাপারে বোর্ডের বিবেচনার জন্য সুপারিশ বা প্রস্তাব পেশ করা; এবং (গ) প্রয়োজনবোধে গভর্নর নির্বাচিত করা; ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দকেই ভোট দিয়া বোর্ডের গভর্নর নির্বাচিত করিতে হয়।

(২) সভায় পেশ করিতে হইবে এমন বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য বোর্ড যে কোন সময় ফাউন্ডেশন সদস্যদের অন্যান্য সাধারণ সভাও আহবান করিতে পারিবেন।

২৯. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশের ৭ নং অনুচ্ছেদবলে মূল অনুচ্ছেদ ৯ এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ৯ এবং ৯ক বসানো হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

[৩০][(৩) চেয়ারম্যান ফাউন্ডেশন সদস্যদের সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত একজন গভর্নর সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) ফাউন্ডেশনের সাধারণ সভার কার্যধারা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিবিধানের নির্ধারিত পন্থায় পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হইবে।]

[৩১][১০. অফিসার ইত্যাদি নিয়োগ-

(১) ফাউন্ডেশনের একজন সচিব থাকিবেন যিনি সরকারের নির্ধারিত শর্তে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং বোর্ড অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) ফাউন্ডেশন নিজ কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনবোধে অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীকে নির্ধারিত শর্তে নিয়োগ করিতে পারিবে।]

১১. কার্যাবলী ঃ

ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী হইবে-

(ক) মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্র, একাডেমী ও [৩২][ইনস্টিটিউট] প্রতিষ্ঠা করা, পরিচালনা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্র, [৩৩][একাডেমী, ইনস্টিটিউট এবং সমাজ সেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে] আর্থিক সহায়তা দেওয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমত সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা এবং প্রচারের কাজে সহায়তা করা [৩৪][এবং সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আর্থনৈতিক জীবননে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা।];

---

৩০. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৫ নং অনুচ্ছেদবলে ৯ক অনুচ্ছেদের (৩) উপ-অনুচ্ছেদের পরিবর্তে (৩) ও (৪) উপ-অনুচ্ছেদ বসানো হইয়াছে।

৩১. ১৯৭৬ সালের ৬৪ নং অধ্যাদেশের ৪ নং অনুচ্ছেদবলে মূল অনুচ্ছেদ ১০ এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ১০ বসানো হইয়াছে।

৩২. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশ বলে "ইনস্টিটিউট" শব্দের পরিবর্তে এই শব্দ বসানো হইয়াছে।

৩৩. ১৯৭৬ সালের ৬৪ নং অধ্যাদেশের ৫ নং অনুচ্ছেদবলে "একাডেমী ও ইনস্টিটিউট" শব্দাবলীর পরিবর্তে এই শব্দাবলী বসানো হইয়াছে।

৩৪. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশবলে "ন্যায়বিচার" শব্দের পর এই শব্দগুলি ও কমা যোগ করা হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

[35](ঙ) [ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করিয়া তোলার লক্ষ্যে] ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তাহার প্রসার ঘটানো এবং [জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেইগুলির সুলভ প্রকাশনা ও বিলিবণ্টনকে উৎসাহিত করা।]

[36][(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

[37][(জজ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাহাতে সহায়তা করা;

(ঝ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

(ঞ) বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি বিধান করা; এবং উপরোক্ত কার্যাবলীর যে কোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

১২. তহবিল-

(১) ফাউন্ডেশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং সেই তহবিলে জমা হইবে- (ক) ২০ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তরিত বায়তুল মুকাররম ও ইসলামী একাডেমীর তহবিলের অর্থ; (খ) সরকারের অনুদান ও ঋণ; (গ) বাংলাদেশে সংগৃহীত ঋণ; (ঘ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থার কাছ হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ; (ঙ) চাঁদা ও দান; (চ) বিনিয়োগ, রয়্যালটি ও সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং (ছ) ফাউন্ডেশনের অন্য আর সকল প্রাপ্তি।

(২) ফাউন্ডেশনের তহবিল এই আইনের অধীনে ফাউন্ডেশনের কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত খরচ বা ব্যয় নির্বাহের কাজে ব্যবহার করা হইবে। এবং ফাউন্ডেশনের যাবতীয় পাওনা ঐ তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

(৩) ফাউন্ডেশনের সমসত্ত অর্থ যে কোন ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হইবে।

---

৩৫. ঐ অধ্যাদেশবলে "বিচারব্যবস্থা" শব্দের পর এই শব্দগুলি ও কমা যোগ করা হইয়াছে।

৩৬. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৬ নং অনুচ্ছেদবলে ১১ অনুচ্ছেদের (চ) ধারার পরিবর্তে (চ) ধারা বসানো হইয়াছে।

৩৭. ঐ অধ্যাদেশের একই অনুচ্ছেদবলে (জ) অনুচ্ছেদের পর এইনূতন ধারা (জজ) সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. হিসাব ঃ

সরকার যেভাবে নির্দেশ দিবে ফাউন্ডেশন সেইভাবে তাহার হিসাব রক্ষা করিবে।

১৪. বাজেট ঃ

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি বছরের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরকারের অনুমোদনের জন্য ফাউন্ডেশন একটি বাজেট পেশ করিবে। এই বাজেট সরকার কর্তৃক নির্দেশিত আকারে প্রতি অর্থ বছরের জন্য পেশ করা হইবে এবং তাহাতে ঐ অর্থ বছরের হিসাবকৃত আয় ও ব্যায় দেখানো হইবে।

১৫. হিসাব পরীক্ষা ঃ

(১) বাংলাদেশের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে অডিটর জেনারেল বলিয়া উল্লিখিত) যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইভাবে ফাউন্ডেশনের হিসাব পরীক্ষা করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর অধীনে হিসাব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অডিটর জেনারেল বা এই ব্যাপারে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি ফাউন্ডেশনের সকল নথিপত্র, বইপুসত্ক, দলিল, ক্যাশ, সিকিউরিটি, স্টোর এবং অন্যান্য সম্পত্তি দেখিতে পারিবেন এবং তিনি যে কোন [৩৮] [গভর্নর, মহাপরিচালক] কিংবা ফাউন্ডেশনের অপর যে কোন অফিসার বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৩) অডিটর জেনারেল সরকারের কাছে তাঁহার অডিট রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং রিপোর্টের একটি কপি ফাউন্ডেশনের কাছে পাঠাইয়া দিবেন।

১৬. রিপোর্ট, ইত্যাদি ঃ

(১) ফাউন্ডেশন সময়ান্তরে সরকারের প্রয়োজন হইতে পারে এমন সকল রিপোর্ট ও বিবরণী সরকারের কাছে দাখিল করিবে।

(২) ফাউন্ডেশ প্রত্যেক অর্থ বছর শেষ হইবার পর নিরীক্ষিত হিসাবের একটি বিবরণী এবং সেই সঙ্গে ফাউন্ডেশনের ঐ বছরের বিষয়াদির অবস্থা সংক্রান্ত একটি বার্ষিক রিপোর্ট যথাশীঘ্র সরকারের কাছে দাখিল করিবে।

১৭. ক্ষমতা অর্পণ ঃ

ফাউন্ডেশন লিখিতভাবে সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশবলে নির্দেশ করিতে পারে যে, এইরূপ পরিস্থিতিতে এবং এইরূপ অবস্থায় তাহার এই সকল ক্ষমতা চেয়ারম্যান [৩৯][যে কোন গভর্নর, মহাপরিচালক] কিংবা ফাউন্ডেশনের অপর যে কোন অফিসার বা কর্মচারীও প্রয়োগ

---

৩৮. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশের ৯ নং অনুচ্ছেদ বলে "ট্রাস্টি, সেক্রেটারী" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে এইসব শব্দ ও কমা বসানো হইয়াছে।

৩৯. ১৯৭৬ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশের ১০ নং অনুচ্ছেদ বলে "যে কোন ট্রাস্টি কর্তৃক বা সেক্রেটারী কর্তৃক" শব্দগুলি পরিবর্তে এইসব শব্দ ও কমা বসানো হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

করিতে পারিবেন। এইরূপ পরিস্থিতি বা অবস্থা উদ্ভূত হইলে আদেশে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোন কোন ক্ষমতার কথা বরঅ হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ অফিসার বা কর্মচারী তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবে তাহাও নির্দিষ্টভাবে বলিতে হইবে।

[৪০][**১৮. বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা ঃ**

সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮ক. রেগুলেশন প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

(১) এই আইনের বিধানসমূহকে কার্যকারিতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে বিধান প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ত তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার লক্ষ্যে বোর্ড সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে এই আইনের বিধানাবলী ও বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন রেগুলেশন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই কার্য ব্যবস্থার অধীনে প্রণীত সকল রেগুলোশন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশিত হইবার সময় হইতে বলবৎ হইবে।

১৮.কক. ফাউন্ডেশনের সম্পত্তিসমূহের ভাড়া নির্ধারণ ঃ

(১) আপাতত বলবৎ অপর যে কোন আইন বা কোন সম্মতি বা চুক্তি যাহাই থাকুক না কেন, (ক) ফাউন্ডেশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার তপসিল অনুয়ায়ী বিরাজমান বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সময়ান্তরে তাহার সম্পত্তিসমূরে ভাড়া নির্ধারণ করিবে; (খ) ফাউন্ডেশন (ক) ধারার অধীনে নির্ধারিত তপসিল অনুযায়ী তাহার সম্পত্তিসমূহের ভাড়া পুননির্ধারণ করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার ভোগদখল কালে কোন সম্পত্তে বা তাহার কোন অংশের ভাড়া **১২** মাসের মধ্যে পুননির্ধারণ করা যাইবে না।

(২) কোন ভাড়াটিয়া (১) উপ-অনুচ্ছেদের অধীনে ধার্যকৃত বা পুনঃধার্যকৃত ভাড়া পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাইলে বা ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হইলে তিনি অননুমোদিত দখলদার বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহাকে ফাউন্ডেশনের সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা হইবে।]

১৯. কার্যক্রম গুটাইয়া ফেলা ঃ

কর্পোরেট সংস্তার কার্যক্রম গুটাইয়া ফেলা সংক্রান্ত আইনের কোন বিধান ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের আদেশ ছাড়া এবং সরকার যেইরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ নির্দেশ ছাড়া ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম গুটাইয়া ফেলা যাইবে না।

---

৪০. ১৯৮৩ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের ৭ নং অনুচ্ছেদ বলে মূল অনুচ্ছেদ ১৮ -এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ১৮, ১৮ক এবং ১৮ কক বসানো হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

২০. বায়তুল মুকাররম ও ইসলামী একাডেমীর অবলুপ্তি ঃ

(১) আপাততঃ বলবৎ কোন আইন বা বিধি, রেগুলেশন বা উপ-বিধি অথবা কোন ট্রাস্ট, ওয়াকফ, চুক্তিপত্র কিংবা অপর কোন দলীলে যাহাই থাকুক না কেন, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর-

(ক) বায়তুল মুকাররম নামে পরিচিত সমিতি যাহা সমিতি নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ২১ নং আইন)-এর অধীনে নিবন্ধীকৃত এবং অতঃপর এখানে যাহা উক্ত সমিতি হিসাবে উল্লিখিত, এবং ইসলামী একাডেমী, ঢাকা নামে পরিচিত ইনস্টিটিউট যাহা অতঃপর এখানে উক্ত ইনস্টিটিউট হিসাবে উল্লিখিত, উভয়ই বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উক্ত সমিতির এডহক কমিটি বা অন্য কোন কমিটির অথবা ব্যবস্থাপকমণ্ডলী, তাহা সে যে নামেই আখ্যায়িত করা হউক না কেন, বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত সমিতির সদস্যরা আর সদস্য থাকিবেন না এবং উক্ত ইনস্টিটিউটের সদস্যবৃন্দ ও প্রশাসকও আর সদস্য ও প্রশাসক থাকিবেন না;

(গ) বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বি উক্ত সমিতি ও উক্ত ইনস্টিটিউটের নামে বিদ্যমান যাবতীয় পরিসম্পৎ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুযোগ-সুবিধা এবং স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, নগদ অর্থ ও ব্যাংক ব্যালেন্স, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং অন্য সেকল রকমের স্বার্থ ও স্বত্ব এবং এই ধরনের সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট ও তাহা হইতে উদভুত স্বত্বসমূহ এবং সকল ঋণ, দায়দেনা ও যে কোন ধরনের আইনগত বাধ্যবাধকতা ফাউন্ডেশনের হাতে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত হইবার আগে উক্ত সমিতি ও উক্ত ইনস্টিটিউটের কৃত যাবতীয় ঋণ ও দায়, সম্পাদিত চুক্তি, অর্জিত স্বত্ব এবং সম্পাদন করিবার জন্য নিয়োজিত বিষয়াদি ফাউন্ডেশন কর্তৃক, ফাউন্ডেশনের সঙ্গে এবং ফাউন্ডেশনের জন্য কৃত, সম্পাদিত, অর্জিত ও নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) উক্ত সমিতি ও উক্ত ইনস্টিটিউটের সকল অফিসার এবং অন্য সকল কর্মচারী ফাউন্ডেশনে বদলী বা স্থানান্তরিত হইবেন এবং তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চাকুরির শর্তাবলী অনুযায়ী তাঁহার ফাউন্ডেশন কর্তক নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এরূপ বদলী বা স্থানান্তরের কারণে ঐ অফিসার ও কর্মচারীদের কেউই কোনরূপ ক্ষতিপূরণের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। এবং

(চ) বিলুপ্ত হইবার আগে উক্ত সমিতি ও উক্ত ইনস্টিটিউট যে সমস্ত মামলা করিয়াছে বা আইনগত ব্যবস্থা নিয়াছে কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা করা হইয়াছে বা আইনগত ব্যবসআ নেওয়া হইয়াছে সেইগুলি ফাউন্ডেশনই করিয়াছে অথবা

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী এইগুলি হয় চলিতে থাকিবে নতুবা এইগুলির ব্যাপারে ভিন্নি রকম পদক্ষেপ নেওয়া হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিলুপ্তি, হস্তান্তর কিংবা অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যে কোন অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার তাহার কাছে উপযুক্ত মনে হইবে এমন আদেশ জারি করিবেন এবং উক্ত আদেশ এই আইনের বিধানসমূহের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ অংশটিকে কার্যকারিতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২১. রহিতকরণ ও সাপেক্ষ বিষয় ঃ

(১) ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের সপ্তদশ অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) এই অধ্যাদেশ রহিত করা সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের যে কোন বিধানবলে প্রণীত যে কোন আদেশ, জারীকৃত যে কোন বিজ্ঞপ্তি কিংবা প্রদত্ত যে কোন নির্দেশসহ যাহা কিছু করা হইয়াছে অথবা যাহা যাহা পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে তাহা এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানবলে করা হইয়াছে, নেওয়া হইয়াছে, প্রণীত হইয়াছে বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

[১৯৮৫ সালের ৭ই মে তারিখে বিশেষ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ৭ই মে, ১৯৮৫

৪৬৩ নং প্রকাশনা । - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৮৫ সালের ২৮ শে এপ্রিল জারিকৃত নিম্নোক্ত অধ্যাদেশ এতদ্বারা সাধারনের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইলঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

১৯৮৫ সালের ২২ নং অধ্যাদেশ

১৯৭৫ সালের ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন অধিকতর সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশ) অধিকতর সংশোধন করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

সেহেতু এখন ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ঘোষণা অনুসারে এবং ঐ ঘোষণায় প্রাপ্ত সমুদয় ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিয়াছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম,- এই অধ্যাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামে অভিহিত হইবে।

২. ১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইনের ২ নং অনুচ্ছেদের সংশোধনী ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইন), অতঃপর যাহা উক্ত আইন হিসাবে উল্লিখিত, সেই আইনের ২ নং অনুচ্ছেদের (ঘ) ধারার শেষে যতি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন বসিবে এবং তারপর নিম্লোক্ত নূতন ধারা যুক্ত হইবে যথা ঃ

"(ঙ) ভাইস চেয়ারম্যান" অর্থ "বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান"।

৩. ১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইনের ৬ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন। -উক্ত আইনের ৬ নং অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদেরে, -(ক) ধারা, "ধর্ম বিষয়ক বিভাগ" শব্দগুলির পরিবর্তে "ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়" শব্দগুলি বসিবে; এবং (খ) (ক) ধারার পর নিম্লোক্ত নূনতন ধারা (কক) সন্নিবেশিত হইবে যথা ঃ (কক) সবিচ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে; তিনি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন।,"

৪. ১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইনের ৭নং অনুচ্ছেদ সংশোধন- উক্ত আইনের ৭ নং অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্লোক্ত অনুচ্ছে বসিবে যথা ঃ "(৪) বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন চেয়ারম্যান এবং তিনি অনুপস্থিত থাকিলে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং, তাঁহারা উভয়েরই অনুপসিস্থত থাকিলে চেয়ারম্যঅন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত একজন গভর্নর।"

৫. ১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইনের ৯ক অনুচ্ছেদের সংশোধনী - উক্ত আইনের ৯ক অনুচ্ছেদের (৩) উপ-অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্লোক্ত উপ-অনুচ্ছেদ বসিবে, যথা ঃ "(৩) ফাউন্ডেশন সদস্যদের সাধারণ সভায় সভাপত্তি করিবেন চেয়ারম্যান, এবং তিনি উপস্থিত থাকিলে ভাইস চেয়ারম্যান এবং তাঁহারা উভয়ে অনুপস্থি থাকিলে চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত একজন গভর্নর।"

এইচ. এম. এমরান, এনডিসি, পিএসসি
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
রাষ্ট্রপতি
মোঃ আবুল বাশার ভূঁইয়া
(উপ-সচিব ড্রাফটিং)

ঢাকা ঃ
২৮ শে আপিল, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞাপ্তি

ঢাকা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

নং এস.ইর. ও ৩৯৯-এল/৮৫/ধর্ম/উন্নয়ন, ৯-৪৪/৮৫। সরকারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভুমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধ) অধ্যাদেশ (১৯৭০ সালের ২৪ নং অধ্যাদেশ) এর ১নং অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উপরোক্ত আধ্যাদেশকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ১৭ নং আইন) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইসলঅমেক ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এম. এ. রশিদ
সবিচ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট[৪১]

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ৩, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৩ মার্চ, ২০১৩/১৯ ফাল্গুন, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিমড়বলিখিত আইনটি ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩/১৪ ফাল্গুন, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০১৩ সনের ১০ নং আইন

Islamic Foundation Act, 1975 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্ন বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে **Islamic Foundation Act, 1975 (Act No XVII of 1975)** এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

---

৪১. ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

সেহেতু এতদ্বারা নিমড়বরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই আইন **Islamic Foundation (Amendment) Act, 2013** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act No XVII of 1975 এর section 2 এর সংশোধন।-** Islamic Foundation Act, 1975 (Act No XVII of 1975), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 2 এর clause (e) বিলুপ্ত হইবে।

৩। **Act No XVII of 1975 এর section 6 এর সংশোধন।-** উক্ত Act এর section 6 এর sub-section (1) এর-

(ক) clause (aa) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) clause (c) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (c) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

æ(c) the secretary, Ministry of Religious Affairs, *ex-officio;"*|

৪। **Act No XVII of 1975 এর section 7 এর সংশোধন।-** উক্ত Act Gi section 7 এর বিদ্যমান sub-section (4) এর পরিবর্তে নিমড়বরূপ নতুন sub-section (4) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(4) All meetings of the Board shall be presided over by the Chairman and, in his absence, by a Governor nominated for the purpose by the Chairman."|

৫। **Act No XVII of 1975 এর section 9A এর সংশোধন।-** উক্ত Act এর section 9A এর বিদ্যমান sub-section (3) এর পরিবর্তে নিমড়বরূপ নতুন sub-section (3) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(3) A general meeting of the members of the Foundation shall be presided over by the Chairman and, in his absence, by a Governor nominated for the purpose by the Chairman."|

৬। **Act No XVII of 1975 এর section 11 এর সংশোধন।-** উক্ত Act Gi section 11 Gi clause (j) এর শেষে উল্লিখিত "ধহফচ শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর নতুন clause (jj) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(jj) to manage and develop the Jamiatul Falah Mosque and Complex, Chittagong; and"|

Dhaka University Institutional Repository

৭। **Act No XVII of 1975 এর section 12 এর সংশোধন**।- উক্ত Act এর section 12 এর sub-section (1) এর clause (a) এর পর নিমড়বরূপ নতুন clause (aa) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(aa) funds of the Jamiatul Falah Mosque and Complex, Chittagong, transferred under section 20A;"|

৮। **Act No XVII of 1975 এ নতুন section 20A এর সন্নিবেশ**।- উক্ত Act এর section 20 এর পর নিমড়বরূপ নতুন section 20A সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"20A. Vesting of Jamiatul Falah Mosque and Complex, Chittagong, in Foundation and its management.-(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other law, rule, regulation or bye-law, or in any trust, waqf, agreement, deed or other instrument, for the time being in force, upon coming into force of this section,-

(a) the society known as Jamiatul Falah, in respect of the Jamiatul Falah Mosque and Complex, Chittagong, registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860), shall stand dissolved;

(b) the management of the Jamiatul Falah Mosque and Complex, Chittagong, hereinafter called the ×the said Mosque and Complex," shall vest in the Foundation; and all assets, rights, powers, authorities and privileges, and all property, movable and immovable, cash and bank balances, reserve funds, investments and all other interests and rights in, or arising out of, such property and all debts, liabilities and obligations of whatever kind in respect of the said Mosque and Complex, subsisting immediately before the coming into force of this section, shall, stand transferred to, and, vest in the Foundation;

(c) any committee or committees, ad-hoc or permanent, or any other committee or body of management in connection with the said Mosque and Complex, by whatever name called, subsisting immediately before the coming into force of this section, shall stand dissolved and members of such committee or committees shall cease to be such members;

(d) all debts and obligations incurred, contracts entered into or rights acquired and all matters and things engaged to be done by, with or for the said Mosque and Complex, before the coming into force of this section,

Dhaka University Institutional Repository

shall be deemed to have been incurred, entered into, acquired or engaged to be done by, with or forthe Foundation;

(e) all officers and other employees of the said Mosque and Complex, appointed or employed before the date of approval by the Cabinet of the Draft Bill in respect of this section, shall stand transferred to the Foundation and shall be deemed to have been appointed by the Foundation in accordance with the terms and conditions of service as had been applicable to them immediately before the coming into force of this section until such terms and conditions are varied by rules or regulations made by the Government or Foundation, as the case may be, and no such officer or employee shall be entitled to any compensation because of such transfer;

(f) all assets and properties vested in the Foundation and any book of account, documents or other papers relating thereto shall be delivered to the Foundation or to an officer authorised by it in this behalf;

(g) the Foundation shall maintain separate account in respect of the income and expenditure of the Jamiatul Falah Mosque and Complex;

(h) the Foundation shall generally utilise the income of the Jamiatul Falah Mosque and Complex for the purpose of management, maintenance and development of the said Mosque and Complex, but the Foundation may also utilise the assets, properties and income of the said Mosque and Complex for the performance of its functions under section 11, if, in its opinion, such utilisation will not be prejudicial to the interest of the said Mosque and Complex; and

(i) all suits and other legal proceedings instituted on behalf of or against the said Mosque and Complex shall be deemed to be suits and proceedings by or against the Foundation and shall be proceeded or otherwise dealt with accordingly.

(2) The Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to matters specified in sub-section (1), make such orders as it considers expedient and any such order shall be deemed to be, and given effect to, as part of the provisions of that sub-section.”।

মোঃ মাহফুজুর রহমান

সচিব।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা পরিষদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অ্যাক্ট অনুযায়ী এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশনের সার্বিক নীতি-নির্ধারণ, নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বোচ্চ প্রমাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে, ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বোর্ডে ৩ ধরনের সদস্য রয়েছে- পদাধিকার বলে সদস্য, মনোনীত সদস্য ও নির্বাচিত সদস্য। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সম্মানিত মহাপরিচালক পদাধিকারবলে বোর্ডের যথাক্রমে চেয়াম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব।[৪২]

১৯৮৩ সালের সংশোধিত অধ্যাদেশ (Ordiance No. LXVII of 1983, Notification in Bangladesh Gazatte dated 19th Dec. 1983; ধর্ম/Ex 9-7/85/347 ইসলামিক ফাউন্ডেশন [অ্যাকট নং ১৭, ১৯৭৫-এর চতুর্থ সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (অধ্যাদেশ নং-২২, ১৯৮৫) এর ধারাতে]) বিঘোষিত বোর্ড অব গভর্ণরস নিম্নরূপঃ[৪৩]

১. চেয়ারম্যান	ঃ	পদাধিকারে	-	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী
২. ভাইস-চেয়ারম্যান	ঃ	পদাধিকারে	-	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব
৩. সদস্য	ঃ	পদাধিকারে	-	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪. সদস্য	ঃ	পদাধিকারে	-	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড
৫. সদস্য	ঃ	পদাধিকারে	-	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
৬. সদস্য	ঃ	পদাধিকারে	-	ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
৭-৯. নির্বাচিত সদস্য তিনজন	ঃ		-	ফাউন্ডেশনের সদস্যগণের মধ্য হতে তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত।
১০-১৪. মনোনিত সদস্য পাঁচজন	ঃ		-	প্রখ্যাত মুসলিম পন্ডিত এবং ধর্ম বেত্তাগণের মধ্য হতে পাঁচজন সরকার কর্তৃক সনোনিত।
১৫-১৬. মনোনীত সদস্য দুইজন	ঃ		-	পার্লামেন্টের সদস্যগণের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত।
১৭. সদস্য সচিব	ঃ	পদাধিকারে	-	ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক।

৪২. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪৩. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২

Dhaka University Institutional Repository

সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদে শ-এর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী প্রধান। বোর্ড অব গভর্নরদের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য সম্পাদনে তাকে সহযোগিতা করার জন্য ১ জন সচিব, ১৪ জন পরিচালক ১ জন প্রকল্প পরিচালক ও ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস) রয়েছেন। তারা প্রত্যেকে এক একটি বিভাগের প্রধান।[৪৪]

তহবিলের উৎস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর তহবিল নিম্নোক্ত উৎসসমূহ থেকে আহরিত হয়ে থাকে-

ক. বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান;

খ. বাংলাদেশ সংগৃহীত ঋণ;

গ. সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে বিদেশী সরকার ও সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য এবং অনুদান;

ঘ. সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প বরাদ্দের খাতে প্রাপ্ত অর্থ;

ঙ. বিনিয়োগ আয়, রয়্যালটি ও ফাউন্ডেশনের নিজস্ব সম্পদ হতে প্রাপ্ত আয়; এবং

চ. দান বা অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয়।[৪৫]

ইসলামিক একাডেমী এবং বায়তুল মুকাররম সোসাইটি প্রায় একই সময়ে মূলতঃ অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। নতুন প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই কর্মসূচিতে সমন্বিত ও সম্প্রসারিত করে।

উপরিউক্ত অধ্যাদেশ বলে বায়তুল মুকাররম সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিপণিকেন্দ্রের আয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হস্তগত হয়। বিলি বন্টনের মধ্যে ত্রুটি এবং তজ্জন্য মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টি এবং দোকান ভাড়ার হার খুবই নিু হওয়ার দরুন ফাউন্ডেশন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই আয় এবং সরকারের অনুদান ছিল উল্লেখযোগ্য। কুরআন মঞ্জিল নামক একটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যা পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে সরকারের কর্তৃত্বাধীন ছিল, তা ফাউন্ডেশনকে প্রদান করা হয়। সুতরাং ফাউন্ডেশন সবর অথচ ধীর পদক্ষেপে এর কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়।

১৯৭৮ সালে ফাউন্ডেশন মুসলিম বিশ্বের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'Human and natural Resources in the Islamic countries' শিরোনামে ও.আই.সি. (Organisation of Islamic Conference) এর উদ্যোগে একটি সেমিনার (২০-২২ মার্চ, ১৯৭৮ খৃ.) ঢাকার পুরাতন বিধান সভার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এর সাংগঠিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর। বাংলাদেশ চাড়া ১৫টি মুসলিম দেশ হতে আগত প্রতিনিধিগণ এই সেমিনারে

---

৪৪. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

যোগদান করেন। ও.আই.সি. যুক্তরাজ্যের ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইউনেস্কো প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সেমিনারের ভাষা ছিল আরবী, ইংরেজি ও ফারসী এবং এই সেমিনারেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যুগপৎ তরজমার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢাকায় ইহাই ছিল এ ধরনের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার।[৪৬] তৎকালীন মহাপরিচালক (আ.ফ.ম. আব্দুল হক ফরিদী কার্যকাল ১৬-১০-৭৭ হতে ২৩-০৭-৭৯)-এর দক্ষ নেতৃত্বে এই সেমিনার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

১৯৭৯-৮০ অর্থ বছর হতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রার উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয়। এই সময় হতে সরকার ফাউন্ডেশনের প্রতি অধিকতর সক্রিয় মনোযোগ প্রদান করেন এবং উদ্যমশীল ইসলামভক্ত কর্মী জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমকে (কার্যকাল ২৪ জুলাই, ১৯৭৯ হতে ৩০ জুলাই, ১৯৮২) ফাউন্ডেশনের গ্রন্থাগারের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়। অসম্পূর্ণ বায়তুল মুকাররম মসজিদ ভবনের সমাপ্তি এবং মসজিদ অংগনের শোভা বর্ধনমূলক কাজের নীল নক্শা তৈরি হয়।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বায়তুল মুকাররমকে জাতীয় মসজিদ রূপে ঘোষণা করেন।[৪৭] মসজিদ ভবনের অসমাপ্ত অংশ নির্মাণের এবং মসজিদের শোভা বর্ধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন উপলক্ষে বায়তুল মুকাররম মসজিদের উত্তর দিকের সম্প্রসারণ-এর কাজ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের ফোয়ারা, বাগানসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এ.জেড.এম. শামসুল আলমের নিরলস প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত কাজগুলোর নীল-নক্শা নতুন সূত্রে তৈরি করা হয় এবং তার স্থলাভিষিক্ত মহাপরিচালক জনাব এ.এফ.এম. ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে মসজিদের উত্তর প্রান্তের অসমাপ্ত কাজ, শোখা বর্ধনের জন্য ফোয়ারাসহ উদ্যান রচনা ও কারুকার্য মন্ডিত পাঁচিল নির্মাণ সমাপ্ত হয়। সরকারের গণপূর্ত বিভাগ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে বায়তুল মুকাররম কমপে- ক্সের যাবতীয় নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পালন করে। তবে মিনার ও পূর্ব দিকের ডি. আইটি সড়কের সাথে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, সাহানশীতল পাথরে মন্ডিত ও লিফটে সংস্থাপনসহ আরো কিছু কাজ এখনও বাকী রয়েছে। তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এম.এ. সোবহান এসব কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বায়তুল মুকাররম মসজিদের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০১ইং মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪৮২.৬৫ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৩০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ৩০ হাজার বর্গফুট আয়তনের একটি মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া সাহানশীতলীকরণ, সিড়ি সংস্কার,

৪৬. এম. রুহুল আমিন, *বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪৩

৪৭. ১৯৮৩/৮৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক অনুষ্ঠানে বায়তুল মুকারমকে জাতীয় মসজিদ রূপে ঘোষণা করেন। কিন্তু এ যাবৎ এর কোন গেজেট প্রকাশ হয়নি এবং কোন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়নি। অথচ জাতীয় স্বার্থে বায়তুল মুকাররমকে জাতীয় মসজিদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাসঙ্গিক যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। [উদ্ধৃত- মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

ফোয়ারা, ওযুখানা, টয়লেট স্থানান্তর ও নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে বায়তুল মুকাররম মসজিদের মূল নক্‌শা মোতাবেক অসম্পন্ন কাজ শেষ হবে। প্রকল্পের ব্যয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো হবে।[৪৮] এই প্রকল্পের কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়েছে।

পর্যায়ক্রমে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ছাপাখানার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ হয়। ভূতপূর্ব মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. আব্দুল হক ফরিদী কর্তৃক আরবী বাংলায় সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ এই আমলে গতিশীল এবং সমাপ্ত হয়। জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম সাহেবের উদ্যোগে ফাউন্ডেশন কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে। যথা- (১) ফাউন্ডেশনের শাখা রূপে ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে, বিভাগীয় সদরে ও জেলা সদরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন; (২) ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ যাতে মসজিদের ইমামগণ ইমামতি ছাড়াও ইসলামী আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং উন্নয়নকর্মে সক্রিয় সহায়তা দান করতে পারেন; (৩) মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং মসজিদভিত্তিক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ; (৪) বাংলায় একটি বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন; এবং (৫) কুরআনের একটি বৃহৎ তাফসীর সংকলনের কাজের সূচনাও হয় এই আমলে। তখন হতে ফাউন্ডেশনে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং দেশ-বিদেশের 'উলামা' ও বিজ্ঞজনের দৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীগণের দৃষ্টিতেও ফাউন্ডেশনের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

জনাব এ.জেড.এম. শামসুল আলম সাহেবের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া (কার্যকাল ৩১ জুলাই, ১৯৮২ হতে ১২ এপ্রিল, ১৯৮৪) যোগ্যতা এবং কর্মকুশলতার সাথে ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেন, যথা- ইসলামিক মিশন প্রকল্প, মক্তব শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, সীরাতুন্নবী (সা) পক্ষ উদ্‌যাপন। এছাড়া তিনি কয়েকটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ইসলাম ও মুসলিম-উম্মাহর ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিজ্ঞান, ইসলাম ও বাংলা উৎপত্তি ও বিকাশ। জনাব এ.এফ.এম. ইয়াহিয়া সাহেবের পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনাব এম.এ. সোবহানকে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন (১২ এপ্রিল, ১৯৮৪)। তিনিও অত্যন্ত যোগ্যতা, সতর্কতা ও স্থির পদক্ষেপ আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের শত শত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্কীম গ্রহণসহ চাকরির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন।

অতঃপর জনাব মুহাম্মদ ওমর ফারুক (২৪-১২-১৯৮৭ হতে ১-৬-১৯৮৮ পর্যন্ত), এবং তাঁর পরে কয়েকদিনের জন্য জনাব মোঃ শফিউদ্দীন (১-৬-১৯৮৮ হতে ৪-৬-১৯৮৮ পর্যন্ত) ইসলামিক

৪৮. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বিগ্রেডিয়ার মোহাম্মদ মসাহেদ চৌধুরী (অবঃ) (৪-৬-১৯৮৮ হতে ৫-১২-১৯৮৮), ব্রিগেডিয়ার মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ (অবঃ) (১-৩-১৯৮৯ হতে ১৯-৯-১৯৯০ পর্যন্ত), জনাব নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত) (২৭-১২-১৯৯০ হতে ১৪-৩-১৯৯১ পর্যন্ত), জনাব মুহাম্মদ মনসুরুল হক খান (১৪-৩-১৯৯১ হতে ২৪-৪-১৯৯৩ পর্যন্ত), জনাব মোহাম্মদ শফিউদ্দিন (২৪-৪-১৯৯৩ হতে ৯-১-১৯৯৪ পর্যন্ত), জনাব দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী (৯-১-১৯৯৪ হতে ১৯-৯-১৯৯৫ পর্যন্ত), জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী (১৯-৯-১৯৯৫ হতে ৩১-৮-১৯৯৬ পর্যন্ত), জনাব আবদুল কুদ্দুস (ভারপ্রাপ্ত) (৩১-৮-১৯৯৬ হতে ১৬-৯-১৯৯৬ পর্যন্ত), জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন (১৬-৯-১৯৯৬ হতে ১৯-২-১৯৯৮ পর্যন্ত), মওলানা আবদুল আউয়াল (১৯-২-১৯৯৮ হতে ৪-৯-২০০১ পর্যন্ত), জনাব মোঃ আবদুল রশীদ খান (৪-৯-২০০১ হতে ২০-১১-২০০১ পর্যন্ত), জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী (১৯-১১-২০০১ হতে ৪-১০-২০০৩ পর্যন্ত) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বর্তমানে জনাব এ.জেড.এম. শামসুল আলম (৪-১০-২০০৩ থেকে) দ্বিতীয় বারের মত ফাউন্ডেমনের মহাপরিচালনেরক দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় বর্তমানে ফাউন্ডেশন ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।[৪৯]

বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম (তৎপূর্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতি) বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। পরিচালনার ভার একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্ণরস-এর উপর ন্যস্ত হয়। সরকার ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং সচিব নিযুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার দেশব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৭৯-৮০ সনে চারটি বিভাগীয় এবং তিনটি জেলা সদরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করো সম্প্রতি ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর নাম পরিবর্তন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা করা হয়। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর কর্মসূচি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন তার প্রধান কার্যালয় ও এর শাখাগুলোর মাধ্যমে দেশব্যাপী ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যায়ে ইসলামী দাওয়াহ সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। তার কর্মসূচীসমূহের মধ্যে প্রধান ক'টি নিম্নরূপ–

১. ইসলামিক মিশনে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সেবাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালন, যেমন–বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে হালাল জীবিকা

---

৪৯. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাহের উপায় অবলম্বনে সহায়তা প্রদান, চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ, গরীব ও দুঃস্থদের সেবা প্রদান, সহায়-সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলা, মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশের অত্যন্ত দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৯৮৩ সনে জুলাই মাস হতে ইসলামিক মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ২৮টি জেলায় ৩১টি মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপরোক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৫০]

এই মিশনের আওতায় আরও দুটি কাজ শুরু হয়েছে।

ক. মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ

খ. মুবাল্লিগ (প্রচারক) প্রশিক্ষণ : মসজিদ এবং দাহলীজ পরিচালিত মক্তব ফুরকানিয়া মাদরাসা-এর শিক্ষকগণকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা কুরআন পাঠ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, অংক, স্বাস্থ্যবিধি, পৌরনীতি ইত্যাদি সম্পর্কেও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাথমিক জ্ঞান দান করতে পারেন। সেই সাথে কৃষি, পশুপালন, পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু ধারণা জন্মাতে পারেন।[৫১]

২. দ্বীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ পরিচালনা

ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার এবং ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও বিভিন্ন মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃত্বের স্মরণে এবং ইসলামের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সেম্পোজিয়ামের আয়োজন, বায়তুল মোকাররম মসজিদের আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর ও দরসে হাদীস এবং বিষয় ভিত্তিক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন ও পরিচালনা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহার নামাজের ব্যবস্থাপনা, শবে কদর, শবে বরাত, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরাআত ও হিফয প্রতিযোগিতার আয়োজন, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দ্বীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম কাজ। এ বিভাগ প্রতি বছর ৩০টি তাফসীর মাহফিল, মহিলা বিষয়ক ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান ৬০টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অনুষ্ঠান ১২০টি, মাসআলা মাসায়েল সংক্রান্ত ৯০টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়াও দুঃস্থ ও বিধবা মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ, কোর্স এবং সকল স্তরের মহিলাদের জন্য কুরআন শিক্ষা কোর্স চালু রয়েছে। এখানে মহিলাদেরকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়। মহিলা শাখায় মহিলাদের জন্য একটি লাইব্রেরীও আছে।[৫২]

---

৫০. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮, পৃ. ৩

৫১. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ২০০

৫২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি, পৃ. ৪ (বিস্তারিত দ্র : http://www.islamicfoundation.org.bd/ pages /introduction_ifb.html)

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা

ইসলামী সাহিত্যের উপর গবেষণাসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠালগ্নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এ লাইব্রেরীতে আল কুরআনুল কারীম, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থসহ ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, ইতিহাস, আইন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর লক্ষাধিক বই রয়েছে।[৫৩] তাছাড়া জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলাতেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৪. যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠা

মুসলিম দুঃস্থ জনসাধারণকে সাহায্য সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ৫ জুন যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। যাকাত বোর্ড পরিচালনা করার জন্য দেশে খ্যাতনামা মনীষীদের সমন্বয়ে গঠিত ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। দেশের খ্যাতনামা একজন মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিকে বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সরকারি যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সমাজের অসহায় ও দুঃস্থদেরকে পুনর্বাসনে যাকাত বোর্ড নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে–

ক. দুঃস্থ দরিদ্র শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য টঙ্গীস্থ শিশু হাসপাতাল পরিচালনা।
খ. অসহায় বেকারদেরকে কর্মক্ষম করে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ২৫টি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু ও পরিচালনা।
গ. দরিদ্র ও দুঃস্থ ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ।
ঘ. দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদান।
ঙ. রিক্সা, ভ্যানগাড়ি প্রদানের মাধ্যমে সহায়-সম্বলহীন বেকারদের পুনর্বাসন।
চ. হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে দুঃস্থ বিধবাগণ যাতে পুনর্বাসিত হতে পারে তজ্জন্য আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান।
ছ. এতিম দুঃস্থদের সাহায্য সহযোগিতাদানে সক্রিয় ও বাস্তবানুগ ভূমিকা গ্রহণ।[৫৪]

৫. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা

মসজিদ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। নবী করীম (স.) ও খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলে মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হত। এই মসজিদই ছিল তখনকার রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যালয়। সচিবালয়, প্রধান বিচারালয় ও সেনাধ্যক্ষের দপ্তর। বাংলাদেশে ১৯,৬৪,০০০টি মসজিদ রয়েছে। এতে নিয়োজিত আছে প্রায় চার লক্ষাধিক ইমাম ও মুয়াজ্জিন।[৫৫] তাদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। একাডেমী ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৬৩,৮২৬ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

---

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৫৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৫৫. *মাসিক অগ্রপথিক*, ১৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০২, ঢাকা : ইফাবা, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯,৭২২ জন ইমামকে রিফ্রেসার্স কোর্স দেওয়া হয়েছে।[৫৬] ফাউন্ডেশন ইমামদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে মসজিদগুলো পুনরায় প্রাণবন্ত করার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। ইমামগণের মাধ্যমে ইসলামের মহান আদর্শ জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এবং মানুষের নৈতিক মানবিক গুণাবলী উৎকর্ষ সাধনপূর্বক সমাজে শান্তি, সহমর্মিতা ও নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করে যাচ্ছে। সম্মানিত ইমামদের মাধ্যমে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পশুপালন, মৎস্যচাষ, বনায়ন, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচাররোধ, সন্ত্রাস দমন, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজে সমাজকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য প্রদানের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এতে সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন "নামায সমাপ্ত হওয়ার পর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তথা জীবিকা অন্বেষণে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়বে। তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যেন তোমরা সফলকাম হও"।[৫৭]

একাডেমীর আওতায় পর্যায়ক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান তথা নৈতিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি রয়েছে।[৫৮]

৬. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সোনালী অতীতের মসজিদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯২ সালে মে মাসে এ প্রকল্প শুরু করে। ধর্মীয় ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৮৬৪০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।[৫৯]

এ প্রকল্পের মাধ্যমে মসজিদের আশেপাশের মহল্লার পিছিয়ে পড়া কোমলমতি মেধাবী শিশুরা একদিকে শিক্ষার সন্ধান পাচ্ছে, অপরদিকে মুসলমান হিসেবে নিজেদের মূল পরিচয় ও অতীত ইসলামী ঐতিহ্যের কথা জানতে পারছে। তারা নামায, রোযা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসনের বাস্তব প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে বড় হচ্ছে।

তাছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে পনেরোর্ধ্ব নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা হচ্ছে। এর পাশাপাশি তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা, পরিবার প্রথা, নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অসামাজিক ও সন্ত্রাসী কার্যাকলাপ হতে বিরত থাকার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ১৬ লাখ ৪৮ হাজার ৮শত ৩০ জন শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।[৬০]

---

৫৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৯
৫৭. আল-কুরআন, ৬২ : ১০
৫৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪-১৫
৫৯. মাওলানা মোঃ নুরুজ্জামান, ইসলাম ও জীবন, দৈনিক যুগান্তর, ২০০২
৬০. মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম সমীক্ষা*, ঢাকা : ইফা গবেষণা বিভাগ, ২০০৪, পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

৭. মসজিদ ভিত্তিক ইসলামী পাঠাগার স্থাপন

ইসলামের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশন, মসজিদ ভিত্তিক ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করছে। এ কার্যক্রম ১৯৯২ সনে শুরু হয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মোট ৩৩৭০টি মসজিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি মসজিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা ফাউন্ডেশনের রয়েছে।

৮. ক্যাসেট তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ

টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেট, কম্পিউটার সি.ডি. ইত্যাদি বৈদ্যুতিক উপকরণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে দেয়া অত্যন্ত সহজ। তাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের প্রখ্যাত কারীগণের কণ্ঠে কুরআন মাজীদের কিরাআত, প্রসিদ্ধ আলিমগণের তরজমা ও তাফসীর সম্বলিত ক্যাসেট তৈরি করে বিভিন্ন সূত্রে তারা বিতরণ ও স্বল্পমূল্যে বিক্রি করছে।

৯. ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রদান

ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে এবং মুসলমানদের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। ইসলামের মৌলতত্ত্ব, সীরাত গ্রন্থ, সমাজ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, শিশু সাহিত্য, অনুবাদ, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে প্রতি হিজরী সনে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১০. গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, গবেষণালব্ধ বিষয়াবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রচারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ফাতওয়া ও মাসাইল, আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কিত বিষয়ে ৫০টি মূল্যবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা নামে একটি গবেষণামূলক ত্রৈ-মাসিক পত্রিকাও এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়।[৬১]

১১. অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রতিষ্ঠা

ইসলামী দাওয়াহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ কুরআনের তাফসীর, হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে অন্য ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি অনুবাদ ও

---

৬১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

সংকলন করছে। এ পর্যন্ত এ বিভাগ থেকে তাফসীর, হাদীস ও সীরাত বিষয়ক দুশতাধিক পুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে।

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে সামনে রেখে দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী, শিক্ষক প্রমুখ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত অন্যভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী বাংলায় প্রকাশের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বাংলায় দুই খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ এবং ২৭ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোমধ্যে বৃহত্তর বিশ্বকোষের ২৬টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া সীরাত বিশ্বকোষ নামে ২২ খণ্ডে সমাপ্ত আরেকটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এতে আম্বিয়া-ই কিরামের (আ), রাসূল (সা) ও সাহাবীগণের (রা) জীবনী স্থান পাবে। ইতোমধ্যে এর ৮টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

১৩. ইসলামী প্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক, যেমন ইসলামের মৌল বিষয় দর্শন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, আইন-বিচার প্রভৃতি বিষয়ের উপর মৌলিক গ্রন্থ ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ প্রকাশ করছে। ইসলামী বিষয়ের উপর যুগ-চাহিদার আলোকে গবেষণার কাজে গবেষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করছে এবং তরুণ সমাজকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ম্যাগাজিন/পত্রিকা প্রকাশ করছে।

বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর প্রথম সভার পরপরই 'কুরআন মঞ্জিল' নামক একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং 'আরেফীন প্রেস' নামক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে মুদ্রিত কুরআনুল কারীম-এর ৩০ পারা ব- কসহ যাবতীয় সম্পদ ইসলামিক ফাউন্ডেশনে দান করা হয়। 'বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' এর দুটি সভা অনুষ্ঠানের পর ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদত বরণ করেন। ফলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামক এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রচার ও প্রসারে তিনি যে সূদূর প্রসারী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তা তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারের আমলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে এবং আজ এর শাখা অফিস দেশের প্রতিটি বিভাগ এবং জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বঙ্গবন্ধু সূচীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এরপরও বাংলাদেশের জেলা সদর পর্যায়ে মোট ৪০টি কার্যালয় অস্থায়ীভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ ২৫ বছর অতিবাহিত হলেও এগুলোর স্থায়ী কার্যালয় করা হয়নি। এতদিন ইসলামের সরকার, নানান সরকার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিল। ২৫ বছর পর আবার বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত ৪০টি অস্থায়ী শাখাকে স্থায়ী করেন। এজন্য প্রতিটি কার্যালয়ে শোকরানা নামায আদায় করে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য দুআ মুনাজাত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অনন্য দূরদর্শিতা ও উদার মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন, উল্লেখিত অধ্যাদেশে বিবৃত কর্মপরিকল্পনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধুর এ কর্মপরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন আজ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

২. মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন

আগেই বলেছি, ব্যক্তি জীবনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। তিনি বাংলাদেশে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইসলামের বিধানের পরিপন্থি মদ, জুয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। মদ, জুয়া, আফিমসহ গর্হিত সকল প্রকার কর্মকান্ডে বঙ্গবন্ধু আরোপিত নিষেধাজ্ঞা পরবর্তীকালে (জিয়াউর রহমান সরকার আমলে) তুলে নেয়া হয়। উক্ত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হল মাদরাসা শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন।[৬২] এ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনের ফলে গোটা দেশের ছাত্র সমাজ আজ অবধি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলামী আকীদাভিত্তিক জীবন যাপন করতে পারছে। দেশের প্রতিটি জেলা সদরসহ অনেক থানা পর্যায়ে এখন কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করার ফলে আজ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে লেখাপড়া শেষ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবীসহ ইসলামী শিক্ষা চালু থাকায় এখানে বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষিত ছাত্ররা প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শিক্ষা লাভ করে তারা ইসলামের সঙ্গে সকল বিষয়ের সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হচ্ছে। কুরআনের তাফসীরসহ হাদীসের অনুবাদ এবং ইসলামী বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বইপুস্তক রচনা করেও তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হচ্ছে। এমনকি এদেশে অনেক মহিলা মাদরাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মাদরাসা শিক্ষার মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদীস। পবিত্র কুরআন নাযিলের প্রথম আয়াতগুলোতেই আল্লাহ্ শিক্ষার কথা বলেছেন। "পড় তোমার প্রভুর নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের কণিকা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার রব মেহেরবান, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না।"[৬৩] জ্ঞান বা শিক্ষাই মানুষকে সত্য-অসত্য, ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাই মানব জন্মের উপাদান দিয়ে শিক্ষাদানের যাত্রা শুধু করেছিলেন। আল্লাহ

৬২. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ইসলামী খিদমত*, পিরোজপুর : সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৬৩. আল কুরআন, ৯৭ : ১-৫

Dhaka University Institutional Repository

কলম দিয়ে শিক্ষার কথা উল্লেখ করে শিক্ষার ব্যবহারিক গুণাগুণকে আরও মহিমান্বিত করেছেন। পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের আরো অনেক আয়াতে আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের গুণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি ও রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে যেসব লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে- সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন।"[৬৪]

আল্লাহ্ মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত বা সৃষ্টির সেরা এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে (তাঁর সৃষ্ট) সকল বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন। পরে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, যে সব জিনিস দেখছ, তন্মধ্যে কার কি নাম, কার কি গুণ?' তখন ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, 'হে মাবুদ! তুমি দয়া করে যেটুকু আমাদের শিক্ষা দিয়েছো, তার বেশি আমরা জানি না।' তখন আল্লাহ আদম (আ)-কে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা দিতে বলেন, আদম (আ) সব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হলেন।[৬৫]

আল্লাহ মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে আরও বলেন, "নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দিবা-রাত্রির বিবর্তনের মধ্যে আর সমুদ্রে মানুষের উপকারার্থে নৌযানের চলাচলের মধ্যে এবং আল্লাহ তা'আলা যে আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, যা দ্বারা মৃত জমিন আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং সবরমক জীবজন্তু ছড়িয়ে পড়ে, আর আবহাওয়া পরিবর্তনের মধ্যে আসমান ও জমিনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে সমঝদার ও জ্ঞানী লোকের জন্য উত্তম নিদর্শন রয়েছে।"[৬৬] আল্লাহ মানুষের চিন্তা-চেতনায় এই সুন্দর পৃথিবীকে একটি জ্ঞানের উপাদান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দিন-রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত, সপ্তাহ, মাস, বছরের বিবর্তন, জলভাগ, স্থলভাগ, পাহাড়-সমুদ্র, উদ্ভিদ-প্রাণী, মরুভূমি, তৃণরাজি সৃষ্টির বৈচিত্রের পরতে পরতে আল্লাহর সৃষ্টির মহিমা মিশে আছে। মানুষের জড়বাদী মনকে পরিচালিত করে আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর রহস্য উদঘাটনের দিকে মনোনিবেশের জন্য আল্লাহর আহ্বান এসেছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ জমিন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তোমাদের জন্য অনুগত ও বশীভূত করে রেখেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও গোপন য়িামতসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন? এরপর অবস্থা হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের নেই কোন প্রকার জ্ঞান, পথনির্দেশনা বা আলো প্রদানকারী কিতাব।"[৬৭]

পবিত্র কুরআনে জগতের সব চাওয়া-পাওয়ার জবাব রয়েছে। সৃষ্টির আদি থেকে অনাদি পর্যন্ত সব কিছু বর্ণনার সমৃদ্ধ এই কিতাব। আল্লাহ বলেন, "এই কুরআন পূর্ব গ্রন্থে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে

---

৬৪. আল কুরআন, ৩ : ১৯০-৯১
৬৫. আল কুরআন, ২ : ৩১-৩৩
৬৬. আল কুরআন, ২ : ১৬৪
৬৭. আল কুরআন, ৩১ : ২০

Dhaka University Institutional Repository

উহার সত্যায়ন এবং সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ।"[৬৮] কাজেই সৃষ্টির ইতিহাসের সাথে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং তাদেরকেও বাড়িয়ে দিবেন যাদের এলেম দান করা হয়েছে।" "আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।"[৬৯] "আর যে ব্যক্তি ধর্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সে অতি কল্যাণের বস্তু প্রাপ্ত হয়।"[৭০] "হে রাসূল আপনি বলুন যে, যারা জ্ঞানী ও যারা অজ্ঞ, তারা কি সামনে হতে পারে? সেই লোকেরাই অসিয়ত গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।"[৭১]

শিশু ইসলামের বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের বর্ণনায় আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন জ্ঞানের কথা বলে। বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহর একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আল্লাহ্ একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন শুধু তাঁর ইবাদতের জন্য। মানুষকে পৃথিবীতে একটি নিয়মের আওতায় শান্তি ও শৃংখলার সাথে স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ দিয়েছেন। মানুষেরা এই সুযোগ কিভাবে কাজে লাগাবে তাও বলেছেন। পৃথিবীর সব সৃষ্টি কি করে মানুষের ব্যবহারে আসবে তারও ইংগিত দিয়েছেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন প্রাসংগিক বর্ণনায় আল্লাহ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিবেককে সমুন্নত রেখে একটি প্রবিধান মালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম-নীতি মানলে কি হবে, না মানলে কি হবে। অতীতে যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনেছে তাদের পুরস্কার এবং যারা মানেনি তাদের তিরস্কারই বা কিভাবে পেয়েছে, সবই বিবৃত হয়েছে আল-কুরআনে। সবশেষে মানুষকে একটি সার্বজনীন পথে চলতে নির্দেশ দিলেন। এ পথ পরিহার করলে তার পরিণতি কি হবে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাও বলেছেন।

আল্লাহ কুরআনের প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি বাক্যে বর্ণনা করেছেন মানব জীবনের হাজার নিয়ামত। আর এই নিয়ামতের বিষয় মানুষ যখন হৃদয়ংগম করতে পেরেছে তখনই মানুষ হেদায়েতের পথে এসেছে। মানুষ জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কুরআন পড়তে শুরু করে। কুরআনের বাহক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট কুরআন বাস্তবায়ন বা আমলের বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের প্রতিক্রিয়া থেকেই দারসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দশ জন সাহাবী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, "একদা আমরা মসজিদে কুবায় জ্ঞান চর্চায় মগ্ন ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা যত ইচ্ছা, বিপুল পরিমাণে জ্ঞান অর্জন কর। কিন্তু মনে রেখো যতক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত

---

৬৮. আল কুরআন, ১২ : ১১১
৬৯. আল কুরআন, ৫৮ : ১১
৭০. আল কুরআন, ২ : ২৬৯
৭১. আল কুরআন, ৩৯ : ৯

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানানুযায়ী আমল না করবে, আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান পাবে না।[৭২] প্রথমে অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে এই দারসের শুরু হলেও দীরে ধীরে তা উপ-আনুষ্ঠানিকতা এবং আনুষ্ঠানিকতায় রূপ নেয়। তা থেকেই আমরা মাদরাসার অস্তিত্ব ও উৎপত্তি খুঁজে পাই।

ইসলামের আবির্ভাব থেকে আল-কুরআন যেমন জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি আল-হাদীস আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিধ্বনিতে হয়ে জ্ঞান বিপ- বের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন মিলিয়ে জ্ঞানার্জনকে মানুষের জন্য এক শক্তিশালী প্রেরণার উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করা হল-

১. "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য ফরয।"[৭৩]

২. "চীন দেশে গিয়েও জ্ঞান আহরণ কর।"

৩. "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষের শিক্ষাকাল।"

৪. "এক ঘণ্টার জ্ঞান চর্চা এক বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

৫. "মানুষকে তার শক্তি অনুযায়ী উপদেশ প্রদান কর। কারণ সবাইকে সব কথা বললে কতক লোক তা বুঝতে পারবে না, তারা ভ্রমে পতিত হয়।"

৬. "শিক্ষার্থীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে অধিকতর ভারী"।

৭. "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর পথে রয়েছে, যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করে।"[৭৪]

পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের উৎস নিয়েই ইসলামী শিক্ষার সূচনা। আর ইসলামী শিক্ষার অনানুষ্ঠানিক উপ-আনুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারা পার হয়েই মাদরাসা শিক্ষার পূর্ণতা আসে। মাদরাসা শব্দটি দারস বা শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ থেকে এসেছে। এর এক বচন মাদ্রাসা এবং বহুবচনে মাদ্রাসা। এই হিসেবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থানকে মাদরাতা বলা হয়।[৭৫] মাদ্রাসা শিক্ষা বলতে বুঝায় কুরআন ও হাদীসভিত্তিক শিক্ষা।[৭৬]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করার কারণে বাংলাদেশের মানুষ ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম, মানবতার ধর্ম, সকলের অধিকার এ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারছে। জাতির জনক যদি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন না করতেন তাহলে ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে কোন প্রকার ধর্মের জ্ঞান এদেশের মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারত এমনটি মনে হয় না। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা এত অগ্রসর হতো না। কিন্তু আজ এ মাদরাসা বোর্ড নিয়ে অনেক অপপ্রচার করা হচ্ছে। এদেশে দীর্ঘ ২৮ বছর ইসলামী মূল্যবোধে

৭২. মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : দারুল ইফতা ও গবেষণা পরিষদ, ১৯৮৬, পৃ. ২১০
৭৩. মাওঃ নূর মোহাম্মদ আযমী (অনু.), *মেশকাত শরীফ*, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭, পৃ. ১৫
৭৪. *মেশকাত শরীফ*, (তিরমিযী ও দারেম সূত্রে বর্ণিত) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৭৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ২৬৫
৭৬. আল কুরআন, ৪ : ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসী বলে দাবিদার একটি সরকারকে আমরা দেখেছি। যারা ইসলামের জন্য কথায় কথায় মুখে খই ফোটাতেন তারা ইসলামের প্রচার প্রসারকল্পে কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আমরা দেখি না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কোন লেবেল-সর্বস্ব ইসলাম পছন্দ করতেন না। তিনি ইসলাম সমর্থিত ধর্ম নিরপেক্ষতাভিত্তিক ও সঠিক আকীদাভিত্তিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেদিন মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন ও মাদরাসা শিক্ষকদের চাকুরির নিশ্চয়তা ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি বলেন– লেবেল সর্বস্ব ইসলাম নয় ; আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। একথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য লেবেলসর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসূলে করীম (স.)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদেরই বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাশের সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেন কেবল তাঁরাই ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফায়স্থা করে তোলার কাজে।[৭৭] বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান ৪র্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।[৭৮]

৩. তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য জমি প্রদান

পবিত্র হজ্জের পর মুসলমানদের সমাবেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তর সমাবেশ হল তাবলীগ জামাতের সমাবেশ। যেটা আন্তর্জাতিক সমাবেশ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিন দিনের এ সমাবেশ প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ৭–৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে ধর্মীয় ওয়ায নসীহত (কোন প্রকার রাজনৈতিক আলোচনা বাদে) করা হয় এবং বিশ্ববাসীর সুখ ও শান্তির জন্য দোয়া মোনাজাত করা হয়। এবারের সমাবেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও যোগদান করেন। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বরেণ্য আলিম ওলামা-ই কিরাম উক্ত সমাবেশে যোগ দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, তাবলীগ জামাত একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন। এজন্য সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আর সেই জন্যই তারা অতি সহজে দাওয়াতি কাজ করতে সক্ষম হয়। সমগ্র বছর দাওয়াতি কাজ করার

---

৭৭. ১৯৭০ সালের নভেম্বর বঙ্গবন্ধুর বেতার ভাষণ [বিস্তারিত দ্র : খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ২০০০, পৃ. ১৯-৩৩]

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

পর বছরশেষে ও নতুন বছরের জানুয়ারি মাসের ৭-৯ তারিখে সমগ্র বিশ্বের বরেণ্য আলিম ওলামা-ই কিরাম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গিতে এক আন্তর্জাতিক মহাসমাবেশে সমবেত হন। আর উক্ত (তাবলীগ জামাতের) বিশ্ব এজতেমা সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে উক্ত জায়গা প্রদান করেন। সে হতে অদ্যাবধি বিশ্ব তাবলীগ জামাত ঐস্থানে তাদের বিশ্ব এজতেমা করে আসছে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামী দাওয়াতের জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'জামাতে তাবলীগ' বা তাবলীগ জামাত ১৩৪৫ হিজরী মোতাবেক ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান ভারতের দিল্লীর সন্নিকটে মেওয়াত এলাকায় উৎপত্তি হয়।[৭৯] এ জামাত গঠনে মূল ভূমিকা পালন করেন ভারতের সাহারানপুরের মাহাহেরুল উলূম মাদরাসার এককালীন শিক্ষক বিখ্যাত আলিমে দীন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.) (জন্ম: ১৩০৩ হিজরী/১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ। মৃত্যু ; ১৩৬৩ হিজরী/১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। আনুষ্ঠানিকভাবে সে জামাতবদ্ধ দাওয়াতের সূচনা তাঁর হলেও পথহারা মুসলমানকে মসজিদে এনে দীনের শিক্ষা দীক্ষা দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর কাজটি তাঁর পিতা হযরত মাওলানা ইসমাঈল (র.) (মৃত্যু: ১৩১৫ হিজরী/১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ) সূচনা করেছিলেন।[৮০]

তাবলিগি মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইলিয়াস (র.) এর 'মালফুযাত' থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদঘাটিত হয়। প্রথমত এই মিশনের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার একটি বক্তব্যেরও মর্মার্থ এ রকম- 'একডটি সুস্থ সমাজে স্বাভাবিক পরিবেশে লোকজন যখন কোনো অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হন, তখন তারা হাসপাতাল বা ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থতা লাভ করেন। কিন্তু কোনো এলাকায় যদি মহামারি আকারে রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে, ঘরে ঘরে যদি অসুস্থতার বিস্তার ঘটে, তখন অবস্থা এমন নাজুক হয় যে- কে কাকে হাসপাতালে নেবে তার কোনো ঠিক থাকে না। এমতাবস্থায় ডাক্তাররাই বরং মেডিকেল টিম নিয়ে নিয়ে এলাকায় ছড়িয়ে বা বেরিয়ে পড়েন। রোগী খুঁজে খুঁজে বের করে চিকিৎসা দেন। এক কাজে ব্যাপক সহযোগিতার জন্য অনেক সাধারণ মানুষকেও নিতান্ত প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণটুকু দিয়ে কাজ করার জন্য মাঠে ছেড়ে দেয়া হয়। এছাড়া পরিস্থিতি সামলানো দায় হয়ে পড়ে। এটাকে 'জরুরি অবস্থা' বলা চলে। তদ্রুপ এ শেষ জামানায় গোমরাহি ও বদদ্বীনি মহামারির মত ছড়িয়ে পড়ায় সবাইকে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকেও অনেককে দ্বীন ও ঈমানের প্রাথমিক দীক্ষা দিয়েই কাজের জন্য মাঠে নামিয়ে দিতে হবে। এ চিন্তা থেকেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রায়স। পাশাপাশি তার আরও একটি বক্তব্য এ রকম যে, 'আমার এ তাবলিগি মিশন এক সময় পৃথিবীর কিন্তু যদি কখনও এর নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা হাককানি উলামায়ে কেরামের হাত তেকে অন্য কারও হস্তগত হয় তাহলে এমনও হতে পারে যে, এর চেয়ে বড় গোমরাহি বা ভ্রষ্টতা আর

---

৭৯. মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (অনু. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ), *মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও তার দ্বীনি দাওয়াত*, ঢাকা : মুহাম্মদী বুক হাউজ, ২০১০, পৃ. ৮৫।

৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

কিছু থাকবে না। এ দুটি উক্তিকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেই তাবলিগী জামাত ও তাবলিগি মিশনের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া বাঞ্ছনীয়।[৮১]

শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বজুড়ে তাবলিগী মিশনের অগ্রগতি বেশ সাফল্যপূর্ণ ও গৌরবজনক। ইসলাম বিরোধী পশ্চিমা বিশ্ব যখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নাম করে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অঙ্গন ও কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে, সেখানেও তাবলিগ জামাতকে কোনো অসুবিধা পোহাতে হচ্ছে না। আজ বাতিল ও তাগুতে আক্রমণ আসছে দ্বীনি মাদরাসা, মসজিদ, মাহফিল, মিডিয়া, উলামা মাশায়েখ সবকিছুর উপর। সেখানে তাবলিগ আছে নিরাপদে এবং চলছে, স্বাভাবিক গতিতে।

পবত্রি হজের পর বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম গণজমায়েত তাবলিগ জামাতের এই ইজতেমা। বহু বছর ধরে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ইজতেমার আমেজ প্রভাব বিস্তার করে আসছে। একান্ত তাবলিগওয়ালাদের এ বার্ষিক সমাবেশটি দিনে দিনে সাধারণ মুসলমানদের অংশগ্রহণে বৃহৎ থেকে বৃহত্তম রূপ ধারণ করেছে। দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নদীর স্রোতের মত ছুটে আসেন রাজধানীর টঙ্গী এলাকায় অবস্থিত ঐতিহাসিক তুরাগ নদীর তীরজুড়ে বিস্তৃত এ ইজতেমার ময়দানে। ভারতের ‘নিজামুদ্দিন’-এর অনুসরণে ঢাকার কাকরাইল মসজিদ থেকে পরিচালিত তাবলিগ মিশনের বার্ষিক আয়োজন এটি। আল্লাহর দ্বীনের মৌলিক ও প্রাথমিক দীক্ষা প্রচার ও চর্চার কাজটি করে থাকে এ তাবলিগ মিশন। দলবদ্ধ বা জামাত আকারে তাদের এ মিশন চলে বলেই তাদেরকে তাবলিগ জামাত বলা হয়। হাজারও পাপাচার আচ্ছন্ন, ব্যস্ত ও অশান্ত এ সমাজের সাধারণ মানুষদের কাছে কালেমার দায়িত্ব ও আমলের দাওয়াত পৌঁছে দেন তারা। সমাজের যেসব মানুষ কোনো আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনাদাতা ওলি দরবেশের সন্ধান বা সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন না, ইলম ও তাসাওউফের কেন্দ্রস্থল দ্বীনি মাদরাসাগুলোর সঙ্গেও যারা সম্পৃক্ত থাকতে পারেন না, হাক্কানি উলামায়ে কেরামের নৈকট্যও যাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় না, দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায় সেই জনগোষ্ঠীর কাছে নিজেরাই দ্বীনের মৌলিক বুঝ ও প্রাথমিক আমলের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার কাজটি তাবলিগওয়ালারা নিরলস চালিয়ে যাচ্ছেন।[৮২]

এলাকার গণ্যমান্য মহাজন মাতুর্ব্বর থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থী, অশিক্ষিত শ্রমজীবী, এমনকি রাজপথ কিংবা গলিপথের অচেনা পথচারী, অর্থাৎ শ্রেণি বর্ণ ও পেশা নির্বিশেষে যাকে যখন যেখানে যেভাবে সুবিধা হয় তাকেই দ্বীনের পথে টানার প্রক্রিয়া ও চেষ্টা চলে এ মিশনের মাধ্যমে। এ কাজে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। মানুষের হাতটি ধরে, পিঠে হাত বুলিয়ে, অতিশয় নম্র ও সংযত আচরণে, অবিরত হাসিমুখে, দরদিস্বরে, মায়াবী দৃষ্টিতে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মহল্লার মসজিদে নামাজে শরিক হতে বলা হয়। বলা হয়- নামাজের পর দয়া করে আল্লাহর ওয়াস্তে একটু সময় নিয়ে ঈমান ও আমলের বয়ানে শরিক হওয়ার জন্য। দুনিয়ার জীবনের জন্য কত কিছুই তো আমরা করছি, কিন্তু আখেরাতের জীবনের জন্যও তো কিছু পুঁজি

---

৮১. মুহিব খান, “*তাবলীগ তাবলীগ চলে*”, সাপ্তাহিক লিখনী, ঢাকা : ১৮ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৮ জানু. ২০১৪, পৃ. ২৩
৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

সংগ্রহ করা দরকার। ভাই রে! আসেন না ভাই, একদিন কিছু সময়ের জন্য আমাদের সঙ্গে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে একটু রাস্তায় হাঁটবেন! ব্যস্ত জীবন থেকে অন্তত তিনটা দিন কাটিয়ে যান না আল্লাহর রাস্তায় কোনো মসজিদের মেঝের বিছানায়! এতে যে কী আনন্দ, কী যে প্রশান্তি আর উম্মতের কত যে কল্যাণ, একবার এলেই বুজবেন ভাই। ঈমান ও আমলকে সহিহ ও প্লোক্ত করার এ যে বিরাট সুযোগ! এই হল তাবলিগ জামাতের আহ্বানের চিরায়ত অবকাঠামো।[৮৩]

সমাজের সর্বত্র এ জামাতের কার্যক্রম সম্প্রসারিত। অনেক প্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য মানুষকে এখন সুন্নতি লেবাস ও দাড়িসমেত ওলির বেশে দেখা যায়, এটি তাবলিগের ফল। তবে তাদের চোখেমুখে দ্বীনের গভীর ইলমের অভাবটাই স্পষ্টতই ফুটে ওঠে, যেহেতু তারা প্রকৃত আলেমে দ্বীন হওয়ার সুযোগ পাননি। শুধু আমল ও অবয়বে দ্বীনের যতটা কাছে আসতে পেরেছেন- তা শুধু তাবলিগের কল্যাণেই। পক্ষান্তরে একজন পরিপূর্ণ আলেমের চেহারায় তার ইলমের আভিজাত্যের নুরানি প্রভা ছড়িয়ে থাকবেই। তার মুখের দাড়ির পরিমাণ কম হোক বা দেহের পোশাক আতরের গন্ধবিহীন জীর্ণশীর্ণ হোক, চোখ হোক সুরমাবিহীন, সে চোখের গভীরে কুরআন ও হাসিদের দ্যুতি কোনো কিছুতেই ঢাকা পড়ে না। কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা যে তাবলিগের সূত্র ধরে আলেম ও ওলিদের বেশটুকু অন্তত গ্রহণ করতে পারেন, এটিও কম নয়।

তাবলিগ একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং শান্তিপ্রিয় মিশন। সমাজে শান্তিসংরক্ষণ ও শান্তি বিস্তারে এর নীরব ভূমিকা রয়েছে।[৮৪] তাবলিগওয়ালারা একে অপরকে সাথী বাই সম্বোধন করে থাকেন। তারা তাদের দাওয়াতি পদযাত্রাকে ‘গাশত’ নামে অবহিত করেন। গাশতের সময় তারা দলবদ্ধ হয়ে একে অপরের পেছনে সারিবদ্ধ থেকে চোখের দৃষ্টি নিম্নমুখী রেখে রাস্তার ডান পাশ ধরে হেঁটে যান এবং বিভিন্ন মানুষের কাছে সালাম ও দাওয়াত পেশ করেন। এ সময় তাদের সবার সামনে থাকেন ‘মুতাকাল্লিম’ বা বক্তা এবং সবার পেছনে থাকেন ‘আমির’ বা দলপ্রধান। এছাড়াও তাদের তিনদিন বা চল্লিশদিন বা সালব্যাপী দাওয়াতি ও আমলি সাধনার নিয়ম তাদেরই পরিকল্পিত এবং নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি। চল্লিশ দিনের মেয়াদকে এক চিল্লা বলা হয়। এ শব্দটির সঙ্গে মানুষের এখন যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গেছে। পুরো মিশনটি পরিচালনার জন্যে তাদের ‘ছয় উসুল’ বা ছয়টি মূলনীতি রয়েছে। এ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তিও অনেকের মধ্যে কাজ করে। অনেকে ইসলামের পাঁচ ভিত্তির সঙ্গে এ ছয় মূলনীতিকে গুলিয়ে ফেলে ভুল করেন। আসলে ইসলামের অসংখ্য কাজ ও বিভাগের মধ্যে তাবলিগ বা দ্বীনের প্রচার একটি বিভাগ মাত্র। এ বিভাগটির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত হয়েছে এই ছয় উসুল। এটি এর বেশি কিছু নয়। এর মধ্যে আকিদা ও আমলি উসুলের পাশাপাশি ব্যবহারিক একটি উসুল বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ হিসেবে প্রমাণিত। এটি হলো ‘ইকরামুল মুসলিমিন’ বা মুসলমানদের সম্মান ও সহযোগিতা। এটি অনেকটা সেবা, ধৈর্য ও চাড়মূলক নীতি। এ নীতির ভিত্তিতেই মূলত তাবলিগের সবল কার্যক্রম শান্তি ও সৌহার্দ্যমূলক সহাবস্থান এবং সহকর্ম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে থাকে। নিজে কম খেয়ে অপর ভাইকে

৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

বেশি দেয়া, নিজে কষ্ট সয়ে অপর ভাইকে আরাম দেয়া, নিজে কাজটি সেরে অপর ভাইকে বিশ্রামের সুযোগ দেয়ার মনোবৃত্তিই এ নীতির মর্মার্থ। সমাজে ও রাষ্ট্রে এ সৌহার্দ্যমূলক মনোবৃত্তিটির তীব্র অভাব বলেই অশান্তি ও কলহের আগুনে পুড়ছে এ পৃথিবী। যার ব্যতিক্রম তাবলিগে পাওয়া যায়। প্রমাণ দেখা যায় বিশ্ব ইজতেমার মহামিলনে। যে দেশে ও সমাজে পাঁচজন মানুষের জমায়েতে সামলাতে দশজন আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাকর্মীর প্রয়োজন হয়, সেখানে লক্ষ লক্ষ ভিন্ন স্বভাব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে সুন্দরভাবে মান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়ায় পরিচালিত করে এই একটি বিশেষ মূলনীতি। নদীতীরের খোলা প্রান্তরে প্রকর রৌদ্রতাপ, শীতের কনকনে বাতাস, ঝড়-বৃষ্টি-কুয়াশা ও রাতের অন্ধকারকে সাথী করে নিয়ে অগণিত মানুষের টানা তিন দিন তিন রাতের এই যে মহা-সহাবস্থান, এর নজির পৃথিবীর আর কিছুতে নেই। পবিত্র হজের মহামিলনমেলায় যত নিশ্ছিদ্র উন্নত ও পর্যাপ্ত সুব্যবস্থাপনা থাকে, এর কোনোদিক থেকেই এর ধারে কাছে নয় ইজতেমার ব্যবস্থাপনা। এরপরও এটি এত সুন্দর ও নিরাপদ হয়ে ওঠে মুমিনের ঈমানি চেতনা ও মূল্যবোধের কারণে।[৮৫]

ইজতেমার শুরু থেকেই এ দেশের বিভিন্ন সরকার একে নানারকম সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। এর সীমানা ও জায়গা বৃদ্ধি, চলাচলের সুব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, ট্রেন বাস ও জলপথে অতিরিক্ত যানবাহন বরাদ্দ, বর্ধিত যোগাযোগ সিডিউলসহ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাষ্ট্র। তাই দেশি ও বিদেশি আগন্তুকরা যথাসম্ভব ভালোভাবেই ইজতেমার কাজ সমাধা করতে পারেন। শুধু রাষ্ট্র বা সরকারই নয়, ইজতেমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন সমাজের উচ্চবিত্ত ধনী ও সচ্ছল অনেক প্রতিষ্ঠান ও মানুষও। তারা এটিকে বিশাল সওয়াবের কাজ এবং পাপমুক্তির উসিলা মনে করেন। আখেরি মুনাজাতে সর্বসাধারণের সঙ্গে শরিক হন রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ রাষ্ট্রের কর্তারাও।[৮৬]

বাংলাদেশের তাবলীগ জামাতের মারকায বা কেন্দ্র নামে পরিচিত কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণকল্পে রমনা পার্কের অনেক খানি জায়গা প্রয়োজন যখন দেখা দেয় তখন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দ্বিধায় কাকরাইল মসজিদকে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করে দেন।[৮৭] একজন সরকার প্রধানের পক্ষে এতোটুকু ইসলামী অনুভূতি কম কথা নয়। কাকরাইল মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো বা তার এরিয়া বঙ্গবন্ধুর ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি সজাগ মনোভাবের প্রতিফলনে দিক-নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

---

৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

৮৬. সাপ্তাহিক *লিখনী*, ২৮ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২২

৮৭. মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্ম চিন্তা, অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, (ঢাকা ঃ ইফাবা-১৯৯৮), পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পবিত্র হজ্জব্রত পালনের সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা

নামায, রোযা ও যাকাতের ন্যায় হজ্জ ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ। হজ্জ মানুষের প্রতি আল্লাহপাক কর্তৃক ফরযকৃত একটি আর্থ-দৈহিক ইবাদত, যা সক্ষম ব্যক্তির উপর সারা জীবনে কেবল একবারই ফরয। যাকে আল্লাহপাক নিজ দেশ বা আবাস থেকে পবিত্র মক্কা নগরী পর্যন্ত যাওয়া ও ফিরে আসার মতো সঙ্গতি দিয়েছেন এবং তার ব্যয় বহনের পর সে হজ্জ পালন করে ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম, তার উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব খুবই বেশি। সে কারণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে হজ্জ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৮৮] কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শাহাদত বরণ করার পর যারা দীর্ঘ ২৮ বছর দেশের ক্ষমতায় ছিলেন, তারা কথায় কথায় নিজেদের ইসলামের সেবক বলে দাবি করলেও তাদের আমলে তারাই হজ্জের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন যা এদেশের অনেকেই হয়ত জানেন না।

৫. বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার

বেতার ও টেলিভিশন দু'টি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। এর বিস্তৃতি দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে। বঙ্গবন্ধু বেতার টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত, ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ দিনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের নির্দেশ দান করেছিলেন। জানা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে কে একজন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, বেতারে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়না। এ কথা শুনে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নির্দেশ জারী করেছিলেন যে কাল সকাল থেকে বেতারে কুরআন তেলাওয়াত হবে এবং সময়মত অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থও পাঠ করার ব্যবস্থা করতে হবে। বাস্তবে পরদিন থেকে তাই হতে থাকল। টিভিতেও তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৮৯] মুসলমানদের ধর্মীয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর পবিত্র কালাম যা ওহীদ্বারা তাঁর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে অবতীর্ণ করেছেন। যা শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নুবুয়্যাত-রিসালতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ। কুরআন তিলাওয়াতে অধিক সওয়াব লাভ হয় যা পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ পাঠে হয় না। কুরআনের একটি হরফ উচ্চারণ করলে ১০টি সওয়াব পাওয়া যায়। এদিক বিবেচনা করে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার শাসনামলেই তারই নির্দেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টেলিভিশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসীর প্রচার শুরু করার সুব্যবস্থা করেন। ফলে সকালের শুভ সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে এবং ঠিক তেমনি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের শেষ হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই এ ব্যবস্থা চালু হয়।[৯০]

---

৮৮. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৯০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬. ও.আই.সি'র অন্তর্ভুক্ত

১৯৬৯ সালে জেরুজালেমে অবস্থিত পবিত্র মসজিদুল আকসায় ইয়াহূদী কর্তৃক অগ্নিকাণ্ডের পর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ২৪টি মুসলিম দেশ মিলিত হয়ে ও.আই.সি প্রতিষ্ঠা করে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিম ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুকবল মুক্ত ও নিরাপদ রেখে ইসলামিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করা।

ও.আই.সি'র যে ৪টি অঙ্গসংস্থা বিদ্যমান সেগুলি হলো–

- রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলন;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন;
- সাধারণ সচিবালয় সম্মেলন;
- আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত।

ও.আই.সি-এর সদর দপ্তর হল জেদ্দা (সৌদী আরব)। সদস্য সংখ্যা ৫৪।[৯১]

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রথম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও.আই.সি. সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ১৯৭৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে এই সংস্থার অন্তর্ভূক্ত করে বিশ্ব মুসলিমের নিকট বাংলাদেশের ইসলামী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলা ও বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বিশ্ব উম্মাহর সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে ও.আই.সি. সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এমনকি ১৯৭১-এর পরাজিত সামরিক জান্তার প্রতিনিধি ভূট্টোর দেশেও যেতে দ্বিধাবোধ করেননি। তেমনি সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এই মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের মধ্যে দিয়েই বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মাঝে বাংলাদেশের স্থান করে নেন। এ কাজগুলো তিনি কাউকে খুশি কিংবা ব্যথিত করার জন্য করেননি। তার ঈমানী দায়িত্ব পালনার্থেই তিনি তা করেছিলেন।[৯২]

৭. জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) পালন

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম হাক্কানী আলেম ওলামাদের সংগঠিত করে পবিত্র ইসলামের সঠিক রূপ জনগণের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় 'সীরাত মজলীশ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।[৯৩] সীরাত মজলিশ ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে রবিউল আউয়াল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বৃহত্তর আঙ্গিকে ঈদে মিলদুন্নবী (সা) মাহফিল উদযাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু বায়তুল মুকাররম মসজিদ চত্বরে মাহফিলের শুভ উদ্বোধন করেন।[৯৪] একজন সরকার প্রধান হিসেবে

---

৯১. বিস্তারিত দ্র : http://www.oic-oci.org/oicv2/home/

৯২. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৯৩. সৈয়দ আবির, *ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ২০৮

৯৪. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *ইসলাম প্রচার প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ইফাবা, ২০১০, পৃ. ২৩

জাতীয়ভাবে ঈদে মিলদুন্নবী (স.) মাহফিলের উদ্বোধন উপমাহদেশের ইতিহাসে প্রথম দৃষ্টান্ত। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনে প্রতিবছর জাতীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) মাহফিল উদযাপন হয়ে আসছে।

৮. ঈদে মিলাদুন্নবী (স.), শব-ই-বরাত, শবে কদর উপলক্ষে সরকারী ছুটি ঘোষণা

ইসলামের ধর্মীয় দিবস যথাযাগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবী (স.), শব-ই- বরাত উপলক্ষে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। উল্লিখিত দিনসমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।[৯৫]

৯. মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান

ইসলামে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

মাদক : ইসলামে মাদক দ্রব্যের মত ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার, উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণন এবং এর মাধ্যমে অর্থোপার্জন হারাম। আল-কুরআনে মদ হারাম করা হয়েছে।[৯৬] এ কারণে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে মদের কোন চাহিদাই সৃষ্টি হতে পারে না। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (স.) বলেন, প্রত্যেক মাদক ও নেশাকর দ্রব্যই মদ এবং প্রত্যেক মদই হারাম। মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এমন যে কোন মাদক দ্রব্যই হারাম। মহানবী (সা)-এর কাছে মধু, ভুট্টা ও যব থেকে তৈরি মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি একটি মৌলনীতি ঘোষণা করেন এবং বলেন, সকল প্রকার মাদকদ্রব্যই 'খামর'। আর সব খামরই হারাম।[৯৭] হযরত উমর ফারুক (রা.) মহানবী (স.)-এর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন, যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে তাই 'খামর' এবং নিষিদ্ধ। মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম- অল্প হোক কি বেশি। ইসলামে মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম ঘোষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তার পরিমাণের উপর মোটেই দৃষ্টি দেয়া হয়নি। কাজেই তার পরিমাণ কম হোক কি বেশি, উভয় অবস্থায়ই তা হারাম। এ পিচ্ছিল পথে পা দিয়ে মানুষ যেন আছাড় না খায়, সে জন্যেই এ ব্যবস্থা। মহানবী (স.) স্পষ্ট করে বলেছেন, 'যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে তার কম পরিমাণও হারাম।' যে জিনিসের কয়েক রতি পরিমাণও নেশাগ্রস্ত করে, তার অঞ্জলী ভরা পরিমাণও হারাম। ইসলামী ফিকাহর মূলনীতিতে বিধৃত ঃ 'মাদকদ্রব্য কম হোক বেশি হোক সম্পূর্ণরূপ হারাম। মাদকদ্রব্য হলো সকল অপকর্মের আধার।'

---

৯৫. প্রাগুক্ত।
৯৬. আল কুরআন, ৫ : ৯০
৯৭. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ্*, বাবু তাহরীমিল খামার, বৈরুত: দারুল আওফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং- ৫২৫২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রকার ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করেছে। মাদকদ্রব্যেরও যাবতীয় কুফল বর্ণনা করে এই মারাত্মক হলাহল সেবন ও ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের উপর জারি করেছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। মদ ছাড়াও কিছু তরল বা কঠিন আকৃতির মাদক দ্রব্য রয়েছে যা খেলে বা পান করলে মাদকতা আসে, বিবেক বুদ্ধি ও মেজাজ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে পাল্টে যায়, আংশিক অথবা পুরোপুরি মাতলামীর সৃষ্টি করে, মাত্রাতিরিক্তি যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে ব্যভিচারে প্ররোচিত করে, স্বভাবে হিংস্রতা এনে গালিগালাজ, মারামারি বা দাংগা-ফাসাদের উস্কানি দেয়, এমনকি মাত্রারিরিক্ত সেবন করলে সেবনকারীর মৃত্যু ঘটে। মাদকাসক্তি একটি Social bad। এটি এমন এক সামাজিক ব্যাধি যা মহামারী আকার ধারণ করতে খুব একটা সময় লাগে না। মদ, গাজা, ভাং, আফিম, তাড়ি, হেরোইন, মরফিন, কোডেইন, পেথিড্রিন, ভেলিয়াম, সোনারিল, মেনড্রেকস, সিডাকসিন, পলিটামিন, এলএসডি, মারিজুয়ানা, হাশিশ, ফেনসিডিল, চরস, কোকেন, হেম্প, ব্রাউন সুগার, স্মার্ক, ইয়াবা,[৯৮] ঝাক্কি, এক্স এল মুড, আইসপিল, আইস ডবি- উ ওয়াই, এক্সাইটমেন্ট, এক্সটাসি, মেথামফেটাসিন, এলকোহল, ক্যানাবিস, মেসকালিন, সাইলেসোইবিন, এমডিএমএ, ক্যাফিন, মৃতসঞ্জিবনী শূরা এবং অনুরূপ দেশী-বিদেশী বস্তু মাদক দ্রব্য ও আওতাভুক্ত। এ সবকটিই হারাম। তাই এসব ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থোপার্জনও হারাম। মহানবী (স.) মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এমনকি অমুসলিমদের সাথেও এ ব্যবসা জায়েয নয়। কাজেই মদের বা মাদক-দ্রব্যের আমদানি বা রপ্তানি পর্যায়ের ব্যবসা করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। মদের দোকানে চাকরি করাও সমানভাবে নিষিদ্ধ। এ কারণেই মহানবী (স.) মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষন করেছেন।

---

৯৮. ইয়াবা এ সময়ের এক আলোচিত টেবলেটের নাম। এ এক মারাত্মক মাদক। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ‘ড্রাগস ইনফরমেশন’ এর ওয়েবসাইটে বলা হয় ইয়াবা নামক মাদকটি হেরোইনের চেয়েও ভয়াবহ। ইয়াবা সেবন করলে শরীরে সাময়িকভাবে উদ্দীপনা বেড়ে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে কমতে থাকে জীবনী শক্তি। নিয়মিত ইয়াবা সেবনকারীদের মস্তিষ্ক বিকৃতি, মস্তিষ্ক রক্তক্ষরণ, হৃদরোগ, ক্ষুধামন্দা, নিদ্রাহীনতা ও খিচুনী দেখা দেয়। ইয়াবায় মেথামফিটাসিন এমপিটাসিন রয়েছে যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। ইয়াবা থাইল্যান্ড-মায়ানমার সীমান্তে উৎপাদন ও তৈরী হয়। নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে থাইল্যান্ডে এই মাদকটি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের বড় একটা অংশ এ মরণ নেশায় জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে সেনাবাহিনীকে অভিযানে নামানো হয়। মিয়ানমার সীমান্তে মাদ ব্যবসায়ীদের সাথে থাই সেনাদের বন্দুক যুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছে। ২০০৪ সালে থাইল্যান্ডের তখনকার প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা ইয়াবা মাদককে তাঁর দেশের নিরাপত্তার প্রধান হুমকি হিসেবে ঘোষণা করেন। এক পর্যায়ে ‘ক্রস ফায়ারের’ মত চরম ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। থাইল্যান্ডের গণমাধ্যমের হিসাব অনুযায়ী ৪৯০০ (চার হাজার নয়শত) মাদক ব্যবসায়ী ও ইয়াবা বিক্রেতা-সেবীকে ক্রস ফায়ারে দেওয়া হয়। ১০টার বেশি ইয়াবা যার কাছে পাওয়া যেতো তাকেই বিক্রেতা হিসেবে গণ্য করা হতো। থাইল্যান্ড সরকার এ রকম কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার পর ইয়াবা ব্যাপকহারে বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। এই নেশায় আসক্তদের উপর পরিচালিত গবেষণায় জানা গেছে এটা সেবনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যৌন উত্তেজক ঔষধের মতো। তবে দীর্ঘদিন সেবনের পর যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এ কারণে দাম্পত্য সংকটের অনেক নজীরও আছে। (বিস্তারিত জানার জন্য প্রথম আলো, ২৫ অক্টোবর ২০০৭ সংখ্যা, পৃ. ১-১৩ দ্রষ্টব্য)

Dhaka University Institutional Repository

মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ী ও মদ্যপায়ী ফাসিক ও অভিশপ্ত। সকল প্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে মাদকদ্রব্য। মাদক আর ঈমান একত্রিত হতে পারে না। তিরমিযি শরীফের হাদীসে আছে ১. মদের নির্যাস বেরকারী, ২. প্রস্তুতকারক, ৩. পানকারী, ৪. পরিবেশনকারী, ৫. আমদানিকারক, ৬. যার জন্য আমদানি করা হয়, ৭. বিক্রেতা, ৮. ক্রেতা, ৯. সরবরাহকারী, ১০. লভ্যাংশ ভোগকারী- মদের সাথে সংশ্লিষ্ট এ দশ শ্রেণীর লোকের উপর মহানবী (স.) লানত করেছেন।[৯৯]

সূরা আল আয়েদার ৯০নং আয়াতে মদ হারাম করা হয়েছে। এ আয়াতটি যখন নাজিল হয় তখন মহানবী (স.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মদ পান হারাম করেছেন। কাজেই সেই এ হুমুক জানতে পারবে তার কাছে তার কিছু পরিমাণ থাকলেও তা পানও করতে পারবে না, তা বিক্রিও করবে না।[১০০] হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় যার কাছে মদ মজুদ ছিল, তারা সকলেই তা মদীনার রাস্তায় প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন।

মদ পানের সব পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, কোন মুসলমান যেন এমন কোন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রি না করে, যার সম্পর্কে জানা যাবে যে, সে এর দ্বারা মদ তৈরি করবে। হাদীসে বলা হয়েছে, যে লোক গাছ থেকে আঙ্গুর তুলে রাখাই করবে ইহূদী, খৃষ্টান বা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে যে তা থেকে মদ তৈরী করবে, তাহলে সে জেনে শুনেই আগুনে ঝাপ দিল।[১০১]

মদ বিক্রয় করা ও এ থেকে উপার্জন করে ভক্ষণ করাই মুসলমানদের জন্যে হারাম নয়, কোন মুসলিম ব্যক্তিই তা কিনে কোন অমুসলিমকে উপহার স্বরূপ দেওয়া, সম্পূর্ণ হারাম। তার জন্যও মাদকদ্রব্য উপঢৌকন হিসেবে আসতে পারে না। কেননা মুসলিমগণ পবিত্র। একজন মুসলিম পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু উপঢৌকন হিসেবে কাউকে দিতেও পারে না, সে নিজেও গ্রহণ করতে পারে না।

এক ব্যক্তি মহানবী (স.)-এর খেদমতে হাদিয়া হিসেবে মদ পেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মহানবী (স.) তা জানতে পেরে তাকে বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করেছেন। তখন লোকটি বলল আমি তা বিক্রি করে দেই। মহানবী (স.) বললেন, আল্লাহ তা পান করার যেমন হারাম করেছেন, তেমনি বিক্রি করাও। লোকটি বলল তাহলে কোন ইহূদীকে তোহফা হিসেবে দিয়ে দেই। মহানবী (স.) বললেন, যিনি তা পান করা হারাম করেছেন তিনিই তা কোন ইহূদীকে তোহফাস্বরূপ দেয়াও হারাম করেছেন। তখন লোকটি বলল, তাহলে আমি তা দিয়ে কি করবো। মহানবী (স.) বললেন, মদীনার রাস্তায় তা প্রবাহিত কর।

---

৯৯. হাদীসটি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, [বিস্তারিত দ্র : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামে' আত-তিরমিযী*, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং- ১২৯৫

১০০. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ্*, বাবু তাহরীমু বাই'উল খামার ..., বৈরুত: দারুল আওফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি.

১০১. তাবারানী

Dhaka University Institutional Repository

জুয়া : বিনিময় না দিয়ে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার অন্যতম পন্থা হচ্ছে জুয়া। জুয়ার কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে মাইসির। জুয়া হল অর্থ-সম্পদ লেনদেনের এমন এক প্রক্রিয়া যা হারজিতের উপর নির্ভরশীল, যা দ্বারা দু'পক্ষের এক পক্ষ সমূলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর অপরপক্ষ কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই প্রথম পক্ষের অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। আর এক পক্ষের লাভ অন্য পক্ষের ক্ষতির উপর নির্ভরশীল। ফলে এক পক্ষ জিতলে লাভবান হয় আর অপর পক্ষ পরাজিত হয়ে বা হেরে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হয়। তাই জুয়া ধাপ্পাবাজীর উপর নির্ভরশীল। জুয়া ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। জুয়া হারাম। জুয়ার বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে। সকল প্রকার জুয়াই সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের জন্য মারাত্মক ধ্বংসাত্মক পরিণাম বয়ে আনে। জুয়া দ্বারা যে সব সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি দেখা দেয় তা নিম্নরূপঃ

১. জুয়ার দানে হারতে হারতে অনেক বিত্তবান ব্যক্তি সর্বস্ব হারিয়ে পথের ফকীর হয়ে যায়। সচ্ছল পরিবার সর্বহারায় পরিণত হয়।

২. জুয়াড়ী সর্বস্ব হারানোর পর কুল-কিনারা না পেয়ে চুরি-ডাকাতি-মাস্তানীর ন্যায় জঘন্য কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে।

৩. জুয়ায় পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ, আত্মকলহ, সন্ত্রাস ও হত্যার ন্যায় জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়।

৪. জুয়া পারস্পরিক সম্প্রীতি, সংবেদনশীলতা, ভদ্রতা ও ন্যায় পরায়ণতাকে ধ্বংস করে। জুয়াড়ীর অন্তরে মনুষ্যত্ববোধ, অন্যের কল্যাণকামিতার মনোভঙ্গী আর থাকে না।

৫. জায়াড়ীর অন্তরে অন্যের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হবার মনোবৃত্তি আগ্রত হয়।

৬. জুয়ায় হেরে যাওয়া ব্যক্তি মানসিক টেনশনের কারণে বিভিন্ন ধরনের দূরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়।

৭. জুয়ায় অংশ নিয়ে সম্পদ পেয়ে যাবার আশায় আশায় জুয়াড়ী শ্রম ও মেহনত বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যে কারণে শ্রম দিয়ে কষ্ট করে উপার্জনের মানসিকতা লোপ পায় এবং সে তার মেধাকেও উপার্জনের কাজে ব্যয় করে না। ফলে এদের শ্রম ও মেধা থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হয়।

৮. জুয়া খেলতে খেলতে প্রচুর সময়ের অপচয় হয়, যা কাজে লাগালে একজন অনায়াসেই স্বাভাবিক জীবন নির্বাহের জন্য উপার্জন করতে সক্ষম হত।

৯. জুয়া মানুষের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়।

১০. জুয়াড়ীগণ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়। জুয়া তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

কার্যত: জুয়া মানুষের ক্ষতি ছাড়া উপকারে আসে না।

জুয়ার উপরোল্লিত ক্ষতির দিকগুলো চিন্তা করেই ইসলাম জুয়ার যাবতীয় প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন বলছে- "হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (তোমরা জেনে রেখো) মদ,

Dhaka University Institutional Repository

জুয়া, পূজার দেবী ও ভাগ্যনির্ধারক শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা (সম্পূর্ণরূপে) বর্জন করো। আশা করা যায়, তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।"[১০২]

এ আয়াতের আলোকে জুয়া এবং এমন সব পন্থা, যেসবের মাধ্যমে কিছু লোকের অর্থ অন্যদের হাতে কেবল ভাগ্য বা ঘটনা চক্রের মাধ্যমে চলে যায়, তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

১০. অশ্লীলতা প্রসারকারী উপায় উপকরণের ব্যবসা

চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসা- যেসব উপকরণ কোন নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে কিংবা সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছাড়ায়; এ ধরনের সমূদয় পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং এর মাধ্যমে উপার্জন ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। যেমন- সিনেমার অশ্লীল ফিল্ম, অশ্লীল পর্ণো বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা, নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন ছবি সম্বলিত প্রচারপত্র ও পোষ্টার, যা দ্বারা নগ্নতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটে, অশ্লীল নাচ-গান সম্পর্কিত সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি বিক্রির মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ এই মর্মে কুরআন মাজীদ ইরশাদ করেছেন- "যারা মুমিনদের মাঝে (মিছে অপবাদ রটনা করে) অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি।"[১০৩]

ইসলামের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পাস্তিানের ২৪ বছরের শাসনামলে অবাধে বঙ্গবন্ধই প্রথম আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান জারী করেন।[১০৪]

১১. ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধকরণ

পাকিস্তানি আমলে ঢাকার বর্তমানে সোহরওয়ার্দী উদ্যানের নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান। এখানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার নামে চলতো জুয়া হাউজি ও বাজিধরা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বাজিতে হেরে অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যেতো। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌগ প্রতিযোগিতা বন্ধ করেন এবং রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন কর রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। আমাদের প্রিয়নবী (স.) বৃক্ষ রোপণের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন 'যদি মনে কর আগামীকাল কিয়ামত হবে, তবুও আজ একটি বৃক্ষের চারা রোপন কর।' মহানবী (স.) এর এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে রেসকোর্স মযদানের অনৈসলামিক কর্মকান্ডের স্মৃতি চিহ্ন মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে বৃক্ষ রোপণ করে সেই স্থানের নাম রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। ঢাকা মহানগরীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বৃক্ষরাজী বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বহন করে চলেছে।[১০৫]

---

১০২. আল-কুরআন, ৫ : ৯০
১০৩. আল-কুরআন, ২৪ : ১৯
১০৪. সৈয়দ আলী আহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
১০৫. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

১২. রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা

রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি কমিউনিস্ট দেশ। সেদেশে বিদেশ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য কেউ অনুমতি পেত না। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়া সহযোগিতা করায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সেদেশের নেতৃবৃন্দের একটি সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতার পর প্রথম রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়নে তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে পূর্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে তাবলীগ জামাতের যেসব দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ তার ভিত্তি রচনা করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[১০৬]

১৩. আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরব বিশ্বও পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন করেন এবং এই যুদ্ধে বাংলাদেশ তার সীমিত সাধ্যের সর্বোচ্চ অবদান রাখার চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লক্ষ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করা হয়।[১০৭]

১৪. মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সমকালীন বিশ্বের অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুষ্টিমেয় ক'জন রাষ্ট্রনায়কের একজন। জীবনে শত জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন, এমনকি ফাঁসিকাষ্ঠের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও তিনি কারো নিকট মাথা নত করেননি। তাঁর আমলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও ছিলো বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সকলের প্রতি বন্ধুত্বের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে তিনি জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন। জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন, ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ বৈঠক কিংবা অন্য কোন আন্তর্জাতিক ফোরাম বা দেশ যেখানেই বঙ্গবন্ধু গেছেন, তিনি তাঁর জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষায় যে ঐতিহাসিক ভাষণদান করেন, তাতে তিনি আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলেন:

'বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করিযাছে। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে আমাদেরকে সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা

---

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১০৭. মুহাম্মদ আখতার ফারুক, "আরব ইসরাঈল সম্পর্ক ও বঙ্গবন্ধু", *অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট ২০১০, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই জন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা তথা বিশ্বের যে কোন অংশে যে কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই।'[১০৮]

তার আগে ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের ভাষণে পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন: 'আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতা আমরা আলোচনা করে বা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স করে আনি নাই। সেজন্য আজ আমাদের পরিষ্কার কথা- আফ্রিকা হোক, ল্যাটিন আমেরিকা হোক, আরব দেশ হোক যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, সেখানে মানুষ দুঃখী, যেখানে মানুষ সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা নির্যাতিত, আমরা বাংলার মানুষ সেই দুঃখী মানুষের সাথে আছি এবং থাকবো। আমাদের নীতির পরিবর্তন হবে না।[১০৯]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর এসব ঘোষণা সারা বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি করে। মুসলিম বিশ্বসহ সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জোয়ার বয়ে যায়। চীন, পাকিস্তান ও দুই-একটি আরব দেশ ছাড়া এ সময়ে বিশ্বের প্রায় সব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। আওয়ামী লীগের উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন: 'আমরা আজ গর্বিত যে মধ্যপ্রাচ্যে আমরা আরব ভাইদের এবং প্যালেস্টাইনী ভাইদের পাশে রয়েছি। ইসরাইলীরা তাদের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। ইসরাইলীরা জাতিসংঘের প্রস্তাব মানে নাই। তারা দখল করে বসে আছে আরবদের ভূমি। আরব ভাইদের এ কথা বলে দেবার চাই এবং তারা প্রমাণ পেয়েছে যে, বাংলার মানুষ তাদের পিছনে রয়েছে। আরব ভাইদের ন্যায্য দাবির পক্ষে রয়েছে। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করবো।'[১১০]

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে বলেন: 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার মর্যাদার নিজস্ব আসনটি দখল করেছে। অটোয়ার কমনওয়েলথ এবং আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্মানিত সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশকে গ্রহণ করে অধিকাংশ আরব দেশ আফ্রিকার দেশ তার সার্বভৌমত্বের প্রতি স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শন করে। আরব দেশগুলোর মধ্যে মিসর, ইরাক, মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, কুয়েত, ইয়েমেন, লেবানন, সিরিয়া, সুদান ও জর্দার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সম্প্রতি আরব-ইসরাইল যুদ্ধেও বাংলাদেশ আরব দেশগুলোর দিকে সংগ্রামী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে আরব দেশগুলোর জনসাধারণ বাংলাদেশকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে।'[১১১]

---

১০৮. মওলানা আবদুল আউয়াল, *বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যোবোধ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ২৬
১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১১০. প্রাগুক্ত।
১১১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণেও বঙ্গবন্ধু প্যালেস্টাইনী আরব ভাইদের সমর্থনের কথা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'বিশ্বের বহু অংশে এখনও অবিচার ও নিপীড়ন চলিতেছে। অবৈধ দখলকৃত ভূখন্ড পুরাপুরি মুক্ত করার জন্য আমাদের আরব ভাইদের সংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে এবং প্যালেস্টাইনী জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকার এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নাই।'[১১২]

বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে আরব বিশ্ব, বিশেষ করে প্যালেস্টাইনী ভাইদের প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন অব্যাহত রাখেন। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় তিনি একটি মেডিক্যাল মিশন, চা প্রভৃতি সাহায্য দ্রব্য পাঠান। তাতে করে আরব বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[১১৩] এই ঘনিষ্ঠতা ছিল সমতার ভিত্তিতে। তাদের নিকট আমাদের পরিচয় ছিলো একটি মর্যাদাবান ও সংগ্রামী জাতি হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে আরব দেশগুলোর চাপেই পাকিস্তান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এটা ছিলো আরব বিশ্বে সম্মেলন পররাষ্ট্রনীতির এক বিরাট সফলতা। ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে ওআইসি'র একটি শুভেচ্ছা মিশন বঙ্গবন্ধুকে সম্মেলনে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের ব্যক্তিগত বিমান পাঠান। ১৯৭৪ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। লাহোরে তাঁকে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানান। এই ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে প্যালেস্টাইনী আরব ভাইদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। ভাষণের মাঝে মাঝে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা বিপুল করতালির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দিত করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পাকিস্তান বেতার সম্মেলন কক্ষ থেকে সরাসরি প্রচার করে। সম্মেলনে ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু বলেন:

> মানুষ এখন বস্তুগত দিক থেকে বৃহত্তর শক্তি অর্জন করেছে, যা সে আর 'কখনো পারে নি। সে পৃথিবীরেক ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আমরা যুদ্ধের জন্য শক্তি অপব্যবহার করতে দেখেছি, জনগণকে নিপীড়ন করতে দেখেছি। আমরা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অস্বীকার করতে দেখেছি। অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে তাদের ঠেলে দিতেও দেখেছি। আর এসব অকথ্য যাতনার চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে আছেন আমাদের প্যালেস্টাইনী ভায়েরা। আর এজন্যই অতীতের তুলনায় আজ এই শক্তিকে প্রজ্ঞার সাথে কাজে লাগানোর প্রয়োজন বেশি। ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি, দুর্ভোগ নয় মানুষের কল্যাণে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মহানবীর প্রচারিত মানবপ্রেম ও মানবমর্যাদার শাশ্বত মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি, তা থেকে বর্তমানকালের সমস্যা সমাধানে মুসলিম জনসাধারণ সুস্পষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এসব মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শান্তি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আমরা একটি নতুন আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারি। এই সম্মেলন শুধু আরব ভাইদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে আমাদের ঐক্য সংহত করার জন্যই নয়, বরং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে এবং সারাবিশ্বের শান্তি ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর সাথে আমাদের একাত্মতা ঘোষণার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতার উপর জোর দিতে হবে। আরব ভাইদের উপর যে নিদারুণ অবিচার হয়েছে অবশ্যই তার অবসান ঘটাতে হবে।

---

১১২. মুহাম্মদ আখতার ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯
১১৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

> অন্যায়ভাবে দখলকৃত আরব ভূমি অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে জেরুজালেমের উপর। আল্লাহর কৃপায় আমরা এখন আমাদের সম্পদ ও শক্তি এমনভাবে সুসংহত করতে পারি, যাতে আমাদের সকলের জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচার অর্জন করা যায়। এই সাফল্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সকল যৌথ প্রচেষ্টা সফল করুন।'[১১৪]

লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ সারা আরব বিশ্বে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। কারণ তাঁর এই ভাষণটি গতানুগতিক ছিল না, সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ছিলো। তিনি তাঁর ভাষণে প্যালেস্টাইনী ভাইদের অধিকার আদায়ের প্রতি যেমন জোর দিয়েছেন তেমনি মহানবীর আদর্শ বা সত্যিকার ইসলামী মূল্যাবোধকে বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন। বিশ্বের সকল নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তাতে করে তিনি ওআইসিকে পরাশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে সত্যিকার মানব কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুকে কোন আরব রাষ্ট্রপ্রধানের অনুগ্রহভাজন হওয়ার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে বার বার দৌড়ে যেতে হয়নি। শীর্ষস্থানীয় আরব দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরাই বরং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সে সময়ে বাংলাদেশ সফরকারী আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে ছিলেন মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীন, লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল মুয়াম্মাদ আল-গাদ্দাফী প্রমুখ। কোন আরব রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশের কোন অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিংবা দেশের নামের আগে বিশেষ কোন শব্দ সংযোজনের প্রস্তাব করারও সাহস করেননি। বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠ এবং একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আরবরা বঙ্গবন্ধুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রদর্শন করতেন।

---

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান

বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকতা

মহান আল্লাহ বলেন, "সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতপর আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ বাতলে দেন।"[১]

এখানে মহান আল্লাহ পাক যা বলেছেন তাতে একটি বিষয় পরিস্কার যে, প্রেরিত কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষ অহেতুক অন্যায়ভাবে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। এভাবে ধর্মে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মান্ধতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অতএব যারা সাম্প্রদায়িক তারা অবশ্যই আল্লাহ্কে খণ্ডিত করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিন্যস্ত ইসলামি আদর্শ সম্পর্কে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন, ধর্মান্ধতা ধর্মহীনতার চেয়েও নিকৃষ্ট আর হাতে গোণা কয়েকজন ছাড়া স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের বুর্জোয়াদের অধিকাংশই ছিল সাম্প্রদায়িক। কারণ তারা শিক্ষিত হলেও সুশিক্ষিত ছিল না। কুরআন-হাদিসের আলোকে রাষ্ট্রপরিচালনার ইসলামিক রীতি-নীতি, জীবন-যাপন ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সাথে সম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত বিধানাবলীর সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব, কুসংস্কার, নিস্পৃহতা ও অযোগ্যতার সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ড ফিরে দাঁড়ানোকে অসম্ভব করে তুলেছিল। বঙ্গবন্ধু এসে এ অসম্ভবটিকে সম্ভব করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটিই বঙ্গবন্ধুর অন্যতম কীর্তিগুলোর একটি। যা অতীতে কোনো বাঙালি করতে পারেনি।

উপমহাদেশের মুসলমানগণ ধর্মভীরু। কিন্তু যত ধর্মভীরু তত শিক্ষিত ছিল না বলে কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা তাদেরকে ধর্মের নামে অধর্মের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা হীন রাজনীতিকরা ধর্মকে নিয়ে কী করত তা বঙ্গবন্ধুর কথায় বিধৃত করা যাক, "তারা (ধর্মব্যবসায়ীরা) বিশেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত ধর্মের নাম। আমার বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। তাই ধর্মের নামে ধোঁকা

১. আল-কুরআন, ২ : ২১৩

দেয়া যত সহজ, অন্য কিছুতে ততটা সহজ নয়। তাই ধর্মকে তারা ব্যবহার করল মানুষকে শোষণ করার অস্ত্র হিসেবে।"[২]

এ জন্যই বঙ্গবন্ধু তাদের অস্ত্রকে ভোঁতা করে দিয়ে ইসলামের প্রকৃত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত শপথে আবেদন জানিয়েছিলেন জনগণের কাছে, "আপনারা আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের সকল রকমের বাধাবিপত্তি অতিক্রমের শক্তি যেন আমি পাই।"[৩]

আল্লাহ্‌ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। তাই এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সফল হয়েছেন। "যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে।'[৪]

পৃথিবীর তাবৎ জিনিস মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা মানুষের নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হতে কেবল তারাই কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম যারা চিন্তাশীল এবং জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের শুদ্ধ করেছেন। যারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আল্লাহকে সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তায় আবদ্ধ রাখে তাদের পক্ষে সৃষ্টি হতে কল্যাণকর ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয় না। তারা ধর্মকে পণ্য ও জনগণকে বিভ্রান্ত করে আল্লাহ্‌র অভিশাপই অর্জন করে মাত্র। আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাগণ সকল পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের এরূপ করা সম্ভব নয়। যারা কুরআনের বাণী বিক্রি করে স্ত্রী-পুত্রদের আহার যোগান, নির্বাচনী খরচ সংগ্রহ করেন তারা কখনও খাঁটি ঈমানদার হতে পারে না। ধর্ম আত্মার শান্তি, পণ্য নয়। ধর্ম কল্যাণের, অকল্যাণের ছোঁয়া এতে নেই।

ধর্ম ব্যবসায়ীদের স্বরূপ ও অবস্থান বর্ণনায় আল্লাহপাক বলেছেন, "মুশরিকরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অতি নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে। অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তার পথ হতে, তারা যা করে চলছে তা অতি নিকৃষ্ট। ধর্মের নাম দিয়ে তারা সৃষ্টি করে বিবাদ।"[৫]

পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্‌ তা'আলা বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬] ধর্ম ব্যবসায়ীরা কুরআন মানে না বলে ইসলামের নামে মানুষে মানুষে বিবাদ সৃষ্টি করে। কুরআনের ঘোষণা অমান্য করে যারা ধর্মের নামে অপরাজনীতি করে, মানুষে মানুষে অহেতুক বিবাদ সৃষ্টি করে তারা পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে। যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে তারা কখনও খাঁটি মুসলমান হতে পারে না। সুতরাং কুরআন-হাদিস ও ইসলামি আদর্শে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিঃসন্দেহে হারাম।

---

২. আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *স্বাধীনতার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : (প্রকাশক মোঃ আবদুল কাদের), ১৯৯৬, পৃ. ৭৭

৩. ১৯৭০ সালের ২৫ ডিসেম্বর পাবনার পুলিশ ময়দানে আহমদ রফিকের স্মরণে আয়োজিত শোক সভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

৪. আল-কুরআন, ২৮ : ৮৪

৫. আল-কুরআন, ৯ : ৯

৬. আল-কুরআন, ৮ : ৪৬

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রতিটি ভাষণে প্রতিক্রিয়াশীল বক-ধার্মিক ও জনশোষক মুনাফিকদের দুরভিসন্ধির কথা তুলে ধরেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।"[৭]

ধর্মব্যবসায়ী পাষণ্ডরা মিষ্টি কথার মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দেয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাদের ক্ষতি হতে প্রকৃত মুমিনদের সতর্ক করে দিয়েছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এমন কি পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেও দেশে যত আপদ এসেছে, যত দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হয়েছে সব অকল্যাণের প্রতিভু ও খোদার দুশমন ধর্মব্যবসায়ী মুনাফিকদের কারণে সৃষ্ট। তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশকে বিরান ভূমিতে পরিণত করে দিয়েছিল। পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় শস্যক্ষেত্র, ভবন ও শত শত বুদ্ধিজীবীর প্রাণনাশ করেছে। তারা সাম্প্রদায়িক বলে এমন জঘন্য কাজ করতে পেরেছে। তাই আল্লাহ্ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন, "নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমর্পিত।[৮]

এ আয়াতটি এটিই ঘোষণা করে যে, যারা ধর্মের নামে রাজনীতির নামে ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোনো সম্পর্ক নেই।

সুরা আল ইমরানে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন, "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজে নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে।"[৯]

উম্মত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এখানে পরিষ্কার। যারা মানব জাতির কল্যাণের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতার নামে মানবজাতির অকল্যাণ ঘটায়, ধর্মের নামে অধর্মের কাজ করে মানুষকে অসৎ কাজে প্রবৃত্ত করে তারা নিকৃষ্ট। আল্লাহ্র কাছে মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন। সৃষ্টিকর্তা যে মানুষকে এত সম্মানে বিভূষিত করেছেন সে মানুষকে যদি কেউ ক্ষমতার নামে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আলয়ে কিংবা ধর্মের বাহানায় অসম্মান করে সে ইসলামের শত্রু ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙালিরা যখন পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত হয়ে ধর্ম ও দেশ রক্ষার খাতিরে আন্দোলন শুরু করেছিল তখন অত্যাচারী শাসকদের পদলেহনকারী বক-ধার্মিকরা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।

মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি। একজন নেতা জনমানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রতিভু। নেতার কাজ তার অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকার সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা এবং সম্পদের সুষমবণ্টনের

৭. আল-কুরআন, ২ : ২০৪-২০৫
৮. আল-কুরআন, ৬ : ১৫৯
৯. আল-কুরআন, ৩ : ১১০

মাধ্যমে অর্থনীতিক শোষণ হতে মানুষকে মুক্ত করা। আইনের বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের নিরাপত্তা বিধান নেতার কাজ। কেউ ধর্ম বা অন্য কোন অজুহাতে জনগণের এ অধিকার বঞ্চিত করলে সে আল্লাহ্‌র কাছে জুলুমবাজ। পাক কুরআনে তাদেরকে আল্লাহ্‌ চরম পাপী, অবিশ্বাসী ও মুনাফিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে যারা সমাজে অন্যায়-অবিচার ও সাম্প্রদায়িক কলহ টিকিয়ে রাখে তারা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্যকারী। তাই বঙ্গবন্ধু তাঁর ঈমানি শক্তির তেজস্বিতায় জনগণকে এদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, "দরকার যদি হয়, আমি আমার বাংলার মানুষকে ডাক দিয়ে অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করব। কিন্তু বেঈমানের কাছে মাথা নত করব না।"[১০]

"দুঃখী বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনবোধে জীবন দান করতে পারি। তবু ধর্মব্যবসায়ী সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে অপকর্ম করতে দেব না।"[১১]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, "ইহুদিরা বলে খ্রিস্টানেরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রিস্টানেরা বলে ইহুদিরা কোন ভিত্তির উপরই নয় অথচ ওরা সবাই কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ তারাও ওদের মতই উক্তি করে ...।"[১২] ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ভণ্ডামীপূর্ণ রাজনীতিক দলগুলোতে এ ধরনের উক্তি অহরহ। আল্লাহ্‌ তা'আলা এদেরকে মূর্খ বলে ভর্ৎসনা করেছেন। সুতরাং বঙ্গবন্ধু ইসলামি আক্বিদায় অবিচল থেকে ধর্মবাজ মুনাফিক ও অজ্ঞদের সাথে সংগ্রাম করে জাতিকে মহা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

মহানবীর (স.) সাথে ইহুদিরা যেমন আচরণ করবে পাকশাসক ও তাদের দোসররা বাংলার সাধারণ মানুষের সাথে তদ্রুপ আচরণ করত। এখন এ কাজ করছে ধর্মের আড়ালে অধর্মের ব্যবসাকারী স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। আল্লাহ্‌ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন, "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা যদি নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারও প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম তাদের ব্যাপার আলাদা।[১৩]

ইসলাম, ইসলামি দর্শন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর মতো এত পরিচ্ছন্ন ধারণা উপমহাদেশে আর কোনো মুসলমান নেতার ছিল না। ইসলামি শাসননীতি অনুসারে সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রনীতির সর্বোত্তম পদ্ধতি। ইসলাম সম্পদের সুষম বণ্টনে জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক দলগুলো বরাবরই ইসলামি আদর্শের বিপরীতে অবস্থান করে গরিবদের শোষণ করে সম্পদকে গুটিকয়েকের পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রিভূত করে রাখার কাজে উৎসাহ দিয়ে যেত। কারণ এরা ছিল শোষক পুঁজিপতিদের ভাঁড়াটে মুখপাত্র। বঙ্গবন্ধুর সম্পদের সুষম বণ্টনে

১০. ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মহান মে দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।
১১. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি নবগঠিত পটুয়াখালী জেলার সদর দফতরে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণ।
১২. আল-কুরআন, ২ : ১১৩
১৩. আল-কুরআন, ২ : ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আদর্শকে প্রতিফলিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি পাকিস্তানের আইন পরিষদে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণে এর স্বরূপ ফুটে ওঠে, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছিলেন-

> It is clearly said by Islam that there should be equal distribution of wealth... Work on the principles of Islam. Establish Islamic principles and philosophy and then speak about Islam. This is absolutely a mockery of Islam and democracy. Here the chaprasi is getting Rs. 45 per month while the head of the state gets 1000 rupees per month. Is this Islamic state? What our Khalifas took in the Islamic state; what was the expenditure of our khalifas; what Hazrat Muhammad (SM) took from the public exchequer? He did not spend a single penny from the state funds.[১৪]

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জানতেন, দুর্বল ও অত্যাচারিতের প্রতি অবহেলা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার জুলুমের নামান্তর। সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ ছাড়া কেউ এমন কাজ করতে পারে না। যারা অত্যাচারী এবং অন্যের অত্যাচার দেখে প্রতিরোধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিশ্চুপ থাকে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুল (দ.) তাদের পছন্দ করেন না। অত্যাচার সহ্যকারী কিংবা অত্যাচারিতের করুণ আর্তনাদ শুনেও নির্লিপ্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে অত্যাচারীদেরকে নির্যাতন হতে মুক্ত করা প্রত্যেক মুমিনের পবিত্র দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে এ পবিত্র দায়িত্বটি সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্‌র পথে নিপীড়িতদের জন্য তোমরা কেন সংগ্রাম করবে না? দুর্বল, অত্যাচারিত নরনারী আজ ক্রন্দন করছে। হে আল্লাহ্ জালিমদের এই ভয়ঙ্কর দেশ হতে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।"[১৫]

পাকিস্তানি শাসক ও দালালদের কর্মকাণ্ডের সাথে কুরআনের এ আয়াতের মিল লক্ষণীয়। অত্যাচারীর অত্যাচার বঙ্গবন্ধুকে বিপুল প্রেরণায় কুরআনের এ আয়াতটির কথা স্মরণ করিয়ে দিত। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন নির্যাতিত মানবতার সেবায়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকর করেছেন। যারা পাকিস্তানি শোষণের পক্ষে অবস্থান নিয়ে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে তারা পক্ষান্তরে ইসলামি আদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "যে সব শোষকদের কারণে বাংলার মানুষ গৃহহারা হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এসব শোষকের সাথে কোনো আপোস নেই।"[১৬]

ধর্মের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা বিভেদ ও কলহ সৃষ্টি করে তাদের শোষণকে নিরাপদ করে তুলতে চেয়েছিল। এদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মুজিবকে থামানো না গেলে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উগ্রতার মাধ্যমে সঞ্চিত বিপুল

---

১৪. সৈয়দ আবির, *ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৫৩-৫৪
১৫. আল-কুরআন, ৪ : ৭৫
১৬. সৈয়দ আবির, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ মুজিব টেনে বের করে জনগণের মাঝে বিলিয়ে দেবেন। তাই তারা সহজ উপায় হিসেবে ধর্মভীরু জনগণের মাঝে অপবাদ ছড়াতে শুরু করে, 'মুজিব ইসলাম বিদ্বেষী, ভারতপন্থী।' এর জবাবে বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ দূরদর্শী জবাব, æMy friends call me a Communist. I cannot understand how they call me a Communist. I am a Mussalman".[১৭] এখানে বন্ধুরা বলতে কক্সবাজারের ফরিদ আহমদ এবং তার মতানুসারী রাজনীতিবিদদের বোঝানো হয়েছে। কারণ তারাই বঙ্গবন্ধুকে কমিউনিস্ট বলত।

অত্যাচারিত মুসলমান আর নির্যাতিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো প্রত্যেক বিশ্বাসী মানুষের কর্তব্য। যে মানুষের অন্তরে বিন্দুমাত্র ধর্মপ্রীতি ও মানবতা অবশিষ্ট থাকে সে কখনও কোনো মানুষকে অত্যাচার করতে পারে না। শুধু তাই নয়, যদি কেউ অত্যাচারীর কার্যকলাপ প্রতিহত করার চেষ্টা না করে তাহলে সে নিজেও অত্যাচারী। অতএব যে রাজনীতি মানুষের অকল্যাণ করে, ধর্মের নামে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে অপমানিত করে তা কোনভাবে আল্লাহ্‌র বিধান নয়। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে বলেন- "লোকেরা নিজেদের মন-অন্তর পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামষ্টিক অবস্থার পরিবর্তন করবেন না।"[১৮]

কুরআন হাদিসের প্রকৃত নির্দেশনা জ্ঞাত করিয়ে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও শোষকদের বিরুদ্ধে মানুষে মন-অন্তর পরিবর্তন করে বাংলাদেশের সামষ্টিক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য বঙ্গবন্ধু রাজনীতি শুরু করেছিলেন।

এক সময় ধর্মভিত্তিক রাজনীতিবিদ ও তাদের দোসরেরা ইংরেজি শিক্ষাকে হারাম বলে ফতোয়া জারি করেছিল। তাদের ফতোয়া ছিল সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ অগ্রসর চিন্তাবিদদের চেষ্টায় মুসলমান সম্প্রদায় আস্তে আস্তে ধর্ম ব্যবসায়ীদের দুরভিসন্ধি ধরে ফেলে। এখন ইংরেজি শিক্ষা পাপ এমন কথা কেউ বলে না। এক সময় এরা মেয়েদের লেখাপড়াকেও হারাম বলেছে। এখন আর বলে না- মেয়ে পড়ানো হারাম। তার মানে তারা ধর্মের নামে আগে যা বলেছিল তা মিথ্যা ছিল। সংগত কারণে এখন যা বলছে তাও মিথ্যা। অতএব সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকেরা শুধু মুনাফিক নয় মিথ্যাবাদীও বটে। অবশ্য মুনাফিক মাত্রই মিথ্যাবাদী। তাই আল্লাহ্ সাম্প্রদায়িকতাকে হারাম করে দিয়েছেন।

সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার লোকজন আল্লাহ্‌র কালাম ও ধর্মকে নিজেদের সুবিধামত ব্যাখ্যা করে প্রচার করে। স্বার্থ পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের মনগড়া ব্যাখ্যাও পরিবর্তন হয়ে যায়। তাদের বিকারগ্রস্ত লোভের কাছে ধর্মভীরু জনগণ অহরহ প্রতারিত হচ্ছে। এদের শঠতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডই মানব জাতির অকল্যাণ ও ধর্মের প্রতি মানুষের অনীহার কারণ। বঙ্গবন্ধু এদের বিরুদ্ধে এমন সময় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন যখন রাজনীতি করা, দাবি আদায়ের আন্দোলন করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, "সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস, সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি; যখন মানুষ আমাদের একটু স্থান দিত না, কারও বাড়িতে জায়গা পাওয়া

১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. আল-কুরআন, ১৩ : ১১

Dhaka University Institutional Repository

যেত না, আত্মীয়স্বজন ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না। সে যুগে, ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যারা এদেশে বিরোধি দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তাঁদের কথা যদি স্মরণ না করি তবে অন্যায় হবে।"[১৯]

যুগে যুগে সত্যবাণী প্রচারকদের এরূপ অসহায় অবস্থা হতে উত্তরণ হতে হয়েছে। আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে অকল্যাণ ও নির্যাতনের যত পথ-মত আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।"[২০]

যারা সাম্প্রদায়িক তারাই ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করে। অতএব তারা নরহত্যাকারীর চেয়েও জঘন্য পাপী। একজন হত্যাকারীর চেয়ে একজন সাম্প্রদায়িক চরিত্রের লোক সমাজের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণীতে তাদেরকে হত্যাকারীর চেয়েও ভয়ঙ্কর চিহ্নিত করা হয়েছে।

পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মে সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধ কিন্তু ইসলাম ধর্মে তার চেয়েও বেশি। কারণ মানবতার ধর্ম ইসলামে সাম্প্রদায়িকতা বিষতুল্য। এ জন্য আল্লাহপাক মুসলমানদের সর্বোচ্চমাত্রায় নিরপেক্ষ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি– যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।"[২১]

যারা আল্লাহ্‌পাকের এত স্নিগ্ধ প্রত্যাশাকে সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে বিনষ্ট করে দেয় তারা কোনো অবস্থাতেই ঈমানদার হতে পারে না। সুতরাং আল কুরআনের নির্দেশনা মতে সাম্প্রদায়িকতা পুরোপুরি হারাম-এ বিষয়ে সন্দেহপোষণকারী ব্যক্তিকে পাক কালামের প্রতি সন্দেহপোষণকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এরাই অবিশ্বাসী।

বঙ্গবন্ধু : ইসলামী আদর্শ ও মানবতার বিকাশ

কেউ কেউ এ বলে বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করত, "তিনি শিশু রাষ্ট্র ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছেন।"[২২] রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় এটি তারা প্রচারও করেছে। ধর্মপ্রাণ সাধারণ লোকদের অনেকে তাদের অপপ্রচার বিশ্বাসও করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে মাওলানা ভাসানীর মত নেতাও সিআইএ প্রণীত এজেন্ডা বলে উপহাস করেছিলেন। আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন, "যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না।"[২৩]

---

১৯. ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ।
২০. আল-কুরআন, ২ : ২১৭
২১. আল-কুরআন, ২ : ১৪৩
২২. সৈয়দ আবির, *ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৫৮
২৩. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

বঙ্গবন্ধুর মত বিশাল রাজনীতিক মেধা ও ইসলামি জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি ছাড়া তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্তসমূহের যৌক্তিকতা ফলাফল না আসার পূর্ব পর্যন্ত সঠিকভাবে অনুধাবন করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ অত বিশাল জ্ঞান, মহীয়ান হৃদয়, তীক্ষ্ণ দুরদর্শিতা বাংলাদেশের আর কারও ছিল না। তাই সোহরাওয়ার্দী কিংবা শেরে বাংলার মত ব্যক্তিত্বগণকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্তের জন্য ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মেধা ও মননশীলতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হত।

স্বাধীনতা বিরোধী ও ধর্মব্যবসায়ীদের ভাষ্য ছিল, "পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ অন্যদিকে নিরীহ জনগণের উপর স্বৈরশাসকের অত্যাচার জিহাদ।"[২৪] শাসকদের ভাড়াটে কিছু লোক ইসলামের নাম দিয়ে বিষয়টির ব্যাপক প্রচার শুরু করে। কিন্তু আল কুরআন বলে, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জিহাদ, অত্যাচার জিহাদ নয়, জুলুম। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে?"[২৫]

অত্যাচারকে জিহাদ আখ্যায়িত করে ধর্মবাজরা আল্লাহ্র সঠিক বাণীকে মিথ্যার আড়ালে গোপন করেছে। তারা অত্যাচারী। পাকিস্তানি শাসকেরা শুধু হত্যা করে নি, হাজার হাজার নারী ও শিশুকে ধর্ষণ করেছে, ঘরবাড়ি লুট করেছে। এরূপ অত্যাচার কি জিহাদ? তাহলে ঐ ভন্ড ধর্মবাজদের কাছে প্যালেস্টাইনি জনগণের উপর ইসরাইলি সৈন্যদের আক্রমণও তো জিহাদ। তাহলে এই চক্রই বুঝি প্যালেস্টাইনের ইহুদি চক্রের আর একটি রূপ? ধর্মের আড়ালে যারা এমন জঘন্য অত্যাচার করে, জুলুম করে, কুরআনের বিকৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্কে অপমানিত করে তারা একাধারে মিথ্যুক, মুনাফেক, জালিম; স্বভাবতই অবিশ্বাসী। পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন, হত্যা আর ধর্ষণের বিরুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ইসলামি দর্শনে অবশ্যই মর্যাদার অধিকারী।[২৬]

মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে কোন্ দলের প্রতি আল্লাহ্ ও রসুলের (স.) সমর্থন থাকে এবং কোন দলকে সাহায্য সহযোগিতা করা নিরপেক্ষদের কর্তব্য পবিত্র কুরআনে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ অবস্থায় কে দোষী এবং দায়ী ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন, "যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা (নিরপেক্ষ ব্যক্তি) তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে,

২৪. সৈয়দ আবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
২৫. আল-কুরআন, ২ : ১৪১
২৬. সৈয়দ আবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারিদেরকে পছন্দ করেন।"[২৭]

আয়াতটির মাধ্যমে পাকিস্তানের শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগের সংগ্রাম, অবশেষে বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধ ঘোষণাকে যাচাই করা যায়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ পর্যন্ত একাধারে ২৩টি বছর বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর বিভিন্ন অজুহাতে আক্রমণকারী ছিল। নিঃসন্দেহে পাকিস্তানি শাসকচক্র। পাকিস্তানি শাসক চক্র ও তাদের দোসর ধর্মান্ধ ভন্ড রাজনীতিবিদরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাংলাদেশের জনগণের উপর কলোনিয়াল অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিল। ১৯৭০-র নির্বাচনে আওয়ামীলীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী প্রতিজ্ঞাভঙ্গ (সংবিধান লংঘন) করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করার অপপ্রয়াস শুরু করে। বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ে সচেষ্ট হলে আলোচনার অজুহাতে পাকিস্তানি শাসকচক্র সময় ক্ষেপণের প্রতারণার আশ্রয়ে ২৬ মার্চ রাতে বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে আক্রমণকারী স্পষ্টতই পাকিস্তানি শাসকচক্র। অতএব যারা কুরআন বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ ও রসুলের (দ.) প্রতি ঈমান রাখেন এবং মুসলমান দাবি করেন তাদের প্রত্যেকের উপর আক্রমণকারী পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ হয়ে পড়েছিল। শুধু পাকিস্তানের মুসলমান নয়, সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য আক্রমণকারী পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আল কুরআনের নির্দেশনা মতে অবশ্যই কর্তব্য ছিল। উল্লেখ্য যুদ্ধ বলতে শুধু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা বুঝায় না, যে কোনভাবে সহযোগিতা করাও যুদ্ধের অন্তর্ভূক্ত।

যারা কুরআন ও আল্লাহ্র প্রকৃত অনুসারী, মানবতার কল্যাণে নিবেদিত তারা কিন্তু ঠিকই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আক্রমণকারী পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এটিই হচ্ছে জেহাদ, কারণ এই প্রতিরোধ আল কুরআনের নির্দেশমতে আল্লাহ্র রাহে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার জন্য করা হয়েছিল। অতএব পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা প্রত্যেকে জেহাদি। যারা করে নি বরং আক্রমণকারীদের সহায়তা করেছিল তারা যতই নিজেদের মুসলমান দাবি করুক না কেন, আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্যকারী। আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্যকারীদের স্থান জাহান্নাম। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (স.) এর প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।"[২৮]

---

২৭. আল-কুরআন, ৪৯:৯
২৮. আল-কুরআন, ৪৯:১৫

যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তারা মুমিন দাবি করতে পারে কি না এ আয়াত হতে অনুমান করে নেয়া যায়। "আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে অব্যাহতি কামনা করে না।"[২৯]

সুতরাং যে সকল ব্যক্তি কিংবা রাজনীতিক দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সহযোগিতা করেছে আল কুরআনের বর্ণনামতে তারা অবিশ্বাসী অর্থাৎ বেঈমান। ঈমান শুধু বিশ্বাসের বস্তু নয় কর্মের মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। বিশ্বাসঘাতকরা পাপী, আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করে না।"[৩০]

"যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহ্র রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, দেখবে শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।"[৩১]

যারা পাকিস্তানি শাসকদের মতো জঘন্য শয়তানদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে আল্লাহ্র আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারী আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তারা কাফের। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামীলীগ এখনও এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে আল্লাহ্র প্রকৃত দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

আল্লাহ্র নির্দেশ, "হে ঈমানদারগণ, নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়।[৩২]

কাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র এ নির্দেশ? "যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর।"[৩৩]

পাকিস্তানিরা বাঙালিদের উপর চরম জবরদস্তি করেছে। সুতরাং পাকিস্তানিদের অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা বাঙালিদের জন্য ফরজ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীতে এমন কোনো পাপ নেই যা পাকিস্তানি নরাধম শাসক ও তাদের চক্র বাঙালিদের উপর করেনি। হত্যা-ধর্ষণ হতে শুরু করে সব অপরাধ তারা ধর্মের নামে বাঙালিদের উপর করেছে। পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া যাদের আর কিছুই ছিল না। তারা সে সকল বাঙালিকে ইসলামের নামে ঠাট্টা বিদ্রুপসহ তেইশটি বছর চরম অত্যাচারে জর্জরিত করে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য বেদনাদায়ক আযাব এবং অপরাধ ক্ষমাহীন ঘোষণা করেছেন।[৩৪]

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের প্রতি শুধু আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নয়, অত্যাচারী শাসক বা ব্যক্তির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬

২৯. আল-কুরআন, ২:৪৪
৩০. আল-কুরআন, ৪:১০৭
৩১. আল-কুরআন, ৪:৭৬
৩২. আল-কুরআন, ৪:৭১
৩৩. আল-কুরআন, ২:১৪৯
৩৪. আল-কুরআন, ৯:৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর বর্বরতা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগের সংগ্রাম ও যুদ্ধ ইসলামের দৃষ্টিতে মহান এক জেহাদ।

জালিম ও মুশরিকদের ধর্মকর্ম অর্থহীন। যারা অত্যাচারী তাদের কোনো ধর্ম নেই, অত্যচার করাই তাদের ধর্ম। আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের কোনো ইবাদত কবুল হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ্‌র বর্ণনা, শুধু ঈমানদার হলে চলবে না, সৎকাজ না করা পর্যন্ত কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না। তারা যতই আল্লামা লিখুক না কেন, আল্লাহ্‌ তাদের ইবাদতকে অযোগ্য ঘোষণা করেছেন। তাদের সাথে যুদ্ধ না করা মানে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করা। আল্লাহ বলেছেন, "নবী ও মুমিনদের উচিত নয় দোযখি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কোন মুশরেকের মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হয়।"[৩৫]

এর মর্মার্থ হচ্ছে দোযখি হওয়ার উপাদানাবলী সংযুক্ত ব্যক্তিগণ পক্ষান্তরে মুশরিক। কোনো মুমিন এরূপ লোকের কল্যাণ কামনা করতে পারে না। পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসর কিংবা স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এ কাজটি করেছে। সংগত কারণে দোযখি। এরূপ দোযখিদের বিরুদ্ধে ও তাঁর জেহাদ আল্লাহ্‌র রাহে বিলীন হওয়ার বিরল সৌভাগ্য।

ধর্মের নামে অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্তদের মুখোশ উন্মোচন করে সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও তদ ভিত্তিতে শোষণহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল লক্ষ্য। ইসলামের শত্রুরাই কেবল বঙ্গবন্ধুর এ মহান উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, "যে ব্যক্তি গীবত করে সে যেন স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করে।"[৩৬]

তো সহজে অনুমেয় পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি বঙ্গবন্ধুর গীবত করে প্রতিদিন কত ভাইয়ের রক্ত খেয়েছে। যারা নিজ ভাইয়ের রক্ত খেতে দ্বিধা করে না তারা কি না করতে পারে! যারা ইসলামের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল। ইসলাম এমন একটি মহান ধর্ম যেখানে একজন নিরীহ লোককে অত্যাচার করা, এমনকি একটি নগণ্য পশুর প্রতিও অহেতুক নৃশংসতা দেখানো হারাম। যারা ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে ইসলামের নামে হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করেছিল, দুই লাখ নারীকে ধর্ষণ করে পূণ্যের আস্বাদনে পুলকিত হয়ে উঠেছিল তারা ইসলামের দৃষ্টিতে জালিম। আর যারা এহেন জঘন্য অত্যাচারীদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল তারা জালিমের সহযোগী। এরূপ অত্যাচারীদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পর্কহীনতার কথা একাধিকবার ঘোষণা করেছেন, "যারা অত্যাচারী, জুলুমবাজ, হত্যাকারী তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" আল্লাহ্‌ বলেছেন, 'যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়, এরাই আখেরাতকে অস্বীকার করে।"[৩৭]

৩৫. আল-কুরআন, ৯:১১৩
৩৬. আল-কুরআন, ৪৯:২
৩৭. আল-কুরআন, ২:১৪৯

স্বাধীনতা বিরোধি চক্র ধর্মের নামে রাজনীতির প্রহসনে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়ে পক্ষান্তরে আখেরাতকে অস্বীকার করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে।

মুনাফিকদের কীভাবে চেনা যায় এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত মুহাম্মদ (দ.) সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "মুনাফিকের পরিচয় তিন বস্তুতে, যখন কথা বলে তো মিথ্যাই বলে, প্রতিজ্ঞা করলে ভঙ্গ করে, যদি তার কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখা যায়, সে তাহা নষ্ট করে।"[৩৮]

পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি বাংলাদেশের জনগণের সাথে যতটি চুক্তি বা ওয়াদা করেছে প্রত্যেকটি প্রতারণামূলকভাবে ভঙ্গ করেছে। তারা বাংলাদেশের মানুষের ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছাড়াও কোটি কোটি টাকার সম্পদ আত্মসাৎ করে আমানত খেয়ানত করেছে। শাসক হিসেবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার হেফাজতকারী হয়েও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের জীবন ও সম্পদকে নির্বিচারে ধ্বংস করেছে।

সুতরাং পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসরেরা নিঃসন্দেহে মুনাফিক। মহান আল্লাহ্‌ মুনাফিকদের নাফরমান হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন, "মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম, শেখায় মন্দ কথা, ভালো কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ করে রাখে। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান। একই সুরার ৬৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করছেন।[৩৯]

অতএব পাকিস্তানি শাসক ও সহযোগী, যারা ধর্মের নামে বাংলাদেশের নিরীহ জনগণকে চরম কষ্ট প্রদান করেছিল তারা কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুনাফেক ও নাফরমান। তাদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ একটি জিহাদে নেতৃত্বদানকারী বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী খাঁটি ঈমানদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ (দ.) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান প্রত্যেক মুসলিমের নিকট অবশ্যই পবিত্র।"[৪০]

যারা বিশ্ব নবীর বাণীকে অবহেলা করে মানুষ হত্যা করেছে, মুসলমান হয়ে আরেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান লুণ্ঠন করেছে তারা জানোয়ার। তাদের মুসলমান দাবি কত যে অসার তার প্রমাণের জন্য বর্ণিত হাদিসটি যথেষ্ট নয় কী? পাকিস্তানি শাসকচক্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফেতনা ফ্যাসাদের মাধ্যমে নিরীহ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এ অবস্থায় বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি আন্দোলন-সংগ্রামের ডাক না দিতেন তো হত্যাকারীদের সহায়তাকারী হিসেবে নিজেই সমপাপের ভাগীদার হয়ে যেতেন।

---

৩৮. আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, *সহীহ লিল মুসলিম*, দিল্লী : মাকতাবা রশিদিয়া, ১৪০৮ হি., কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানু খিসালুল মুনাফিকি, হাদীস নং- ২২০

৩৯. আল-কুরআন, ৯:৬৭-৬৮

৪০. আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, *সহীহ লিল মুসলিম*, দিল্লী : মাকতাবা রশিদিয়া, ১৪০৮ হিজরী, বিতাবুল আদাব।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ, "তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্যাৎনা ফ্যাসাদ নিরসন না হয়।"[৪১]

একজন খাঁটি মুমিন হিসেবে পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি কর্তৃক সৃষ্ট ফ্যাৎনা ফ্যাসাদ বন্ধ না করে বঙ্গবন্ধুর ঘরে ফেরার কোন পথ খোলা ছিল না। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম আল্লাহ্র নির্দেশে আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য নিবেদিত একটি অসাধারণ প্রয়াস। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা বাংলাদেশের জনগণের জন্য কুরআনি বিবেচনায় ফরজ হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ফরজ কাজটি সম্পন্ন করে বাঙালি জাতিকে চরম পাপ হতে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাই বঙ্গবন্ধু শুধু মহান নয়, সুমহান।[৪২]

প্রখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ ডঃ এনামুল হক বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন দু'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি কেবল একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি। স্বাধীনতার অবিসংবাদিত রূপকার ও মহান ঘোষক। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম কাণ্ডারী। সেই সাথে তিনি ছিলেন পবিত্র ধর্ম ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ সেবক। সমকালীন বাংলাদেশে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।[৪৩]

হাদিসে আছে দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গস্বরূপ। আমৃত্যু বঙ্গবন্ধু ছিলেন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। দেশ এবং দেশের মানুষের জন্যে কোন ত্যাগকেই তিনি বড় করে দেখেন নি। জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় তার কেটেছে কারাগারে। দু'বার তিনি ফাঁসি কাষ্ঠের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কোন লোভ-মোহ-শংকা বা ত্রাস তাঁকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ থেকে টলাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর আজীবন স্বপ্ন ছিল সুখীসমৃদ্ধ পাপপংকিলতা ও আবিলতামুক্ত এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা যা হবে ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মদীনা রাষ্ট্রের ভাবাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহানবী (স.) তার বিখ্যাত মদীনা সনদে একটি সত্যিকার ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রূপ-রেখা দিয়েছিলেন। ইসলাম যে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে নয় এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। চৌদ্দশ' বছর আগে মহানবী (স.)-এর মতো ধর্মনিরপেক্ষতার কথা এমন করে আর কেউ বলে নি। মদীনা সনদে পরিস্কার বলা হয়েছে। "ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"[৪৪]

মহানবী (স.)-এর আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে এমনি একটি আদর্শ ও যথার্থ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। মদীনা সনদের ভাবার্থ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর মূল মন্ত্র ছিল, "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।"

---

৪১. আল-কুরআন, ৮:৩৯
৪২. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
৪৩. আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম যে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী নয়, বরং ইসলাম যে ধর্মনিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষকতা করে তার বহু দৃষ্টান্ত কুরআন ও হাদিস থেকে দেয়া যায়। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষী খালিদ এল গুয়াবা (Khalid L Guaba) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'The Prophet of The Desert' এ লিখেছিলেন, 'The God of muhammad ... is the Rab-ul-Alameen, - the God, creator, nourisher, sustaineer of all wordls and of all mankind, believers and unbelievers alike similarly the society set up by Islam is open to all persons, irrespective of distinction of colour, race or worldly goods. It is a brotherhood par excellence.'[৪৫]

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানব জাতিরই স্রষ্টা, পুষ্টিদাতা ও রক্ষাকর্তা। ইসলামী সমাজে বর্ণ, জাতি ও বিত্ত নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার। এর চেয়ে মহত্তর ভ্রাতৃত্বের চেতনা আর কী হতে পারে। আল্লাহর নবী (স.) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন তাঁর বিরুদ্ধাচারণকারীদের উদ্দেশ্যে বলতেন, "তারা যাদের উপাসনা করে তিনি তাদের উপাসনা করেন না এবং তিনি যার উপাসনা করেন তারা তার উপাসনা করে না। তিনি যেমন তার উপাসনার প্রতিফল পাবেন তেমনি তারাও তাদের উপাসনার প্রতিফল পাবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন তাদের উভয়েরই বিচারকর্তা।"[৪৬] এরকম আরো বহু দৃষ্টান্ত দেয়া যায় যা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, ইসলাম সব সময়েই ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ পোষণ ও ধারণ করে এসেছে। বঙ্গবন্ধু ইসলামের এই ধর্ম নিরপেক্ষতার চেতনা থেকেই শিক্ষা পেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বারংবার বলেছেন ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কখনোই ধর্মহীনতা নয়। পাকিস্তানের জিন্দানখানা থেকে সসম্মানে দেশে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশে তার প্রথম জনসভায় বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।"[৪৭]

বঙ্গবন্ধু গর্ব করে বলতেন, "বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। সর্ব বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়া চলে পঞ্চশীলা বা ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিতে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বলে কেবল গর্বই করতেন না, সেই হিসেবে তাকে গড়ে তোলার যাবতীয় উদ্যোগও তিনি আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছিলেন।

মহান ধর্ম ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধু যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা হচ্ছে-

ক. বঙ্গবন্ধুর সরকার মদ, জুয়াসহ সকল ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। পরবর্তী জিয়া সরকার আমলে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। বর্তমানে বছরে ২০ কোটি টাকার বেশি মদ বিদেশ থেকে আমদানী হয়। হাউজী নামক জুয়া চলছে

৪৫. Khalid L Guaba, *The Prophet of Desert* হতে উদ্ধৃত আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৪৬. আল-কুরআন, ১০৯:২-৬
৪৭. আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

প্রকাশ্যে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে মদ-জুয়া আবারো নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আনা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার তা সংখ্যাধিক্যতার জোরে নাকচ করে দেয়।

খ. ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশের মহান লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা।

গ. দ্বীনি শিক্ষার প্রসারে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা বোর্ড গঠন ও মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক সরকারি স্বীকৃতিদান।

ঘ. শবে কদর, শবে বরাত, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী ইত্যাদি ধর্মীয় পবিত্র দিন উদযাপন উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং উক্ত পবিত্র দিনগুলোতে প্রেক্ষাগৃহ চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখা।

ঙ. দরিদ্র হজ্ব যাত্রীদের জন্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা। পরবর্তীকালে কোন সরকারই এই অনুদান দিচ্ছে না বা দেয় নি।

চ. বিশ্ব তাবলীগ জামাতের জন্যে টঙ্গীতে জমিদান।

ছ. রেডিও-টেলিভিশনে পবিত্র কুরআন নিয়মিত ভাবে তিলাওয়াত প্রবর্তন।

জ. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি।

বাংলাদেশে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বিপুল অবদান রাখার পরেও বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করা হয়। নিন্দুকরা এখনো সোচ্চার। মুখে ইসলামের প্রতি দরদ দেখালেও কাজে-কর্মে এরা মহাভন্ড। আমরা প্রতিনিয়ত এদের ভন্ডামী প্রত্যক্ষ করছি।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই কিভাবে ইসলামের মহান সেবক ও শাসকদের একের পর এক নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.), তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) একের পর এক নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। মহানবী (দ.)'র প্রিয় দৌহিত্রদ্বয় হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হুসেন (রা.) কেও বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এত সব হত্যাকান্ডের পরও ইসলামকে স্তব্ধ করা যায়নি। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদেরসহ হত্যা করলেও তাঁর আদর্শ আজো উজ্জ্বল, তাঁর স্মৃতি আজো অম্লান।

ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণি সাধারণ মানুষের স্বার্থকে অবহেলা করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অত্যাচারী পুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষার জন্য ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণের কাজে লেগে যায়। তারা শোষণের মাধ্যমে নিরীহ লোকদের জীবনকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দুর্বিষহ করে তোলে। তারা জনগণের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদাভঙ্গ করে ইসলামি চেতনা ও মূল্যবোধকে ভূলুণ্ঠিত করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। শুরু হয় আইয়ামে জাহলিয়াত। মদ-জুয়া, ব্যভিচার ইত্যাদি সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির এ সব অপকর্ম দেখে মর্মাহত হয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এতে বিচলিত বোধ করবে না কেবল তারাই, যারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণকে দূরে

Dhaka University Institutional Repository

সরিয়ে রেখে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় বহাল হওয়ার খোয়াব দেখেন অথবা সে কাজে সিদ্ধহস্ত"।[৪৮]

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসর ধর্মব্যবসায়ী ভণ্ডদের চক্রান্ত ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। তাই তিনি বলেছিলেন, "পনেরশ মাইল দূরের দুটি অংশ নিয়ে কোন সময় কোন একটি রাষ্ট্র হয়েছে বলে আমার জানা নাই। কিন্তু আমরা ধর্মভীরু মানুষ; তাই পাকিস্তানিরা ধর্মের নামে এক রাষ্ট্রের দোহাই দিতে আরম্ভ করল। আমরা যারা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম তারা সংগ্রাম করেছি। যারা বুঝতে চেষ্টা করে নাই তারা দালালি করেছে।"[৪৯]

ইসলাম জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। সাধারণ জনগণের অধিকার যেখানে বিঘ্নিত হয়েছে ইসলাম সেখানে সোচ্চার হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম যেখানে সোচ্চার অধিকার সেখানে প্রত্যেক ঈমানদারকে বাধ্যতামূলকভাবে সোচ্চার হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কঠোর নির্দেশ রয়েছে। যেহেতু বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। সুতরাং তাঁকে ইসলামের মূল্যবোধ রক্ষার্থে অন্যায় ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হয়েছে। যারা ভণ্ড-মুসলিম কেবল তারাই জনকল্যাণ বিঘ্নিত করেছে। যেখানে বঙ্গবন্ধু শোষণ দেখেছেন, অত্যাচার দেখেছেন সেখানেই প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতেন। ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ। মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত বিধানই আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহপাক বলেছেন, "যারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে শাসন পরিচালনা করে না তারা অবিশ্বাসী।"[৫০]

সুতরাং পাকিস্তানের শাসন পরিচালনায় আল্লাহ্‌র বিধানকে লংঘন করে পাকিস্তানি শাসকেরা অবিশ্বাসীর কাজ করেছে। একদিকে তারা অবিশ্বাসী অন্যদিকে অত্যাচারী। সুতরাং ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হয়েছিল।

ইসলামি মূল্যবোধের পরিস্ফুটনের মাধ্যমে পাকিস্তানের আপামর অধিবাসী যাতে স্বাধীনভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতিক বিকাশের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তদলক্ষ্যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বকীয় মর্যাদাবোধ ও বিশ্ব শান্তিতে পর্যাপ্ত অবদান রাখার অনুকূলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ জনগণ এ বোধ হতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। ইসলামি মূল্যবোধের সাথে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান কিন্তু প্রারম্ভে বিশ্বাসঘাতকতার জঘন্য দেয়ালে ধাক্কা খায়। শাসক শ্রেণির অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অনৈসলামিক সিদ্ধান্ত জনগণকে পরাধীনতার চেয়েও কঠোর নাগপাশে আবদ্ধ করে ফেলে। ইসলামের নামে মনগড়া অনৈসলামিক বাহানা ইসলামি মূল্যবোধকে ভূলুণ্ঠিত করে দিচ্ছিল। ব্রিটিশদের চেয়েও কষ্টকর নিষ্পেষণে জনগণ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি। এ অবস্থায়

৪৮. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনের আগে টেলিভিশনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।
৪৯. ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামীলীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য।
৫০. আল-কুরআন, ৫:৪৪

বঙ্গবন্ধুর মত একজন নির্ভেজাল ইসলামি যোদ্ধা ও বোদ্ধা নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেন না। তিনি শাসক শ্রেণির অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অনৈসলামিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁর স্বভাবসুলভ আন্দোলন শুরু করে দেন। দেশপ্রেমের সাথে কুরআনের বাণী ও ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের একচ্ছত্র নেতা।[৫১]

সংগঠন ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ। সংগঠন একতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে শক্তিকে সংহত করে এবং ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সংগঠন প্রতিষ্ঠাকে ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের এ নীতির আলোকে বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগঠনের মাধ্যমে মানুষকে একতাবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছেন। সংগঠনকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার এবং ইসলামি চেতনা বিকাশের অন্যতম কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়। ইমাম শাওকির ভাষায়, "সংগঠন প্রতিষ্ঠা আবশ্যক, কারণ- যে সকল মতবিরোধ, অমিল ও মনোমালিন্য সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় সাংগঠনিক জীবন ও সংঘবদ্ধতার ফলে তা হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।"[৫২]

আওয়ামীলীগ নামক ঐতিহাসিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধু ইসলামের কল্যাণে নজিরবিহীন সফলতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ গঠন করি।"[৫৩]

বঙ্গবন্ধু ব্যতীত বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে পাকিস্তানি শাসকেরা এখনও ইসলামের নামে অনৈসলামিক কার্য চালিয়ে যেত। অতএব আওয়ামীলীগের মত অসাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তুলে বঙ্গবন্ধু উপমহাদেশে মানবতা ও ইসলামকে স্বার্থান্বেষী পাপীদের করাল থাবা হতে রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু হযরত (দ.)-এর নির্দেশ পালনে কখনও দ্বিধা করেননি। যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানেই নিঃসঙ্কোচে প্রতিবাদ মুখর হয়ে অপ্রিয় সত্য কথাটি বলে দিয়েছেন। এই অনুপম চরিত্রটি তাঁকে একদিকে যেমন সাহসী ও পুণ্যবান অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর চক্ষুশুলে পিছপা হননি। হযরত মুহাম্মদ (দ.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি খারাপ কিছু দেখে তার উচিত তার নিজ হাতে তথা শক্তি প্রয়োগে তা সংশোধন করা, এবং এতে সে অসমর্থ হলে তার জিহ্বার দ্বারা; এবং সে যদি তাতেও অসমর্থ হয়, তখন তার অন্তর দ্বারা; কিন্তু এ হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[৫৪]

তাই শত নিপীড়নের মাঝেও বঙ্গবন্ধুর থেমে থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি সবসময় নিজ হাতে সংশোধনের চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্ ও রসুল প্রেমে একাকার বঙ্গবন্ধুর ঈমান এত প্রবল ও

---

৫১. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
৫২. নাইমুল আখতার, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭ [উদ্ধৃত- সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*]
৫৩. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দি। [উদ্ধৃত- সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২]
৫৪. আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, *সহীহ লিল মুসলিম*, দিল্লী : মাকতাবা রশিদিয়া, ১৪০৮ হি., কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানু কাওনুন নাহী আনিল মুনকারি মিনাল ঈমান, হাদীস নং- ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রতিরোধ্য ছিল যে, তিনি রসুলের কোন বাণীকে অবহেলা করার কল্পনাও করতে পারতেন না। বঙ্গবন্ধু কখনও দুর্বল ঈমানের পরিচয় দেননি। তিনি সবসময় অন্যায় অবিচার দেখলে সর্বশক্তি দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর পক্ষে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

নির্বাচনের দুইমাস পরও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিষদের বৈঠক ডাকলেন না। সংখ্যালঘু জনগণের নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা অগ্রাহ্য করে ভুট্টোর পরামর্শ মতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ পরিষদের বৈঠক দিলেন। ইয়াহিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাকে অগ্রাহ্য করে ইসলাম বিরোধী কাজ করে ফেললেন। একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রধান হয়ে যদি ইসলাম বিরোধী কাজ করেন ইসলামি দর্শনে তাকে হত্যা করার নির্দেশ আছে। ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী আখ্যা দিয়ে ছয় দফা মেনে নেবেন অঙ্গীকার করে ঢাকা ত্যাগ করলেন। এর পর যা করলেন তা পুরো বিশ্বাসঘাতকতা আর প্রতারণা। কৌশলে কুচক্রীদলের মাধ্যমে বাংলাদেশি জনগণের বিরুদ্ধে চরম ফেতনা সৃষ্টি করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ ছিল চরম মুনাফেকি। মহান আল্লাহ্ বলছেন, "বিপথগামী তারাই যারা যারা পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে।"[৫৫] এবং "আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।"[৫৬]

পাকিস্তানি শাসকচক্র দুটোই একসাথে করেছিল। অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতকরা জাহান্নামী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না।"[৫৭]

এত প্রতারণার পরও বঙ্গবন্ধু ধৈর্য হারালেন না। প্রকৃত ধার্মিক ও খোলাফায়ে রাশেদিনের মত ধীর পদক্ষেপ ও বিচক্ষণ মানসিকতায় অবিচল থাকলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন, "আল্লাহ্ চক্রান্তকারীদের ভিত্তিমূল ধ্বংস করে দেন।"[৫৮]

তাদের মন্দ কাজ তাদের মাথায় আপতিত হবে এবং তারা যে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা তাদের উপর পড়বে।[৫৯]

আল্লাহ্ তা'আলা জনগণের সম্পদ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এদেশের কিছু লোক যারা এখনও ধর্মের আবরণে রাজনীতি করে যাচ্ছে তারা জেনেশুনে বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ পাপ পন্থায় আত্মসাতের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে এটি করেছে। প্রকৃত মুমিন কি আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করতে পারে? তারা স্পষ্টতই

৫৫. আল-কুরআন, ২:২৭
৫৬. আল-কুরআন, ২২:৩৮
৫৭. আল-কুরআন, ১২:৫২
৫৮. আল-কুরআন, ১৬:২৬
৫৯. আল-কুরআন, ১৬:৩৪

মুনাফিক আর অবিশ্বাসী। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না।"[৬০]

বঙ্গবন্ধু কখনও এই জঘন্য চক্রটির সাথে হাত মেলাননি। যারা এরূপ বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহীদের সাথে হাত মেলায় তারা আল্লাহ্র নির্দেশ ভঙ্গকারী, তারাও অবিশ্বাসী। অন্যায়কারী ও সহ্যকারী দুজনেই তো সম অপরাধী।

নামের আড়ালে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন জাতীয় গল্প সৃষ্টি করা যায় কিন্তু প্রকৃত ইসলাম কায়েম করা যায় না। ধর্ম ব্যবসায়ীদের খণ্ডবিখণ্ডকরণ হতে ইসলামকে রক্ষা করে জনগণের কাছে প্রকৃত ইসলামকে উপস্থাপন করে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। ধর্মের নামে আচ্ছাদিত দলগুলো পবিত্র ইসলাম ধর্মকে ধর্মের দোহাই দিয়ে খণ্ডখণ্ড করে ইসলামকে ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল বঙ্গবন্ধু এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। একমাত্র বঙ্গবন্ধুই ইসলামকে রক্ষার জন্য রাজনীতিকে সার্বজনীন করে ধর্মকে তার পরম পবিত্রতায় বিধূষিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন এবং বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এ পাপীষ্ঠ গ্যাংটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। পতাকার অবমাননাকারী হয়েও পতাকা উড়োচ্ছে। তারা কি জানে না হত্যাকারীকে প্রশ্রয় দেয়াও হত্যার মত সমান পাপ? যদি না জানেন তো কীভাবে তারা নিজেদের মুসলমান দাবি করেন, আর জানলে এমন পাপে রত হন কীভাবে? মুসলমান দাবি করতে হলে, মানুষ দাবি করতে হলে এ মুহূর্তে সবার উচিত এসব পাপীদের সংগত্যাগ করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা কী বলেন তা বিশ্লেষণ করা যাক। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোকা দেয়। যারা (ধর্মের নামে অন্যদের) ধোকা দেয় তারা আল্লাহ্র ভাষায় ব্যাধিগ্রস্ত।"[৬১]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অপশক্তি ধর্মের নামে মানুষকে ধোকা দিয়েছিল, মানবতাকে লাঞ্ছিত করেছিল এবং এখনও অনুরূপ করে যাচ্ছে তারা হচ্ছে আল্লাহ্র সেই ব্যাধিগ্রস্ত লোক, যাদের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর নবী (স.) সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন। অভিশপ্ত এ সকল পাপিষ্ঠদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু যে সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন তা ইসলামি দর্শনের আলোকে একটি পবিত্র জেহাদ। তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করলে বঙ্গবন্ধুকে ইসলামি আন্দোলনের প্রবক্তা গণ্যে এক লাইনও লেখা সম্ভব হত না।

পরিষদের বৈঠক বাতিল করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে অগণতান্ত্রিক কাজ করেছিলেন সে সময় বঙ্গবন্ধু ইচ্ছা করলে পুরো পাকিস্তান ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা কেবল একজন মহামানবের কাছে প্রত্যাশা করা

---

৬০. আল-কুরআন, ৫:৪৪
৬১. আল-কুরআন, ২:৮-১০

যায়। বঙ্গবন্ধুর ধৈর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, "আওয়ামীলীগ নেতা (বঙ্গবন্ধু) অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়া উপযুক্ত যোগ্য নেতার কাজ করিলেন। ... শেখ মুজিবের সময়োপযোগী অসীম ধৈর্যে ও স্থৈর্যে আমি মুগ্ধ ও গর্বিত হইয়াছিলাম।"[৬২]

ইসলামি আদর্শে পরিপূর্ণ, বিশ্ব মানবতায় বিদূষিত এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার আলোয় সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই কেবল এত অত্যাচার নির্বিচারে সহ্য করে সম্পূর্ণ অহিংস নীতিতে ইসলামি দর্শনের আলোকে কোনরূপ নিষ্ঠুরতা ব্যতিরেকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। যারা আজ বঙ্গবন্ধুকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অধর্মের প্রচলক বলে থাকেন তারা কেউ বেঁচে থাকতে পারত না, যদি বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক হতেন। লক্ষ লক্ষ জনতা, যারা বঙ্গবন্ধুর এক আঙ্গুলের ইশারায় জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন তারা ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র ধর্মদ্রোহী পাপিষ্ঠদের টেনে হিছড়ে অভিশপ্ত জাতিগুলোর ন্যায় মাটিতে মিশিয়ে দিতেন। বঙ্গবন্ধু এসব কিছুই করেননি, কারণ তিনি মুসলমান। "... অবশ্যই পূণ্য কাজ পাপ দূর করে দেয়..."। আর ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুন্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করবে না।"[৬৩]

বঙ্গবন্ধু পূণ্যবান ছিলেন বলে ধৈর্যবান ছিলেন। তাই মুনাফিকরা সেদিন বেঁচে গিয়েছিল। একই কারণে স্বাধীনতার পরও তিনি তাদের ক্ষমা করার মত মহত্ত্বতা দেখাতে পেরেছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়ার ধর্ম বিরোধী কাজ ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে অহিংস আন্দোলনের ডাক দিয়ে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর শিক্ষা ও কুরআনের বাণীকে বাস্তবে প্রয়োগ করে প্রমাণ করেছিলেন ইসলাম শান্তির ধর্ম। পাকিস্তানি শাসকচক্র ও স্বাধীনতা বিরোধী লবি ভাষা আন্দোলন হতে শুরু করে বাঙালি জাতির চেতনাদীপ্ত আন্দোলনসমূহে যত মুসলমান খুন করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তারা কীভাবে নিজেদের মুসলমান দাবি করে? তারা মুসলমান নয়, নাফরমান। এই নাফরমানদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু জেহাদ ঘোষণা না করলে বাংলাদেশে আজ কোন মানুষই থাকত না। থাকত না ইসলামি কোন চেতনা।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন ছিল বিশ্বের ইতিহাসের বিরল একটি ঘটনা। সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রায় সবাই কোনরূপ প্রচার-প্রচারণা ও বাধ্যবাধকতা ছাড়া বঙ্গবন্ধুর একটি ঘোষণায় সরকারকে মুহূর্তের মাঝে অস্তিত্বহীন করে তুলেছিল। সুবেদার মেজর আহমদ হোসেনের ভাষায়, "গাছের পাতাও যেন নড়ছে না, সবাই শেখ মুজিব কী বলেন তার অপেক্ষায়। পাখিদের ডাকও শোনা যাচ্ছিল না। এ যেন এক অলৌকিক মিশন। একমাত্র অলৌকিক বিস্ময়ের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। তখন বঙ্গবন্ধু যদি বলতেন তাহলে বাংলাদেশের জনগণ পুরো পাকিস্তানের মাটি তুলে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিত এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুরো বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্র হতে হারিয়ে যেত।"[৬৪]

---

৬২. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতি পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাবমহল, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪৮
৬৩. আল-কুরআন, ১১:১১৪-১১৫
৬৪. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি

স্বাধীনতার পর স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব-প্রতিপত্তি, ব্যক্তিত্ব, ভাবমূর্তি ও মানবিক নির্মাল্য আরও বেড়ে যায়। রাষ্ট্রনায়কের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম অনুষঙ্গ। সংগত কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ইসলামি চেতনার ধারক হিসেবে ছেলেবেলা হতে প্রসিদ্ধ বঙ্গবন্ধু ইসলামি আন্দোলনের লৌহ-মানব হিসেবে তার রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ শুরু করেন। অনাবিল চারিত্রিক প্রভাবের কারণে তাঁর পররাষ্ট্রনীতিও ইসলামি মূল্যবোধ ও চেতনায় মহীয়ান হয়ে ওঠে। পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয় একটি উক্তি "আমি বাংলাদেশকে সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই" –তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক স্তম্ভ।[৬৫] সুইজারল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি, জোটনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাধীনচেতা মনোভাব, সুসমন্বিত বন্ধুত্ব পরায়ণ নীতি বঙ্গবন্ধুকে আকৃষ্ট করেছিল। একদিন আলাপকালে হযরত মোহাম্মদ (স) হযরত আবুযর (রা) কে বললেন, "সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের স্পৃহা হৃদয়ে না থাকলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না।"[৬৬]

বঙ্গবন্ধু তাঁর পররাষ্ট্রনীতি পরিবিন্যাসকালের সমগ্র মানবজাতির বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাই পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের স্পৃহাকে সামনে রেখে পররাষ্ট্র নীতি চয়ন করতেন।

'কারও সাথে শত্রুতা নয়, সবার সাথে বন্ধুত্ব ইসলামি পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক দিক। বঙ্গবন্ধুও অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকালে এ নীতি অনুসরণ করতেন। তবে বন্ধুত্বের আড়ালে কারও প্রভুত্ব ইসলামের মত তিনিও কোনদিন মেনে নিতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অভিমত যেমন দৃঢ় তেমনি পরিষ্কার, "আমার দেশ স্বাধীন। ভারত হোক, রাশিয়া হোক, গ্রেট বৃটেন হোক, কারও এমন শক্তি নেই, যে আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।[৬৭]

বঙ্গবন্ধুর এ উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর স্বকীয়তা ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গীর দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। তিনি প্রায় বলতেন, "নীতির প্রশ্নে কোন আপোষ নেই। মানুষের উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে।"

আপোষহীন অথচ সুসমন্বিত সম্মানজনক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে স্বাধীন জাতি সত্তার প্রতি যথাযথ সম্মান, শোষিতের প্রতি সমর্থন, বিশ্বশান্তি ও ইসলামি ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির উপাদান।

---

৬৫. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৪৯-১৫০

৬৬. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.

৬৭. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

এখন যেমন দেশের বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের টেলিভিশনে হাজির করে বক্তব্য আদায় করে জনগণের বিশ্বাস আদায় করার প্রয়াস নেয়া হয় সেটি বঙ্গবন্ধু কল্পনাও করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, "দেশে বিদেশে আমার কাজের মাধ্যমে আমার দেশের মূল্যায়ন হবে।"[৬৮] স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জোটনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও ইসলামি ঐক্যের মাধ্যমে নব-জাগরণ প্রতিষ্ঠিত করা ছিল বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। তবে বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্ক, সে যাই হোক, যে দেশের সাথে হোক তার ভিত্তিও হবে ইসলামি রাষ্ট্রনীতির আলোকে আত্মসম্মান বোধের পবিত্রতম আলয়ে। বঙ্গবন্ধুর উক্তির মধ্যে তার প্রমাণ মেলে, "চীনের সাথে আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি, কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই না।"[৬৯]

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ এর ভাষণে বঙ্গবন্ধু তার পররাষ্ট্রনীতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "বাংলার পতাকা আজ দুনিয়ায় ওড়ে। বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ আজ জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য, কমনওয়েলথ এর সদস্য, ইসলামি সামিট এর সদস্য। বাংলাদেশ দুনিয়ায় এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না।... আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমরা জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি। আমরা কো-এক্সিজটেন্সে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করি।"[৭০] বঙ্গবন্ধুর এ বক্তব্য তাঁর পররাষ্ট্রনীতির উচ্চ আদর্শের পরিচায়ক। সবার সাথে বন্ধুত্ব কামনা করলেও তিনি একই ভাষণে বলেছেন, "পরের সম্পদ লুট করে খেয়ে বড় কথা বলা যায়। আমার সম্পদ ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তোমার (পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো) সাথে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না।... পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নাই কিন্তু আমার সম্পদ তাকে ফেরত দিতে হবে।"[৭১]

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাদরে গৃহীত হয় নি। পাকিস্তান ও তার দোসরদের স্বাধীনতা-যুদ্ধ বিরোধী প্রচারণার কারণে ইসলামী বিশ্ব মনে করেছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধ ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত। তাদেরকে আরও বোঝানো হয়েছিল যে, মুসলমানদের উৎখাত করার লক্ষ্যে ভারতের ইন্ধনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ এ অপকর্মটি সাধিত করছে। পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি ইসলামী বিশ্বে আরও প্রচার করেছিল যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভূখণ্ডটি ভারতের কব্জায় চলে যাবে। পর্যাপ্ত লোকবল ও অবকাঠামোগত কারণে প্রবাসী সরকারের কুটনীতিকগণ পাকিস্তানি অপপ্রচারণার বিপরীতে প্রথমে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হননি।[৭২] বাংলাদেশের কিছু বিশ্বাসঘাতক বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ব্যবধান সৃষ্টি হয়। তাদের মনে এ ধারণা গেড়ে বসে যে, শেখ মুজিব ইসলাম বিদ্বেষী। কিন্তু তারা এ কথাটি একবারও ভাবল না যে, বাংলাদেশের ৮৫ ভাগ লোক

৬৮. মোনায়েম সরকার (সম্পা), *বাঙালির কণ্ঠস্বর*, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু পরিষদ, পৃ. ৩৫৩
৬৯. প্রাগুক্ত।
৭০. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬
৭১. প্রাগুক্ত।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

মুসলমান। অতএব এখানে ইসলাম বিদ্বেষী কেউ নেতা হতে পারে না। তবে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতার কারণে এ অপপ্রচারের ধাক্কা সহজে এবং স্বল্পসময়ে দূরীভূত করা সম্ভব হয়।

বঙ্গবন্ধুর সঠিক পদক্ষেপের কারণে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আফ্রো এশীয় সংহতি সংস্থার (AAPSO) সম্মেলনে বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে বাংলাদেশ ঐ বছরই আফ্রো এশীয় সংস্থার সদস্য পদ অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ সুযোগে বঙ্গবন্ধু ইসলামি বিশ্বে আস্তে আস্তে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করানোর কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁর কার্যক্রম যে ইসলাম বিরোধী ছিল না, বরং পাকিস্তানের কার্যকলাপই যে ইসলাম বিরোধী ছিল তা আফ্রো এশীয় সংহতি সংস্থার নিন্দা প্রস্তাবের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের প্রাথমিক সম্পর্কের টানাপোড়নের আরেকটি কারণ হচ্ছে জেদ্দার ইসলামি পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের একটি প্রস্তাব। কয়েকটি ইসলামি দেশ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি হতে ২ মার্চ জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে মুজিব-ভুট্টোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আপোসের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে অখণ্ড পাকিস্তান গঠন করে পূর্বের রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।[৭৩] এটি ছিল অসম্ভব একটি বিষয়। সংগত কারণে বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় উদ্যোগী রাষ্ট্রগুলোসহ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র বঙ্গবন্ধুর উপর রুষ্ট হয়। হোক রুষ্ট, হলেও বঙ্গবন্ধুর কিছু করার ছিল না। তিনি সারা জীবন দেশ ও ইসলামের জন্য কাজ করে আসছেন। কুরআন-হাদিসে স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় সাওগাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু একজন মুসলমান হয়ে কীভাবে ভুট্টোর মতো একজন প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী, কলহ সৃষ্টিকারী, বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী ও অজ্ঞের সাথে পুনরায় মিলিত হন? আল্লাহ্ বলেছেন, "... আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি অজ্ঞদের দলভূক্ত হবেন না।"[৭৪]

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বসহ জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ইসলাম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করতে বহুলাংশে সক্ষম হন। মুক্তিযুদ্ধের ঘোরবিরোধী গাদ্দাফির সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বৈঠক করেন। বৈঠকে গাদ্দাফি বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আসল স্বরূপ অনুধাবন করতে পেরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলাদেশের মঙ্গল কামনার জন্য মুনাজাত করেছিলেন। সৌদি বাদশাহ ফয়সলকেও বঙ্গবন্ধু তার পররাষ্ট্রনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ বোঝাতে সক্ষম হন। মুজিব-ফয়সল বৈঠক শেষে এক সৌদি মুখপাত্র সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেছিলেন, "মধ্যপ্রাচ্যে এখন বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক পরিষ্কার।"[৭৫]

---

৭৩. প্রাগুক্ত।

৭৪. আল-কুরআন, ১১:৪৬

৭৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি", ডাঃ শাহাদাত (সম্পা.), *'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'* ঢাকা : ইফাবা, ২০০৯, পৃ. ৩৪৭

আলজিয়ার্স সম্মেলনে সারা বিশ্ব বঙ্গবন্ধুর ইসলামি চেতনা ও তাঁর সংগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাকিস্তানি অপপ্রচার ক্রমশ মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে থাকে। মিথ্যুক কীভাবে মুসলমান হয়? ইসলামি সংস্থার সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ইসলামি বিশ্বে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "আরব ভাইদের সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি। প্যালেস্টাইনের আরব ভাইদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করে বাংলার মানুষে। আরব ভাইদের পেছনে তারা থাকবে প্যালেস্টাইন উদ্ধার করার জন্য। এও আমাদের পলিসি। যেখানে নির্যাতিত দুঃখী মানুষ সেখানে আমরা থাকব।"[৭৬]

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আরব ইসরাইল যুদ্ধ চলাকালীন মুজিব সারা রাত ঘুমোতেন না, ঘুমোতে পারতেন না। আরব ইসরাইল যুদ্ধের সংবাদের জন্য ছটফট করতেন সারা রাত। তখন এখনকার মত ডিস ছিল না। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিবিসি বা ভয়েস অব আমেরিকা ছাড়া সংবাদ সংগ্রহের কোন উপায় সাধারণভাবে ছিল না। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় পর ওগুলো হতেও আর সংবাদ পাওয়ার কোন সুযোগ থাকত না। এমতাবস্থায় মুজিব রাত অবধি সংবাদ সংস্থার অফিসসমূহে ফোন করে যুদ্ধের খবর নিতেন। এমনকি বিদেশ হতেও ফোনে খবর নিতেন। এ বিষয়ে জাওয়াদুল করিম লিখেছেন, "১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আরব ইসরাইল যুদ্ধ আরম্ভ হলে বঙ্গবন্ধু নিয়মিত যুদ্ধের খবর রাখতেন। একদিন রাত ১২টার দিকে তিনি ৩২নং বাড়ি থেকে টেলিফোনে আমার কাছে যুদ্ধের শেষ খবরাখবর জানতে চাইলেন।"[৭৭]

মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ যেমন ছিল প্রবল তেমনি আন্তরিক। ইসলামের কল্যাণকে তিনি নিজের কল্যাণের চেয়েও উর্ধ্বে স্থান দিতেন। সারাদিনের কর্মক্লান্ত একজন রাষ্ট্রপ্রধান শুধু খবর নেয়ার জন্য সারারাত জেগে থাকতেন, এটা সাধারণ কোন বিষয় ছিল না। আন্তরিকতার সাথে প্রচণ্ড সহানুভূতি না থাকলে কেউ তা করতে পারে না। লোক দেখানো কুম্ভীরাশ্রু জনসমক্ষে বিসর্জন করা যায় কিন্তু রাতের গভীরে নিজের ঘরে যে সহানুভূতি চোখে হৃদয়ভাঙ্গা বন্যা নিয়ে আসে তা নিতান্তই স্বর্গীয়। আরব ইসরাইল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই ভালোবাসা ও একাত্মতার নির্দশন স্বরূপ সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। এরপূর্বে কোন মুসলিম দেশ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে সাহায্য পাঠাননি। তাদের পশ্চিমা প্রভু অখুশি হয়ে যাবে এ ভয়ে তথাকথিত মুসলিম লেবাসে আবৃত দেশগুলো আরব যুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসেনি। যেমন পারেনি প্যালেস্টাইনের মত ইরাক ও আফগানিস্তানে আক্রমণের ক্ষেত্রে। আরব-ইসরাইল যুদ্ধে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ২৮ সদস্যের একটি মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছিল। একই সাথে মিশরীয় সেনাবাহিনীতে যুদ্ধরতদের জন্য বঙ্গবন্ধু প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ৫০০০ সদস্যের একটি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করেছিলেন।[৭৮]

---

৭৬. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

৭৭. জাওয়াদুল করিম, *মুজিব ও সমকালীন রাজনীতি*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৩০

৭৮. মুহাম্মদ আখতার ফারুক, "আরব ইসরাঈল সম্পর্ক ও বঙ্গবন্ধু", *অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট-২০১০, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যের এ ধারাটি ছিল ইসলামি বিশ্বে প্রথম এবং অভাবিত। ইসলামি বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশের সংহতির এ প্রকাশ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থানকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। যখন বঙ্গবন্ধু আরব-ইসরাইল যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পাকিস্তান ছিল নির্বিকার। বঙ্গবন্ধুর ইসলাম প্রীতি এবং মহানুভূবতায় মিশর সরকার অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। একজন মিশরীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা একজন বাংলাদেশী সাংবাদিককে বলছিলেন, "আমরা এতদিন পাকিস্তানের প্রচারণা বিশ্বাস করে এসেছি। আপনাদের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। এখন আমরা উপলব্ধি করছিয়ে, ইয়াহিয়া চক্র দ্বারা সংঘটিত অপরাধে প্রধানমন্ত্রী জনাব ভুট্টোরও যোগসাজস ছিল।"[৭৯]

একই সময়ে আরেকজন মিশরীয় কুটনীতিবিদ একই সাংবাদিককে বলেছিলেন, "আপনাদের প্রধানমন্ত্রী (শেখ মুজিবুর রহমান) একটি বড় রকমের যুদ্ধে একটি গুলিও না ছুড়ে বা অস্ত্র ব্যবহার না করে আরব বিশ্বসহ প্রায় অর্ধেক আফ্রিকা জয় করে নিয়েছেন।"[৮০]

সত্যি এত বড় জয় উপমহাদেশের আর কোন নেতার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় নি। আরব বিশ্ব নিয়ে পরাশক্তির চক্রান্তের বিষয়ে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই সুস্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করে ইসলামি বিশ্বের ঐক্যের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, "ঐক্য কাঠামোগত কোন বিষয় নয়, নয় কোন তথ্যগত উপস্থাপনা। অর্গানাইজেশন কিংবা সভা-সমিতি করে ঐক্যের ফল পাওয়া যায় না। ঐক্যের ফলাফল ভোগ করতে হলে আন্তরিকতা চাই, চাই ঈমান ও সৎকাজ করার সাহস। যারা পরাশক্তির সাহায্যে ইসলামিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে তাদেরকে তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি বলতেন, ইসলামের দুশমনদের কাছ হতে সাহায্য নিয়ে ইসলামের খেদমত কখনও সম্ভব নয়।"[৮১]

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ তখনও সৌদি আরবসহ অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবু শেখ মুজিব বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোকে ইসলামি জাগরণে যে কোন অবস্থায় সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলছিলেন, "আরবদের স্বীকৃতি ছাড়াই বাংলাদেশ নির্দ্ধিধায় সর্ববিষয়ে সমর্থন দেবে।"[৮২]

অর্থাৎ কোন ইসলামি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল কি না সেটি বড় কথা নয়, ইসলামি দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু অবশ্যই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

---

৭৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামি বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ. ১০৫-১০৬
৮০. প্রাগুক্ত।
৮১. প্রাগুক্ত।
৮২. জাওয়াদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে আসেন। এর পর বঙ্গবন্ধু অসাধারণ কুটনীতিক বুদ্ধিমত্তা ও ঈমানি দৃঢ়তার আলয়ে সৃষ্ট অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ১২ মার্চ তারিখের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যকে কোনরূপ মনোমালিন্য বা সামান্যতম ভুল বোঝাবুঝি ব্যতিরেকে ভারতে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন দেশ স্বাধীনতায় সহায়তাকারী দেশের সৈন্যকে এত সহজে স্বদেশ পাঠাতে সক্ষম হননি। এটি পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ সাফল্যের বিমূর্ত প্রমাণ।

ইসলামিক দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্ব রক্ষায় বঙ্গবন্ধু যথেষ্ট আন্তরিক ও আগ্রহী থাকলেও নিজের স্বকীয়তা ও ইসলামি মূল্যবোধ তিল পরিমাণ বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন না। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বন্যা ও খরায় বাংলাদেশে সরকারি হিসাবমতে ২৭,০০০ লোক মারা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে সাহায্য আসে। সৌদি আরব ১০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়ার কথা ঘোষণা দেন তবে শর্তাধীন। শর্তটি হল সাহায্য দেবে যদি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে সউদি আরবের কথামত ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। শর্তটি নিঃসন্দেহে খুবই অপমানজনক। কারণ সৌদি আরবের কথা মত ইসলামি রাষ্ট্র করা হলে বাংলাদেশে ইসলাম বলে আর কিছু থাকবে না। সৌদি আরবের শাসনতন্ত্র প্রকৃতই ইসলামি শাসনতন্ত্র কিনা তা নিয়ে ইসলামি বিশ্বে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। যে দেশে মার্কিন-ইহুদি লবির প্রভাবে পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত হয়, সে দেশের ইসলাম বাংলাদেশের জনগণ কিছুতেই মেনে নেবে না। বঙ্গবন্ধু বলছিলেন, "আমরা নীতি বিসর্জন দিয়ে টাকা নিতে পারি না। কোন অবস্থাতেই আমরা রাষ্ট্রীয় চার নীতির সঙ্গে আপোস করব না। বাঙালি জাতি তার সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবে। যে জাতি রক্ত দিতে জানে, তার আত্মমর্যাদা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।"[৮৩]

ইসলামী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান

ইসলামের তথাকথিত ধ্বজাধারী পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসরেরা ইসলাম নিয়ে শুধু চিল্লাচিল্লিই করেছে, কিন্তু ইসলামের কল্যাণে কোন কিছুই করেনি, বরং ইসলামের অকল্যাণ ঘটানোর জন্য যা কিছু দরকার তা-ই করেছে। যুদ্ধের আগে পাকিস্তান আমলে ইসলামি শিক্ষার উৎস মাদ্রাসাগুলোকে নিজস্ব আয়ে চলতে হত। সরকার তেমন কোন সাহায্য করত না বলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় মাদ্রাসাগুলোও চরম দুরবস্থায় পতিত হয়। স্বাধীনতার শত্রুরা প্রচার করতে শুরু করে যে, আওয়ামীলীগ মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিতে চাইছে। বঙ্গবন্ধু তখন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে। তিনি দেশে আসার পর প্রথমে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। এ বিষয়ে আলাপ করার জন্য গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুস সালাম ও কাপাসিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ওয়ারেছ আলীসহ নেতৃস্থানীয় আলেমদের সাথে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু তাঁদেরকে বলেছিলেন, "কেউ কেউ হয়ত ভাবছে বঙ্গবন্ধুর সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে নয়। কিন্তু আমি মুসলমানের ছেলে।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা শিক্ষা কি বলছেন, আমি স্কুল কলেজেও কুরআন-হাদিসের শিক্ষাক্রম চালু করব। তবে ইসলাম নিয়ে যারা বাণিজ্য করছে তাদেরকে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে দেব না। আপনাদের ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান তো মদ, জুয়া, রেস-এর মত অবৈধ ও ইসলাম বিরোধি কাজকেও আইন করে হালাল করে দিয়েছিল। দেখবেন, সহসাই আমি এসব বাতিল করে দেব। আমার ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও কি করে ইসরাম বিরোধি কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বসে বসে শুধু দেখবেন।"[৮৪]

বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর ইসলামি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেন। এর পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ও স্বীকৃতি ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষাকেও যে রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে ধারণাও ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের তথাকথিত শাসকদের ছিল না। বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম ইসলামি শিক্ষাকে প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে চেয়ারম্যান এবং আলাউদ্দিন আল আজহিরকে সম্পাদক করে "ইসলামি শিক্ষা সংস্কার সংস্থা" নাম দিয়ে ইসলামি শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, আহমদ হোসাইন, আকবর আলী, শামসুল আলম, মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, মাওলানা এম জালাল উদ্দিন ও চট্টগ্রামের মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অভিন্ন অঙ্গরূপে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে পাকিস্তান আমলের অবহেলিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেন।[৮৫]

এই কমিটির প্রস্তাবের আলোকে বঙ্গবন্ধুর তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমমর্যাদায় উন্নীত করে আলেমদের আর্থসামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গবন্ধুর আগে মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকুরি, বেতন ও সামাজিক মর্যাদা খুবই নিুস্তরের ছিল। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকুরি স্থায়ী করার ব্যবস্থা করে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসায় অধ্যয়নরতদেরকে আরও মর্যাদাবান করে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু নিজেই মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও উদ্যোগে স্বাধীনতা পরবর্তী মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রথম মহাসমাবেশ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান কারাগার হতে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম যে সমাবেশটি করেছিলেন তার স্থান ছিল ঢাকার বকশী বাজারস্থ আলিয়া মাদ্রাসার মাঠ।[৮৬] মাওলানা সৈয়দ শরীফ এবং তাঁর বন্ধু চট্টগ্রামের মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাজাকার নিজামী নয়) স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আলিয়া মাদ্রাসা শিখ সেনাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এখানে দেদারছে নাচ-গান আর মদ্য পান চলত। বঙ্গবন্ধু সমাবেশ

---

৮৪. আহমদ সেলিম রেজা, "বঙ্গবন্ধুর ইসলাম প্রীতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতা", অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (সম্পা.) *বঙ্গবন্ধুর হত্যার দলিল*, ঢাকা : সুচয়নী প্রকাশন, ১৯৯৬, পৃ. ২৫৩

৮৫. *মহানাগরিক*, মুখপত্র মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পরিষদের ৪র্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৪

৮৬. আহমদ সেলিম রেজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

করে আলিয়া মাদ্রাসাকে শিখ সেনা মুক্ত করে পুনরায় পাঠদানের সুযোগ করে দেন। ঐ সমাবেশে বঙ্গবন্ধু দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "যারা বলেছিলেন আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এলে ইসলাম থাকবে না, তারা এসে দেখে যান এখানে যারা বসে আছেন এই দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা আলেম, ওলামা কারও প্রতি কোন অবিচার করা হয় নি। সবাই বহাল তবিয়তে আছেন। আওয়ামীলীগ ইসলাম বিরোধী নয়। তবে ইসলামের নামে রাজনীতির বিরোধী।[৮৭]

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের মত আমাদের জাতীয় ধ্বনি এখনও বিছমিল্লাহ হলেও কার্যক্ষেত্রে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে দেশ ছেয়ে আছে। আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করা হলেও আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ম-নীতিকে তোয়াক্কা করা হত না। ইসলামের তথাকথিত রক্ষকেরা পাকিস্তানকে সুড়িখানায় পরিণত করেছিল। দেশের আনাচে কানাচে পশ্চিমা সৈন্য ও কর্মকর্তাদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল হাজার হাজার পতিতালয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পাকিস্তান আমলে ইতস্ততঃ গজিয়ে ওঠা শুড়িখানা ও মদবিক্রির বারগুলো বন্ধ করে দেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর এগুলো আবার গজিয়ে ওঠে। কেন? আমার এক বন্ধু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহ প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিল, "বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের আনন্দ-স্ফুর্তির সুযোগ করে দেয়ার জন্যই শুড়িখানা ও বেশ্যালয়গুলো আবার চালু করা হয়েছিল। এখন ব্যাঙের ছাতার মত বার আর বেশ্যালয়। যে আওয়ামীলীগকে ইসলাম বিদ্বেষী দল বলে অপবাদ দেয়া হয় সে দলই ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আসার পর কুখ্যাত টানবাজার পতিতালয়সহ অনেকগুলো পতিতালয় উচ্ছেদ করে অনৈসলামিক কর্মকান্ড বন্ধ করার প্রয়াস নিয়েছিল। পাকিস্তান আমলে মদ জুয়া, হাওজি, লটারি প্রভৃতি রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ ছিল। অথচ ইসলামে এগুলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামের ঝান্ডারূপী পাকিস্তানি শাসক ও তার দোসররা নির্দ্ধিধায় এসব ইসলাম বিরোধি কাজ চালিয়ে গেছে। রমজানে দিনের বেলা তারা বারে বসে গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলছে। এ জন্য পাকিস্তানকে অনেকে ইসলামিয়া শরাবখানা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই মদ পান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেন।

কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে বিশ্বাসীগণ, মাদকদ্রব্য ও জুয়া ইত্যাদি শয়তানি চক্রান্ত; এগুলো বর্জন কর। তাহলে (ইহজগত ও পরকালে) তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।"[৮৮]

কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে পাকিস্তান আমলে মুসলমান নামধারী মুনাফেকগুলো সারাদেশে মদ জুয়ার অবাধ ব্যবহার চালু করেছিল। তাদের আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে, তারা কুরআন-হাদিসে বিশ্বাসী ছিল না, শয়তানি চক্রান্তে নিমজ্জিত ছিল। পাকিস্তান আমলে মদ পানে বা বিতরণে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। এমনকি সরকারি অনুষ্ঠানাদিতেও মদের ফোয়ারা বসানো হত। বিদেশি মেহমানের নামে বসানো হত নিষিদ্ধ পানীয়ের বন্যা। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় এসে এ অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সরকারি অনুষ্ঠানে বিদেশি অতিথিদেরকেও মদ পরিবেশনের উপর বঙ্গবন্ধু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। এখন তো বিদেশি মেহমানদের জন্য মদ সস্তা করে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬-২৫৭
৮৮. আল-কুরআন, ৫:৯০

Dhaka University Institutional Repository

বলেছিলেন, “আমি আমার দেশে অনৈসলামিক কোন কাজ হতে দিতে পারি না, পাকিস্তান আমলে ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে যে সকল অনৈসলামিক রীতি-নীতি চালু ছিল তা আর চলতে দেয়া হবে না।” পাকিস্তানের ধর্মবাজ রাজনীতিক দলগুলোর নেতারা মদের বোতল হাতে ছুটত জুয়ার আড্ডায়। মাতাল হয়ে ঘোড় দৌড়ের মাঠে বাজি খেলতে যেত। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো এমন মদ্যপ ছিলেন যে, হুইস্কি সেবন না করলে কোন কাজ করতে পারতেন না।[৮৯]

মদ-জুয়া-বাজি ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকচক্র তা নির্বিচারে চালিয়ে গেছে। ইসলামের নামে বঙ্গবন্ধু এহেন অবমাননা সহ্য করতে পারেন নি বলে তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন ঈমানি প্রত্যয়ে। এসব অনৈসলামিক কার্যকলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদারেসিনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব হযরত মৌলানা আব্দুস সালামকে বলেছিলেন, “আপনাদের ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান তো মুখে শুধু ইসলাম ইসলাম করেই গেল আর আমার ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে আইন করে আমি মদ, জুয়া ও রেস খেলা বন্ধ করে দিলাম। এই রেস খেলে হাজার হাজার গরিব নিঃশেষ হয়ে গেছে।[৯০]

এম এ ওয়াজেদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি এক সরকারি আদেশে দেশের সর্বত্র মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড় জুয়া খেলার ব্যবসা ইত্যাদি অনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে রেসকোর্স (ঘোড়দৌড়) ময়দানকে একটি বিশেষ উদ্যানে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এর নতুন নামকরণ করা হয় ‘সোহরাওয়ার্দী উদ্যান’।”[৯১]

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পর প্রেসিডেন্ট ইরশাদ ক্ষমতায় এসে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করেন এবং এর পরপরই শুরু হয় ঢাকা-চট্টগ্রামে নাইট ক্লাবে নাইট-লাইফ ফাংশন। ইসলামের নামে ইসলামের এ অবমাননা সবসময় ধর্মান্ধদের দ্বারা সাধিত হয়েছে। কোন অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ধর্মের নামে কখনও অধর্ম করেনি। কারণ তারাই যে প্রকৃত ধার্মিক।

বঙ্গবন্ধু থাকলে এগুলো কল্পনাও করা যেত না। কারণ তিনি যে প্রকৃত ইসলামের আদর্শের নিবিড় আলেখ্য! বঙ্গবন্ধুর হতার পর দেশে ইসলামকে নিয়ে রাজনীতি হয়েছে, ব্যবসা হয়েছে কিন্তু ইসলামের কোন কল্যাণ হয়নি, বরং ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল হোসেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর আজ দেশে অনৈসলামিক ও শরিয়ত বিরোধি আচরণের ক্ষেত্রে সরকারি মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতা চলছে। অবক্ষয় হয়েছে মূল্যবোধের। এ অভিযোগ স্বয়ং আলেম সমাজের। বি এন পি সরকার তসলিমাকে নিয়ে নাটক করল। কিন্তু যখন একজন কবি মহানবী (স) সম্পর্কে কটুক্তি করেছিল বঙ্গবন্ধু তখন তাকে

---

৮৯. বিস্তারিত দ্র : অ্যান্থনী মাসকারেণহাস (অনু. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (রনাত্রি)), *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ*, ঢাকা : পপুলার পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ৪৬-৫৮

৯০. আহমদ সেলিম রেজা প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৯১. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

কারারুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শের প্রতি সব সময়ই ছিলেন আন্তরিক। আর.বি.এন.পি ইসলামকে নিয়ে রাজনীতি করছে।"[৯২]

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের গাজিপুর জেলায়, যাকে লোকজন বিশ্ব ইজতেমা বলে জানেন। যে মাঠে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সে মাঠটি বিশ্ব ইজতেমার জন্য বঙ্গবন্ধুই দান করেছিলেন। টঙ্গীতে বর্তমানে যেখানে বিশ্ব ইজতেমা হয় সেটি বঙ্গবন্ধুর ইসলাম-প্রীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিভূ হিসেবে আযুগ থেকে যাবে পূণ্যের বারতায়। তাবলিগ জামাতের দাওয়াতি কার্যক্রমকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সবসময় উদারহস্ত ছিলেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাবলিগ জামাতের কার্যক্রমকে তিনি যুযোপযোগী বলে মনে করতেন। কাকরাইল মসজিদ ও তৎসংলগ্ন স্থানটি তবলিগি মারকাজকে প্রদান করে বঙ্গবন্ধু ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি যদি তা না করতেন আজ তা সম্ভব হত না। কারণ ধর্মব্যবসায়ীদের বিভেদ-খপ্পরে সবকিছু তলিয়ে যেত অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে গহ্বরে।

বায়তুল মোকাররম মসজিদের পূর্ব আঙ্গিনায় এখন সুন্দর একটি উদ্যান শোভমান, ঠিক প্রকৃতির লীলায় যেন সৃষ্টির মহিমার অপূর্ব নিদর্শন। ফুলেল শুভেচ্ছায় আনত বাগানের প্রতিটি কণা এখনও বঙ্গবন্ধুর অবদানের ভারে নত। এই সুন্দর বাগানটি বাংলাদেশ ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের অংশ থাকাকালে ক্লাব হিসেবে ব্যবহৃত হত। স্পোর্টিং ক্লাবের নামে মসজিদের পাশে চলত অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড। প্রতিবাদ করলে জবরদখলকৃত ক্লাবের রথি মহারথিরা ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের অপমান করতেও ছাড়ত না।

বঙ্গবন্ধু বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেন। মসজিদের পাশে ক্লাব আর ক্লাবে অনৈসলামিক কাজ বন্ধের উদ্যোগ নেন এবং অনতিবিলম্বে জবরদখলকারীদের ঐ স্থান হতে সরিয়ে দিয়ে সকল স্পোর্টিং ক্লাব বন্ধ করে দেন এবং স্থানটিকে বায়তুল মোকারারম মসজিদ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন।[৯৩]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। এটি বঙ্গবন্ধুর ইসলাম প্রীতি ও মূল্যবোধের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ ইসলামিক ইতিহাসের একটি বিশেষ দিন। ঐ দিন বাঙালি জাতির ইতিহাসের মহানায়ক, বিশ্বশান্তির প্রবক্তা ও ইসলামি জাগরণের অগ্রদূত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠনে বঙ্গবন্ধু যে উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তা ইসলামি জাগরণে শুধু উপমহাদেশে নয়, সারা বিশ্বকে আলোড়িত করার লক্ষ্যে প্রণীত।

বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন ইসলামের মাঝে লুকিয়ে থাকা ইসলামের শত্রুদের চিহ্নিত করে তাদের সমূলে উৎপাটন করতে হলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। তজ্জন্য যে বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেটি সাধারণ মানুষকে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষায় পরিপূর্ণ শিক্ষিত করে তোলা।

---

৯২. আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন '*বঙ্গবন্ধু ও ইসলাম*' কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু রূপ প্রকাশক, ১৯৯৭, পৃ. ১২০

৯৩. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমাশক্তির ভাড়াটে মোল্লাদের উপর নির্ভরতা ও তাদের অপব্যাখ্যার অকল্যাণ হতে জাতিকে মুক্ত করতে হলে প্রচুর ইসলামি গ্রন্থ প্রয়োজন। ইসলামের বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা প্রচারের সাথে সাথে বর্ণচোরা ও ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্নদের স্বরূপ উদঘাটন করে মুহাম্মদ (স) এর ইসলামকে পরিব্যপ্তত করাকে বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

বায়তুল মোকাররম মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মার্কেট তিন একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ তিন একর জায়গা বঙ্গবন্ধু নিজ উদ্যোগে মসজিদের নামে বরাদ্দ ও বিনা সেলামিতে রেজিস্ট্রি করে সরকারের পক্ষে মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। এর পূর্বে বর্ণিত স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্য সরকারি কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ইসলামি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপনের যে ব্যাপক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় তাও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ হতে নিজ উদ্যোগে চালু করেছিলেন। সিরাত মজলিশের ব্যানারে অনুষ্ঠিত ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স.) এর সমাবেশও বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণায় শুরু হয়েছিল এবং তিনি এর প্রথম সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সিরাত এর গুরুত্বকে সবার উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন।[৯৪]

স্বাধীনতাপূর্ব মাসিক মদীনা নামক ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন মাওলানা মহিউদ্দিন খান। স্বাধীনতা যুদ্ধে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মহিউদ্দিন সাহেবের পত্রিকা অফিসটি কিছু ভূগ্রাসী জবর দখল করে নেয়। অনেক চেষ্টা তদ্বির করেও তিনি অফিসটি উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন না। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমানও ছিলেন মদীনা পত্রিকার পাঠক। সে সূত্র ধরে মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যান। ঘটনাটি শুনে বঙ্গবন্ধু গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমার দেশে এমন সাহস কার? যে একটি ইসলামি পত্রিকার অফিস দখল করবে? পরদিনই মহিউদ্দিন সাহেব তাঁর বেদখলকৃত পত্রিকা অফিস ফেরত পেয়েছিলেন।"[৯৫]

নামাজ ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। বঙ্গবন্ধু বুদ্ধি হওয়ার পর হতে কোনদিন সজ্ঞানে নামাজ ও রোজা ক্বাজা করেননি।

জাতির জনক অনেক রাতে ঘুমোতে গেলেও খুব ভোরে নামাজ পড়ে, কোরান তেলাওয়াত করে নিচে হাঁটতে নামতেন। তিনি আল্লাহ্‌র উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে কর্মজীবন শুরু করতেন।[৯৬]

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বায়তুল মোকাররম মসজিদে বঙ্গবন্ধুকে প্রথম খুব কাছ হতে দেখেন মাওলানা সৈয়দ ইসলাম। ঐদিন নামাজ শেষে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ্বও যাকাত ইসলামের এ পাঁচটি স্তম্ভকে আমাদের জীবনের পাঁচটি স্তম্ভ হিসেবে মনে করতে হবে। মুসল্লি ভাইয়েরা আপনারা আমাকে দোয়া করবেন আমি যেন কোন দিন

---

৯৪. আহমদ সেলিম রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

৯৬. ফারুক আহমদ বাচ্চু, "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান", অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিল*, ঢাকা : সুচয়ন প্রকাশন, ১৯৯৬, পৃ. ৮২

নামাজ ক্বাজা না করি। আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারি। আমি আপনাদের সেবক, ইসলামের গোলাম। ইসলামের প্রকৃত বিকাশই আমার লক্ষ্য। কোন অবস্থাতে আমি ইসলামকে নিয়ে কাউকে ব্যবসা করতে দেব না। আমি ইসলামকে জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করব ইনশা'ল্লাহ। জাতীয় মসজিদে আপনাদের আমি কথা দিচ্ছি আগামী দুই বছরের মধ্যে ইনশা'ল্লাহ্ আমি শিক্ষার সর্বস্তরে কুরআন-হাদিসের আলোকে প্রকৃত ইসলামকে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব।" অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মুনাজাতের ভঙ্গীতে হাত দুটো তুলে মিষ্টি সুরে পড়তে শুরু করেছিলেন, "মুসা বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন।"[৯৭]

স্বাধীনতার অনেক আগেই বঙ্গবন্ধু বিদগ্ধ আলেমদের নিয়ে গঠন করেছিলেন আওয়ামী উলেমা পার্টি। উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে ইসলাম সম্পর্কে যাতে উলেমায়ে কেরামদের সুচিন্তিত অভিমত ও সুপারিশ পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় কোন সিদ্ধান্ত, কোন প্রজ্ঞাপন বা বিধিবিধান জারির পূর্বে বঙ্গবন্ধু উলেমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। ইসলাম আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তা সাথে সাথে পরিত্যাগ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিতেন।[৯৮]

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকাস্থ আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামি শিক্ষা সেমিনার উদ্বোধন করেন।[৯৯]

ঐ সম্মেলনে সৈয়দ ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আলেমদেরকে বলেছিলেন, 'আমি একজন মুসলমান, আমার রক্তে ইসলামের তরঙ্গ, আমি ইসলামি উম্মাহ্‌র কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেব। তবে ইসলামকে নিয়ে কোন বাণিজ্য করতে দেয়া হবে না।"[১০০]

ইসলামে মানবাধিকার ও বঙ্গবন্ধুর চেতনা

স্থান, কাল, বর্ণ নির্বিশেষে ইসলাম সর্বাগ্রে মানুষে মানুষে সমতার বিধান প্রতিষ্ঠিত করে মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপনের যাবতীয় প্রচলিত রীতি-নীতির অসারতা প্রমাণ করেছে। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানুষের জীবনের সকল স্তরে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যা যথার্থই প্রয়োজন, ইসলাম তা সকল বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করেছে এবং প্রত্যেকের সমষ্টিগত মর্যাদা নিরূপণে যা প্রয়োজন, তা গ্রহণ করেছে। সুদৃঢ় ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় ইসলাম মানুষের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব এবং তার পরিণামবোধ এবং কর্মের অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারের মত সাধারণ অধিকারসমূহ এবং অর্থনৈতিক অধিকার নিরূপণ করেছে। পলায়নী মনোবৃত্তি ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় হতে যা

---

৯৭. আল-কুরআন, ২০:২৫-২৯
৯৮. কামরুজ্জামান লিটন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮
৯৯. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭
১০০. প্রাগুক্ত

মানুষকে রক্ষা করে, তার দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা মানুষের জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা সমষ্টি ও ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করে তাকে শীর্ষ স্থানে উপনীত করবে।

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা, সহজাত ক্ষমতার সৃজনশীল বিকাশ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার। এগুলো এমন অধিকার যেগুলো ব্যতীত মানুষ সত্যিকার মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে না। অধিকারগুলো মূল্য ও মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং মানুষরূপে জন্মলাভ করার কারণে তার জন্মগত অধিকার। সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব।[১০১] তাই সৃষ্টিকর্তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সমভাবে এ অধিকারগুলো প্রদান করেছেন। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বলেই সম্ভবত এসব অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার বলা হয়। Encyclopedia Britannica-তে এ অধিকারগুলোকে প্রাকৃতিক আইনের আওতায় প্রাপ্য মানুষের অধিকার হিসেবে অভিহিত করে বলা হয়েছে- æRights thought to belong to the individual under natural law as a consequence of his being human”[১০২] প্রকৃতপক্ষে মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সহজাত, সর্বজনীন ও অহস্তান্তরযোগ্য (Inalienable) কিছু অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার।[১০৩]

UNO এর Universal Declaration of Human Rights, 1995-এর Preamble-এ মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে æ... recognition of the inherent dignity of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom justice and peace in the world.”[১০৪] অন্যভাবে বলা যায়, æHuman rights are mostly inherent and natural rights. The execution, Preservation of enjoyment of these rights are not aboigenetic. Without the effective environmental and structural foundation the enjoyment of human rights is simply impossible.”[১০৫]

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা ও ভাষণে ইসলামী চেতনা

পাকিস্তানের কারাগার হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে বঙ্গবন্ধু ভারতের নয়াদিল্লীতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সে ভাষণটি একজন রাষ্ট্রনায়ক কিংবা বিজেতার শুধু নয়, একজন মহান ধর্মপ্রচারকের

---

১০১. আল-কুরআন, ১৭:৭০

১০২. *The New Encyclopedia Britannicaq*, Founded 1768, 15th edition, printed in U.S.A, Vol. 5, P. 200

১০৩. U.N.O-এর "Universal Declaration of Human Right", 1945-এর Preamble.

১০৪. Moses Moscowity, *Human Rights and World Order*, New Yark : Occana publication, inc., Appendix-1, P. 199

১০৫. Begum Rokeya, "Human Rights-An overview in Historical Perspective" *The Journal of Social Development*, Vol. 12, No.-1, Dec., 1997, P. 185

সফল পরিসমাপ্তির শুকরানামূলক বক্তব্য হিসেবেও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারও জন্য কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে, অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অপ্রকৃতিস্থতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে।"[১০৬]

পাকিস্তানি শাসক ও দোসররা লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে, অগণিত রমণীকে ধর্ষণ করেছে। তারা প্রায় দেশটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সাল হতে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের নাগরিক ও বঙ্গবন্ধুকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। বিজয়ের পর কোন সাধারণ রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে জঘন্য অত্যাচারী শাসককুল ও তাদের নৃশংস সহযোগীদের এমন উদারতা দেখাতে পারতেন না। আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট ও ইসলামের পবিত্রতা বিধৌত পুত চিত্তের অধিকারী ছিলেন বলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এমন উদারতা দেখানো সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পাপাচার ও অধর্মের বিরুদ্ধে অর্জিত জয়কে বঙ্গবন্ধু আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ মনে করতেন। তাই সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে অর্জিত জয়কে পরিতৃপ্তির সোপান অভিহিত করে সমস্ত বিদ্বেষকে মুছে দেয়ার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন।

বিদায় হজ্বের ভাষণে হযরত মোহাম্মদ (স.) বলেছিলেন, "হে মানুষ, তোমরা আমার কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শোন। মনে রেখ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ।"[১০৭] বিদায় হজ্বের ভাষণের সম্প্রীতিপূর্ণ উক্তির অনুস্মরণে বঙ্গবন্ধু হযরত মোহাম্মদ (স.) এর একজন উম্মত হিসেবে পার্থিব প্রতিশোধের কথা না বলে বঙ্গবন্ধু মানবতা ও ইসলামি মূল্যবোধকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। ভ্রাতৃত্বের পরশে উদ্ভাসিত করেছেন ইসলামকে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকে জয়ী করে মহান আল্লাহ্ সত্যকে সমাগত ও মিথ্যাকে অপসৃত করেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে ইনশা'ল্লাহ্ বলার সময় আকাশের দিকে ডানহাতের আঙ্গুল তুলে পরম সৃষ্টিকর্তার মহিমাকে বিকশিত করে তাঁর প্রতি নির্ভর ও বিশ্বস্ত থাকার অনিন্দ্য প্রমাণে জনগণকে জানিয়ে দিতেন–"সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ, জনগণের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্। জনগণের কল্যাণের জন্যই আমি আল্লাহ্র গোলাম হয়ে আপনাদের সেবা করব।" তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই আঙ্গুলে এত ক্ষমতা এত সম্মান এত সাহস ও এত বিচক্ষণতা দিয়ে বিশ্বস্ততার মর্যাদা প্রদান করেছেন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামি আদর্শ প্রতিপালনে একটি বেহেশতি সওগাত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা বাংলায় যারা কথা বলো না, তারা এখন থেকে বাংলার মানুষ হও।

---

১০৬. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০
১০৭. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৭, পৃ.১২৩

ভাইরা, তাদের (বিশ্বাসঘাতক) গায়ে হাত দিও না; তারাও আমাদের ভাই। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই; বাঙালিরা কেবলমাত্র স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করতে পারে, তাই না, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে।"[১০৮] ইসলাম ধর্মের মহান বাণীর প্রতিটি অনুসরণিকা বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এ অংশে পরম মমতায় ফুটে উঠেছে। ইসলাম ধর্মের মহান আদর্শে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এরূপ সার্বজনীন বক্তব্য প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন আল্লাহই তাকে জেল হতে বের করে এনেছেন। কুরআনে তার প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, "আমার পালনকর্তা একে (স্বপ্নকে) সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের উপর কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান কৌশলে সম্পন্ন করেন। তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"[১০৯]

আল্লাহ্‌তে সমর্পিত ছিলেন বলেই সৃষ্টিকর্তা তাঁকে আল কুরআনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাকিস্তানি কারাগারের মৃত্যুকুপ হতে বের করে নিয়ে এসেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে "বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র।"

ঘোষণা দিয়ে ইসলাম ও বাংলাদেশের জয়ধ্বনি করেছিলেন।[১১০] তিনি ইসলামি আন্দোলনের মহান নেতা বা খলিফাদের ন্যায় নিজেকে প্রেসিডেন্ট বা নেতা দাবি করেন নি। খুব সাধারণভাবে বলেছেন, "আমি বাঙালি, আমি মানুষ আমি মুসলমান।" মুসলমান কারও অকল্যাণ কামনা করতে পারে না, এমন কি শত্রুরও। ইসলামের ইতিহাসে এর নজির অসংখ্য। তারই প্রতিফলনে বঙ্গবন্ধু একইভাবে ইসলামি আদর্শের আলোকে উদ্বেলিত হয়ে বলেছিলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা আপনারা অসংখ্য বাঙালি হত্যা করেছেন, অসংখ্য বাঙালি মা-বোনের অসম্মান করেছেন, তবু আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন।"[১১১]

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে বঙ্গবন্ধু টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য– লেবেল সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসুলে করিম (স.) এর ইসলাম। যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন আমাদের সংগ্রাম সেই মুনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলাম

---

১০৮. কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
১০৯. আল-কুরআন, ১২:১০১
১১০. কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০
১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

বিরোধি আইন পাসের সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেন কেবল তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফায়াস্থা করে তোলার কাজে।[১১২]

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন বন্দুকের নল নয়, জনগণই ক্ষমতার উৎস। ইসলামে ক্ষমতা অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যদি তা কল্যাণের জন্য হয়। ক্ষমতা যদি শোষণের জন্য, অকল্যাণ কিংবা অসৎকাজের জন্য হয় তো সে ক্ষমতা অর্জন কিংবা অর্জনের চেষ্টা নিঃসন্দেহে পাপ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, "ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই, তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে–কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমার চা-ই চা-ই। সে শক্তি যোগাতে পারেন কেবল আপনারাই।"[১১৩]

কারণ শক্তির সাথে লড়তে হলে শক্তির প্রয়োজন। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তি সঞ্চয়ের প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন। ইসলামও ঐক্যের মাধ্যমে শক্তি অর্জনকে উৎসাহিত করেছেন। ঐক্যের চেয়ে বড় শক্তি আর নেই। জনসাধারণ তাঁকে এ সুযোগ দেয়ার পর তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "জনসাধারণের সংগ্রামের এই প্রথম বিজয়ের জন্যে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।"

এখানেও বঙ্গবন্ধু জনগণের যথাযথ মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেছেন। জনগণ নয়, আল্লাহই সার্বভৌমত্বের আধার। জনগণের জন্য এ সার্বভৌমত্ব নিবেদিত।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে উচ্চারিত 'ইনশা'ল্লাহ্' শব্দটি ছিল সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় গোষ্ঠীর কবর। ইনশা'ল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ যদি চান শব্দটি দিয়ে সমস্ত কিছু আল্লাহ্র ইচ্ছা কিংবা সন্তুষ্টিতে সমর্পণ করে দেয়া হয়েছে। ঐ একটি শব্দ দিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত ধর্মের মানুষকে তিনি নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ্ সেখানেই সন্তুষ্ট হবেন যেখানে মানবতার বন্ধন সুদৃঢ়, যেখানে কল্যাণের জন্যই সব কর্ম পরিচালিত। এর আগে ইনশা'ল্লাহ্ শব্দটি শতকরা ৩ জন বাঙালির কাছে প্রচলিত ছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর শব্দটির প্রচলন ৯৭ ভাগে উন্নীত হয়। এখন বাংলাদেশের ৯৭ ভাগ মুসলমান নিজের অজান্তে অবচেতন মনে কথা বলার সময় বঙ্গবন্ধুর প্রিয় 'ইনশা'ল্লাহ্' শব্দটি উচ্চারণ করে বসে।

ইনশা'ল্লাহ্র প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডাঃ এস এ মালেক বলেছেন, "That historic speech was that did not forget to say 'Insha Allah', i.e. if Allah pleases. It was for them to judge who still propagate that Bangabandhu had no faith."[১১৪]

---

১১২. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২

১১৩. দৈনিক পূর্ব-দেশ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০

১১৪. Dr. S A Malek, *Steam of Thought*, Dhaka : News and Views Publications, 1997, P. 29-30

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ইসলামে শাসকদের মর্যাদার স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমরা এ দেশের শাসক নই, আমরা এ দেশের সেবক– এ কথা মনে রাখতে হবে। জনগণের সেবার জন্যই আমরা নির্বাচিত হয়েছি এবং তাদের সেবাতেই আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।[১১৫]

ইসলামি রাষ্ট্রনীতির সাথে তাঁর এ বক্তব্যের সাযুজ্যতা খোলাফায়ে রাশেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নব নির্বাচিত গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু যে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণটি দিয়েছিলেন তার সাথে হযরত আলীর ঐতিহাসিক পত্রটির মিল রয়েছে। আল্লাহ্র উপর তার আস্থা ছিল হিমালয়ের মত অনড়। তাইতো গভর্ণরদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আল্লাহ্ ছাড়া কারো ভয় করবেন না। আমিও আপনাদের সাথেই আছি। আমার কাছে তওবা করে যান আপনারা স্বজনপ্রীতি করবেন না।"[১১৬]

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষনটি ছিল সর্বস্তরের জনগণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত স্থান হতে সরাসরি দেয়া তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। এ ভাষণটি রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে কার্যকর রাষ্ট্র পরিচালনার নিমিত্ত একটি অব্যর্থ দলিল হিসেবে স্বীকৃত। উপমহাদেশে ইতোপূর্বে আর কোন নেতা এত দূরদর্শী ও বাস্তবসম্মত দিননির্দেশনা ভরপুর ভাষণ দিতে পারেননি। ভাষণে বিধৃত উদ্দেশ্যগুলো ছিল যেমন মহৎ তেমনি প্রয়োগযোগ্য ও ফলপ্রসূ। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বঙ্গবন্ধুর এর নির্দেশনা অনুসরণ করলে সারা বিশ্ব উপকৃত হবে।

হযরত মোহাম্মদ (স.) বিদায় হজ্বের ভাষণে সমাবেত জনতার উদ্দেশ্যে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সে মহান আদর্শে লালিত বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ভাষণটির অনুসরণ আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তবে যারা অন্ধ, আল্লাহ্ যাদের গোমরাহ করে দিয়েছেন, মুনাফিক করে দিয়েছেন, ধর্মের কুসংস্কারে বেঁধে জাহান্নামের অতলে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে সকল বিশ্বাসঘাতকদের কথা আলাদা। সুখের বিষয়, স্বীকার না করলেও বঙ্গবন্ধু পরবর্তী প্রত্যেকটি সরকার বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের অধিকাংশ নীতি চেতন-অবচেতন মনে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো জনকল্যাণে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার প্রত্যেকটি মূলতঃ বঙ্গবন্ধু অনুসৃত নীতি-উপদেশের আলোকে নীত। ১৯ দফা কিংবা শত দফা, যাই হোক না কেন, কোনটি নতুন নয়, বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিফলন মাত্র। খালখনন কিংবা উপজেলা পরিষদ, দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা পল্লী উন্নয়ন সব কিছুই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা ও উপস্থাপনা হতে গৃহীত। যদিও অনেকে এগুলো নিজেদের আবিষ্কার বলে দাবি করে। বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড এত ব্যাপক ও বিশাল ছিল যে, যেখানে হাত দেয়া হোক না কোন প্রকৃতির মতই তাঁর জয়গান অবশ্যম্ভাবী বাধ্যকতায় অনিবার্য হয়ে উঠত।

---

১১৫. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫
১১৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিদায় হজ্বের ভাষণে হযরত মুহাম্মদ (স.) মুসলমানদের করণীয় বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনাগত বিপদ বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণে বঙ্গবন্ধুও সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কাছ হতে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি দেশবাসীকে শত্রুবন্ধুর স্বরূপ উন্মোচন করে সংকটজনক পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন দেশে মুনাফিক, জালিম ও ইসলামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মুনাফিকদের নিষ্ঠুর থাবা জনগণের উপর যে কোন সময় নেমে আসতে পারে সহিংস নিষ্ঠুরতায়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসর জালিমদের দ্বারা নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর নৃশংস আক্রমণের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শুরু করেছিলেন। কোথা হতে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু এবং কোথায় বর্তমান অবস্থান তা জনগণকে বোধগম্য করার লক্ষ্যে প্রারম্ভিক অবস্থানের ব্যাখ্যা প্রদান ছিল দূরদর্শী চিন্তার ফসল। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, একাত্তরে যেমন দেশবাসী তাঁর ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মোনাফেকদের উপর, দেশদ্রোহী ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীদের উপর এবং ছিনিয়ে এনেছিলে জয়, তাহলে আজকে কেন পারবে না? পাকিস্তানি শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকে দেশবাসী শুধু সাহায্য করেছিলেন তা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশও সাহায্য করেছিল। এটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি দেশবাসীর প্রতি আরও দেশপ্রেম বোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মানসিক দৃঢ়তা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেদিন তিনি দেশবাসীকে ইসলামি আদর্শে উদ্বেল হয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার আহ্বান করেছিলেন।

কৃতজ্ঞতাবোধ ইসলামের অনন্য আদর্শ। ইসলাম ধর্মে অকৃতজ্ঞ লোককে নিকৃষ্টতম মানুষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ভাষণে কৃতজ্ঞতাবোধের বিনীত প্রকাশ পরম লালিত্যে ফুটে উঠত। "আমি তাদের স্মরণ করি, খোদার কাছে মাগফেরাত কামনা করি, যারা এ দেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছে, আত্মহুতি দিয়েছেন।" শহীদদের মাগফেরাতের জন্য বিশাল জনসভায় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা বঙ্গবন্ধুর ইসলামি চেতনার গভীর স্বীকৃতির বহিঃপ্রকাশ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন দিয়েছিল তাঁদেরকেও তিনি স্মরণ করেছিলেন। তাঁর স্মরণের ভাষা ও কৌশলটা এমন উদার, বিচক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল যে, যাতে কুরআন-সুন্নাহ্‌র সাথে সংঘর্ষিক না হয়। কোন ইসলামি চিন্তাবিদ যদি এ জিনিসটি দেখে না থাকেন তো আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেখুন বঙ্গবন্ধু কোন অবস্থাতেই যতই আবেগপ্রবণ বা উদ্বেল থাকুন না কেন, ইসলামি নীতি আদর্শের ব্যাপারে কখনও ভুল করতেন না। কারণ ইসলাম শুধু বিশ্বাসের ছিল না, ছিল মজ্জাগত- ঠিক নিজের নিঃশ্বাসের মত। কারণ তিনি জানতেন ধর্ম মর্ম শক্তির স্বর্গীয় সুধার মত চির আকর্ষণীয়।

মুসলমান কে? কী তাঁর বৈশিষ্ট্য? পবিত্র কুরআানে আল্লাহ্ বারবার তা সবিস্তারে প্রকাশ করছেন, "যিনি ঈমান এনেছেন এবং সৎকর্ম করেছেন তিনিই মুসলমান।" অর্থাৎ শুধু ঈমান একজন মানুষকে মুসলমান করার জন্য যথেষ্ট নয়। কে শ্রেষ্ঠ মুসলমান? আল্লাহ্ বলছেন, যিনি ঈমান

এনেছেন, সৎকর্ম করেছেন, মিথ্যা হতে দূরে রয়েছেন এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন আর কোন কারণে প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে তা ব্যাখ্যাসহ অকপটে স্বীকার করেছেন- তিনিই প্রকৃত মুসলমান। এখানে বর্ণিত গুণাবলীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর রহমান পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ছিল। অতএব তিনি একাধারে খাঁটি ও শ্রেষ্ঠ মুসলমান। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনে এগুলো কীভাবে পরিস্ফুট করেছেন তা তাঁর শেষ ভাষণে উপস্থাপিত তথ্যে বিশ্লেষণ করলে অনুভব করা যায়। ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “ভায়েরা, বোনেরা আমার, আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা করেছি জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি।... আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের (পাকিস্তানি ও তার দোসরদের) বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাফ করেছি, তাদের আমি বিচার করিনি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এ জন্য যে, এশিয়ায়, দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম।” বঙ্গবন্ধুর এ অকপট স্বীকারোক্তিতে একটা জিনিস পরিস্কার, “বঙ্গবন্ধু কোনদিন কখনও কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি শুধু একটি ওয়াদা ছাড়া। কোন প্রতিজ্ঞাটি তিনি রাখতে পারেননি এবং কেন রাখতে পারেননি এবং রাখতে না পারাটি পাপের না কি পুণ্যের তা কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে বিশ্লেষণ করা যায়।

মহান আল্লাহ্ নিজেকে ক্ষমাশীল ভাবতে বেশি পছন্দ করেন। কুরআনে তিনি নিজেকে ক্ষমাশীল ও ক্ষমাকে স্বর্গীয় বলে অভিহিত করেছেন। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বঙ্গবন্ধুর ক্ষমা তথা ওয়াদা রাখতে না পারাটি স্বর্গীয় প্রমুগ্ধতায় একটি মহান পুণ্য হিসেবে চিহ্নিত। প্রকৃতির মত উদার না হলেও পক্ষে এমন পুণ্য অর্জন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মানুষ যাতে কষ্ট পায়, শান্তিতে বসবাস করতে না পারে- এজন্য পাকিস্তানি শাসক এবং তাদের দোসরেরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দেশের সমস্ত অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছিল। বাঙালিরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তজ্জন্য বুদ্ধিজীবিদেরকেও হত্যা করা হয়েছিল। বাঙালিরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তজ্জন্য বুদ্ধিজীবিদেরকেও হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের এ বিষয়টি জনগণের কাছে অকপটে স্বীকার করে ও ক্ষমা চেয়ে নিজেকে পুত করে নিয়েছেন। বুঝতে পেরেছিলেন, এরূপ মুনাফেকদের ক্ষমা করা উচিত হয়নি। কুরআনে মুনাফেকদের খুন করে ফেলার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। আবার ক্ষমা করার নির্দেশনাও আছে। দুটোর মধ্যে মহত্তমটিই বঙ্গবন্ধু বেছে নিয়েছিলেন। এটি করে তিনি আরও মহান মানুষে পরিণত হয়েছেন। তিনি শান্তির জন্য, ঐক্যের জন্য এটি করেছিলেন, যদিও মুনাফেকদের কাছে এগুলোর কোন মূল্য ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা এজন্যই পবিত্র কুরআনে মুনাফেকদের অভিশাপ দিয়েছেন।

দয়া আল্লাহ্র প্রতিভু, নবী করিম (স.) এর অন্যতম প্রকাশ। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করছেন, “আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেছিলে, যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরতা প্রদর্শন করতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত।”[১১৭]

১১৭. আল কোরআন, ৩:১৫৯

আজ যে সকল স্বাধীনতাদ্রোহী মুনাফেক রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে জনগণকে শোষণ করে যাচ্ছে, জাতির জনকের নামে অপবাদ ছড়াচ্ছে, ধর্মের নামে জনগণকে বিপথে পরিচালিত করছে তাদের জীবন আল্লাহ্‌র বদৌলতে বঙ্গবন্ধুর উছিলায় প্রাপ্ত অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত মুনিন হলে তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস বঙ্গবন্ধুর প্রতি পরম কৃতজ্ঞতায় বিনীত থাকা উচিত ছিল, উচিত ছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেদের বিলীন করে আল্লাহ্‌র কাছে কৃত পাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। কিন্তু তারা অকৃতজ্ঞ বলে তাদের কাছ হতে কেউ কৃতজ্ঞতা আশা করে না। বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান ও নাফরমানরাই অকৃতজ্ঞ হয়। ক্ষমা করার পরও তারা বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি, বরং আগের মতই হীন রয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ এরকম অকৃতজ্ঞদের উপর চির লানত বর্ষণ করেন।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ক্ষতবিক্ষত। বলা যায় ঠিক নবজাতকের মতই করুণ; না পারছিল হাঁটতে না পারছিল বলতে। চারিদিকে শুধু ধ্বংসের নির্মম ক্ষত। অসংখ্য প্রতিকূল আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় এন্টিবডি বাংলাদেশের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ছিল। এমন অবস্থায় সদ্যজাত বাংলাদেশ কত অসহায় ছিল তা সহজে অনুমেয়। পিতা বঙ্গবন্ধু পরম আদরে অসহ্য শ্রমের নিদারুণ আনন্দে তাঁর কামাল-জামাল, হাসিনা-রেহানা-রাসেলের চেয়েও গভীর স্নেহে বাংলাদেশকে তিল-তিল করে ক্ষমতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। জনগণকে বঙ্গবন্ধু তাঁর শেষ ভাষণে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "বিধ্বস্ত একটি দেশ এবং সাড়ে সাতকোটি ক্ষুধার্ত মানুষ ছাড়া হানাদার বাহিনী আর কিছুই রেখে যায়নি। ধানের গোলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় অত্যাবশ্যক কোন বিভাগ, দপ্তরই তারা অক্ষত রেখে যায়নি। এরূপ নিদারুণ অবস্থায় আমাকে শুরু করতে হয়েছে।" তিনি ভাষণে কীভাবে এরূপ অসহায় অবস্থা হতে দেশকে এগিয়ে আনেন তা উল্লেখ করে সমালোচকদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেষ ভাষণে সিস্টেম পরিবর্তনের বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ তথ্য-বিবরণ তুলে ধরেছিলেন। পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বঙ্গবন্ধুর ন্যায় আর কে বুঝবেন? তিনিই তো সর্বপ্রথম পাকিস্তানে সিস্টেমের সার্বিক পরিবর্তন এনেছিলেন। পাকিস্তানে ইসলামের নামে ২৩ বছর যে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড চলেছে বঙ্গবন্ধুই সে পাপ হতে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করে এনেছিলেন। তো বাংলাদেশে সিস্টেম পরিবর্তন করা হলে তা অবশ্যই জনস্বার্থে দেশকে ভালোবেসে দেশের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। কেউ যদি তার বিরোধিতা করে, ধরে নিতে হবে পাকিস্তানের তাবেদার গ্রুপের মতই তাদের চিন্তা চেতনা। যে লোক দেশটি স্বাধীন করল তাঁর কাছে দেশের দরদ কী তাদের চেয়ে কম? মা এর চেয়ে মাসীর দরদ বেশি মানে নিশ্চয় কোন গণ্ডগোল। ভাষণে বঙ্গবন্ধু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কেন সিস্টেম পরিবর্তন প্রয়োজন। দূরাচার কিছু নাগরিকের দুষ্কর্ম বন্ধ করার জন্য সিস্টেম পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। বলেছিলেন, "যে ঘুষখোর, যে দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চোরাচালান দেয়, তাদের সামাজিক বয়কট করতে হবে। গ্রামে গ্রামে মিটিং করে দেখাতে হবে- ঐ চোর, ঐ ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, ঐ ঘুষখোর। ভয় নাই, কোন ভয় নাই, আমি আছি ইনশাআল্লাহ্‌ আপনাদের উপর অত্যাচার করতে দিব না।" বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর স্পষ্ট কথা, "রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট

Dhaka University Institutional Repository

ভরে ভাত খেতে না পারে, কাপড় পরতে না পারে; বেকার সমস্যা দূর না হয়, তাহলে মানুষের জীবনে শান্তি আসতে পারে না।" তাই তিনি সবাইকে দায়িত্ববান ও পরিশ্রমী হওয়ার আহ্বান করেছিলেন, "আপনারা কাজ করেন, প্রাণ দিয়ে কাজ করুন।" আসলে তন্ত্র-মন্ত্র বড় কথা নয়, বড় কথা কাজ আর উদ্দেশ্য।

জনসাধারণের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আস্থা, নির্ভরশীলতা ও সহানুভূতি তাঁকে মহামানবে পরিণত করেছিল। জাতির পিতা হতে হলে যেগুণগুলো থাকা প্রয়োজন তার সবগুলোতে তিনি বিদূষিত ছিলেন। ধর্মীয় দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সত্যিকারের খাঁটি ঈমানদার, নিঁখুত মানুষ আর পরম পুণ্যবান। কারণ তিনি দেশপ্রেমিক, তিনি অসহায় মানুষের জন্য ভাবতেন, তিনি পরাধীনতার নাগপাশ হতে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ইসলাম যেখানে একটা দাস মুক্তি দিতে পারলে অপরিমেয় পুণ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেখানে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মুক্তি দিয়ে বঙ্গবন্ধু কত পুণ্য সঞ্চয় করেছেন তা হিসাব করে বের করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

জনগণ ছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি না ক্ষমতা বন্দুকের নলে। আমি বিশ্বাস করি ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে।" আল্লাহ্ চাহে তো আমাদের সকল প্রয়াস সার্থক হবে মহাপবিত্রতার বরপুত্র চাড়া আর কী! কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাদের প্রশান্তি কামনা করেছেন এবং নবী করিম (স.) এর মাধ্যমে বান্দাদের কল্যাণের সুসংবাদ জ্ঞাত করিয়েছেন।

"হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়।"[১১৮]

আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর বান্দাকে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে শেখানো স্বীকৃতি বঙ্গবন্ধুকে গভীর অনুরাগে সিক্ত রাখতেন। বঙ্গবন্দু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন আল্লাহ আলেমুন গায়েব। পৃথিবীর সব কিছু তার নখদর্পণে। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় নির্বাহের সমস্ত দোষগুণ জনসমক্ষে বক্তৃতার সময় প্রকাশ্যে প্রকাশ করে দিতেন, যাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়; কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি না করতে হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে সরকারের কর্মকাণ্ড ও সম্পর্কে জনগণকে জ্ঞাত করে ইসলামি আদর্শের এমন লোকের পক্ষে এক বিন্দু পাপ করা কীভাবে সম্ভব?

শেষ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নাই। একটি লোককে আপনারা ভিক্ষা দেন টাকা কি আট আনা। তারপর তার দিকে কীভাবে চান, বলেন- ও বেটা ভিক্ষুক, যা বেটা নিয়ে যা আট আনা পয়সা। একটা জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে, আমারে খাবার দাও, আমারে টাকা দাও, সেই জাতির ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না।" এরূপ সহজ সরল অপ্রিয় সত্য কথা বলার মত সাহস আর কোন নেতা রাখেন কী? ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু ভিক্ষুক জাতির নেতা না থাকার যে সংকল্প তা পরবর্তীকালে

১১৮. আল কোরআন, ১৪ : ২৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু যারা জাতিকে ভিক্ষুক বানিয়ে রেখে ফায়দা লুটতে চায় সে মুনাফেকের দল তাঁকে থাকতে ছিল না।

শেষ ভাষণে বঙ্গবন্ধু আটবার ইনশাআল্লাহ্সহ মোট নয় বার আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রগাঢ় নৈকট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরমকরুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তিনি নিজেকে নত করে জাতিকে আত্মসচেতন করে গড়ে তোলার প্রার্থনা করেছিলেন।

দুর্নীতি রোধ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু তাঁর শেষ ভাষণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ, সমবায় আন্দোলন, জাতীয় ঐক্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বোচ্চ আন্তরিকতায় কাজ করার জন্য জনগণকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। যারা সাধারণ জনগণকে কষ্টে রাখে, পাপ-পুণ্য কিংবা ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে ভোগ বিলাসে মত্ত কিংবা বাংলাদেশের মত গরিব দেশের জনগণের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মানবতার অপমানে লিপ্ত তাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "তোমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ কর। ওই সম্পদ দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যয় কর। তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে। আজকে তোমরা মনে করছ আমি গরিব-

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের
করেছো অপমান,
অপমানে হতে হবে তাদের
সবার সমান।'

উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো বিখ্যাত কবিতা বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমানের ঠোটস্থ ছিল। তিনি নিয়মিত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতা আবৃতি সহকারে পড়ে মুখস্থ করতেন। গুণগুণ শব্দে কুরআন কিংবা কবিতা আবৃতি সহকারে বঙ্গবন্দু যখন ৩২ নম্বর বাড়ির নিচে নেমে হাঁটতেন তখন তার পালিত পায়রাগুলো বাকবাকুম শব্দে বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি চলে আসত। আয় আয় শব্দে আহ্বান জানাতেই পরম নির্ভরতায় বঙ্গবন্ধুর হাতে এসে বসতো। ... যেন এটাই নিয়ম একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে শুভেচ্ছা জানানোর।

বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়িতে প্রায় ১২টির মত কবুতর ছিল। আশপাশ হতে আরও কয়েক ডজন এসে মাঝে মাঝে যোগ দিত। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পায়রাগুলো আর কখনও ডাকেনি। বঙ্গবন্ধুকে দেখতে না পেয়ে পায়রাগুলো খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। এবং দু' একদিনের মধ্যে সবগুলো পায়রা কোথায় যেন হারিয়ে যায় অজানায়। হয়তঃ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আল্লাহ মানুষের জন্যই জাহান্নাম করেছেন। পাখিদের জন্য নয়। যে দেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর মত মহামানব হত্যা করা হয় সে দেশটি জাহান্নাম ছাড়া আর কী? ওখানে শান্তির দূত পায়রা থাকবে কী করে?[১১৯]

---

১১৯. সৈয়দ আবির, *ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২৩১

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রণয়ন বঙ্গবন্ধুর ইসলামি চেতনার বিকাশ

বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইসলাম ও ইসলামি-গণতন্ত্র প্রেমী। ইসলাম আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে পরম ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকার করে না, বঙ্গবন্ধুও সে মতের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক ও তাঁদের দোসর ধর্মবাজরা মনে করত ব্যক্তিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাই পাকিস্তানের গভর্ণর এবং গভর্ণর জেনারেলগণকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে কোন কারণ ব্যতিরেকে নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা তাঁরা সংরক্ষণ করতেন।

তাই বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত প্রতিনিধিকে গভর্ণর কিংবা গভর্ণর জেনারেল বা প্রেসিডেন্টের হাতের পুতুল হতে মুক্ত করে জনপ্রতিনিধি হিসেবে স্বাধীন ও স্বকীয় সত্তায় অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। জনপ্রতিনিধির মর্যাদা বৃদ্ধি ইসলামি শাসনতন্ত্রের অপরিহার্য নীতি। তাই জনপ্রতিনিধির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তিনি পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশনে সোচ্চার হয়েছিলেন, æDo not give absolute power to one man who is not our representative- may be he is the Head of the state. But I say: Absolute power corrupts absolutely.”[১২০]

করাচির এ্যাসেম্বলি সেন্টারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে লালন ও শক্তিশালী করার জন্য জোরালো যুক্তির মাধ্যমে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু আইন পরিষদে বলেছিলেন, গভর্ণরেরা যেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধি নন এবং যেহেতু ইসলাম এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করা হতে বিরত থাকার জন্য বলেছেন সেহেতু তাঁদের অসীম ক্ষমতা প্রদান বাঞ্ছনীয় নয়। এটি ইসলামের পরিপন্থী এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর। গভর্ণর জেনারেল জনমতের তোয়াক্কা না করে মর্জি-মাফিক তথাকথিত অসন্তুষ্টি কিংবা জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ৯২(এ) ধারা বলবৎ করে বসেন এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে ক্ষমতাচ্যুত ও ধর-পাকর শুরু করেন। এটি জনগণের প্রতি চরম অবমাননা এবং তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্রের অনৈসলামিক কার্য ছাড়া আর কিছু নয়। এদিকে ইঙ্গিত করে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, “People have elected their representatives and one fine morning we see in the paper, the Governor-General is satisfied and section 92A is imposed and arrests are made, I appeal to them to the name of democracy, in the name of Pakistan : Do not give power to a particular man who is not your representative.”[১২১]

---

১২০. *Karachi*, Thursday, the 22nd September, 1955.
১২১. Ibid, Wednesday, the 28th September, 1955

পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি কখনও ইসলামি আদর্শের অনুসারী ছিলেন না; বরং ইসলামের নামে তাঁরা বরাবরই অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে গিয়েছেন। সম্পদের সুষম বণ্টন ইসলামি শাসনতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও শাসক চক্র তার উল্টোটি করে যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু এটি বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন ইসলামি শরিয়া বিষয়ে ঋদ্ধ এক মহান চিন্তাবিদ। তিনি বলতেন, ইসলামের নামে পাকিস্তান যা করছে তা মোনাফেকি। তিনি আইন পরিষদে ইসলামের নামে পাকিস্তানি শাসক চক্রের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ও অত্যাচার-অবিচারকে বজ্রকণ্ঠে সপ্রমাণ তুলে ধরেছিলেন, æSir, we declare to the world that we are Islamic country and will follow Islamic principles. Now, is it following the Islamic principles when you give Rs. 6,000 to the Governor while the poor people of our country aer dying to starvation and hunger? Sir, the people of my country have not any shelter. They cannot get food, they cannot get clothes, and sometimes respectable women have to sell their honor for food and cloth. Now, Sir, whose money is it that we are going to spend? It is the money of the poor cultivators of this country- the jute and cotton cultivators and it is the money of the common man who pays taxes and out of those taxes we are going to pay Rs. 6000 per month to the Governor. Sir, we pretend that we are an Islamic country, but a peon here get Rs. 50 per month.. a clerk gets Rs. 100.. and in this Islamic Country these leaders of Islam will get Rs. 6000 per month. Now is it Islam, about which we are boasting too much and about which we are declaring from the house-top."[১২২]

করাচিতে ফেডারেল ও প্রাদেশিক রাজধানীর গভর্নরদের অতিরিক্ত বেতন প্রদান বিষয়ে তিনি কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন, "যখন দেশের হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরে যাচ্ছে, সম্ভ্রান্ত রমণীরা পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালায় নিজের ইজ্জত বিকোতে বাধ্য হচ্ছে সেখানে ইসলামি রাষ্ট্রনামে আখ্যায়িত পাকিস্তানের গভর্ণর নামের নেতাদের ৬০০০ টাকা মাসিক বেতন ইসলামি চেতনা ও মূল্যবোধের অন্তরায়।[১২৩]

তাদের উদ্দেশ্য ইসলামি মূল্যবোধকে ধ্বংস করে শোষক ও মুনাফিক তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

যখন পাকিস্তানের গভর্ণরেরা মাসিক ৬০০০ টাকা বেতন নিচ্ছিলেন তখন ৬০ কোটি মানুষের নেতা মাও সেতুং এর মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। তখন পৃথিবীর কোন দেশে গভর্ণর, প্রেসিডেন্ট কিংবা সরকার প্রধানের বেতন ৬০০০ টাকা ছিল না। তা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু

---

১২২. Ibid, Wednesday, the 28th September, 1955.
১২৩. আইন পরিষদে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ১৯৫৫

বলেছিলেন, æI see citizen of Pakistan lying on the footpaths under the open sky and side by side there are palatial buildings with beautiful cars. This is the position in and Islamic country. Here our Ambassador at Washington and in that rich country of America, President Eisenhower get less than that. .. I will ask my friends not to insult Islam any more, You have no right to talk of Islam when you are going to pay Rs. 6000 to your Governors."[১২৪]

পূর্ব পাকিস্তান শুধু নয়, পাকিস্তানের যে অংশেই হোক না কেন, নির্যাতিত জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি রাজপথের ন্যায় সংসদেও উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। সংসদ সদস্য হিসেবে নিজের কিংবা নিজেদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর বিষয়ে বর্তমানের ন্যায় আত্মমগ্নিক চিন্তা করার অবকাশও বঙ্গবন্ধু কখনও পাননি। যেখানে হাজার-হাজার, লাখ-লাখ লোক অভাবে অনাহারে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে সেখানে ভোগবিলাসের জন্য কষ্টপীড়িত জনগণের অর্থ হতে নিজেদের আরাম আয়াসের সামগ্রী ক্রয় কোন অবস্থাতে ইসলামি চেতনার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে না। যারা এসব করে তারা ইসলামের শত্রু, মানবতার দুশমন। তাই মাঠের মত সংসদেও সবাইকে শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। চেষ্টা করতেন নিজেদের আত্মবোধ জাগিয়ে তুলে সুপ্ত চেতনাকে সক্রিয় করার। The people East Pakistan will come to realise that they have been deceived... The four by electric will prove that the public cannot be deceived so easily.[১২৫]

এখনকার মত তখনও গণপরিষদের অধিবেশনের নামে গালগল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হত। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধু মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। তিনি চাইতেন জনগণের কল্যাণ হোক, সুবিধাবাদীদের সুবিধা কিছুটা কমিয়ে নির্যাতিত ও নিরীহদের কল্যাণে ব্যয় করা হোক। যাদের ম্যান্ডেট নিয়ে গণপরিষদে আসার সৌভাগ্য হয়েছে তাদের কথা বঙ্গবন্ধু এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারতেন না। গণপরিষদে বসে হযরত ওমরের (রা) আদর্শে উদ্বেলিত হয়ে সে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নেতাদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করতেন। গরিব জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কল্যাণের করার চেষ্টা করতেন। গরিব জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কল্যাণের নামে অযথা সময় ক্ষেপণ এবং নিজেদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিলের পরে বিল এনে রাষ্ট্রীয় অর্থলোপাটকে পাপ ও নেতাদের চারিত্রিক স্খলনের প্রমাণ উল্লেখ করে বরাবরই এর বিরোধিতা করেছেন, æBut may I ask why have you called us to

১২৪. *Karachi*, Wednesday, the 28th September, 1955
১২৫. Ibid.

assemble here today only for a couple of days spending lakhs of rupees for the short meeting."[১২৬]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জাতির আত্মসচেতনতার পরিমাপক। গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে হলে সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। সংবাদপত্র জাতির বিবেককে জাগ্রত করে। বাকস্বাধীনতা আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রাখা উচিত বলে বঙ্গবন্ধু মনে করতেন। কিন্তু সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ক্ষমতার কষাঘাতে জর্জরিত করে রেখেছিল। জনগণ যাতে আত্মসচেতন হতে না পারে, তাদের বিবেক যাতে নির্লিপ্ত রাখা যায় সেজন্য শাসকগোষ্ঠী হীন প্রয়াসের মাধ্যমে সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতাকে শেষ করে দেয়ার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল। পাকিস্তানের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার করুণ অবস্থা বর্ণনা করে বঙ্গবন্ধু আইন পরিষদে বলেছিলেন, æSir, we are members of this House, but, you will be surprised to know that every letter of ours is censored, ... our phones are being trapped, ...Do you know that in East Bengal how the editors are called and it is said you can not wrie this, you cannot write that... A sub-inspector goes on behalf of the Government to stop Press from writing a particular thing."[১২৭]

গণপরিষদের অধিবেশনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আনীত সংশোধনীর উপর বক্তব্য রাখার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন-

> I want to tell them that today you are in power; tomorrow you may not be in power, you may be in Opposition ; then this 144 may be used in your meetings. In the name of Islam which you utilize for vote please accept the amendment and show to the country and to world that this is an Islamic Constitutions, and your country is a democratic country."[১২৮]

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি পাকিস্তান আইন পরিষদে পাকিস্তানের সংবিধানের খসড়া নিয়ে বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ যে ব্যক্তব্য প্রদান করেন তা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সংসদীয় বক্তব্য হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐ বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু মানবাধিকার, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ও মাতৃভাষা প্রশ্নে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং ইসলামিক ইতিহাসের আলোকে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তা কেবল একজন ইসলামি বিশেষজ্ঞের পক্ষে সম্ভব। এটি প্রমাণ করে যে, বঙ্গবন্ধু ইসলামি ইতিহাস, কুরআন, সুন্নাহ্, ইসলামি দর্শন ও চিন্তাচেতনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের ন্যায় ঋদ্ধ ছিলেন। মক্তবের

---

১২৬. Ibid.
১২৭. *Karachi*, Friday, the 3rd February, 1956
১২৮. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

সাথে পরিচয় হওয়ার পর এমন কোন দিন তার যায়নি, যেদিন তিনি কোন ইসলামি জ্ঞান-তথ্য আহরণ হতে নিজেকে বিরত রেখেছেন।[১২৯]

খসড়া সংবিধানে ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে যে অনৈসলামিক ভেদপ্রথার বিধান রাখা হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি স্পীকারকে উদ্দেশ্য করে জাতিকে বলেছিলেন, æIt begins with the name of Constitutions for Islamic Republic of Pakistan. Sir, we want to make an Islamic Republic of Pakistan. The name is already her. May I ask a question from my Nizam-i-Islam friends, particularly and from the members of teh United Front, whether a non-Muslim can preside over the Constituent Assembly to frame an Islamic Constitution or not? Sir, I have respect for you. It is, I think and I feel, that my country has given a non-Muslim the responsibility for a little while over this sovereign body of Pakistan, but we have started in the name of Allah, but Sir, when a non-Muslim who does not believe in La-ilaha Illal-Lah Muhammadur Rasulallah, who does not believe in the Prophet of Allah, can preside over such a constitution-making body as ours? I know that I will get an answer from Holy Quran or from the Sunnah or from the history of Islam or from the history of the Muslim Rule."[১৩০]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও প্রচলিত অন্যান্য ভাষাগুলোর মর্যাদা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর মতামত বরাবরই ছিল ইসলামি মতাদর্শ প্রসূত গণতান্ত্রিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার বিশ্ব বিস্ময়কারী বিজয়ের পরও পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভিন্নভাবে বাংলাভাষার মর্যাদা ও প্রচার-প্রসারকে ভূলুণ্ঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিল। বাংলাভাষাকে কৌশলে যথামর্যাদা হতে বঞ্চিত করার জন্য সরকার রাষ্ট্রীয় ভাষা, অফিসিয়াল ভাষা এবং জাতীয় ভাষা নাম দিয়ে তিন-তিনটি হাস্যকর শব্দ সৃষ্টি করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে বাংলাকে দ্বিতীয় শ্রেণির ভাষা ও বাঙালিকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা। এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সংসদে সংবিধানে এসব ভাষা সম্পর্কীয় হাস্যকর শব্দের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে শাসক গোষ্ঠীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, æWhen you were a minister in Bengali in 1948 when I started State language movement, you asked your police to lathi charge me and I know my feeling about this question because was lathi charged by your police and I also I was sent

---

১২৯. খতিবে আজম মৌলানা সিদ্দিক আহমদ, কক্সবাজার, চকোরিয়া বড়ইতলী। [উদ্ধৃত- সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪-২৫৫]

১৩০. *Karachi*, Friday, the 3rd February, 1956

Dhaka University Institutional Repository

to jail.– Bengali and Urdu should be the state language of Pakistan from today and towards."[১৩১]

What is the lanuage of Islam, Sir, Arabic, Urdu, Persian, or Bengali. What is the language of the Mussalmans, who will judge it? My friend says urdu. I would say Bengali. Persians will say persian. Turks will say Turkish, Indonesians will say Indonesian. Other people will say their own language.[১৩২]

পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি ইসলামি লেবাসধারী ধর্ম ব্যবসায়ীদের কাছ হতে যৌথ নির্বাচনকে ইসলাম বিরোধি মর্মে ফতোয়া আদায় করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ সহ তুলে ধরেন, "যদি যৌথ নির্বাচন পাপ হয়ে থাকে তাহলে আমরা পাকিস্তানিরা সবাই পাপী কারণ বিগত সাত বছর যাবৎ পাকিস্তানে যৌথ নির্বাচনই হয়ে আসছিল। According to the fatwa, Sir, the Muslims all over the world are kafirs because they vote jointly. I will justly point out how the Muslims of different countries are voting jointly and yet they are the true followers of Islam. In India the four crores of Muslims are voting jointly. In Indonesia, the Muslims, Christians, the Chiness and Buddists, they are all voting jointly. Seven crores of Muslims in Indonesia who are also staunch followers of Islam vote with the Christians and other communities. In Burma Buddhists and Christians vote with Muslims. In Lebanon, Syria, Egypt and Iran everywhere the Muslims are giving joint votees with Christians and jews etc. and still they are the true Muslims.[১৩৩] এ রকম মিথ্যা ফতোয়াবাজদের জন্য আল্লাহ্ কঠোর আজাব রেখেছেন। কয়েকটি টাকার জন্য লোভী ফতোয়াবাজরা কুরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে ইসলামকে ধ্বংস করার খেলায় মেতে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুকে এ বক্তব্য ও অনুরূপ প্রচারণার মাধ্যমে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ্র দ্বীনকে রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। খতিবে আজম মৌলানা সিদ্দিক আহমদকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, যৌথ নির্বাচন ইসলাম বিরোধী নয়। পাকিস্তানিরা তাদের স্বার্থে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এমনটি ঘোষণা করেছিল।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "Power is nobody's monopoly. Power may come and power maygo but the people will continue, the country will continue. I

---

১৩১. Ibid, Tuesday the 7th February 1956
১৩২. Ibid.
১৩৩. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

am putting all this things in the direct way. I am a direct man myself. I was speaking about regional autonomy and parity in all respects. Sir is it against Islam also? I don't know when the fatwah will come from our Maulanas that this is also against Islam as may friend. Mr. Farid Ahmed Choudhury. You can jail us, Some times we hear that our lives in danger, but we are not afraid They want to destroy the Pakistan in the name of Islam."[১৩৪] ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধ ধ্বংসকরণে পাকিস্তানি শাসকচক্র তাদের দোসর ধর্মবাজদের দিয়ে নিত্য নতুন ফতোয়া বানিয়ে ধর্মপ্রাণ জনগণকে প্রতারণা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। তিনি বলেছিলেন, ... পাকিস্তানি মুসলমানের এক জাতি। পাসপোর্টে পাকিস্তানি খ্রিস্টান, পাকিস্তানি মুসলমান, পাকিস্তানি পারসিস, পাকিস্তানি বুড্ডিস্ট লেখার চেষ্টা প্রতিহত করা হবে।"

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা পররাষ্ট্রনীতি একটি দেশকে বিশ্বে পরিচিত করে তোলার প্রধান নিয়ামক। তৎকালীন ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সংবিধানের খসড়ায় এমন কিছু দফা রেখেছিল যা পক্ষান্তরে শুধু অনৈসলামিক নয়, সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। মূলত ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে ইহুদি লবিং চক্রান্তে এ দফাগুলো রাখা হয়েছিল। এর প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আনীত এক সংশোধনীর উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু আইন পরিষদের অধিবেশনে বলেছিলেন, ...We are categorically say that we are a Muslim State, then definitely we must make relations with other Muslim countries more cordial. Sir, might be if there is a war between Afghanistan and Pakistan other non-Muslim countries might help us. I do not think that any where in any constitution of the world, it is written that the state shall endavor to promote friendly relation with particular countries; no doubt we will do it, but why write in the constitution. For example, in the UNO in connection with Kashmir issue, there are so many non-Muslim countries that are friendly to us, we have to play politics. There is the Muslim country of Indonesia, which is friendly to India. Saudia Arabia is a kingdom, it is not a democratic country; no doubt we should be friendly with Saudia Arabia. Then there is Egypt and Iran... Today we may no be on good terms with India, but tomorrow we can be friendly with her. We can get more help from India than from any other

১৩৪. Ibid, Saturday, the 1st January, 1956

country. Great Britain is a country with whom we are friendly; we are still member of teh Commonwealth. Then why should we say that only with Muslim countries we will promote friendly relations. This is politics, you have to play it. Afghanistan is a Muslim country; but how can you be friendly simply because it is a Muslim country; but how can you be friendly simply because it is a Muslim country; when that country is claiming our land? How can we say that simply because it is a Muslim country, it must be our friend? ... we should say that we will have friendly relations with all the countries of the world unless they themselves make us enemies.[১৩৫]

১৩৫. Ibid, Saturday, the 4th February, 1956

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষতা : ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচিতি ও মূল্যায়ন

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শাসনামলে সম্পর্কে বলা হয়- তিনি ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার বা তৎকালীন নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্রে যে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করা হয়, তাতে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে কি অর্থে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ইহজাগতিকতা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তার কর্মকাণ্ড নাগরিকরা ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগতভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ভোগ করবে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক যেকোন ধর্মের অনুসারী হোক না কেন, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের সবার সমান অধিকার থাকবে। ধর্মীয় মতাদর্শের জন্য কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন সীমারেখা রয়েছে। সাংবিধানিকভাবে এই সীমারেখা নিশ্চিত করতে হবে।

এই সীমারেখার মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতা। ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মের যে সম্পর্ক রয়েছে, তার সাথে রাষ্ট্রকে কোনভাবেই জড়ানো হবে না। ব্যক্তি তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য তার পছন্দমত যেকোন ধর্ম পালন করতে পারবে। এই স্বাধীনতা একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্র ব্যক্তির এই অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।[১]

অপরদিকে রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যেও ধর্মকে টেনে আনা যাবে না। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ব্যক্তিকে নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস কোন অবস্থায়ই তার নাগরিক অধিকারকে স্পর্শ বা ক্ষুণ্ন করে না। এ ব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসের দরুন একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার যেমন ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে না, তেমনি রাষ্ট্র কোন অজুহাতে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আবার একাধিক ধর্মের অনুসারী সমাজে এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের ওপর কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার ধর্ম ও রাষ্ট্র নিজ নিজ সীমারেখা বা পরিমণ্ডলে উন্নতি লাভ করতে পারে। আবার একাধিক ধর্মের অনুসারী সমাজে এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের ওপর কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম ও রাষ্ট্র নিজ নিজ সীমারেখা বা পরিমণ্ডলে উন্নতি লাভ করতে পারে। তাতে করে গড়ে ওঠে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং পরমতসহিষ্ণু সমাজব্যবস্থা। আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল কথাও এটাই। এই দিক থেকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ পরমতসহিষ্ণুতাও নিতে পারি। বস্তুত আধুনিক গণতান্ত্রিক

১. মওলানা আবদুল আউয়াল, *বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মের নামে অসহিষ্ণুতা ও বাড়াবাড়ি রোধ করে ধর্মীয় নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও বঙ্গবন্ধু এই লক্ষ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[২] ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশনে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

> ‘ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের বাধা দিবার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই। হিন্দুরা তাঁদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার-বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।’[৩]

বঙ্গবন্ধু গণপরিষদে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে সামান্য কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ, একে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এ দেশে ধর্ম ব্যবসায়ের একটি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেন। এরপরও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ধর্মহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অভিযোগ সত্যের কতটা অপলাপ, ইতিহাসের কতটা যে বিকৃতি–তা কোন সচেতন পাঠকের নিকট ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরমতসহিষ্ণুতা আমাদের জাতিসত্তার অখণ্ডত্ব ও সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ–এমনকি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের যৌক্তিকতার মানদণ্ড। আর এজন্যই বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রকৃত গণতন্ত্রের মত ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরমতসহিষ্ণুতাও পবিত্র ইসলামের মহান শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশে পবিত্র ইসলামকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারকারী একটি বিশেষ শ্রেণী একদিকে গণতন্ত্রের কথা বলে। অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ‘ইসলাম বিরোধী’, ‘ধর্মহীনতা’ ইত্যাদি বলে সমালোচনা করে। হয় তারা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাস জানে না, নতুবা জেনেও না জানার ভান করে জাতিকে বোকা বানাবার অপচেষ্টা করছে। মূলতঃ গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গণতন্ত্রের ক্ষেত্র ধর্মনিরপেক্ষতার তুলনায় অনেক ব্যাপক। বলা চলে, গণতন্ত্রেরই পরিপূরক বিষয় হচ্ছে

২. খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১১১
৩. মওলানা আবদুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

ধর্মনিরপেক্ষতা। সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিক অবাধে তাদের ধর্মকর্ম পালন করতে পারে। আর যে সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হবে, ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরমতসহিষ্ণুতাকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অবাধ অধিকার ছাড়া গণতন্ত্রের ধারণা একটা প্রহসন বৈ কিছু নয়। মূলতঃ বিবেকের এবং নিজ নিজ জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করার স্বাধীনতা সকল প্রকার সত্যিকার গণতন্ত্রেরই ব্যবস্থা বিনষ্ট হওয়ার পর গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা তৎকালীন পৃথিবীতে ছিল না বললেই চলে। বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে পরমতসহিষ্ণুতার বাণী থাকলেও বাস্তবে তা ছিল না। সেকালে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের হানাহানি এবং বৈদিকদের হাতে বৌদ্ধদের নিধনযজ্ঞ এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার মাধ্যমে মানবসমাজে আবার গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরমতসহিষ্ণুতার ধারণার বিকাশ শুরু হয়। গণতন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: "তারা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজকর্ম সম্পাদন করে।"[৪]

মহানবীর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "(হে মুহাম্মদ) আপনি কাজে কর্মে (সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়) তাদের সাথে পরামর্শ করুন।"[৫]

বাস্তবেও আমরা দেখতে পাই, যোগাযোগবিহীন সেকালের বিশেষ সামাজিক পরিবেশের উপযোগী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাদের রাষ্ট্র পরিচালনায়ও গণতন্ত্র বা মৌলিক অধিকারের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

গণতন্ত্রের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ধর্মনিরপেক্ষতাও ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। ইসলাম বিশ্বাস করে, জোর করে কারো উপর চাপিয়ে দেয়া কোন সত্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে আর সত্য থাকে না। সত্যের অন্বেষণ এবং তা অনুসরণের অপরিহার্য শর্ত হলো বিবেকের স্বাধীনতা। বিবেকের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পবিত্র কোরআনে মহানবীকে (স.) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে: "এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করতেন তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর সবাই একযোগে বিশ্বাস স্থাপন করতো। তা সত্ত্বেও কি সবাই মুমিন বা বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত তুমি লোকদের উপর বলপ্রয়োগ করবে?"[৬]

বিবেক এবং নিজের মনোনীত জীবন পদ্ধতি অনুসরণের স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে পবিত্র কোরআনে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে : "ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ নেই।"[৭]

পরমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার জন্য মুসলমানদের উপদেশ দান প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: 'যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মিথ্যে মাবুদকে ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারাও শত্রুতাবশত না জেনে আল্লাহকে মন্দ বলবে।'[৮]

---

৪. আল-কুরআন, ৪২:৩৮
৫. আল-কুরআন, ৩:১৫৯
৬. আল-কুরআন, ১০:৯৯
৭. আল-কুরআন, ২:২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তাতে করে পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে মানুষের বিবেক ও জীবন-পদ্ধতির স্বাধীনতার কথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে পবিত্র কোরআনে একাধিক হুঁশিয়ারি বাণী রয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে : "আল্লাহ যদি মানবমণ্ডলীর এককে অপরের দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত না করতেন, তাহলে আল্লাহর নাম যেখানে অধিকমাত্রায় স্মরণ করা হয় সেসব ধ্যানালয় ও গীর্জা এবং ইহুদী ভজনালয় ও মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে যেতো।"[৯]

পবিত্র কোরআনের উপর্যুক্ত ভাষ্যে পরিষ্কার বলা হয়েছে, আল্লাহতা'য়ালা যদি ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর আক্রমণকারীদের প্রতিহত না করতেন তাহলে সকল ধর্মমতের ধর্মীয় স্থানগুলোই বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। আর এটাই তো ধর্মনিরপেক্ষতা। এই মহান লক্ষ্য সামনে রেখেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছিলেন। জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতিকে তিনি যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন নি তেমনি এ দেশের কোন সম্প্রদায়ের ধর্মকর্মে অন্য কোন সম্প্রদায় হস্তক্ষেপ করুক, তাও তিনি চান নি। ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে তিনি সে ব্যবস্থাই করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন ভাষণে এ কথাই একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে : "এ দেশের প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"[১০]

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের গোঁজামিলের রাষ্ট্রব্যবস্থার মত বাংলাদেশেও যাতে পবিত্র ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করার চেষ্টা করা না হয়, ধর্ম ও রাজনীতি যাতে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে সহবস্থান করতে পারে, তার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চেতনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, যেখানে সকল ধর্মের অনুসারীরা শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে অনুসরণ করতে পারবে নিজ নিজ ধর্ম। এ জন্যে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৭২ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশ গণপরিষদে প্রদত্ত এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানদের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধ ও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্ম নিরপেক্ষতা আছে। এর

---

৮. আল-কুরআন, ৬:১০৮
৯. আল-কুরআন, ২৩:৪০
১০. আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *স্বাধীনতার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : প্রকাশক মোঃ আব্দুল কাদের, ১৯৯৬, পৃ. ৬৯

একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আল-বদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না।”[১১]

বঙ্গবন্ধু যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছিলেন তা ছিল ইসলামী চেতনা, মূল্যবোধ ও আদর্শ এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্তার সাথে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের সুরা কাফেরুনে বলেছেন, ‘লা কুম দ্বীনকুম অলিয়াদীন’ অর্থাৎ যার যার ধর্ম তার তার কাছে। নবী করিম (দঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার উপদেশ দেন। মহানবী (স.) তাঁর বিখ্যাত মদীনা সনদে একটি সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রূপরেখা দিয়েছিলেন। মদীনা সনদই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে বড় দলিল। ইসলাম যে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে নয়, এটা হচ্ছে তার বড় প্রমাণ। চৌদ্দ শ’ বছর আগে মহানবীর (স.) মত ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা এমন করে আর কেউ বলেন নি। মদীনা সনদে বলা হয়েছে, “মদীনার ইহুদী, নাসরা, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করিবে, কেহই কাহারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।”[১২]

অতএব দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতা কোনোভাবেই ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ নয়। তিনি বরং ধর্মের পক্ষেই কথা বলেছেন, স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণভাবে যার যার ধর্ম পালনেরই বিধান করে গিয়েছিলেন। ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের পরিণাম যে কতটা অশুভ হতে পারে সে ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু চান নি এর পুনরাবৃত্তি হোক। এখনো অনেক মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া সরকারিভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তুরস্কও একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম রাষ্ট্র। এখানেও ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি অনুসৃত হচ্ছে। মিসর এবং সিরিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। অতএব বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ ছিল একটি সুচিন্তিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে নভেম্বরে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশে পাকিস্তান বেতারে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন:

‘আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামী বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য-লেবেল সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসূলে করিমের (স.) ইসলাম, যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান সে দেশে ইসলামবিরোধী আইন

---

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
১২. প্রাগুক্ত

পাসের সম্ভাবনা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফায়েস্থা করে তোলার জন্য।'[১৩]

পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলার ইতিহাসের বৃহত্তম জনসমাবেশে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

'বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না।'[১৪]

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণদানকালে পবিত্র ইসলাম সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু যে কথা বলেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক জনসমুদ্রেও তিনি তার ব্যতিক্রমটি বলেন নি। এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় পবিত্র ইসলাম বা ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক কপটতা ছিলো না। তিনি আন্তরিকভাবেই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের মত বঙ্গবন্ধু নিছক রাজনৈতিক শ্লোগান ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করতেন না। শুধু তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর আমলে তিনি পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক ও শোষণের স্বার্থে শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার তৎপরতাও নির্মূল করেছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঐতিহাসিক ৭ জুন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণদানকালে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন:

'বাংলাদেশে মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা করা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার-আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না।'[১৫]

ইসলাম কোন গোষ্ঠীর বা কোন জাতির ধর্ম নয়, সকলের ধর্ম ইসলাম। এ কথার প্রমাণ আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে দেখতে পাই। যেমন– আল্লাহ পাক সকল বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।"[১৬] এ মহান বাণীতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, আল্লাহপাক বিশ্বজগতে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ইত্যাদি। তিনি কোন গোষ্ঠীর, কোন জাতির, কোন এলাকার বা কোন সম্প্রদায়ের বা

১৩. মওলানা আবদুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১৬. আল-কুরআন, ১:১

কোন রাজনৈতিক দলের নন, বরং তিনি সকল এলাকার সকল মানুষের, সকল রাজনৈতিক দলের পালনকর্তা। তিনি হলেন রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা। তিনি সকল ধর্মের মানুষের পালনকর্তা, রিযিকদাতা ইত্যাদি। তিনি শুধু মুসলমানের পালনকর্তা নন। কেউ যদি মনে করেন যে, আল্লাহপাক শুধু আমাদের (মুসলমানদের), পালনকর্তা তবে সেটা আল্লাহর রবুবিয়াতের খেলাফ হবে। কেননা পবিত্র কালামে পাকে বলেন–

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশে বিশ্বাস কর আর কিয়দংশে অবিশ্বাস কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে দুর্গতি এবং কিয়ামতের দিন কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।"[১৭]

এতে বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআনে কোন স্থানে রাব্বুল মুসলিমীন বলা হয়নি। আল্লাহ পাককে রাব্বুল মুসলিমীন মনে করা মানে মহাগ্রন্থের কিছু অংশ মেনে নেয়া আর কিছু অংশ অস্বীকার করার নামান্তর। বিধায় আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে বলেন, "নিশ্চয়ই তা সুলায়মান (আ)-এর নিকট থেকে এবং নিশ্চয়ই তা আল্লাহর নাম সহকারে যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।"[১৮]

আল্লাহর এই মহান বাণীর রহমান ও রাহিম শব্দদ্বয়ের অর্থের পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য করতে পারি। তাফসীরকারকদের নিকট শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য এরূপ যে, "আর রহমান ফিদ দুনিয়া।" অর্থাৎ আল্লাহপাক রহমান (দয়ালু) দুনিয়ার সৃষ্টির জন্য সকল কিছুর জন্য তিনি রহমান। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পাদরী সকল ধর্মের মানুষের জন্য তিনি হলেন দুনিয়ায় রহমান। তাঁর দয়া সকলেই সমানভাবে প্রাপ্ত হবে। এখানে শুধু মুসলিম-এর জন্য এমনটা উল্লেখ নেই। তাই আল্লাহপাক যদি শুধু মুসলিমদের জন্য না হন তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা কেমন করে হবে? ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রয়োজন আমরা বিসমিল্লাহির মহান বাণীতে পেয়ে থাকি। আর "রহিম" ফিল আখিরাত,[১৯] অর্থাৎ আল্লাহর দয়া পরকালে শুধু নেক আমলকারীগণ বা যারা আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছে, তারাই পাবে। এখানে শুধু মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে। যারা ভাল কাজ করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষমত হবে তারা তাঁর দয়া প্রাপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, "যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য ফেরদাউস নামক জান্নাতই আতিথেয়তা।"[২০]

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য এসব বাগান রয়েছে যেগুলোর নিুদেশের নহরসমূহ প্রবাহিত এটাই হলো বড় সফলতা।"[২১]

---

১৭. আল-কুরআন, ২:৮৫

১৮. আল-কুরআন, ২৭:৩০

১৯. আবদুস সালাম, *তাফসীরে ইবনে আবদুস সালাম*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১ [উদ্ধৃত- অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু, ও ড. আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৯৮, পৃ. ৪৮]

২০. আল-কুরআন, ১৮:১০৭

২১. আল-কুরআন, ৮৫:১১

এতে বুঝা যায় যে, পরকালের শাস্তি ও শান্তি কোন গোষ্ঠীর জন্য নয়, যারা নেক আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে, তারাই পাবে (বেহেশত), আর যারা ব্যর্থ হবে তারাই পাবে শাস্তি।

মুসলমানদের কাবা হলো 'মক্কা শরীফ'। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়েও আল্লাহপাক বলেন, "নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটাই যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক।"[২২]

এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় কাবা শরীফ কোন জাতির বা কোন গোষ্ঠীর বা কোন ধর্মের লোকদের জন্য বরকতময় বা হেদায়ত স্বরূপ নয়, তা সকল ধর্মের বর্ণের মানুষের জন্য হেদায়ত ও বরকতময়। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ পাকের এ পবিত্র ঘরও কারোর জন্য নির্দিষ্ট নয়, সকলের জন্য। তাই বলা যায়, এ পবিত্র ঘরেরও নিরপেক্ষতা আছে। তাই বলা যায় সকল কিছুর যখন নিরপেক্ষতা আছে তখন ধর্মের থাকবে না কেন? যদি ধর্মে নিরপেক্ষতা না থাকে এবং একই দেশে যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান মেনে নিয়ে বা রাষ্ট্রের অধীনস্থ হয়ে থাকতে পারে। সেখানে কি তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার খর্ব করার বিধান ইসলামে আছে? যদি না থাকে তাহলে ধর্ম নিরপেক্ষতায় মানুষের অসুবিধা কোথায়?

আল্লাহপাক যুগে যুগে নবী ও রাসুলগণ পাঠিয়ে তার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রচার করার সু ব্যবস্থা করেছেন। আর আমাদের শেষনবীর পূর্বে যত নবী ও রাসূল দুনিয়ায় এসেছিলেন তাঁরা সবাই তাদের গোত্রের, তাদের নিজেদের কওমের, এলাকার জন্য নবী হিসেবে এসেছিলেন। কিন্তু শেষনবী (স.) কোন গোত্রের কোন গোষ্ঠীর বা কোন এলাকার জন্য আসেননি। তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ এসেছিলেন। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেন, "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[২৩]

আল্লাহপাকের মহান বাণীতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল (স.) কোন জাতি বা কোন গোষ্ঠীর জন্য নন। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপ। মহান আল্লাহপাক মানব জাতির জন্যে একমাত্র মহাগ্রন্থ হিসেবে আল-কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন। যেটাকে মুসলিম জাতির সংবিধানও বলা যায়। পবিত্র কালাম হিসেবে তার একক প্রাধান্য আছে। মহাগ্রন্থ কুরআনও কোন জাতির এবং গোষ্ঠীর জন্যে নয়। এ আয়াত তা প্রমাণ করে। যার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই পবিত্র কুরআনের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে। এমন কি আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাতেও পবিত্র কুরআন অনুবাদ করে, তার মর্মবাণী সকল শ্রেণীর মানুষের সহজে অনুধাবন করার নিমিত্তে প্রথম অনুবাদ করেন একজন অমুসলিম ব্যক্তিত্ব। তার নাম গিরিশ চন্দ্র সেন। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বে আজ মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এক কথায় সকল ধর্মের মানুষ আল-কুরআনের জ্ঞানচর্চা শুরু করেছেন। এর অনেক সুফল আমরা লক্ষ্য করেছি। অনেক অমুসলিম নিজ নিজ মাতৃভাষার কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমান হয়েছেন। আল-

২২. আল-কুরআন, ৩:৯৬
২৩. আল-কুরআন, ২১:১০৭

কুরআন শিক্ষার জন্য কোন ধর্মের মানুষ হওয়া শর্ত নেই। শুধু পবিত্রতার শর্ত আছে। এ সব দিক বিচার করলে দেখা যায় যে ইসলাম ধর্মের সকল বিষয়ে একটা নিরপেক্ষতা আছে। নির্দ্বিধায় বলা যায় ধর্ম কোন গোষ্ঠীর জন্যে নির্দিষ্টভাবে নয়। ধর্মের নিরপেক্ষতা বিদ্যমান।

সেদিনের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেয়া ভাষণ ইসলামের বিধানের প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ এবং আল-কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন পাশ না করার অঙ্গীকারের ঘোষণায় মুসলমানদের মনোবল বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এটা তার ঈমান ও ইসলাম প্রীতিরই একটি অনন্য নজীর হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার অনেক আগেই বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞ আলিমদের সমন্বয়ে গঠন করেছিলেন আওয়ামী ওলামা পার্টি। উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে ইসলাম সম্পর্কে যাতে ওলামায়ে-ই কিরামের সুচিন্তিত অভিমত ও সুপারিশ পাওয়া যায়।

আমরা দেখতে পাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ইসলামের চেতনা ও মূল্যবোধ এবং ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আদর্শের একটি সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কেবল ঘোষণা বা বক্তৃতা দিয়ে তিনি তার দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং তা বাস্তবায়নে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার উপদেশ দেন। আল্লাহপাক যথার্থই উপদেশ দিয়ে বলেন, "ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার জোর জবরদস্তি নেই।"[২৪]

আল্লাহ পাক আরও বলেন, "তোমাদের দীন (ধর্ম) তোমাদের এবং আমার দীন (ধর্ম) আমার।"[২৫]

সাম্প্রদায়িকতা নয়, মানবতাই মূলশক্তি

শুধু পাকিস্তান আমলে নয়, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে অখন্ড ভারতে ধর্মান্ধ রাজনীতিক দলগুলোর উস্কানীতে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধেও বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ছাত্রজীবন হতে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অবিশ্বাস্য সাফল্যে ভরপুর। তিনি রাতদিন পরিশ্রম করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভুবনমোহন বক্তব্য আর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এবং সর্বোতভাবে সফল হয়েছেন। কেবল পরিপূর্ণ গোমরাহিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিরা ছাড়া অধিকাংশ লোক বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ইসলামের প্রশান্তিতে প্রীত হয়েছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান আমলে দেশে যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত হয়েছে ধর্মবাজ রাজনীতিক দলগুলো ছিল তার মূল হোতা। তারা কেবল রাজনীতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ধর্মকে বিকৃত উপায়ে ব্যবহার করে হাজার হাজার মানুষের কষ্টের কারণ ঘটিয়েছে। একইভাবে এ দলটি ইতিহাসেরও বিকৃতি ঘটানোর অপপ্রয়াসে লিপ্ত আছে। অবশ্য যারা ধর্মকে বিকৃতি করতে কুণ্ঠবোধ করে না তাদের জন্য ইতিহাস বিকৃত খোলামকুচি। স্বাধীনতা যুদ্ধেও এ

২৪. আল-কুরআন, ২:২৫৬
২৫. আল-কুরআন, ১০৯:৬

বিকৃত দলটির নৃশংসতা ছিল অবর্ণনীয়। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর কাছে মানবতাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পা রাখার পর বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে ধর্মব্যবসায়ী মুনাফিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে। ইবসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।"[২৬]

ইসলামি দর্শন আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিবিম্ব। সুতরাং আদর্শ রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন ও রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের প্রতি সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ প্রতিষ্ঠা। বঙ্গবন্ধুও এটি চেয়েছিলেন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কৃষক প্রজা পার্টি সুভাষ-পন্থী কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে নিয়ে ফজলুল হক সাহেব প্রোগ্রেসিভ কয়োলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ইংরেজ সরকারের চক্রান্তের ফলে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ তাঁর মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। এর একমাস পর মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মুখ্যমন্ত্রী হন স্যার নাজিমুদ্দিন। তিনি ছিলেন স্বার্থবাদী মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণির লোক; যেমন বর্বর তেমন সম্প্রদায়িক। ফলে তাঁর সময় হতে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। নাজিমুদ্দিন ইসলামের নামে পশ্চিমাশক্তির তল্পিবাহক হয়ে ইসলাম-বিরোধি কার্যকলাপে মেতে ওঠে। পূর্ব বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভূমিস্যাৎ করার জন্য ইসলামের শান্তির বার্তাকে সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘূর্ণিতে নিক্ষেপ করে। ফলে নেমে আসে আল্লাহর গজব। কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০) মারা যায় ৫০ লক্ষ বাঙালি। তারপরও নাজিমুদ্দিন ছিলেন নির্লিপ্ত- সম্রাট নিরোর বাঁশি নিয়ে হাসি মুখে চিবিয়ে গেছেন মোরগের রান।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ দেশ বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন দেশ বিভাগ তথা পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট পাকিস্তানের দাবিতে জিন্নাহ্ ডাইরেক্ট একশন দিবস পালনের আহ্বান জানান। এটি ছিল একটি সাম্প্রদায়িক উস্কানি, অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত। এ একটি মাত্র সিদ্ধান্ত কলকাতায় বিভৎস দাঙ্গার কারণ ঘটায়। এ সময় সাম্প্রদায়িকতার হোতা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সর্প ধর্মান্ধ খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, আমাদের সংগ্রাম ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে" ।[২৭]

তার এ ঘোষণা ছিল ইসলামি মূল্যবোধ আর চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুসলমান দাবিকারী কোন ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এমন অনৈসলামিক ঘোষণা দিতে পারেন- তা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। কুরআন হাদিস ইজমা-কিয়াস কোথাও এরূপ হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। সংগত কারণে বলা যায় নাজিমুদ্দিন কোনভাবেই মুমিন ছিলেন না, ছিলেন একজন জালিম ও মুনাফিক। আর যারা ঐদিন তাকে সমর্থন করেছিলেন তারাও ছিলেন অনুরূপ।

---

২৬. ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রদত্ত প্রথম ভাষণ। [সৈয়দ আবির, *ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ১০৯]

২৭. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ৮৪

জিন্নাহর ডাইরেক্ট একশনের ঘোষণা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দাঙ্গা আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্র খুঁজে পায়। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহ্-নাজিমুদ্দিন চক্রের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরে ১৬ আগস্ট ছুটির দিন ঘোষণা করেন। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। সাম্প্রদায়িক মুনাফেকদ্বয়ের লাগামহীন আচরণের কারণে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট হতে পরবর্তী কয়েকদিন কলকাতায় যে হৃদয়বিদারক দাঙ্গা হয়েছিল তা যে কোন ভয়াবহ যুদ্ধের চেয়েও নিষ্ঠুর ও রক্তক্ষয়ী। জিন্নাহ্-নাজিম উদ্দিন গংদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য সৃষ্ট দাঙ্গায় নিহত মানুষের একটি আক্ষার কাছেও তারা কেয়ামতের দিন জবাব দিতে সক্ষম হবে না। হত্যাকারী হিসেব জাহান্নামই হবে তাদের স্থান। বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন ছাব্বিশ। সে বয়সে তিনি দাঙ্গা থামানোর জন্য যে শ্রম ও মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন তার নজির পৃথিবীতে বিরল। তিনি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সেবার জন্য পরিবার পরিজন ছেড়ে রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বিচক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর একক প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই একটি কাজে বঙ্গবন্ধু যে পুণ্য অর্জন করেছেন তা পরিমাপ করার চিন্তা করাও অসাধ্য। শুধু এটুক বলা যায় বঙ্গবন্ধু ও তার সঙ্গীরা সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ না নিলে আরও এক লাখ মানুষ সাম্প্রদায়িকতার হাতে বলী হত। মহা পুণ্যবান বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অনুসারীদের পাকিস্তানি শাসকেরা হিন্দুদের এজেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করে ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচারে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "অতীতে আমাদেরকে হিন্দুদের এজেন্ট হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা দেয়া হয়।"[২৮]

জিন্নাহ্ কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে আসলেও কোনদিন ভুলেও ব্রিটিশ বিরোধী কোন বক্তব্য বা আন্দোলনে যোগ দেননি, মূলতঃ তিনি ছিলেন ইহুদি লবি নিয়োজিত ইসলাম বিরোধী একজন কুখ্যাত দালাল। সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে উপমহাদেশের ইসলামকে ধ্বংস করে ইহুদি লবির কাছে দেশ ও জাতিকে তুলে দেয়াই ছিল তাঁর দায়িত্ব। জিন্নাহ্ সুকৌশলে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দখল করার পর হঠাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন। কিন্তু কার বিরুদ্ধে? প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে তা স্পষ্ট না করলেও তাদের কার্যকলাপ ও বক্তব্যে হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। এতদিনের তিলে তিলে গড়ে ওঠা কাঁচ-শক্ত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে হঠাৎ ধাক্কা লাগে, এমন ধাক্কা যে ফেটে যায় সম্পর্ক। এটি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট শুরু হওয়া ভয়াবহ হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরুর প্রেক্ষাপট।[২৯]

কলকাতা হতে দাঙ্গা প্রথমে বিহারে এবং পরে নোয়াখালীতে ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গায় উদ্বাস্তু হাজার হাজার বিহারী মোহাজেরদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অবিশ্বাস্য। একমাত্র শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অনুসারীগণ ছাড়া কেউ গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এ

২৮. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
২৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। এ থেকে জিন্নাহ্ ও তার সমর্থক ধর্মবাজ দলগুলোর ইসলাম ধ্বংসের চক্রান্ত আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সাহায্যের পরিবর্তে শাসকশ্রেণি বিলাসিতায় মেতে ওঠে। যারা হাজার হাজার মুসলিম উদ্বাস্তুদের অরক্ষিত রেখে ক্ষমতার মসনদে বসে বিলাসিতার মগ্ন ছিলেন তাদের পক্ষে ইসলামি চেতনার প্রবক্তা সেজে ইসলামি আদর্শের প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকায় অভিনয় করা চরম শয়তানি ছাড়া আর কিছু নয়।[৩০]

বঙ্গবন্ধু কত আন্তরিক মমতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার প্রায়স নিয়েছিলেন তা অবগত করানোর জন্য একটি উদাহরণ টানা যেতে পারে। কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের (বর্তমান বিধান সরণী) উপর ছিল বিখ্যাত চিকিৎসক ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়ি। এই বাড়িটি একদল দাঙ্গাকারী ঘেরাও করে ফেলে। তাঁর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ার খবর পাওয়ামাত্র কালবিলম্ব না করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভলান্টিয়ার কোর নিয়ে হাজির হন বিধান রায়ের বাড়িতে। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় দাঙ্গাবাজদের প্রতিহত করে বিধান রায় ও তার পরিবারের জানমাল রক্ষা করতে সক্ষম হন।[৩১]

বঙ্গবন্ধু নিজে ভলান্টিয়ার কোর নিয়ে না এসে পুলিশকে খবর দিলে কিংবা পুলিশের জন্য অপেক্ষা করলে বিধান চন্দ্রকে দাঙ্গাবাজদের হাত হতে বাঁচানো সম্ভব হত কি না সন্দেহ। এভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে বঙ্গবন্ধু হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন। যারা বঙ্গবন্ধুকে আজ ইসলাম বিদ্বেষী বলেন তারা কয়জন মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে? যারা সামান্য অর্থের জন্য ধর্মকে বিকৃত করে, গ্রন্থে বাপ-দাদা, স্বামী-খালুর নাম তোলার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের পক্ষে মানুষ দূরে থাক একটা সক্রিয় সংহারি, জীবন ক্ষয়কারী, রক্ষাকারী নয়।

দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে ছবি বিশ্বাসের মালামাল ফেরত আনার ঘটনাটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। ঘটনার সময় ছবি বিশ্বাস বাড়ি ছিলেন না। দাঙ্গাকারীরা পুরো বাড়ির জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। একদল সন্ত্রাসী আড্ডা বসায় তার বাড়িতে। ছবি বিশ্বাস খবর পেয়ে পাগলপ্রায়, মহিলা মানুষ- যাবেন কোথায়, খাবেন কী? পড়ার কাপড় পর্যন্ত দাঙ্গাবাজেরা নিয়ে গেছেন। অনেক চেষ্টা করেও বাড়ি কিংবা সামগ্রী উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। কোন সুরাহা করতে না পেরে ছবি বিশ্বাস শেখ মুজিবের শরণাপন্ন হন। সোহারাওয়ার্দীর অতি প্রিয় সাগরেদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রচণ্ড প্রভাবশালী। মিনা পেশোয়ারি নামক একজন দুর্ধর্ষ ফলবিক্রেতা দাঙ্গাবাজ ও লুটেরাদের নিয়ন্ত্রক ছিলেন। পেশোয়ারি ছিলেন আবার সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত। বঙ্গবন্ধু পেশোয়ারিকে ছবি বিশ্বাসের ঘর হতে লুট করা মাল অবিলম্বে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা তখনও কারও ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়। লুট হওয়া সমস্ত মালামাল ছবি বিশ্বাসের বাড়িতে চলে আসে, এমন কি সুঁই পর্যন্ত। এভাবে বঙ্গবন্ধু অনেক হিন্দু-মুলসমানের জান-মাল ও সহায়সম্পদ রক্ষা করেছেন।[৩২]

---

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. আবদুল গাফফার চৌধুরী, *ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা*, ঢাকা : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ১৩৩

৩২. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

চার খলিফার শাসনামলে শাসক-জনগণ সম্পর্ক ছিল সার্বজনীন সম্প্রীতির অনন্য বিশ্বাসে ভরপুর। "রাজ্যে বসবাসরত কারও উপর জুলম করা যাবে না, প্রত্যেককে সমদৃষ্টিতে দেখতে হবে। খলিফা কোন ধর্মের প্রতিনিধি নয় বরং সমস্ত মানবজাতির সেবক হিসেবে সবার প্রতি সমভাবে নিবেদিত। কারণ খলিফারা নায়েবে রসুল।"[৩৩] এ ছিল খোলাফায়ে রাশেদিনের রাষ্ট্রীয় নীতি। বঙ্গবন্ধু নিজেও ইসলামের মহান খলিফাদের আদর্শের আলোকে রাজনীতিকে সার্বজনীন করে ইসলামের ঝান্ডাকে আরও বিকশিত করে তোলার প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মুসলমান শব্দটিকে বিক্রিস্থল হতে উদ্ধার করে সসম্মানে স্থান দেন মর্মে। ধর্ম মর্ম মাঝে স্থান পেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রকৃত ইসলামের আলোয়। বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত মুসলমানেরা বঙ্গবন্ধুর দলে সমবেত হয়ে ইসলামি চেতনার বন্দনায় নিজেদের উৎসর্গ করার প্রেরণা খোঁজে পায়। দেশের প্রত্যেক ধর্মের মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতি উজাড় করা ভালোবাসা আর বিনীত সম্মানে মুগ্ধ ছিল। তিনি যেমন ছিলেন মুসলমান তেমন ছিলেন মানুষ, যেমন ছিলেন নেতা তেমন ছিলেন খলিফা, যেমন ছিলেন বাঙালি তেমন ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ- যা কেবল একজন প্রকৃত ঈমানদারের চরিত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। আল্লাহ্ ও তাঁর অনুসৃত বাণীর প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস না থাকলে এতগুলো গুণাবলী এক সাথে লালন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অসাধারণ এ গুণাবলীর সমাহার মুজিবকে আত্ম অধিকারে মহীয়ান করে তুলেছিল। তাই তিনি বাঙালি জাতির স্বাধিকারের জন্য সোচ্চার না হয়ে পারেন নি। যখনই তিনি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়েছেন তখনই পাকিস্তানি শাসকচক্র কারণে-অকারণে ধর্মের বাহানায় আল্লাহ্‌র কালামকে বিকৃত করে নিজেদের অপকর্ম ঢাকার জন্য বঙ্গবন্ধুকে ধর্ম বিদ্বেষী আখ্যায়িত করে সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু গণঐক্য সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা প্রতিহত করার জন্য মানুষের সুপ্ত বিকাশকে আন্দোলিত করে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'গণঐক্যের দৃঢ়ভিত্তির উপরই একমাত্র আমাদের সমাজের পুনর্গঠন এবং অঞ্চলে অঞ্চলে মানুষের মধ্যে অবিচার দূর করার কার্যকরী কর্মসূচি রচিত হতে পারে।"[৩৪]

রাষ্ট্র ক্ষমতায় না থাকলেও একজন মানুষ হিসেবে, প্রকৃত মুমিন হিসেবে, জাতির ভাবী জনক হিসেবে বঙ্গবন্ধু প্রত্যেকটি দাঙ্গা দমনে জীবনপণ রেখে ত্বড়িৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার সময়োচিত হস্তক্ষেপ ও বিচক্ষণতার কারণে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিগুলো চরম মাত্রায় পৌঁছতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক হলে কিংবা সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও অর্ধবাজ রাজনীতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে না তোললে পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতি বছর কমপক্ষে দশ হাজার করে মানুষ নিহত হত। পাকিস্তানের বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দেখলে এ মন্তব্যটির সত্যতা সম্পর্কে উত্থিত সন্দেহ নিরসন করতে সহায়ক হবে। পাকিস্তানে এখনও প্রতিবছর গড়ে ৮ হাজার লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়। আহত হয় এর পাঁচগুণ। ২০০৩

৩৩. সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৩৪. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাঘরিষ্টতা অর্জনের পর ৯ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর লিখিত বিবৃতি। [সৈয়দ আবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩]

খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিনেই একটি শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৫০ জন লোক নিহত হয়।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ না করে পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করলে বাংলাদেশেও প্রতি বছর ৮ হাজার লোককে সাম্প্রদায়িক হানাহানির বলী হতে হত, আহত হত আরও ৪০ হাজার।

বঙ্গবন্ধু যতদিন ছিলেন ততদিন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোন স্থান ছিল না। তিনি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রটিকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে পরিচালনা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উপসংহার

উপসংহার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। একজন সাচ্ছা মুসলিম। তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি। বাঙালি জাতির ইতিহাসে তাঁর বহুবর্ণিল ও সংগ্রামী জীবন, কর্ম, চিন্তাচেতনা এবং নিখাদ দেশপ্রেম ধ্রুবতারার মতো অম্লান মহিমায় ভাস্বর। সর্বপ্রকার অন্যায়, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর অকুতোভয় সাহস, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমতা– সর্বোপরি রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা বাঙালি জাতির চিরদিনের গর্বিত উত্তরাধিকার। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী মূল্যবোধের উজ্জীবন ও ইসলাম প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এসব অবদানের কথা জাতির ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যতদিন বাঙালি থাকবে, বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন তিনি বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন অক্ষয় মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে।

বঙ্গবন্ধুর সহজ সরল জীবন, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সততা, অসম সাহসী নেতৃত্ব, দুরদর্শিতা, সর্বোপরি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাসে তিনি অনন্য হয়ে থাকবেন। ১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এক স্মরণসভায় বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন বলেছিলেন "যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, যতদিন বাংলা থাকবে, বাঙালি থাকবে, গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, করতোয়া, কীর্তনখোলা নদীর দুই তীরের মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, যতদিন এদেশের মানুষের হৃদয়ে উত্তাপ থাকবে, ততদিন অন্তরের মণিকোঠায় একটি নাম চির জাগরুক থাকবে শেখ মুজিবুর রহমান।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন মহান রাজনীতিবিদ, বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠসন্তান ইতিহাসের মহানায়ক। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তিনি আমাদের জাতির জনক ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বাংলা ১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র মঙ্গলবার রাত ৮ ঘটিকায়[১] তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতা তাঁকে আদর করে খোকন বলে ডাকতেন। নানা শেখ আব্দুল মজিদ খোকনের নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমানের বাল্যকাল টুঙ্গিপাড়া গ্রামেই কাটে। শৈশব থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনে তিনি জমিদার, তালুকদার ও মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ ও প্রজা পীড়ন দেখেছেন। শিশুকালে তিনি চঞ্চল ও অন্যায়ের প্রতি আপোষহীন ছিলেন। সমাজ ও পরিবেশ তাঁকে বাল্যকাল থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে।[২]

১. শেখ হাসিনা, (সম্পা. পার্থ ঘোষ), *শেখ মুজিব আমার পিতা*, কলকাতা : সাহিত্যম, ১৯৯৯, পৃ. ২৮

২. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাজীবন বাড়িতেই শুরু হয়। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়ার গিমাডাঙ্গা ও টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। গিমাডাঙ্গা বিদ্যালয়ে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ১৯২৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ সীতানাথ একাডেমীতে ভর্তি হন। ১৯৩৪ সালে মাদারীপুর ইসলামিয়া হাই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। ১৯৩৫ সালে শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৩৭ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালে শেখ মুজিবের আঠার বছর বয়সে বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৩৯ সালে অষ্টম ও ১৯৪০ সলে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। গোপালগঞ্জ শহরের রসরঞ্জন সেনগুপ্ত শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাইভেট শিক্ষক ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাড়ি গিয়ে পড়তেন। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ম্যাট্রিক পাস করেন।[৩]

স্কুল জীবনে শেখ মুজিবুর রহমান একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠেন। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটিরও সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪]

২২ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করার পর বঙ্গবন্ধু ষোলমাত্রার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। বিভিন্ন আন্দোলনে সংযুক্ত হওয়ার কারণে তাকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৪৭ সালে তিনি বিএ পাস করেন।

এর পরবর্তীতে ইতিহাসের পরিক্রমায় ৫২'র ভাষা আন্দোলনসহ সকল উল্লেখযোগ্য সংগ্রামেই তাঁর ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি তিনিই। রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহন, রাজনৈতিক দূরদর্শীতা, ইত্যকার যাবতীয় কৃতীত্ব, সাফল্য এবং অবদান পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাড় করাতে। তার জীবন পরিক্রমা অধ্যয়নে আমরা এরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল- দুর্নীতি দমন; ক্ষেতে খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় চলে আসে।

---

৩. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৪. শেখ হাসিনা, (সম্পা. পার্থ ঘোষ), *শেখ মুজিব আমার পিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না। ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের ভোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন।

এই ছিলেন বঙ্গবন্ধু। যিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশের স্থপতি। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলার বঞ্চিত জনসাধারণের বাঁচবার দাবি আদায়ে অকুতোভয় সৈনিক তিনি। পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের অবিরাম অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির বিবেককে জাগ্রত করবার কাজটি বঙ্গবন্ধু করেছেন। বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি মানুষ, খাঁটি বাঙালি, খাঁটি মুসলমান। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মানবতা এবং ন্যায় ও সুবিচারের ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। পরধর্মের লোকদের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না। তিনি বলেন-

> আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য- লেবেল-সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসূলে করীম (সা)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে যারা বারবার অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে।[৫]

একটি জাতিকে পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করবার ইচ্ছা লালন করে গেছেন তিনি আজীবন। তাঁর দেশপ্রেম তুলনাহীন। "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ"-এ কথাটিকে তিনি অন্তরে ধারণ করেছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসনামলে শোষণ-বঞ্চনার করুণ রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ধর্মের নামে অনৈসলামী কাজে নিয়োজিত ইসলামের শত্রুদের প্রচারণায় রক্তাক্ত হয়েছেন। ধর্ম বিক্রি নামে যারা আখের গোছাবার কাজে নেমেছিলো তারা হালে পানি পায়নি। এ কারণেই সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকেই বাঙালিরা ভোট দিয়েছে। প্রাদেশিক আসনের দু'টি বাদে সকল আসনই লাভ করেছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল।

ইসলামের নাম ভাঙিয়ে যারা পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর তাঁবেদারে পরিণত হয়েছিল, তারা একাত্তর সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে চরম আঘাত হানতে ভুল করেনি। এ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের দলগুলো রাজাকার, আলবদর নাম নিয়ে মূলত হিটলারের এস.এস. বাহিনীর মতো কাজ করেছে। মাত্র নয় মাসে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসররা তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করেছে। এ হানাদার বাহিনীর সাহায্যকারী এইসব বাঙালি ও মুসলমান নামের কলঙ্করা, মুনাফিকরা ছিল স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতার বিরোধী। স্বাধীনতা অর্জনের সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার মাধ্যমে ঐ ধর্ম ব্যবসায়ী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী আবার দেশের রাজনীতিতে জেঁকে বসে। সৎ ও ঈমানদার মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত আজও ওরা করে চলেছে।

৫. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ২০০০, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন-

> বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ।[৬]

ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন,

> ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খৃষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না।[৭]

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ মুসলমান ও হিন্দু ধর্মের বুনিয়াদে দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম) এবং ভারত দুটো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপক ব্যবধানের পরও কেবলমাত্র ধর্মীয় আদলের কারণে এই দুই অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়। ফলে শুরু থেকেই উভয় অঞ্চলের মধ্যে নানা সংকট দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দু প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই ভাষাকেন্দ্রিক সংকট মোকাবেলায় হত্যা, জুলুম, গোষ্ঠীগত বৈষম্য, দাসত্বের শিকার হয় বাঙালিরা দীর্ঘ ২৪ বৎসর।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতিবিদদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি রাষ্ট্রনীতি ও জাতিগত বৈষম্য ও দমননীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পরিবর্তে নব্য ঔপনিবেশিক শাসনে পতিত হয়েছে। উপনিবেশ হিসেবে ইংরেজ শাসকরা এ অঞ্চলে যত না মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি ও ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা বাঙালিরা শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে। এর প্রমাণ এই সময়ের ইতিহাস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।

১৯৫২ সালে মাতৃভাষা 'বাংলা'কে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম থেকে শুরু করে ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবি, বৈষম্যের বিরুদ্ধে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারিষ্ঠতা অর্জনের পরও এদেশের গণমানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চাকরি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ নানা অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা. দমননীতি পর্যায়ক্রমে স্বাধিকার

৬. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৭. মওলানা আবদুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। এই আন্দোলনের ধারক, বাহক, উদ্দীপক ও মহানায়ক হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শ নির্ধারণ, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, স্বল্পতম সময়ে সংবিধান প্রণয়ন, নির্বাচন, তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের স্বদেশ প্রত্যবর্তনের ব্যবস্থা করণ, যুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেয়া প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে ফিরিয়ে আনা এবং পুনর্বাসন করা তাঁর অনন্য কৃতীত্ব। অবকাঠামো নির্মাণ, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা কমিশন গঠন, যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের বিচারের আয়োজন, মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংস্কার, ব্যাংক, বীমা, শিল্পসহ মোট প্রায় ৫০০ প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, ওআইসি, কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ, শতাধিক দেশের স্বীকৃতি অর্জনসহ বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দেশ এবং বিদেশে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে পবিত্র ইসলাম সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু যে কথা বলেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক জনসমুদ্রেও তিনি তাঁর ব্যতিক্রমটি বলেননি। এ থেকে পরিস্কার প্রমাণিত হয় পবিত্র ইসলাম বা ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক কপটতা ছিলো না। তিনি আন্তরিকভাবেই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি ও তাদের এদেশীয় দোষরদের মত বঙ্গবন্ধু নিছক রাজনৈতিক স্লোগান ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করতেন না। শুধু তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর আমলে তিনি পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক ও শোষণের স্বার্থে স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেরার তৎপরতাও নির্মুল করেছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঐতিহাসিক ৭ জুন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণদানকালে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন- 'বাংলাদেশে মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা করা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার-আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না।'

পবিত্র ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পাকিস্তান আমলের স্টাইল বন্ধ করে দেয়ায় এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীর রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। তারা বঙ্গবন্ধুর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরকাল দেশ পরিচালনাকালে এদেশের মুসলমানদের সমাজ জীবনের ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৪ বছরে তার একভাগও হয়নি। 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান' আমলে আমাদের দেশে মদ, জুয়া, লটারী প্রভৃতি ইসলামবিরোধী কাজ আইনগতভাবে বৈধ ছিলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্পকালীন দেশ

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনাকালে আইন করে মদ, জুয়া, ঢাকার সোহরাওয়াদী উদ্যানে ঘোড়দৌড়ের নামে জুয়া, হাউজী, লটারী, 'গেট-এ-ওয়ার্ড' প্রভৃতি ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দেন। এমনকি সরকারি অনুষ্ঠানাদিতে বিদেশিদেরও মদ পরিবেশন বন্ধ করে দেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। বাংলাদেশের তবলীগ জামাতের কেন্দ্র কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। টঙ্গীতে তবলীগের বিশ্ব ইজতেমার জন্য স্থান করে দেন। বায়তুল মোকাররম মসজিদের পূর্ব আঙ্গিনায় এখন যেখানে সুন্দর উদ্যান গড়ে উঠেছে, পাকিস্তান আমল থেকে এই এলাকাটা কয়েকটি স্পোর্টিং ক্লাবের জবরদখলে ছিলো। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু এসব ক্লাব এখান থেকে সরিয়ে দেন। এই এলাকাকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি পরিস্কার নির্দেশ দেন, পবিত্র মসজিদের আঙ্গিনায় খেলার ক্লাব থাকতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছর শাসনামলে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা। মুসলমানদের সমাজ জীবনে সত্যিকার ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, দেশের বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এবং ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন সম্পর্কিত আইনটি ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।[৮] উক্ত আইনের ভূমিকায় ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'মসজিদ, বিজ্ঞান ও সভ্যতায় ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায়বিচারের মৌলিক ইসলামী আদর্শ প্রচার এবং ইসলামের আদর্শ, দর্শন, আইন ও ব্যবহার শাস্ত্র এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এই আইনটি প্রণয়ন করা হলো।'

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত আইনের উপরোক্ত ভূমিকার প্রতি তাকালে যে কোন সচেতন পাঠক স্বীকার করবেন, পাকিস্তান কিংবা আমাদের দেশের কোন কোন শাসকের মত বঙ্গবন্ধু মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে রাজনীতি করেননি। কিন্তু মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে সত্যিকার ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা তিনি মনেপ্রাণে কামনা করতেন। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে এক শ্রেণীর ভণ্ড "পাকিস্তান মানে ইসলাম, পাকিস্তান রক্ষা করা মানে ইসলাম রক্ষা, মুক্তিযুদ্ধ ইসলামের প্রতিপক্ষ" ইত্যাদি বলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী গণহত্যা চালিয়েছিল অথচ মানবতাবাদের প্রতীক ইসলামকেই মৌলবাদ, প্রগতি-বিরুদ্ধ ইত্যাদি সমালোচনা শুনতে হচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইসলাম বিরুদ্ধ ছিল না। এই মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধ ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ; অধিকার-বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে মরণপণ সংগ্রাম। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্যই মুসলমান নামধারী কিছু স্বার্থান্বেষী ভণ্ড, প্রতারক মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল।

---

৮. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা নং- ১৯১৭, পৃ. ২; মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মব্যবসাকে চিরতরে দেশের মাটি থেকে উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। যার যার ধর্ম সে সে পবিত্র মনে পালন করবে- এই ছিল বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস। পঁচাত্তরের ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের আবারও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত একজন প্রকৃত মুসলমান, ধর্মান্ধদের বক্তব্য নয়, রসূলুল্লাহ (সা)-এর ইসলামই ছিল তাঁর আদর্শ।

পরিশেষে **"স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান"** শিরোনামে আমার উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বঙ্গবন্ধুকে পাঠকের কাছে নতুন ভাবে পরিচিত করে দেবে। যে বঙ্গবন্ধু কেবল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা-জাতির জনকই নন বরং তিনি যে ইসলাম দরদী, প্রকৃত মুসলিম ছিলেন এ অভিসন্দর্ভ সে বঙ্গবন্ধুকে এক অসাধারণ প্রতিচ্ছবিতে প্রতিষ্ঠিত করবে।

আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হয়েছে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি আরো বিশ্বাস করি যে এ অভিসন্দর্ভ দ্বারা সাধারণ পাঠক ও সুধী সমাজ উপকৃত হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ দান করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট-১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

১. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার-ভাষণ।

২. বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশন মারফত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ।

৩. পাকিস্তানের কারগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ।

৪. ঐতিহাসিক ৭জুন ১৯৭২ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ।

৫. জাতীয় প্রেসক্লাবে ১৬ জুলাই, ১৯৭২ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।

৬. প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৮ অক্টোবর, ১৯৭২ পি.জি. হাসপাতালের রক্ত সংরক্ষণাগার এবং নতুন মহিলা ওয়ার্ডের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ।

৭. ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশনে শোক প্রস্তাব এবং খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণ।

৮. ০৪ নভেম্বর, ১৯৭২ গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে ভাষণ।

৯. জাতীয় দিবস উপলক্ষে ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ।

১০. ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বেতার-ভাষণ [১]

আজ থেকে ২৪ বছর আগে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার রঙিন আশায় বুক বেঁধে এমনি করেই একদিন জনগণ ভোট দিয়েছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে, কিন্তু দিন না যেতেই দেখেছেন পাকিস্তানের জন্মলগ্নে জনগণের দেয়া সুস্পষ্ট ম্যান্ডেটের প্রতি এদেশের এক শ্রেণীর নেতার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সব স্বপ্ন তাদের ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছে। কেবল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষই নয়, সারাদেশের বারো কোটি মানুষই আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নিজ দেশে পরবাসী। পরাধীন আমলেও এ চেহারা এদেশের মানুষের ছিল কিনা তা জনগণই তার বিচার করবেন। স্বাধীনতা-উত্তর জীবনে বিগত ২৩টি বছর ধরে সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শোষণ ও বঞ্চনা এদেশের মানুষকে পোহাতে হয়েছে, তার সাক্ষী কেবল আমি বা আমার দলই নয়, সাক্ষী প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ। তাঁদের সন্তান ছালাম-বরকত বুকের রক্ত ঢেলে রাজপথে যে সংগ্রামী চেতনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিল, তারি সূত্র ধরে এদেশের আরও শত শত সোনার সন্তানের আত্মদানের পরে হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীর অপরিসীম নির্যাতন ভোগের ফলে এদেশের মানুষ আজ তাদের অধিকার ফিরে পেতে চলেছে। জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের সৃষ্ট ফসল হিসেবে এইবারই সর্বপ্রথম দেশের আপামর মানুষের মতামত নিয়ে তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সমাধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত দুই যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণেরই মতামত নিয়ে পাকিস্তানের বুকে শোষণহীন, ইনসাফের সমাজপ্রতিষ্ঠার উপযোগী একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে সুযোগ আজ এসেছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের ওপরই এদেশের আপাময় জনসাধারণের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

ষড়যন্ত্রের রাজনীতি

পাকিস্তানের বিগত তেইশ বছরের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারাক্রমে জাতি আজ এক চরম সংকট-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংকট থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য দেশব্যাপী যে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে তাকে উপলক্ষ করে প্রতিপক্ষীয় রাজনীতিকরা সেই পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল শোষক সম্প্রদায়ের প্রভুদেরকেই আবার ক্ষমতার আসনে বসাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই তাদের এ কারসাজি বুঝা কঠিন নয়। গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শোষণচক্রের এই বাঙালি দালালরা পাকিস্তানের জন্মাবধি নির্বাচন এড়িয়ে জনগণ থেকে নিজেদেরকে সযত্নে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে গিয়ে কুচক্রী ও কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণস্বার্থের সমাধির উপর নিজেদের ভাগ্যের ইমারত গড়েছেন, আবার আন্দোলন দেখলেই পিঠটান দিয়ে আরাম কেদারায় শুয়ে নতুন কোনো সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গুজরান করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের

---

১. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ২০০০, পৃ. ১৯-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অপপ্রচারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের মুরুব্বিদের হয়ে গোপন অভিসন্ধি চরিতার্থ করা। কে না জানে যে, এবারকার নির্বাচনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে জাতীয় পরিষদের সদস্যরা কিংবা কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতার মস্‌নদে গিয়ে বসে পড়বেন, সে-সুযোগ সেখানে নেই। ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নই হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সমাপ্ত করার পরই কেবল উঠতে পারে মসনদে বসার প্রশ্ন, তার আগে কখনোই নয়। নির্ধারিত মেয়াদের আগে শাসনতন্ত্র তৈরির কাজ সমাধা করতে না পারলে দেশ বিপর্যয়ের কোন্ অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে তা ভাবতেও দেশপ্রেমিক মাত্রেরই গা শিউরে ওঠার কথা। এতে বিচলিত বোধ করবেন না কেবল তাঁরই-যাঁরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণকে দূরে সরিয়ে রেখে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় বহাল হওয়ার খোয়াব দেখেন অথবা সে কাজে সিদ্ধহস্ত।

জনগণের ইচ্ছাই শেষ কথা

আওয়ামীলীগ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিশ্বাসী, আর বিশ্বাসী বলেই তাঁদের হয়ে জন্মাবধি তারা সংগ্রাম করে এসেছে। জনগণের অভিরুচি অনুযায়ী দেশ শাসিত হউক, এই কামনাই তাদের সংগ্রামী চেতনার মূল উৎস। তাই পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই জনগণের সুস্পষ্ট ম্যান্ডেটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে দেশকে যখন বিপথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্র হয়, তখন তা নসাৎ করার জন্য তারা দেশব্যাপী জাতীয়ভিত্তিক সাধারণ নির্বাচন চেয়েছে। আর জনগণের প্রতি আস্থাহীন, দেশ ও দেশের সম্পদ লুট করে ভাগ্য গড়ার নীতিতে বিশ্বাসী আমাদের প্রতিপক্ষীয় একশ্রেণীর রাজনীতিকরা কায়েমী স্বার্থ, আমলাতন্ত্র ও পশ্চিমাঞ্চলের সামন্তনেতৃত্বে, জোতদার, জায়গীরদারদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব প্রচেষ্টাই এ যাবৎ নসাৎ করে এসেছেন। আজও সে-চেষ্টার বিরাম নেই।

সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা এই সোনার বাংলাকে শোষণের চারণক্ষেত্রে পরিণত করার দুরভিসন্ধিতে মেতে নেপথ্যের একশ্রেণীর কুচক্রীরা যে মতলব এঁটেছিল, এই বাংলার 'মীরজাফররাই' বারবার সে-মতলবের বাস্তবায়নে প্রধান হাতিয়ার হয়ে কাজ করে এসেছে, আর তাই এদেশের তেরো কোটি মানুষের আজ এ দুরবস্থা। ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থ, আমলাতন্ত্র ও পশ্চিমাঞ্চলের সামন্তবাদী নেতৃত্বের চক্র ও চক্রান্তের প্রতিভূস্থানীয় যে মুসলিম লীগকে বাংলার বুক থেকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, কয়েকটি মাস না যেতেই বাংলার কোন্ সে ছদ্মবেশী "সু-সন্তানরা" সেই মুসলিম লীগ চক্রের সাথেই রাতারাতি হাত মিলিয়ে বাংলার সাতকোটি মানুষের স্বার্থবিরোধী শাসনতন্ত্র রচনায় মত্ত হয়েছিলেন, তাও কারও অজানা নয়। পরবর্তীকালে দেশে জাতীয়ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখল করে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান যখন এদেশের বারো কোটি মানুষের শত অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে দেশব্যাপী 'কবরে শান্তি' প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়েছিলেন, মোনেম খাঁ জাতীয় বাংলার কোনো সে মীরজাফর সেই স্বৈরাচারী শাসকের গললগ্ন হয়ে সোনার বাংলাকে অপর অঞ্চলের উপনিবেশ তথা

শ্মশানে পরিণত করার চক্রান্ত বাস্তবায়নের 'পবিত্র দায়িত্ব' পালনে সদা সচেষ্ট ছিলেন, যে কাহিনীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন করে না।

বাংলার করুণ ইতিহাস

তাই বলি, বাংলা আর বাঙালির ইতিহাস-সিরাজদ্দৌলা বনাম মীরজাফরের ইতিহাস বাংলার ইতিহাস-বাংলার আপামর মানুষ বনাম জনাব মোনেম খাঁদেরই ইতিহাস। এ ইতিহাস বড় করচণ, বড় মর্মন্তুদ। এ ইতিহাস আবার গৌরবদীপ্তও বটে। বাংলার কচিপ্রাণ সালাম-বরকতের তপ্ত তাজা রক্তের পিছিল পথে নূরচল আমীনের আর সাজেন্ট জহুর-মনুমিয়া-আসাদ-শম্ভু-আলাউদ্দিন আর আনোয়ারাদের শোকসন্তপ্ত মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনীর তপ্ত অশ্রচর রোষানলে মোনেম খাঁদের ক্ষমতার আসনচ্যুতিও এদেশের ইতিহাসের কত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যয়। তবু শিক্ষা তাদের হয়নি। হয়তো বা অতীতে যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে এদেশকে কায়েমী স্বার্থের অবাধ শোষণক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছিলেন আপনি, আমিও সে-ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা নিতে পারিনি। সে শিক্ষা যদি তাদের হত; অথবা দেশব্যাপী যদি তা থেকে কোনো শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম হতেন তাহলে ১৯৬৯ এর প্রচ- গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সেদিন যাঁরা নিজ নাম-ঠিকানা গোপন করে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন, তারা আজ আবার তাদেরই কথিত এদেশের 'গরচ ছাগলের' দরবারে ভোটপ্রার্থী হন বা হতে পারেন কোন্ দুঃসাহসে। আমার বিচারে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিচার-বুদ্ধির প্রতি এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, এক মহাঅগ্নিপরীক্ষা। এ চ্যালেঞ্জের জবাব জনসাধারণ কীভাবে দিবেন, এ অগ্নিপরীক্ষায় কীভাবেই বা তাঁরা উত্তীর্ণ হতে চান, তা তাঁদেরই বিবেচ্য।

তবে, আমি যা বুঝি, আমার দলীয় সহকর্মীরা যা বুঝেন অথবা এদেশের সংগ্রামী ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক সমাজ যা বুঝেন, এককথায় তা হল এই যে, এবারকার সাধারণ নির্বাচনই বাংলার সাড়ে সাত কোটি তথা সারাদেশের তেরো কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের প্রথম ও শেষ সুযোগ। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে কেউ যদি ভেবে থাকেন ভবিষ্যত বংশধরদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে তিনি সক্ষম হবেন, তবে ভুল করবেন নিঃসন্দেহে। আর সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়তো বা কোনোদিনই আর সম্ভব হয়ে উঠবে না। জনগণের এতদিনের সংগ্রাম সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব ও সুযোগ আবারও যদি সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী সেই একই পুঁজিবাদী, ধনকুবের, দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থশিকারী, আমলাতন্ত্র বা একনায়কত্ববাদের হাতে চলে যায় তাহলে দেশ ও দশের সর্বনাশ অবধারিত। আর বয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকালে জনগণ ভোটাধিকারটুকুর যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে কুচক্রীদের হাত থেকে সে দায়িত্ব ও সুযোগ যদি ছিনিয়ে আনতে পারেন তবেই দেশ ও দশের কল্যাণ। এই কারণেই আওয়ামীলীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ চাই

ভুললে চলবে না যে, পাকিস্তানে এবারই সর্বপ্রথম জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা এদেশের মনুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মূল সম্পদ শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে। বাংলাকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে, এদেশের বারো কোটি মানুষকে সত্যিকার মুক্তির সন্ধান দিতে হলে চাই মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ--সেই-আওয়াজ তুলতে হবে বাংলারই জনপ্রতিনিধিদের। পশ্চিম পাকিস্তানের অসহায় মানুষের ভোটে যারা নির্বাচিত হযে আসবেন তাদের অধিকাংশই জীবনে সামন্ত স্বার্থেরই প্রতিভূ। তাদের কণ্ঠে কখনো দেশের কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা মানুষের স্বার্থের কথা ধ্বনিত হতে পারে না। বরং নিজেদের স্বার্থেই তারা চইবেন গণস্বার্থকে দাবিয়ে রাখতে। জাতীয় পরিষদে তাদেরকে মোকাবেলা করে এদেশের আপামর মানুষের স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে এনে পাকাপাকিভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান দেওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবল বাংলার মানুষের নির্বচিত প্রতিনিধিদের ঐক্য। ভিন্ন ভিন্ন দলের পৃথক চিন্তাধারার প্রতিনিধিদের কণ্ঠে বেসুরো আওয়াজ উঠতে বাধ্য। তার ওপর রয়েছে বাংলার মীরজাফরদের ভূমিকা। ইতিমধ্যেই অন্যান্য রাজনৈতিক দল কেউ একশত কেউ বা ৩০/৪০টি আসনে দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এসব দলের সব কয়টিরই শিকড় পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের জন্য তাদের এমনই দরদ যে পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পেলেও বাংলাদেশের বেলায 'যে-কয়টি আসন পাওয়া যায় ভালো' এই নিয়মেই তাঁরা নির্বাচনে নামছেন। তারা যে বাংলার তথা আপামর জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রেণের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, তার সবচাইতে বড় প্রমাণ তারা নির্বাচনে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোনো চেষ্টাই করতে চান না। তারা জানেন, যেনতেন প্রকারের গুটিকয়েক আসন যদি তারা এখান থেকে পার করিয়ে নিতে পারেন তাহলে তাদেরকে বগল-দাবা করে যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাকে সংখ্যালঘু করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের পথ ঠিকই করে নিতে পারবেন। এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাই বাংলার মানুষকে সজাগড় থাকতে হবে।

সত্যের ভিত্তিতে ছয় দফা

আরেকটি প্রশ্ন হল, নির্বাচণকে সামনে রেখে আজ অনেক দলই বাংলার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে চলেছেন। কিন্তু কীভাবে দেশের দু-অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে, কী করে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্রতর প্রদেশগুলির মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, তার কোনো কর্মসূচিই জনসাধারণের সামনে তাঁরা ঘোষণা করেননি। ব্যক্তিগত স্বার্থের রাজনীতি আওয়ামী লীগ করে না। রাজনীতির অঙ্গনে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' নীতিতেও আমরা বিশ্বাসী নই। তাই, জনগণের জন্য আমরা যা চাই তা সুস্পষ্ট ভাষায়, সরাসরি ঘোষণা করি। এ কারণে, আমাদের বহু নির্যাতনও পোহাতে হয়, কখনো 'রাষ্ট্রদোহী', কখনো 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আবার কখনো 'বিদেশী চরে'র আখ্যাও আমাদের পেতে হয়েছে। তবু জনগণের জন্য যা সত্য ও সুন্দর বলে জেনেছি তা থেকে আমরা কখনো বিচ্যূত হইনি। রক্তচক্ষুর সামনে সত্যকে বর্জন করিনি-রক্ত চক্ষু দিয়েই তার জবাব দিয়েছি। দীর্ঘ তেইশ বছর অত্যাচার, নির্যাতন, শাসন, শোষণ আর বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতার

Dhaka University Institutional Repository

আলোকে বিচার করে সর্বশেষ কর্মসূচি হিসাবে আমার দল ৬ দফাকে জাতির সামনে পেশ করেছে। এদেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজও ৬ দফার সারবত্তা অনুধাবন করে তাদের ১১ দফা কর্মসূচিতে ৬ দফাকে স্থান দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। পাকিস্তানের ১২ কোটি মানুষের সত্যিকার মুক্তিচিন্তার স্বর্ণফসল হিসেবে কাউন্সিল অধিবেশনে ও কর্মীসমাজ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ৬ দফা। এই কর্মসূচিকে আওয়ামী লীগ কারও ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়নি। ৬ দফার গুণাগুণ বিচারের ভার আমরা জনগণেরর ওপরই ছেড়ে দিয়েছি। ৬ দফা বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ, ৬ দফা শোষকের হাত হতে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬ দফা মুসলিম-হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর নির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি, ৬ দফা বাঙালির আত্মমর্যাদায় সম্মানজনক আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি, ৬ দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন-মরণের সংগ্রাম। তাই এবারকার নির্বাচনে আমার দলের জয়ের অর্থ ৬ দফারই জয় আর ৬ দফার জয়ের অর্থ এদেশের লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের জয়।

লেবেল-সর্বস্ব ইসলাম নয়

আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ-কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য--লেবেল-সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসুলে করীম (দ.) এর ইসলাম, যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদেরই বিরুদ্ধে। যেদেশের শতকরা ৯৫জনই মুসলমান, সেদেশে ইসলামবিরোধী আইন পাসের সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেন কেবল তাঁরাই যারা ইসলামকে ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফায়স্থা করে তোলার কাজে।

কথা তোলা হয়েছে যে, নির্বাচনী ঐক্যজোটে সম্মত না হয়ে আমরা বাংলার স্বার্থেরই ক্ষতি করছি। এর উত্তর হল- বাংলার স্বার্তের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যই আমরা নির্বাচনী ঐক্যজোটে আর বিশ্বাসী নই। অতীতে বহুবার, এমনকি ১৯৫৪ সালে ঐক্যজোট গঠনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। বাংলার মানুষ গভীর আশায় বুক বেঁধে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করেছিল, কিন্তু আমরা দেখেছি যুক্তফ্রন্টের নাম নিয়েই আওয়ামী লীগ সদস্যরা ছাড়া আর সব অঙ্গদলের সদস্যরাই কেন্দ্রের সেই ধিকৃত দলটিতেই ভিড়ে গিয়েছেন, যে-দলকে দুদিন আগে বাংলার আপামর মানুষ বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎখাত করেছে। ফলত সর্বনাশ হয়েছে বাংলার আর বাঙালির, সর্বনাশ হয়েছে এদেশের কোটি মানুষের। তাই এবার আর আমরা ভিন্ন চিন্তাদর্শের মানুষের সাথে ঐক্যজোট গঠন করে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে। এবার আমাদের কথা হল কর্মসূচি বলতে কিছু থেকে থাকলে তার ভিত্তিতে জনগণের দরবারে যান, জনগণ আপনাকে গ্রহণ করলে জাতীয় পরিষদে গিয়ে প্রয়োজন হলে আপনার সাথে ঐক্যজোট গঠন করব, এখন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমার জীবনের স্বপ্ন

জাতির এ মহা সন্ধিক্ষণে বাংলার জননায়ক শেরে বাংলা পরলোকে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিও আজ আমাদের মাঝে নেই। মানিক ভাই-এর খুরধার লেখনীও আজ চিরতরে স্তব্ধ। প্রাচীন নেতাদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা অতীতের নিয়মে এখনো পশ্চিমাঞ্চলের সেই কায়েমী স্বার্থের কাছে নিজেদের বিকিয়ে রেখেছেন, নয়তো নির্জীব নিষ্কর্মা হয়ে বসে পড়েছেন, অন্যের শলাপরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। শত প্রতিকুলতার মুখে গর্দান খাড়া রেখে কথা বলার মতো নেতৃত্বের আজ বড় অভাব। নিজের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যে দেশবাসীর খেদমত করতে স্বপ্ন ও সাধনার আলোকে বিচার করে নিশ্চতই আজ আমি বুঝতে পারছি ভাগ্যাহত বাংলার–এদেশের আপামর তথা সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়ার বাসনাকে সার্থক রূপ দেওয়ার যে বিরাট গুরুদায়িত্ব আজ আমাদের সামনে, সে-দায়িত্ব আজ আমাকেই স্কন্ধে তুলে নিতে হচ্ছে। এদেশের ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্য প্রণয়নের দায়িত্ব বাংলার মাটিতে অঙ্কুরিত আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। আমি ও আমার দল সে-দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কেবল প্রয়োজন জনগণের দোয়া আর শুভেচ্ছা, যা কিনা আমাদের এবারের চলার পথে একমাত্র পাথেয়।

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত হিসেবে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার বক্তব্য: নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি এদেশের ভাবি নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করে যেতে পারে, আজাদী আন্দোলনের সূচনাতে এদেশের মানুষ মনের পটে যে সুখী–সুন্দর জীবনের ছক এঁকেছিল, সে-স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ কিছুটাও যদি প্রশস্ত করে যেতে পারি তাহলেই আমার সংগ্রাম সার্থক মনে করব।

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। তবু আমার প্রতিপক্ষেরা আমাকে এ অপবাদ দিয়ে চলেছেন। বিগত ২৩ বৎসর ধরে ক্ষমতার আসন আমি কবে যখন আঁকড়ে ধরেছি তার বিবরণ তারা দেন না। বিগত গোলটেবিল বৈঠকের সময় আমাকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ গ্রহনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমি তা দু-পায়ে ঠেলে দিয়েছি। এতে আমার প্রতিপক্ষের বন্ধুদের অনেক রুষ্টও হয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভ বা স্বার্থের বখরায় শরীক হয়ে দেশবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলী দেয়া আমার রাজনীতির লক্ষ্য কোনোদিন ছিল না, আজও নাই। তাই রুষ্ট হলেও প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রলোভনের মুখে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থের প্রশ্নের নিজ বিবেককে আমি বিকিয়ে দিতে চাইনি। তাঁদের দৃষ্টিতে এ আমার অপরাধ হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় দেশবাসীর দৃষ্টিতে নয়।

লোকশক্তির প্রত্যাশী

ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই, তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে-কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমরা চাই-ই-চাই। সে–শক্তি জোগাতে পারেন কেবল জনগণই। এ কারনে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার প্রার্থনা: জাতীয় পরিষদে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের হয়ে এক কণ্ঠে আওয়াজ তুলে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ ও অধিকার যাতে আমরা আদায় করে আনতে পারি, তার জন্য জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটি আসনে জনগণ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কারণ

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের শাসনতন্ত্র চাহিদামতো পাস করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমরা চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের চাবিকাঠি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি তাঁরা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমতনির্বিশেষে দেন, তাহলে আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তাঁদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবই। আর যদি আপনাদের বিচারে ভুল হয়, আবার যদি পার্লামেন্টে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের দরুন বাংলার প্রতিনিধিরা দলে দলে ভাগ হয়ে বসে বেসুরো আওয়াজ তোলেন, তাহলে হাতে পেলেও সবই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, আর তার অর্থ হবে এদেশের বারো কোটি মানুষ ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সর্বনাশ। এ সর্বনাশে আপনি আমি জ্ঞানত শরীক হতে পারি কিনা, তা বিচারের ভার আপনাদের ওপরই আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

বাংলার মীরজাফরদের সম্পর্কে আমি আপনাদের সজাগ করে দিয়ে এই কথাই বলতে চাই যে, তেইশটি বছরের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও শাসনে বাংলার মানুষ আজ নিঃস্ব, সর্বহারা। ক্ষুধায় তাদের অন্ন নেই, পরনে নেই বস্ত্র, সংস্থান নেই বাসস্থানের। বাংলার অতীত আজ লুপ্ত, বর্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জাতির এহেন দুর্দিনে বাংলার ভবিষ্যৎ সন্তানদের বাঁচাবার দায়িত্ব আপনার। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ যদি আপনারা আমাকে ও আওয়ামী লাগকে দেহ তাহলে এদেশের কৃষক–শ্রমিক–ছাত্র–মধ্যবিত্ত, যারা আজ সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত ও শূন্যহস্ত, তাদের মুখে ইনশাআল্লাহ আমরা হাসি ফোটাতে পারব–এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বাংলার সকল অধিবাসী–সে সংখ্যাগুরুতেই হউক বা সংখ্যালঘুই হউক, সকলকেই আজ দেশাত্ববোধ নিয়ে জেগে উঠতে হবে– মরণপথ করে বাংলার মান–ইজ্জতদ রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে আজও যারা ঘুমিয়ে আছেন তাদেরকে এবার ডাক দিয়ে কেবল বলে যেতে চাইঃ জাগো, বাঙালি জাগো। তোমাদের জাগরণেই এদেশের বারো কোটি মানুষের মুক্তি।

সামন্ত নেতৃত্ব–লাঞ্ছিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের আপামর মানুষও আজ তোমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। তোমরা তাদের নিরাশ করো না।

জয় জনগণের জয়!

জয় বাংলার জয়!

সকলের সমান অধিকার, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব

যে সংকট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে তার প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়, জনগণের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত এগুলোই বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতি বিদ্যমান তাকে নির্মূল করতে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ।

অসহনীয় অবিচার

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন সাধারণ করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ দু-ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাঙ্কিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ এই দুই ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাঙ্কের লগ্নীকৃত অর্থের শতকরা ৮২ ভাগ আজ মোট জমাকারীদের মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশে যে করপ্রথা কায়েম রয়েছে, তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপরপক্ষে, লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ওপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের বিপুল পরিমাণে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার ঋন, অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সুযোগ করে দিয়েছে।

ছিটেফোঁটা ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও সামন্তপ্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী রয়েছেন। তাঁরা সীমাহীন সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন। তাঁদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে। কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক–পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয়বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প–শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর। মুদ্রা মজুরি যা বাড়ছে–তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয়বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী, বিশেস করে চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলবিদ্ধ করছেন।

ভয়াবহ বৈষম্য

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে–গত বাইশ বছরে সরকারি রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র পনেরো শত কোটি টাকার মতো (মোট ব্যয়ে এক–পঞ্চমাংশ) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানের খরচ করা হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়াংশে অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বিশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র তেরো শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি করা হয়েছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিনগুণ বেশি বিদেশী মুদ্রা আমদানি করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশী মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বড়াতি দু-হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানি করতে পেরেছে তার কারণ বাংলাদেশের অর্জিত পাঁচশ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরেও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত হয়েছে।

চাকরিতে বাঙালির বঞ্চনা

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানও ঠিক একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার তেইশ বছর গত হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বাঙালির সংখ্যা আজও মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা মাত্র ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজণিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধুমাত্র অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে তার শিকার পরিণত হয়ে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল শতকরা ৫০ থেকে ১০০ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানের যেক্ষেত্রে মোটা চাউলের দাম প্রতিমণ ২০ থেকে ২৫ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম প্রতিমণ ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিষার তেলের দাম মাত্র আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি সের তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচিতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৭০ টাকা। তারপরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলায় সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমস্ এর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

গত বাইশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন– এসব অবিচার তারই পুঞ্জিভূত ফলশ্রুতি। এ অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এই সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা। কেন্দ্রীয় সরকার যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন অতীতের অন্যায় অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ–চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি, যে কর্মসূচি ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সে কর্মসূচি আঞ্চলিক অন্যায় অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাংলার প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তম ব্যয়-বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে আওয়ামী লীগের ৬

Dhaka University Institutional Repository

দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবি এ স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই দিতে হবে। এ জন্যেই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাদানের ব্যাপারে আমরা সবসময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি। এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সকরারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার উর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেশন সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা বিষয় ও নিরাপত্তামূলক শর্ত–সাপেক্ষে মুদ্রাব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে একটা ন্যায় সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েম করতে হতে পারে বরে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকার পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকরিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলি যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করে, তবে তারা কার্যকরীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসন ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে চান–বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পরিকল্পনা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে।

আমাদের বিশ্বাস, শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এবং অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবেন যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণি সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারব। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের নামে ব্যাংক ও বিমা কোম্পানীগুলোসহ দুর্নীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হবে জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারি পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ সাধণ করতে হবে। কর ব্যবস্থাকে সত্যিকারের গণমুখী করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সুতা এবং রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্পসুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ যাবৎ বাংলার আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া বেপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবস্যা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতিও একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেজন্যে আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্য অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসলের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একটা স্বল্প-সম্পদের দেশে কৃষিপর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষীদের ন্যায্যা ও স্থিতিশীল মূল্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

কৃষি বিপ্লব অত্যাবশ্যক

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জায়গীরদারি, জমিদারি সরদারি প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমিব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমি দখলের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারি খাস ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কৃষিব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষীদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমি রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ ও বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমি রাজস্ব প্রথাও তুলে দেবার কথা ভাবছি।

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বন সম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ হাঁস-মুরগির চাষ, দুগ্ধ খামার সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক মৌলভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তর সেগুলোকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা নিন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে

Dhaka University Institutional Repository

দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে বিজলি সরবরাহ করতে না–পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হবে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিজলি সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা বাংলাদেশে পঁচিশ'শ কিলোওয়াটস বিজলি উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবর্তন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধুনদের উপর এবং বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলীর উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেলব্যবস্তার উপরও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছি।

শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ

সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ জন সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বিয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈনতিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটা 'ক্রাস প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বারা সকল শ্রেণির জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দু যাতে ইংরেজির স্থান দখল করতে পারে–সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলির দিকে তাকারে আমরা দেখতে পাব নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুরি বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তুহারা ও বিত্তহীনের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথা কুটে ফিরছে। ভবিষ্যতে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার সংখ্যাগরিষ্ঠ

দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগসুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থার প্রয়োজন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপন করা প্রয়োজন। চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্যে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন প্রয়োজন। পল্লী এলাকর জন্যে বিপুলসংখ্যক প্যারামেডিকেল পার্সনেলদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার।

শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা

গণ-আন্দোলনের মতোই শিল্প-শ্রমিকরা অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের মৌলিক স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের বেঁচে থাকার মতো মজুরি, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকৎসর সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম আইন বাতিল করতে হবে। শিল্পকারখানা–শ্রমিকদের ন্যায্যা হিস্যাদানের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে শিল্প উৎপাদনে বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরির কাঠামো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভূক্ত কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে।

সকল নাগরিকদের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমরা সবসময়ই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে আসছি। সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকদের মতোই সমান অধিকার ভোগ করবে। আইনের সমান রক্ষাকবচ সর্বক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরোপুরি সংযোজিত ভোগ করে, এজন্যে উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারীরা যাতে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে–সেজন্য তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতোই সমান সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রয়োজন

৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে–সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষ বারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলারে পরিপন্থী হতে পারে না।

পররাষ্ট্র নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে–আজ বিশ্ব জুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোনো মতোই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এজন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমরা ইতিমধ্যেই সিয়াটো, সেন্টো ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবি জানিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনো জোটে জড়িয়ে না–পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে–সে-সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।

"কারোর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব"– এ নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত, এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির ওপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচি ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নের গণভোটরূপে আমরা গ্রহণ করেছি।

রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিকের বিরুদ্দে ও বিগত গণ অভ্যুত্থানকালীণ দায়েরকৃত মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও দন্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হলে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশে সৃষ্টি হবে। বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দিকেও মুক্তি দিতে হবে।

রাজনীতি ও সেনাবাহিনী

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করতে দেওয়া কোনো প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্র বাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে–আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবেলা করবই। প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্তার মধ্যেই একত্রে বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোনো উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এই ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে তাকে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাল্লাহ্ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার–টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ।[২]

[বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশন মারফত জাতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দান করেন, তার পূর্ণ বিবরণ]

আমার প্রাণপ্রিয় বীর বাঙালি ভাইবোনেরা, আমরা আজ স্বাধীনতা প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছি। এই মহান দিনে স্বাধীনতা অর্জনের পথে যে লক্ষ লক্ষ বীর শহীদ হয়েছেন তাঁদের জন্য গভীর বেদনাপ্লুত মন নিয়ে আমার শোকাতুর দেশবাসীর সাথে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরবারে মাগফেরাত কামনা করছি। এই সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ও অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য আমি মুক্তিবাহিনীর সকল অঙ্গদল তথা বাংলাদেশ, রাইফেলস, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সশস্ত্রবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যবৃন্দ, নির্ভীক যুবক, ছাত্র–কৃষক–মজদুর–বুদ্ধিজীবী আর আমার সংগ্রামী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও একনিষ্ঠ আত্মদান অনাগতকালের ভাবী বাঙালিদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত মুক্তিপাগল জনতার চেতনাকে উদ্ভাসিত করবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, বিগত পঁচিশ বৎসর ধরে আপনারা ক্ষুধা, বঞ্চনা, অশিক্ষা এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষকেরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটা নিকৃষ্টতম উপনিবেশে পরিণত করেছিল। দুঃসহ ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম। পিষ্ট হচ্ছিলাম শোষণের জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়ে। দারিদ্র্যের ও অনাহারের বিষবাষ্পে যখন আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন তদানীন্তন পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের কষ্টার্জিত তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তোলার কাজে মত্ত ছিল। ন্যায়বিচার দাবি করায় মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ আমাদের উপর নেমে এসেছিল। সমসাময়িককালে নিষ্ঠুরতম স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, আর তিন কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত। এ সবকিছুই ঘটেছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য। আজ আমি যকন আমার সোনার বাংলার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ধূসর পাণ্ডুর জমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের স্বাধীনতা যদি এদেরকে আশা–নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে এদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে তুলে দিতে না পারে এক মুষ্টি অন্ন, মুছে দিতে না পারে মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তাহলে সে স্বাধীনতা মিথ্যা, সে আত্মত্যাগ বৃথা। আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উৎসবের লগ্নে দাঁড়িয়ে, আসুন আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি, বিধ্বস্ত মুক্ত বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলব। গুটি কয়েক

---

২. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৪৩

সুবিধাবাদী নয়, সাড়ে সাতকোটি মানুষ তার ফল ভোগ করবে। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী ও উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

পর্বততুল্য সমস্যা

আজ আমাদের সামনে পর্বততুল্য সমস্যা উপস্থিত। মহা সংকটের ক্রান্তিলগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি। বিদেশ ফেরত এক কোটি উদ্বাস্তু, স্বদেশের বুকে দু-কোটি গৃহহারা মানুষ, বিধ্বস্ত কর্মহীন চালনা-চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়, নিশ্চল কারখানা, নির্বাপিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, অসংখ্য বেকার, অপরিমিত অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা বাণিজ্যিক সরবরাহ ব্যবস্থা, ভগ্ন সড়ক, সেতু ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, দারিদ্র্য; খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং অকর্ষিত ভূমি–এ সবকিছুই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। জনগণের গভীর ভালোবাসা, আস্থা, অদম্য সাহস ও অতুলনীয় ঐক্য–এগুরোকে সম্বল করেই আমার সকার এই মহা সংকট কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

আমি আশা করব, অতীতে আপনারা যেভাবে দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে ইয়াহিয়ার সামরিক যন্ত্রকে পরাভূত করেছিলেন, গভীর প্রত্যয় ও সাহস নিয়ে তেমনি বর্তমান সংকটের মোকাবেলা করবেন। আমরা পুরাতন আমলের জীর্ণ ধ্বংসস্তুপের মধ্যে থেকে নতুন সমাজ গড়ে তুলব।

প্রশাসন কাঠামো

ভাই ও বোনেরা, আপনারা জানেন হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের বাংলাদেশ রাইফেলস্ ও পুলিশের বিপুল সংখ্যকব সদস্যকে হত্যা করেছে। আইনের শাসন কায়েম ও শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনের অভাব বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নতুন নিযুক্তির মাধ্যমে আমরা পুলিশ বিভাগকে সংগঠিত করছি এবং ইতিমধ্যে যে সকল সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারী স্বাধীনতা-উত্তর সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের মন দমন করে জনসাধারণের মনে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতীর জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু কিছু আমরা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তারা এখনো বনেদী আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। আমরা তাদেরকে স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের জন্য উপদেশ দিচ্ছি এবং আশা করছি, তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। আমার সরকার নবরাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকে পুর্নগঠিত করবে। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারদিের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের সমগ্র মহকুমাগুলোকে জেলা পর্যায়ে উন্নতি করার পরিকল্পনা তৈরি করছি।

শাসনতন্ত্র

বিশেষজ্ঞরা খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং খসড়া শাসনতন্ত্র গণপরিষদের সামনে পেশ করা হবে। এই শাসনতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ৫৪টি বন্ধু রাষ্ট্র এ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিপুল সংখ্যা বন্ধু রাষ্ট্রের এই স্বীকৃতি দান রাষ্ট্র পুঞ্জের অন্যান্য সদস্যকে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে।

উদার সাহায্য কামনা

উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসন ও অর্থনীতিকে পুর্নগঠনের জন্য আমরা বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে উদার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। বিশেষ করে ভারত আমাদের সুদিন ও দুর্দিনের প্রতিবেশী। সম্প্রতি মহান ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। এই চুক্তি দুই দেমের মেহনতী মানুষের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব এবং সংহতির বন্ধনকে মজবুত করবে। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্যোগময় মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি সোভিয়েত রাশিয়া সফল করে এসেছি। সেখানে তাদের অকৃত্রিম আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুর্নগঠনে কাজে সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো এবং অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ যাঁরা আমাদের দিকে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসছেন তাঁদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি জোট বহির্ভূত ও সক্রিয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত। বৃহৎ শক্তির আন্তর্জাতিক সংঘাতের বাইরে আমরা শান্তিকামী। আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব সৃষ্টিতে আগ্রহী। দেশ গড়ার কাজে কেউ আমাদের সাহায্য করতে চাইলে তা আমরা গ্রহণ করব। কিন্তু সে-সাহায্য অবশ্যই হতে হবে নিষ্কণ্টক ও শর্তহীন। আমরা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সব জাতির সম-মর্যাদার নীতিতে আস্থাশীল। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবেন না, এটাই আমাদের কামনা।

বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতে হবে

দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের শাসকরা বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিচ্ছেন না। তাঁরা পাঁচ লক্ষ নিরীহ বাঙালিকে সন্ত্রাস ও দুর্দশার মধ্যে আটকে রেখেছেন। আমি বিশ্বব্যাপী বিবেকসম্পন্ন মানুষ, বিশেষ করে মি. ভুট্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হউক। এই ইস্যুকে কোনোক্রমেই যুদ্ধ বন্দীদের সমপর্যায়ে ভাবা চলবে না। কারণ তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যা অপরাধে অপরাধী। তারা মানবিকতাকে লঙ্ঘন করছে এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের বিচার হবে্ পাকিস্তানের সংবেদনশীল সাধারণ মানুষের কাছে আমার আবেদন–নুরেমবার্গ মামলার আসামিদের থেকেও নিকৃষ্ট ধরনের এই অপরাধীদেরকে তারা স্বজাতি বলে ডাকবেন না।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা দেশে ফিরে এসেছে। সাহায্য, পুর্নগঠন ও পুর্নবাসনের জন্য আমরা কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। বিনামূল্যে ও ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্যে কিছুটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ছিন্নমূল মানুষের মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ার জন্যে অস্থায়ী বাসগৃহ তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। বিধবা, অনাথ ও নির্যাতিতা মহিলাদের পুর্নবাসন পরিকল্পনাকে সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করছেন। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে গেছে তাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে দশ বছর সময় দরকার। আমাদের বিপ্লবী সরকার আশা করছে ৩ বছর সময়ের মধ্যে এ কাজ সমাধা করবে।

মজুতদাররা হুঁশিয়ার

বিপুল খাদ্যঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ। কিন্তু আমি কাউকে না খেয়ে মরতে দিতে চাই না। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আশা করি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ তেকে আনতে পারব। ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১০ লক্ষ টন আমদানি করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্যে ঘোর দুর্দিন। আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী–আপনারা ধৈর্য্যধারণ করুন, উচ্চতম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্যঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারি ও গুজব বিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে–তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

জাতীয়করণ

আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব তাত্ত্বিকতা নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ ও অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলব এবং জাতির এই মহাক্রান্তিলগ্নে সম্পদের সামাজিকরণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচি শুভ সূচনা হিসাবে আমার সকার উল্লিখিত বিষয়গুরো জাতীয়করণ করেছেঃ ১. ব্যাংকসমূহ (বিদেশী ব্যাংকের শাখাগুলো বাদে), ২. সাধারণ ও জীবন বিমা কোম্পানীসহ (বিদেশী বিমা কোম্পানীর শাখাসমূহ বাদে), ৩. সকল পাটকল, ৪. সকল বস্ত্র ও সূতাকল, ৫. সকল চিনিকল, ৬. অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌযানের বৃহদাংশ, ৭. ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যে তদূর্ধ্ব সকল পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পক্তি, ৮. বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং করর্পোরেশনকে সরকারি সংস্থা হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে এবং ৯. সমগ্র বহির্বাণিজ্যিকে রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য নিয়ে সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্যের বৃহদাংশকে এই মুহূর্তে ট্রেডিং করর্পোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি প্রতিভাববান ব্যক্তিদের আমি দেশ গড়ার কাজে এগিড়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সরকারি সেক্টরে কাজ করার জন্য তাদের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা দেওযা হবে। শিগগিরই যে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হচ্ছে, তাতে এসব ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হবে। যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে বাঙালিদের মালিকানা স্বার্থ সরাসরি জড়িত, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাবেক মালিক অথবা প্রধান কর্মকর্তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নেন, আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, সেগুলো সবদিক থেকে বিপ্লবাত্মক এবং জনসাধারণকে অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারি ক্ষেত্রে মাঝির ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের নীতির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সরকারি নীতির কাঠামোর মধ্যে থেকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজ ন্যায্যভাবে চালানোর জন্যে উৎসাহ দেওয়া হবে।

আর শ্রমিক-মালিক বিরোধ নয়

আমি এমন এক নীতি নির্ধারন করতে চাই, যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারবেন। এই বলিষ্ঠ শ্রেণির কর্তব্যবোদের উপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করছি। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমানকাল ধরে যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে, তা আমাদের নতুন নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেকখানি বিলুপ্ত হবে। শ্রমিক কর্মচারীকে আর সর্বদা মালিকের সাথে বিরোধে লিপ্ত থাকতে হবে না। কেননা, বর্তমানে তাদের মালিক হলো বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যারা মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে বিশ্বাস করে নিজেদের সম্পত্তি জমা রেখেছে।

আমি খুব শিগগিরই শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা করছি। সেই সভায় শ্রমিক–সংক্রান্ত সরকারি নীতি ও আমাদের বিপ্লবী নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করতে তাদের যে পূর্ণ সহযোগিতা লাগবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছানোর পরে আমি আশ করব যে, শ্রমিক-নেতারা আমার সরকার ও আমার সাথে একযোগে কাজ করবেন এবং এই বিপ্লবী নীতিসমূহ সরাসরি শিল্প এলাকায় কার্যকরী করবেন। তদুপরি শ্রমিকদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষা কমিশন

আমার ছাত্র ভায়েরা, যারা মুক্তিসংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাদের কাজ করে যেতে থাকে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশসহ আমি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করতে চলেছি।

কৃষি ব্যবস্থা

আমাদের সমাজে চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি ও তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে। সম্পদের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বোও আমরা চাষীদের স্বল্প মেয়াদী সাহায্য দানের জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২৫ বিঘার কম জমি যাদের আছে তাদের খাজনা চিরদিনের জন্য মওকুফ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সমস্ত বকেয়া খাজনা মাফ করা হয়েছে। তাকাবি ঋণ বাবদ ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হচ্ছে এবং ১৬ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। লবণের উপর থেকে কর তুলে দেওয়া হয়েছে।

সারা বছর ধরে সেচের কাজ চালানো, উন্নত মানের বীজবপন, সার, কীটনাশক ঔষধ এবং প্রতিটি চাষীকে পর্যাপ্ত ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভূ–মালিকানার ক্ষেত্রে পশ্চাতের বৈষম্য

Dhaka University Institutional Repository

দূরীকরণের জন্য পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমিয়ে এনে পরিবার পিছু এক শ বিঘায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই উচ্চসীমা আরও কমিয়ে আনা যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে। ছোট ছোট চাষীদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে। এ কথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষীরা কেবল আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না, বরং সমবায়ের মাধমে সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে। এই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন ও স্বল্পজমির অধিকারী চাষীদের জন্যে ব্যাপক পল্লী পুর্নগঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করা। 'কাজ করলে খাদ্য' এই কম কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া টেস্ট রিলিফের অধীনে পল্লীর কর্মসংস্থানের জন্যে নগদ ১৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়ে গেছে।

কুটির শিল্প

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে বেকার সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। জনসাধারণের নিত্য–নৈমিত্তিক প্রয়োজনের চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে এটা গড়ে তোলা হবে। আমাদের কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের এটা হবে সহায়ক। এই সরকার নগরভিত্তিক ও গ্রামীন জীবনের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন। সেই সব ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার যাঁরা পাটচাষীদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে মানুষ হয়েছে তাঁদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে। আমি ইতিমধ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামে কাজ করার জন্য ৫'শ ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছি। বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না। সম্পদের বন্টনব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে এবং উচ্চতর আয় ও নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বী বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করার ব্যবস্থাদি উদ্ভাবনের জন্যে আমি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার কথা বিবেচনা করছি। আজ আমরা বিশ্ব সভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে আমরা বিভোর, একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল, আমাদের সমস্ত নীতি–আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত হবে। আমাদের দুস্তর পথ। এ পথ আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের লাল আস্তরণে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেব না। আজি জীবনেও কোনোদিন কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেই নাই। শত্রুরা বাংলাদেশের সবকিছু ধ্বংস করে গেছে। কিছুই রেখে যায়নি। কী করে যে এ দেশ চলবে, সত্যিই চিন্তা করলে আমি শিহরিয়া উঠি!

সোনার বাংলা গড়তে হবে

শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে–শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবে। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ক্ষেতখামার, কারখানা দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন, সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।

জয়বাংলা

পাকিস্তানের কারগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ [৩]

গত ৭ মার্চে এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলুন; এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালিও প্রাণ থাকেত এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্রে হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে–পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশের আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মসুলমান একমাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলল, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দিন এবং আমার অন্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভায়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি চাই, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে, তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য

৩. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৬

যে কোনো রাষ্ট্রের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্বই হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুবই কম আছে, যে পরিবারের লোক মারা যায়নি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চুতর্থ। কিন্তু অদৃষ্টেয় পরিহাস, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এদেশের কৃষক–শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করেছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান প ি ত জওহেরলাল নেহরুর কন্যাই নন, প ি ত মতিলার নেহরুর নাতনীও। তাঁর সাথে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থসংশি- ষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবেন। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসধারণের জন্য শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক–যাঁরা পাকিস্তান সোনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন–এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তিবাহিনী, ছাত্র–কৃষক–শ্রমিক সমাজ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ই.পি.আর, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখ–কষ্ট সহ্য করেছেন তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিবভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তাঁর নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয় ।পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দু-দেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংগের নিকট একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন। জয় বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ৭জুন ১৯৭২ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত বঙ্গুবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা [৪]

আমার ভাই ও বোনেরা,

আজ ৭ জুন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ১৯৬৬ সালের এই দিনে আওয়ামী লীগ ছয় দফা ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণায় সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী ক্ষেপে গিয়েছিল। কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে, আমরাও তাদের বুঝতে পেরেছি। তারা জানতে পেরেছিল, বাঙালিদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাই আইয়ুব খান ও মোনেম খান তাঁদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমার লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমি তখন কারাগারে বন্দী হয়ে যাই।

আপনাদের নিশ্চয়ই আরও মনে আছে, আমাকে যশোহরে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তারপর যশোহর থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ঢাকা থেকে আমাকে সিলেট নেওয়া হয় এবং সেখানেও আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিলেট থেকে ময়মনসিংহ নেওয়া হয় এবং ময়মনসিংহেও আমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এমনি করে গ্রেপ্তারের পালা চলে। সঙ্গে সঙ্গে ৭ মে তারিখে আওয়ামী লীগের তাজউদ্দিন, জহুর আহমদ চৌধুরী, খোন্দকার মুশতাক আহমদ প্রমুখ নেতাও গ্রেপ্তার হন। পরে আমার সহকর্মী বন্ধু মিজুনুর রহমান চৌধুরী, শামসুল হক, মোল্লা জালালুদ্দিন, মনসুর আলী, মরহুম আব্দুল আজিজ (চট্টগ্রাম), মরহুম আমজাদ হোসেন (যিনি পাবনায় মৃত্যুবরন করেছেন) এবং হাজার হাজার আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্র ও শ্রমিক কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

শুধু তাই নয়। ৭ জুন তারিখে তেজগাঁও, ভিক্টোরিয়া পার্ক, নারায়ণগঞ্জ, মুক্তাগাছা এবং আরো অনেক জায়গাতে গুলি করে আমার শত শত ভাইবোনকে হত্যা করা হয়। আইয়ুব খান মনে করেছিলেন, গুলি করে বাঙালিদের দাবিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি তা পারেন নাই। সেইদিনই শুরু হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম। অনেকে হয়তো বুঝতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা জানতাম, এ ব্যাপার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এইজন্যে ধাপে ধাপে আন্দোলন এগিয়ে নেওয়া হয়।

এরপরে আমি যখন গ্রোপ্তার হয়ে চলে যাই, আমার সহগর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী সভাপতি হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তারপর যিনিই আওয়ামী লীগের সবাপতি বা সম্পদক হয়েছেন, তাঁকেই গ্রেপ্তার করে জেলে দেওয়া হয়েছে।

তারপরেও ষড়যন্ত্র হয়। আওয়ামী লঅগকে বিভক্ত করে তার মধ্যে থেকে এক দলকে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান সরিয়ে নিয়ে যান। তাতেও আমাদের দাবাতে না পেরে আমার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হয়। আপনাদের সব ইতিহাসই মনে আছে। সেইদিনও আপনারা শুনেছেন, অনেক দল আইয়ুব খানের টাকা খেয়ে ছয় দফা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আপনাদের এ কথাও জানা আছে যে, ৭ জুন তারিখে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল।

---

৪. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

তারপর আসুন ১৯৬৮-৬৯ সালের ঘটনারগুলোর কথায়। সে সময়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করে। আওয়ামী লীগও আন্দোলনে যোগদান করে এবং তাতে নেতৃত্বে দেয়। তারপর আইয়ুব খান আগরতলা মামলা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। সেদিনও আমার দেশের বহুলোকে জীবন দিতে হয়েছে। রক্ত আমাদের অনেক দিতে হয়েছে। বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য যত রক্ত দিতে হয়েছে, কোনো দেশ, কোনো জাতি তা দেয় নাই।

আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। লোকে বলে, মানুসের স্মৃতিশক্তি নাকি দুর্বল। সে নাকি অল্পদিনেই সব ভুলে যায়। কিন্তু কেমন করে ভুলবে? ২৩-২৪ বৎসর আওয়ামী লীগকে নিয়ে আমি সংগ্রাম করেছি। এই সময়ের মধ্যে মাত্র ১২-১৩ মাস সোহরাওয়ার্দী সাহেব ক্ষমতায় ছিলেন। সর্বক্ষণই উজানে আমাদের নৌকা বাইতে হয়েছে এবং বারবার গ্রেপ্তার হতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে। সে ইতিহাস আজও অম্লান রয়েছে।

নির্বাচন বানচাল করবার চেষ্টা

তারপর যখন নির্বাচনে আপনারা আমাকে ভোট দিলেন, তখনো একদন লোক নির্বাচন বানচাল করবার চেষ্টা করেছিল। আমি বলেছিলাম, দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, বাংলার মানুষ এক, বাংলার মানুষ স্বাধীনতা চায়, বাংলার মানুষ তাদের পক্ষ থেকে কথা বলার অধিকার আমাকে দিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে এসব প্রমাণও হয়ে গেল কিন্তু ষড়যন্ত্র বন্ধ হল না। ইয়াহিয়া খান সাহেব এসে গদিতে বসলেন। অর্থাৎ এক কান গেলেন আর এক খান এলেন। ইয়াহিয়া কান এসে শুরু করলেন নির্বাচনের কথা। মিষ্টি কথা, ফিসফিস কথা, ছোট ছোট কথা, বড় বড় কথা। আর, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য বাড়াতে লাগলেন বাংলার বুকে, আমার উপর আঘাত হানার জন্য। আমরা প্রস্তুত হলাম। আমরাও এখানে দাঁড়িয়ে শপথ নিলাম ৩ জানুয়ারি তারিখে, যে আদর্শে বাংলার মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে তাতে আপস নাই।

আপনারা জানেন, ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্তী হবেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি মনে করেছিলেন, আমাকে প্রধানমন্ত্রী বললেই আমি গলে গদগদ হয়ে যাব। আর আমার দাবি ছেড়ে আমি তাঁর সঙ্গে হাত মেলাব। কিন্তু তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে জানতেন না। আওয়ামী লীগকেও জানতেন না। তাঁর এটাও জানা ছিল না যে, প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য মুজিবুর রহমান রাজনীতি করে নাই। আমি রাজনীতি করেছি বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্য, বাংলার মানুষকে স্বাধীনতা দেবার জন্য, বাংলার মানুষের জন্য শোষণহীন সমাজ গড়ার জন্য। আামি রাজনীতি করেছি পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্য। বাংলার মানুষ যাতে মানুষের মতো দুনিয়ায় দাঁড়াতে পারে তার জন্য এবং বাংলার সম্পদ যাতে পশ্চিমারা লুট করে খেতে না পারে তারই জন্য আমি সংগ্রহ করেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য সংগ্রাম করি নাই।

ভায়েরা আমার,

Dhaka University Institutional Repository

এরপর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন এবং তার পরের ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে কিছু বলবার চেষ্টা করব। সে-সবের আলোচনায় আপনাদের বেশি সময় আজ আমি নেব না। কারণ, আরও অনেক কথা আপনাদের বলতে হবে। জেল থেকে বের হয়ে এখানে এসে আমি সামান্য কয়েকটি কথা বলেছিলাম। সেদিন আমি বেশি কিছু বলতে পারি নাই। কারণ, মাঝে মাঝে আমার চোখে পানি এসে গেছে। তারপরে ভারতের মহীয়সী নারী মিসেস গান্ধী যখন এখানে আসেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আপনাদের সামনে এসেছিলাম এবং কয়েক মিনিট বক্তৃতা করেছিলাম। তিনি অতিথি। তাঁর সামনে অন্য কথা বেশি বলা যায় না।

মুক্তিসংগ্রামের সূচনা

আজ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের জানা দরকার। ত্রিশ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে। ২৫ মার্চ রাত্রে ইয়াহিয়া বর্বর বাহিনী আমার উপর আক্রমণ চালায়। সেদিন রাত্রে আমার অবস্থা যে কেমন ছিল সেটা কেবল আমিই জানি। আমি জানতাম ঘর থেকে বের হলেই আমাকে গুলি করে মারবে। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু বাংলার মাটিকে আমি ছাড়তে পারি নাই। রাত্রি ১১টার সময় আমার সম্সত সহকর্মীকে, আওয়ামী লীগের নেতাদের হুকুম দিলাম 'বের হয়ে যাও। যেখানে পার, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। খবরদার, স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো।'

রাত্রে আমি চট্টগ্রামে নির্দেশ পাঠালাম। আগে যাকে ই.পি. আর. বলা হত, তাদের সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রাম। পিলখানা হেডকোয়ার্টার তখন শত্রুরা দখন করে নিয়েছে। ওদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি যখন পিলখানার সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম না তখন আমি চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ করে বললাম, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমরা বাংলার সব জায়গায় ওয়ারলেস এ খরব দিয়ে দাও। পুলিশ হোক, সৈন্যবাহিনী হোক, আওয়ামী লীগ হোক, ছাত্র হোক, যে যেখানে আছে, পশ্চিমাদের বাংলা থেকে খতম না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও। বাংলাদেশ স্বাধীন।' তারা আমার কথামতো খবর পৌঁছিয়েছিল।

সে রাত্রে কেবল আমার বাড়িতে নয়, রাজারবাগ, পিলখানা ও আওয়ামী লীগের অফিস আর ছাত্রাবাসেও আক্রমণ চলে। বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রাজারবাগের পুলিশরা ৬ ঘন্টা ৩০৩ রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। ঢাকায় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিন চারটে ব্যাটেলিয়ন ছিল। হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের অর্ধেককে মেরে ফেলা হয়।

এমনি করে সমস্ত বাংলাদেশের ছাত্র-যুবক-কৃষকদের মেরে ফেলা হয়। আমার সহকর্মীরা পালিয়ে মুজিবনগরে আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁরা স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন সরকার কায়েম করেন। নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হন আর তাজউদ্দিন হন প্রধানমন্ত্রী। মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং খোন্দকার মুশতাক আহমদকে নিয়ে সরকার গঠিত হয়।

দালালদের সমালোচনা

এখন যাঁরা সমালোচনা করে বক্তৃতা দিচ্ছেন, তখন তাঁদের কাউকে এসব কাজে দেখা যায় নাই। তাঁদের কেউ যুদ্ধে এগিয়ে আসেন নাই। তাঁরা কেবল প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে বেড়াতেন। অথচ আওয়ামী লীগের নেতারা তখন মুজিবনগরে বসে আবার সকলকে একতাবদ্ধ করে যুদ্ধ শুরু করেন, সারা দুনিয়ায় লোক পাঠিয়ে বাংলাদেশের কথা সবাইকে জানিয়ে দেন। সে সময়ে বাংলাদেশ থেকে এক কোটি লোক পালিয়ে গিয়ে পশ্চিম বাংলা, মেঘালয়, আসাম আর ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। তারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে দেশ ছেড়ে চলে যায়। তখন ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লাশ। সারা বাংলার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লাশ। নদীতে লাশ, ঘরে ঘরে লাশ। মানুষের মা-বোনের আর্তনাদ! চারিদিকে হাহাকার, সর্বহারার আর্তনাদ! তবু সেদিন সমালোচকদের কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় নাই। তারা বরং ইয়াহিয়া খানের দালালি করেছে।

তার পরের যুদ্ধের ইতিহাস আপনারা জানেন। পাকবাহিনী ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিল। লোক দেশত্যাগ করলো। বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হল। শ্রমিক আর ছাত্রদের গুলি করে মারা হল। আজ অনেকেই সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন আর এম.সি.এ-দের এবং আওয়ামী লীগকে গালি দেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের ত্যাগের কথা কারও মুখেই শোনা যায় না। আওয়ামী লীগের এম.সি.এ আমার সহকর্মী মসিহুর রহমানকে দুই মাস পর্যন্ত মারতে মারতে হত্যা করা হয়েছে। আমার আর একজন এম.সি.এ আমীনউদ্দিনকে আধামরা করে জিপের পিছনে বেঁধে তিন মাইল ঘুরিয়ে মেরে ফেলা হয়। আমার এক চাচাকে ছয় টুকরো করে ছয় রাস্তার মাথায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। সৈয়দপুরের এম.সি.এ নজমুল হুদা সরকারকে গুলি করে হত্যা করে দুই ভাগ করে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল। এখন যাঁরা বড় বড় কথা বলেন, তখন তাঁরা কোথায় ছিলেন? সবাই স্বাধীনতা পেয়ে গেছেন। কিন্তু এ কি চোরাকারবারির স্বাধীনতা, মুনাফাখোরের আর মজুতদারের স্বাধীনতা? রাজাকারের আর আল বদরের স্বাধীনতা? আমি কিছু বলি না। এইজন্য কি তারা ভেবেছে আমি নরম মানুষ! আমি নরম মানুষ নই। আমি তাদের খেলতেদ দিয়েছিলাম।

আমাকে আপনারা 'জাতির পিতা' আখ্যা দিয়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য আসি নাই। আমি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ভালোবাসি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আমাকে ভালোবাসে। জীবনে কখনো আমি তাদের সাথে বেঈমানি করি নাই। চারবার আমাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা হয়েছে। তবু আমি মাথা নত করি নাই। তা সত্ত্বেও কেন এত কথা বলা হয়?

যুদ্ধোত্তর পরিস্তিতি

জেল থেকে বের হয়ে আসার পর আমি বলেছিলাম, আমার কর্তব্য বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার পতাকা আজ দুনিয়ার আকাশে ওড়ে। আমার দেশ বাংলাদেশ আজ দুনিয়ার মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। আজ আমি বলতে পারি, আমি বাঙালি। আজ আমি বলতে পারি, বাঙালি একটি জাতি। আজ আমি বলতে পারি, বাংলার মাটি আমার মাটি। এর বেশি তো আমি চাই নাই। আপনারাও আমাকে সব দিয়েছেন। আপনারা তো আমাকে জাতির পিতা বানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রিত্ব তো আমার জন্য বড় জিনিস নয়। যা কোনোদিন কোনো মানুষ পায়

Dhaka University Institutional Repository

নাই, তা আমি পেয়েছি। আপনারা যা দিয়েছেন, সে হল আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি। এর বেশি কিছুই আমি চাই না।

জেল থেকে বের হয়ে এসে আমি দেখেছিলাম রেলওয়ে ভেঙ্গে গেছে, চালের গুদাম নাই, দোকানে মাল নাই। ব্যাংকের টাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়েছে। আমি আরও দেখেছিলাম মানুষের কাছে বন্দুক। আমার দেশের লোক আমাকে ভালোবাসে। তাই আমার সহকর্মীরা বললেন, তোমাকেই, সবকিছুর ভার নিতে হবে। তার ফলে আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব নিতে বাধ্য হলাম। বিশেষ করে এই জন্য যে, আমার বাংলার স্বীকৃতি দরকার। আমি বাংলাদেশের মানুষের কাছে আবেদন জানালাম, তোমাদের অস্ত্র ফেরত দাও। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আমার বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা দুই লক্ষ অস্ত্র আমার হাতে দিয়েছে। অস্ত্রসমর্পণের এমন নজির দুনিয়ার ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

আমাদের গুদামে চাল নাই। পকেটে পয়সা নাই। পোর্ট ভেঙে দিয়েছে। বাস-ট্রাক পুড়িয়ে দিয়েছে। রেলগাড়ি চলে না। রাস্তায় গাড়ি চলতে পারে না। চট্টগ্রাম ও চালনা পোর্টের মুখে সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে রেখে দিয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বাঁচাব কী করে? দস্যুর দল মানুষ হত্যা করে খুশি হয় নাই। আমার সম্পদ ধ্বংস করে লুট করে নিয়ে গেছে। অথচ আজ একদল এসবের জন্য ভারতকে দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এক কোটি লোককে মিসেস গান্ধী খাবার দিয়েছিলেন, কাপড় দিয়েছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন। এসব কি তারা দেখে আসে নাই?

খাদ্য ও ত্রাণ

আমার দেশ স্বাধীন দেশ। ভারত হোক, আমেরিকা হোক, রাশিয়া হোক, গ্রেট ব্রিটেন হোক, কারো এমন শক্তি নাই যে, আমি যতক্ষণ বাঁচি আছি, ততক্ষণ আমার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু বন্ধুরাষ্ট্রকে বন্ধু বলতে লজ্জা করা উচিত নয়। যেদিন আমার সরকার ক্ষমতায় আসে, সেদিন এক ছটাক চাল ছিল না। আমি তাই ভারতের কাছে চাল চাই। ভারত তখন আমাদের সাড়ে সাত লক্ষ টন চাল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরই মধ্যে তাদের কাছে আমি এক কোটি বাষট্টি লক্ষ মন চাল পেয়েছি। এই চাল গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'আনরড' ও চাল দিয়েছে। রাশিয়াও আমাকে সাহায্য করেছে। রাশিয়া আমার বন্দর সাফ করে না দিলে আমি খাবার আনতে পারতাম না। আমার বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামেও আমাদের সাহায্য করেছে। তবু একদল লোক তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ বন্ধুত্ব নষ্ট করবার ক্ষমতা কারও নাই।

বাংলার মানুষকে আমি জানি। আমাকেও বাংলার মানুষ চেনে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের জন্য কোনো কাজে হাত দিয়ে কখনো হাল ছাড়ি না। আপনাদের কাছে আমি প্রথম দিন বলেছি, তিন বৎসর আপনাদের কিছুই দিতে পারব না। পরে সারা বাংলাদেশেই আমি এই কথা বলেছি। কিন্তু পারব না বললেও আমি দিয়েছি। রিলিফের জন্য, ঘরবাড়ি তৈয়ার করার জন্য এই ছয় মাসে ঊনত্রিশ কোটি টাকা দেওয়া

হয়েছে। টেস্ট রিলিফের জন্য গ্রাম অঞ্চলে দেওয়া হয়েছে ২৬ কোটি টাকা। স্কুল কলেজের জন্য দেওয়া হয়েছে ১০ কোটি টাকা। রিলিফ ক্যাম্পের জন্য দেওয়া হয়েছে ১০ কোটি টাকা। মোট ৭৫ কোটি টাকা এই ছয় মাসে দেওয়া হয়েছে। রিলিফ, কৃষি ঋন এবং সমবায় ঋন দেওয়া হয়েছে ২৬ কোটি টাকা। এছাড়া, যত বকেয়া খাজনা ছিল সব মাফ করে দিয়েছি। একদিন এই ময়দানে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেব। তা আমি দিয়েছি। আমাদের বন্দর ঠিক হয়ে গেছে। এখন বিদেশ থেকে মাল আসতে পারবে, আমার তেল ছিল না, ভারত তেল দিয়েছে। আমাকে সব জিনিসই অন্যের কাছ থেকে আনতে হচ্ছে। বাংলাদেশ তো কলোনি ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের বাজার ছিল। পশ্চিমারা সেখানে মাল তৈরি করত আর বাংলাদেশে সেই মাল বেঁচে পকেটে টাকা নিয়ে উড়ে চলে যেত। আজ জিনিসপত্রের ঘাটতি পড়েছে। সব জিনিসই আমাকে বাইরে থেকে আনতে হবে।

শিল্প জাতীয়করণ ও শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি

আমার শ্রমিক ভায়েরা, কৃষক ভাইদের জন্য আমি টেস্ট রিলিফ দিচ্ছি, তাকাবি ঋণ দিচ্ছি, খাজনা মাফ করেছি। এই সঙ্গে আমি ব্যাংক জাতীয়করণ করেছি। বড় বড় শিল্পকারখানার আর ইন্সিওরেন্স কোম্পানিও জাতীয়করণ করেছি। এসব জাতীয়করণের অর্থ আমাদের বুঝে দেখতে হবে। এগুলো সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পদ। শ্রমিকেরা সারা জীবন শিল্পকারখানা, ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি ইত্যাদি জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছেন। এগুলো জাতীয়করণের অর্থ হল শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দেওয়া। আমরা শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দিয়েছি। আপনারা জানেন, পশ্চিমাদের হাতে যে সমস্ত কলকারখানা ছিল তার সব টাকা তারা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, কারখানা চালাতে এ গবর্নমেন্টের একশ আটান্ন কোটি টাকা দিতে হয়েছে।

যদি কারখানা চালিয়ে উৎপাদন না করতে পারেন, আমি বেতন বাড়াব কোথা থেকে? আপনারা আমার কাছে চান নাই, আমি কাছে দাবি করার দারকারও নাই। আমি আপনাদের জন্য জীবনভর দাবি করেছি। আমার কাছে আপনারা কী দাবি করবেন? আপনারা না বললেও আমি ২৫ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ৩৫ কোটি টাকা বেতন বাড়াতে হয়েছে। আপনারা যদি উৎপাদন না করেন, আমি টাকা দেব কোথা থেকে? আমি কি তবে বাংলাদেশটা বিক্রি করে টাকা দেব? না, বাংলাদেমকে বিক্রি করতে পারব না। আমাকে সমালোচনা করে বলা হয়েছে, আমি ধর্মঘট কেন বন্ধ করলাম? কিন্তু আমি তো ধর্মঘট বন্ধ করতে চাই নাই। তবে, আমি যদি শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্য টংগিতে টাকা পাঠাই বা রিলিফের টাকা দিই আর সেখানে সেই টাকা কেড়ে নেওয়া হয় এবং তারপর আবার যদি কেউ বেতন নিতে আসে তাহলে সেটা কি ভালো হয়? শ্রমিকদের কর্তব্য হল উৎপাদন করা।

ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন

আমি এখানে আজ আর একটা ঘোষণা করছি। সরকার যে সব কারখানা জাতীয়করণ করেছেন, এখন থেকে সেগুলোর প্রত্যেকটির ম্যানেজমেন্ট বোর্ডে দুইজন করে সদস্য থাকবে এবং শ্রমিকরা

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের মাধ্যমে এই সদস্যদের বোর্ডে পাঠাবেন। এছাড়া বোর্ডে সরকারের এবং ব্যাংকের পক্ষ থেকে তিনজন সদস্য থাকবেন এবং এই পাঁচজন বসে কারখানা চালাবেন। যাই আয় হোক না কে, আদমজী, দাউদ বা আমিনের পকেটে যাবে না। কোথায় যাবে, তা আপনারা জানতে পারবেন। আপনারা হলেন শতকরা একজন বা দেড়জন, আর বাংলার কৃষক হল শতকরা ৮৫ জন। আয়ের একটা অংশ আপনারা নেবেন। আর বাকি অংশ দেশের কৃষকদের। তাদের টাকা দিয়ে শিল্পকারখানা চালানো হয়। তাদেরও ভোগ করার অধিকার রয়েছে। শ্রমিক ভায়েরা, দুধ খান, গরু জাবই করে খেয়ে ফেলবেন না। তাতে দেশ চলবে না। আর লালবাহিনীর ভায়েরা, আপনারা হবেন আদর্শকর্মী। আপনাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। আর আপনাদের দেখাতে হবে যে, ৮ ঘন্টার জায়গায় লালবাহিনীর ছেলেরা ১০ ঘন্টা পরিশ্রম করে এবং এই কাজ দেখিয়ে অন্য শ্রমিকদের উৎসাহ দিতে হবে। আপনারা ১০ ঘন্টা না পারেন ৯ ঘন্টা কাজ করুন বা ৮ ঘন্টা করুন। উৎপাদন বাড়ান। তাহলেই লালবাহিনী আপনাদের ইজ্জত থাকবে। লাল পুটি মাথায় দিয়ে বেড়ালে লালবাহিনীর ইজ্জত পাওয়া যাবে না।

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ

ভায়েরা আমার, আজ আপনাদের বেতন বাড়ালেই সুবিধা হবে না। সেইজন্য বাংলাদেশে ৪২০০ দোকান খোলা হচ্ছে। প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা করে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র দেওয়ার জন্য শ্রমিক এলাকায়ও এ ধরনের দোকান খোলা হবে। তাতে খরচ হবে ১৯ কোটি টাকা। তবে মজুতদার, চোরাকারবারী আর চোরাচালানিরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও। তাদের আমি সোজা কথায় বলে দিচ্ছি, পাঁচ মাস আমি তাদের অনুরোধ করেছি, আবেদন করেছি, বুঝিয়েছি, অনেক করে বলেছি, এ কাজ কর না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, তারা আমার কথা শুনবে। কিন্তু দেখছি, "চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী"। তাই তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে চাই, যারা শহরে সরকারি বাড়ি, গাড়ি দখন করে আছ, যারা দোকান বা অন্যের জমি দখন করে আছ, যারা মজুদ করছ, জিনিসপত্র বিক্রয় করছ না, জিনিসের দাম বাড়াবার চেষ্টা করছ, তাদের রেহাই নাই। আমি ভিক্ষা করে দুনিয়ার নানা দেশ থেকে জিনিসপত্র আনছি আমার গরিব-দুঃখীদের জন্য। সেই জিনিস যারা লুটপাট করে খাচ্ছ, তাঁদেরও রক্ষা নাই। আমি ১৫ দিন সময় দিলাম। ১৫ দিনের মধ্যে যদি সরকারি বাড়ী না ছাড়ো, যদি মজুদ করে রাখো, এক একটা এলাকায় আমি কারফিউ দেব আর সমস্ত পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট আর আমার স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানে তল্লাশি চালাবেন। এতদিন আমি কিছু বলি নাই। এখন বলে দিলাম, হুকুম দিয়ে দিলাম। এরপরেও বড় বড় বক্তৃতা করবে আর রাত্রিবেলায় চোরা গাড়িতে চড়বে, এটা হবে না। আমার প্রাণ থাকতে নয়। বারবার ঘুঘু তুমি ধান খেয়ে যাও। আর ঘুঘু ধান খাওয়ার চেষ্টা কর না। আমি পেটের মধ্য হতে ধান বের করে ফেলব। চিন্তার কারণ নাই।

এম.সি.এ-দের সমালোচনা

ভায়েরা আমার, আর একটা কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। আওয়ামী লীগ ২৩ বৎসর এই বাংলাদেশে রাজনীতি করছে। এখন কিছু লোক এই আওয়ামী লীগের এম.সি.এ-দের নিন্দা

Dhaka University Institutional Repository

করে। কিন্তু ২৩ জন এম.সি.এ-কে বহিস্কার করেছে কোন্ পার্টি? এমন বহিষ্কারের নজির পৃথিবীর আর কোন্ দেশের ইতিহাসে আছে? কিন্তু আমি বহিষ্কার করেছি, আওয়ামী লীগ করেছে। ভবিষ্যতে যদি কোনো এম.সি.এ. বা পার্টি–সে যে পার্টিরই হোক না কেন–কিংবা কোনো শ্রমিকনেতা বা ছাত্রনেতা চুরি করে, তাহলে আমি মাফ করব না।

এখন এম.সি.এ-দের সমালোচনা করার অর্থ কী? যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা ভাবেন, আমি নির্বাচনের ব্যবস্থা করব। তাঁরা যদি এম.সি.এ-দের দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন, তাহলে নিজেরা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করবেন। কিন্তু সব এম.সি.এ-ই কি চোর? কোনো এম.সি.এ. কি যুদ্ধ করেন নাই? তাঁরা কি গুলি খেয়ে মরে নাই? এম.সি.এ-দের মধ্যে ভালো মানুষ আছে, খারাপ মানুষও আছে। সব দলেই ভালো-মন্দ মানুষ আছে। যারা খারাপ, তারা সবসময়ই খারাপ। আমার দলের মধ্যে কেউ যদি চুরি করে, বিশ্বাস রাখতে পারেন, তাকে কেমন করে শায়েস্ত করতে হয়, আমি জানি। তার পরিষদ সদস্যপদ আমি কেড়ে নেব। কিন্তু এম.সি.এ-দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা খারাপ। তাঁরা গণপরিষদের সদস্য। তাঁরা নির্বাচনের মাধ্যমে এসেছেন, তাঁরা শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন। আমি বাংলাদেশে শাসনতন্ত্র দিতে চাই, ইয়াহিয়া খান বা আইয়ুব খানের মতো গভর্নমেন্ট চালাতে চাই না। জনগণকে আমি ভয় করি না। জনগণকে আমি ভালোবাসি। সেজন্র শাসনতন্ত্র যত শীঘ্র হয় আমি দেব।

জাতির আদর্শ

এখন আমাদের একটা স্লোগান। আগে ছিল ৬ দফা, এখন বলি ৪টা স্তম্ভ। আমার বাংলার সভ্যতা, আমার বাঙালি জাতি-এ নিয়ে হল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলার বুকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ থাকবে। এ হল আমার এক নম্বর স্তম্ভ।

দ্বিতীয় স্তম্ভ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র আমি দুনিয়া থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না, এ সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মাটির সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র বাংলার মানুষের সমাজতন্ত্র, তার অর্থ হল শোষণহীন সমাজ, সম্পদের সুষম বণ্টন। বাংলাদেশে ধনীদের আমি আর ধনসম্পদ বাড়াতে দেব না। বাংলার কৃষক, মজদুর, বাংলার বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক এদেশে সমাজতন্ত্রের সুবিধা ভোগ করবে।

কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে আছে সে-দেশে গনতন্ত্র নেই। দুনিয়ায় আমি বাংলার মাটি দেখতে চাই, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি সমাজতন্ত্র কায়েম করব। আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমি জনগণকে ভালোবাসি, আমি জনগণকে ভয় পাই না। দরকার হলে আবার ভোটে যাব। গণতন্ত্র বাংলায় অবশ্যই থাকবে।

ভুট্টো সাহেব আমার চার লক্ষ বাঙালিকে আটকে রেখেছেন। তারা নিরপরাধ, কিছুই করে নাই। তবু তিনি দরকষাকষি করছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি আমার বাঙালিদের ইনশাআল্লাহ্ বাংলার বুকে ফেরত আনব। তিনি ঠেকাতে পারবেন না।

তবে, একটা অনুরোধ করব আপনাদের কাছে। যে সমস্ত অবাঙালি এখানে আছে, যারা আলবদর, রাজার নয়, যারা বাংলার মাটিতে বাঙালি হিসেবে বাস করতে চায়, আমি আগেও বলেছি, এখনো

Dhaka University Institutional Repository

বলি, তাদের বাংলায় থাকবার অধিকার রয়েছে। যারা যেতে চায়, ভুট্টো সাহেব যেন মেহেরবানি করে তাদের নিয়ে যান। আমার আপত্তি নাই। তিনি বলছেন, তিনি তাদের নেবেন না। কেন নেবেন না? তাদের হাতে তো বন্দুক তাঁরাই দিয়েছিলেন। তাদের তো ব্যবহার করেছিলেন। তাদের দিয়ে বাঙালিদের হত্যা করিয়েছিলেন। এখন কেন নেবেন না? যা রা যেতে চায়, তাদের নিয়ে যান। আমি ছেড়ে দেব। আমার চার লক্ষ লোক ফেরত দিন। ভুট্টো সাহেব যেন এ কথা মনে না করেন যে, বাংলাদেশে শুধু বিহারি আছে। পশ্চিম পাকিস্তানেরও অনেকে আমার কাছে আছে। ভুট্টো সাহেব আমার লোক ফেরত দিন, আমিও তাদের লোক ফেরত দিচ্ছি। যুদ্ধবন্দীর সঙ্গে জনসাধারণ কোনোদিন এক হতে পারে না। এমন নজির দুনিয়ায় নাই, কোনোদিন হয় নাই।

একদল লোক দুনিয়ায় চিৎকার করে বেড়াচ্ছেন যে, বিহারিরা বড় কষ্টে আছে। যখন আমার লোক না খেয়ে মরছিল, যখন গুলি খেয়ে মরছিল, যখন এদেশের মানুষকে ধরে ধরে কুর্মিটোলায় গুরি করেছিল, যখন জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন কেন মেহেরবানি করে তাঁরা প্রতিবাদ করেন নাই? এখন কেন তাঁরা কেঁদেকেটে একেবারে অস্থির হড়ে পড়ছেন?

ত্রাণ ও বিদেশি সাহায্য

আমার বাংলার এক কোটি লোক পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে ৬ মাসে ফিরে এসেছে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের খাবার দিতে হয়। আমার বাংলাদেশের দেড় কোটি লোক এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে, ও গ্রাম থেকে এ গ্রামে পালিয়ে বেড়াত। তাদের জন্য কেউ মায়াকান্না কাঁদে নাই। গ্রামে যান। দেখে আসুন, আমার মানুষ না খেয়ে আছে। আমার মানুষের কাপড় নাই। আমার কৃষকের বীজ নাই। আমার মানুষের চাল নাই।

আমি তো পরিষ্কার বলেছি, দুনিয়ার সমস্ত দেশ থেকে আমি সাহায্য নিতে রাজি আছি। কিন্তু সে সাহায্য হবে শর্তহীন। শর্ত দিয়ে কারো কাছ থেকে আমি ভিক্ষা আনতে পারব না। শর্ত ছাড়া যদি কেউ আমাকে সাহায্য করতে চায়, দুনিয়ার যে কোনো দেশ থেকে সাহায্য নিতে আমি রাজি আছি। তবে এমন কিছু আনতে চাই না, যাতে ভবিষ্যতে আমার অসুবিধা হতে পারে। সেজন্য আমি একটু আস্তে আস্তে চলি।

শিল্পের উৎপাদন

শ্রমিক ভায়েরা, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু উৎপাদন কর। আল্লাহর ওয়াস্তে মিল খেয়ে ফেল না। পয়সা থাকবে না। ব্যাংক থেকে ১৫৭ কোটি টাকা তোমাদের আমি দিয়েছি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চালাবার জন্য। অনেক মিল বন্ধ। তুব মাইনে দিয়ে চলছি। অনেক মিলে অর্ধেক কাজ হয়। সেখানেও আমি মাইনে দিয়ে চলছি। আমি তাদের ভালোবাসি, এইজন্যই তো আমি বিনা কথায় ২৫ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছি। তাদের ২/৩ বৎসর কষ্ট করতে হবে। উৎপাদন করতে হবে। ইন্‌শাআল্লাহ একবার যদি উৎপাদন বেড়ে যায়, তাহলে আর কোনো কষ্ট হবে না। শ্রমিকরা সমস্ত মানুষের সঙ্গে সমানভাবে দেশের সম্পদ ভাগ করে খেতে পারবে। কিন্তু চার সের দুধ হলে তারা একসের খাবে। বাকি তিন সের গ্রামের লোককে দেবে। চার সেরই যেন নিজেরা না খায়। তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের লোক বাঁচবে না। গ্রামে থাকে কারা? আপনার আমার বাবা-মা। যারা গ্রামে বাস করে, তারই কৃষক। তাদের প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে। তাদের আমি ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত খাজনা মাফ করেছি। তাদের আমি ঋণ দিচ্ছি। দরকার হলে আরো দেব। আমি চাই, তারা খাদ্য উৎপাদন করুক। আমি বেশি দিন ভিক্ষা করতে পারব না। আমার ৩০ লক্ষ টন খাদ্যের দরকার। ১৭ লক্ষ টন আমি পেয়েছি। আরও ১০ লক্ষ টন ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমি পাব। খাদ্যসামগ্রীর অভাব হবে না।

জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিল। আবার একটু কমে দিকে আছে। আমাদের অনেক খবরের কাগজ, যেগুলো দাম বাড়তে দেখলে লাফ দিয়ে কেবল বাড়ায়। যখন কমে তখন আর মেহেরবানি করে কিছু লেখে না। তারা যেন দাম কমলে একটু লেখে। আমার তো ছোট চাদরের অবস্থা। মাথায় দিলে পা খারি, পায়ে দিলে বুক খালি। চাল আনরে ডাল আসে না, ডাল আনলে নুন আসে না। নুন আনলে তেল আসে না, তেল থাকলে লবণ থাকে না। আনতে হয় চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে, চালনা পোর্ট থেকে।

ভায়েরা আমার, আমি জানতে চাই, আপনাদের আমার ওপর আস্থা আছে কি নাই? আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা আছে কি নাই? বাংলাদেশকে গড়বেন কি গড়বেন না? তিন বছর আমি কিছু দিতে পারব না। দাবিদাওয়া আমার কাছে চলবে না। একদল লোক বলছে, মুজিবুর রহমান লন্ডন যাবে। কিন্তু মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না। মুজিবুর রহমান বাংলার মানুষকে ফেলে বেহেস্তে গেলেও শন্তি পাবে না। মুজিবুর রহমান বাংলার মানুষকে সুখী করতে চায়। বাংলাকে সোনার বাংলা করতে চায়। লোকে বলে, মুজিবুর রহমান লন্ডন যাবে। মুজিবুর রহমান সব ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমি কেন সব ছাড়ব?

আজ মুনাফাখোর, আড়তদার, চোরাকারবারী সাবধান হয়ে যাও। ভবিষ্যতে যদি জিনিসের দাম আর বাড়ে, আমি তোমাদের শেষ করে দেব কারফিউ করে করে। আর দরকার যদি হয়, আইন পাস করব। যদি চোরাকারবারি বা আড়তদাররা আমার কথা না শোনে, তাদের ছাড়ব না। আর যারা অস্ত্র নিয়ে চলে, তারা সোজা পথে না এলে আমি বাধ্য হয়ে আইন পাস করব তাদের গুলি করে হত্যা করার জন্য। আর সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনারনা ঘুষ খাবেন না। আমার লোক আছে। আমি সব খবরই পাচ্ছি। ঘুষখোররা নয় নম্বর ধারায় চাকরি যাবে, জেলখানায় যাবে। আর চোর, গুন্ডা, বদমাইশ, ডাকাত, সাবধান হয়ে যাও।

কর্মী ভাইয়েরা, গ্রামে গ্রামে তোমরা পাহারা দাও, যাতে চোর-গুন্ডা-বদমাইশ মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে।

আর যারা শুধু সমালোচনা করে বক্তৃতা করে, তাদের কাছে অনুরোধ করি, গ্রামে গিয়ে একটু কাজ করুন, একটু রিলিফের কাজ করুন। তাতে ফল হবে।

আমি এবার তাহলে চলি, খোদা হাফেজ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় প্রেসক্লাবে ১৬ জুলাই, ১৯৭২ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উদ্ধৃতাংশ [৫]

মাননীয় সভাপতি, সুধীবৃন্দ ও সাংবাদিক ভাইয়েরা,

আপনারা জানেন, আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আপনাদের অনেক সহকর্মী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। আমি অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে জেলখানায় কাটিয়েছি। এবারের সংগ্রামে তাঁদের নির্মর্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নাই। তেমনি নাই ৩০ লক্ষ লোক, যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য। তাঁদের কথা চিরদিন আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং যে-আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন, সে-আদর্শে যদি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, তাহলে তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

স্বাধীনতার পটভূমি

সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার কয়েকটা স্পষ্ট আরজ আছে। আপারা জানেন, বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং সে বিপ্লব ছিল রক্তক্ষয়ী। এমন বিপ্লবের পরে কোনো দেশ কোনো যুগে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই, যা আমরা করছি। আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও বিশ্বাস করি। এজন্য আপনাদের কোনো কাজে কখনো কোনোরকম হস্তক্ষেপ করি নাই। যদিও নতুন বাংলাদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ। বিপ্লবের পূর্বেকার সরকার একটা মিউনিসিপ্যাল করর্পোরেশনের মতো ছিল। আর যাঁরা এদেশে ছিলেন, জাতীয় সরকার কী করে চালাতে হয় সে বিষযে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল না। আমাদের তাই নানা অসুবিধার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। শুধু মুক্তিবাহিনীর ভায়েরাই অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করে নাই। জনগণকেও লড়তে হয়েছে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে। হানাদারবাহিনী যাওয়ার সময় আমাদের স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে অস্ত্র দিয়ে গেছে। আমাদের কাছে এর দলিল আছে। শত্রুদের বিচারের সময় আপনারা সেসব দলির দেখতে পাবেন।

সাংবাদিকতার আদর্শ

আপনারা খবরের কাগজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি এবং এইসব আদর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, এটাও আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। আমরা এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতেই দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাই। কিন্তু গণতন্ত্রেও একটা মূলনীতি আছে। গণতন্ত্রের অর্থ পরের দন চুরি, খুন-জখম, লুঠতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনি একটা নীতিমালা আছে। আমরা জানি, সাংবাদিকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা সামরিক চক্রের হীনকাজে

---

৫. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা করেছেন। তাঁরাই ধরিয়ে দিয়েছেন সেই সাংবাদিকদের, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। এই তথাকথিত সাংবাদিকদের একজন কোনো দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন। তিনি আল বদরের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন। এমন সাংবাদিকও আছেন, যাদের এই ধৃষ্টতামূলক কাজের নজির আমাদের কাছে আছে। তাঁরা হানাদারবাহিনীকে সংবাদ সরবরাহ করতেন। কিছু কিছু সাংবাদিক নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করতেন। কিন্তু তারা স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে খবর সরবরাহ করেছেন। আপনারা কি বলবেন যে, তাদের গায়ে হাত দিরে গণতন্ত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার উপর আঘাত করা হবে?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

যিনি একদিন দৈনিক ‘পয়গাম’ চলাতেন, তিনি যদি আয় উপার্জনহীন কোনো ব্যক্তির আশ্রয় নিয়ে রাতারাতি একখানি দৈনিক কাগজ বের করেন, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাঁর এই মালিকের টাকা কোত্থেকে এল? এরপর আবার এই রাতারাতি গজিয়ে ওঠা মালিক-সাংবাদিক সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখতে আরম্ভ করলেন। আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনোদিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ, তা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবে। ‘ওভারসিজ পাকিস্তান’ নামে কোনো সংস্থা যদি এখান থেকে খবরের কাগজ প্রকাশ করে, তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আপনারা সামান্য কিছুলোকের স্বার্থ দেখবেন, না সাড়ে সাত কোটি লোকের স্বার্থ, যে ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে, তাঁদের স্বার্থ দেখবেন? বিপ্লবের পরে সংবাদপত্র যে-স্বাধীনতা পেয়েছে, তা এদেশে আর কখনো ছিল না। এইজন্যই রাতারাতি খবরের কাগজ বের করেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ ছাপানো হয়, “এক লক্ষ বামপন্থী হত্যা”, “বিমানবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ” ইত্যাদি। কিন্তু এসব কি লেখা উচিত? এবং এসব কার স্বার্থে ছাপানো হয়?

সংবাদপত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন। আমিও বলি। কিন্তু কোনো কোনো খবরের কাগজে এমন কথাও লেখা হয়, যা সাম্প্রদায়িকতার চরম। অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চব্বিশটি বছর প্রগতিশীল সাংবাদিকগণ সংগ্রাম করেছেন। আমরা সংগ্রাম করেছি, বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। আমাদের ছেলেরা, কর্মীরা জান দিয়েছে, জেল খেটেছে। সে নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনো সাংবাদিক লেখেন তাহলে আপনারা কী করবেন? এটাও আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

একখানা কাগজে লেখা হয়েছে, “গণহত্যা চলছে।” গণহত্যার কথাই যদি বলেন, তবে আমি আপনাদের বলব যে, এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় বহু আওয়ামী লীগ কর্মী আর প্রগতিশীল কর্মী মারা গেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে গণহত্যা হয় নাই। এজন্যে দুনিয়ার কাছে বাংলাদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এত বড় বিপ্লবের পরে, হানাদারদের দ্বারা সংঘটিত এত বড় হত্যাকান্ডের

পরেও যে আর একটা হত্যাকান্ড হয় নাই, তার জন্য বাংলার মানুষ ও প্রগতিশীল কর্মীদের আপনার নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাবেন।

ভারতীয় চক্রান্ত?

অনেকে ভারতীয় চক্রান্তের কথা বলে থাকেন। যারা আমাদের দুর্দিনে সাহায্য করেছে তারা নাকি আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পকেটে ফেলে রাখবার চেষ্টা করছে। এধরনের কতা বলা কি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা? এর নাম কি গণতন্ত্র?

যদি কেউ অনাহারে মরে থাকে, আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন। তার জন্য আমিও দায়ী হব। আমি চেষ্টা করছি, যাতে কেউ অনাহারে না মরে। যদিও দেশে খাবার নাই। আমাদের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ টন। আমি বিদেশ থেকে ১৭ লক্ষ টন এনেছি। ভারত ৭লক্ষ টন খাবার দিয়েছে। এছাড়া "আনরড" এবং ইউএসএ, কানাডা ও রাশিয়া থেকেও খাবার পাওয়া গেছে। সাধ্যমত সবাই আমাদের সাহায্য করছে। এর ভিতর ভারতীয় চক্রান্ত কোথায়? অথচ কোনো কোনো খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে "৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাচার", "আমরা কি সত্যিই সার্বভৌম" ইত্যাদি।

দালাল সাংবাদিক

অনেক কাগজের শিরোনাম আমার কাছে আছে। এই কাগজগুলো ফরমান আলী খানের দয়ায় ঢাকায় বসে নয় মাস কাজ করেছে, কিন্তু তাদের আজও ছোঁয়া হয় নাই। অনেক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। অনেক সাংবাদিক মা-বোন-বউ ঘরে ফেলে অকূল পাথারে ভেসে বেড়িয়েছেন। কিন্তু ফরমান আলীর অনুগ্রহভাজনরা এখানে বসে আরামে খবরের কাগজ চালান এবং হানাদারদের সাথে সহযোগিতা করেন। এরপর স্বাধীনতা পেয়ে তাঁরা রাতারাতি বিপ্লবী হয়ে গেলেন। তাঁরা এখন সরকারের বিরুদ্ধে লেখেন। তাঁদের সরকার ক্ষমা করতে পারে, জনগণ ক্ষমা করবে কিনা সন্দেহ আছে।

সরকারের যেমন স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আছে, তেমনি নীতি পালনের দায়িত্ব আছে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও আছে।

আমরা গণতন্ত্র চাই, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা চাই না, কারও বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতেও চাই না। অথচ কোনো কাগজে লেখা হয়েছে, "মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ হও"। যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চান তাহলে তা কি আপনারা সহ্য করবেন? আপনাদের যে কোনো কথা বলবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আপনাদের একটা নীতিমালাও রয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের সংকট

স্বাধীন দেশে যথেচ্ছাচার চলতে দেওয়া যেতে পারে না। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার তারই আছে, যে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে জানে। আপনাদের অনেক দাবি ছিল সেসব দাবি আমরা

Dhaka University Institutional Repository

সবসময়ই সমর্থন করেছি। আর গত ছয় মাসে কোনো দাবিই পূরণ করা হয় নাই, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। আমাদের পোর্ট বন্ধ। আমাদের রাস্তা নাই। গুদামে চাল নাই। এক পয়সার বৈদেশকি মুদ্রা নাই। রাজস্ব আদায় নাই।

তবু আমাদের সরকার চালাতে হয়েছে। আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্তা পূর্ণগঠন করতে হয়েছে। এর মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৮০টা দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। আমরা জাতিসংঘের এবং অন্যান্য সংস্থার সদস্যও হতে যাচ্ছি। আমাদের বলতে পারবেন না। স্বাধীনতা লাভের সময় আমাদের হাতে কী ছিল? তখন পররাষ্ট্র দফতর বলতে কিছুই ছিল না। বাংলাদেশে দেশরক্ষা দফতরও ছিল না। অর্থ দফতরটিও একটি নেজারাতের মতো ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। স্কুল–কলেজের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। মোট কতা স্কুল-কলেজ ভাঙা ছিল। আমাদের সবকিছুই ছিল বিধ্বস্ত। এমন দেশ নেই যেখানে বিপ্লবের পরে দুই চারবার দুর্ভিক্ষ হয় নাই। কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত খাবার দিতে না-পারলেও বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের প্রতিটিতেই কিছু না কিছু খাবার পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা অনেকগুলো কমিশন গঠন করেছি এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করবার জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোনো দেশ চলতে পারে না। আমরা যে সমস্ত কমিশন গঠন করেছি, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা কমিশন, বেতন কমিশন। শীঘ্রই বেতন বোর্ড, চাকরি পূনর্বির্ন্যাস কমিশনও গঠন করা হবে।

স্ক্রিনিং

সরকারি কর্মচারীদের স্ক্রিনিং করার জন্য স্ক্রিনিং কমিটি করা হয়েছে। যারা দালালি করেছে, তাদের বিষয় স্ক্রিনিং কমিটিতে আসবে এবং কমিটির বিচার বিবেচনার ফলাফল খবরের কাগজে দেওয়া হবে। যাঁদের ওপর আপনাদের আস্থা আছে সে সমস্ত লোক নিয়েই কমিটি গঠিত হয়েছেন। তাঁদের ভিতর হাইকোর্টের জজও রাখা হয়েছে। যাতে কেউ বলতে না পারেন, রাজনৈতিক কারণে আমি আওয়ামী লীগ ও তার বন্ধু দলগুলোকে বাদ দিয়ে কেবল অন্য দলের লোকদের স্ক্রিনিং করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়েও স্ক্রিনিং চলছে। তবে, তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। এজন্য স্ক্রিনিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তাঁরাই নেবেন। আমাকে বলা হয়েছে, সিন্ডিকেট প্রস্তাব পাস করেছে, সরকার যে হাইকোর্ট জজ দিয়ে স্ক্রিনিং কমিটি করেছে তাঁর কাছেই তাঁরা রির্পোট পেশ করবেন। আপনারা সরকারি কর্মচারদের স্ক্রিনিং চান, শিক্ষকদের স্ক্রিনিং চান, বেতারের স্ক্রিনিং চান। অনুগ্রহ করে একটু নিজেদের স্ক্রিনিং করুন। একটু বলুন এই লোকগুলো এই কাজ করেছে। আমরা তা মেনে নেব। আর যদি নিজেরা কিছু না করেন আমাকে বলবেন। আমি করব। আমাকে করতেই হবে। কারন, পাকিস্তানের নামে পয়সা নিয়ে এসে যদি কেউ রাতারাতি খবরের কাগজ বের করে আর মানুষের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে আমাদের সব নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করে, এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াবার চেষ্টা করে, জাতির আদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে সেটাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। সে স্বাধীনতা কোনো সরকার, কোনো জনগণ, কোনো প্রগতিশীল দল কোনোদিন সমর্থন করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মঘট

আপনারা যেসব দাবি করেছেন সেগুলো ন্যায্য। সেগুলোর জন্য আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আমরা যতদূর সম্ভব দাবিগুলো পূরণের চেষ্টা করছি।

আপনারা বলেছেন, ধর্মঘট বন্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আমি তো ধর্মঘট বন্ধ করি নাই। তবে সমাজতন্ত্রের একটা নীতি আছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে শ্রমিকদের কর্তব্য কী সেটাও বুঝতে হবে এবং শ্রমিকরাই সমাজতন্ত্র চায় বেশি। কিন্তু যখন সরকারের আয় নাই, তখন ২৫ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির পরও যদি এটা-ওটা নিয়ে ঘেরাও বা জোরজবরদস্তি চরে, তাহলে কী হয়? এটা কোন্ ধরনের সমাজতন্ত্র?

আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন যারা সত্যিকার শ্রমিক, তারা এসব করছে না। কিছু কিছু লোক করছে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যই ধর্মঘটন বন্ধ করা হয়েছে। তাও মাত্র ছ-মাসের জন্যে। আপনারা বিশ্বাস করুন, কারো অধিকার কেউ নষ্ট করুক এ আমি কখনোই চাই না। আমি জীবনভর আন্দোলন করেছি এবং আন্দোলনের ভিতর দিয়েই আমি এতদূরে এগিয়ে এসেছি। সেজন্য আমি কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। এ সরকারও কারো ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট করতে চায় না। যেখানে কাজ জানা লোক নাই, ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা নাই, সমাজতন্ত্রের জ্ঞন নাই, সেখানে ব্যাংক এবং ইনস্যুরেন্স কোম্পানিসহ সমস্ত মূলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি কেউ পয়সার জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে, তবে সেখানে আমি বাধা না দিয়ে কী করতে পারি? আমি কি বলতে পারি যে, সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করুক?

শহীদদের পরিবারের জন্য সাহায্য

যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে সাধ্যমতো সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া চাঁদা তুলে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল গঠন করে শহীদদের প্রত্যেক পরিবারকে ২ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। শহীদ সরকারি কর্মচারীদের পরিবার পরিজনকে পেনসন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং মালিকহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে তাঁরাও জীবনভর একটা কিছু করে খেতে পারেন। তাঁরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করে পঙ্গু হয়েছেন। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকেও এসবের একটা অংশ দেওয়ার জন্য একটা বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। কেউ বাদ পড়বেন না। সবাই সেখান থেকে কিছুটা সাহায্য সহানুভূতি পাবেন।

সাংবাদিকদের কাছে দাবি

আপনাদের দাবিদাওয়ার উত্তরে আমিও কিছু দাবি জানাচ্ছি। আমি চাই আপনারাও স্ক্রিনিং করুন। যারা নয় মাস এখানে ছিল, তাদের কারো কারো সম্পর্কে দলিলপত্র আমাতের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের গায়ে যদি আমি হাত দেই আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি সরকারি কর্মচারীকে জেলে দিয়েছি, হাইকোর্টের জজকে জেলে দিয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে জেলে

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছি, এদেশের রাজনৈতিক কর্মীদের এবং আওয়ামী লীগের এম.সি.এ-কেও জেলে দিয়েছি। আপনাদের মধ্যে যাদের অপরাধী পাব, তাদের নিশ্চয়ই ধরতে হবে। কোনো সরকারি কর্মচারী বাড়াবাড়ি করলেও আপনারা সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে, দালাল আইনে-হাকিম আছে, কোর্ট আছে, বিচার হচ্ছে। সরকার যদি আসামির বিরুদ্ধে দলিলপত্র দাখিল করতে না পারে, তাহলে সে খালাস হয়ে যাবে।

সরকারের সমালোচনা

স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, তা রক্ষা করা তার চেয়েও কষ্টকর। স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। তবু বিপ্লবের পর ছয় মাসের মধ্যে আপনারা যতখানি স্বাধীনতা পেয়েছেন ততখানি স্বাধীনতা এদেশে এর পূর্বে কেউ পায় নাই। কিন্তু অনেকেই তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কর্মে মেতে উঠেছে। তার জন্যে আমাকে কিছু ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। যেমন কারফিউ দিয়ে তল্লাশি চালানো। এতে কিছু সৎ লোকের অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু এই অসুবিধা এড়ানোর উপায় নাই। আর অসৎ লোকের তো আমি আগেই সতর্ক হওয়ার সময় দিয়েছিলাম।

কোনো কোনো কাগজে সমালোচনা করে বলা হয়, এখনকার অবস্থা আইয়ুব ও ইয়াহিয়া সরকারের আমলের চেয়েও খারাপ। ১৯৫৮ সালে যখন মার্শাল ল জারি হয়েছিল এবং আমাকে বন্দী করা হয়েছিল, তখন এরা কিছুই লেখেন নাই্ আবার এরাই এখন লেখেন, "চালের মণ একশো বিশ টাকা।" চাল থাকতেও আমি দিচ্ছি না। কিন্তু আমি তো তা বলি নাই। আমি শুধু চেষ্টা করছি এবং কিছু কিছু দিচ্ছি। চালের দাম মিথ্যা করে বাড়িয়ে বলার অর্থ অন্য জায়গায় আতঙ্কের সৃষ্টি করা। এসব কথা যারা লেখে তারা মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করে। এর নাম কি সাংবাদিকের স্বাধীনতা?

সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও আপনারা লেখেন। আপনারা জানেন যে, সরকারি কর্মচারীদের জবাব দেওয়ার অধিকার নাই। যদি কেউ কারো নাম করে কিছু লেখেন এবং সে যদি কোন প্রতিবাদ করে তাহলে সেটা প্রকাশ করাও সাংবাদিকদের দায়িত্ব। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেক সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধেই তো মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু কারও প্রতিবাদই খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। এটা সাংবাদিকতার কোন্ নীতিমালায় আছে?

ভীতি প্রদর্শন (ব্ল্যাক মেইলিং)

আমি আরও একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছি। এটা বাংলাদেশে আগে ছিল না। আমি এটা দেখেছি করাচিতে আর দেখেছি পিন্ডিতে। এটা হল ভীতি প্রদর্শন। কোনো সাপ্তাহিক বা সান্ধ্য দৈনিকে কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখে তাকে বলা হতো, টাকা দাও, নইলে আবার তোমার বিরুদ্ধে লেখা হবে। তখন সত্যি সত্যিই টাকা দিয়ে সে কাগজের মুখ বন্ধ করা হতো। আমি লক্ষ্য করছি এখানেও এই ধরনের একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

আরও দেখা যাচ্ছে, যার আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নেই, সেও দৈনিক কাগজ বের করছে। রাতারাতি কাগজটা বের হয় কোথা থেকে? পয়সা দেয় কে? আমি শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি, ব্যাংক রাষ্ট্রয়ত্ত করেছি। এর জন্য তারা কেঁদে মরে। তাদের পয়সা আসে কোত্থেকে? আমি যদি খবর পাই যে, বিদেশীরা তাদের সাহায্য করছে এবং তখন যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করি তাহলেও কি আপনারা বলবেন, সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকদের উপর অন্যায় হামলা করা হয়েছে?

আপনারা জানেন, আমি ঢাকা শহরে সাইকেল নিয়ে ঘুরে রাজনীতি করেছি। কিন্তু এখন কিছু কিছু লোক রাতে হাইজ্যাকের গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর দিনের বেলায় বিপ্লব করে। তারা দুষ্কৃতকারী। তাদের আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নাই। অথচ প্রচুর টাকা খরচ করে। এ টাকা আসে কোত্থেকে? কে দেয়? আমি যদি এসবের তদন্ত করি, তবে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবেন না আশা করি। এটাও আইন।

আদর্শের রূপায়ণ

আমি জানি, আমার মতো আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুনিয়ায় দেকা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের কাতিরে বাধা দূর করবার জন্য রূঢ় হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। এজন্য যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, আমি চেষ্টা করে দেখছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার আন্দোলন। সেই জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব নষ্ট হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাও আমাদের আদর্শ। এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। রাজাকার, আলবদররা এখন কিছু কিছু বড় বড় প্রগতিশীল নেতার আশ্রয় নিয়ে "প্রগতিশীল" বনে গেছে। আসলে তারা খুনের মামলার আসামি। তাদের নামে হুলিয়া রয়েছে। এখন তাদের কেউ বরে, আমি ওমুক নেতার সেক্রোটরি, কেউ বলে আমি সম্পাদক। এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কী, আপনারাই বলুন?

সাংবাদিক স্বার্থ

আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের স্বার্থরক্ষা করতে হরে আপনারা নিজেরাও আত্মসমালোচনা করুন। আপনারা শিক্ষিত, আপনারা লেখক, আপনারা ভালো মানুষ। আপনারাই বলুন, কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে সহযোগিতা করব।

আপনাদের দাবিদাওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আমি বড় খুশি হয়েছি। আমি সারা জীবন আপনাদের সঙ্গে সংগ্রামে ছিলাম। এখনো আমি সংগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনাদের ন্যায্য পাওয়া যা আছে, তা নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন। কিন্তু তার বেশি চাইলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি পারব না। বাংলাদেশের মানুষকে আমি বলেছি, তিনবছর কিছুই দিতে পারব না। তারা তা মেনে নিয়েছে। আশা করি, আমার সাংবাদিক ভাইয়েরাও বললেন, তিন বছর কিছুই চাই না। কারণ, আপনারা কোনো পৃথক জাত নন। আপনারা সাত কোটি লোকের একটা অংশ। তাছাড়া, গনতন্ত্রের একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে। এদুটো মনে রাখলে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারব।

জয় বাংলা।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮ অক্টোবর, ১৯৭২ পি.জি. হাসপাতালের রক্ত সংরক্ষণাগার এবং নতুন মহিলা ওয়ার্ডের উদ্বোধন উপলক্ষে যে ভাষণ দেন তার পূর্ণ বিবরণ[৬]

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ,

প্রথমে আমি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মহাবিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাই। সরকার তার অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের সাহায্য করতে পারেন নাই, তা সত্ত্বেও তাঁরা যেভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন তাতে তাঁদের ধন্যবাদ দিতে হয়। আপনারা আমাকে আপনাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর কোনো অনুষ্ঠানে আমি এ পর্যন্ত যাই নাই। ডাক্তার নুরুল ইসলাম আমার মানা করেছেন কোথাও যেতে, তবু আজ আমি এখানে এসেছি। আপনাদের সাথে দেখা হলো–এতেই আমি খুশি। যে রক্ত সংরক্ষণ কেন্দ্র আপনারা খুলেছেন এর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, গবেষণার দিক দিয়ে এর অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে।

আপনারা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী; আপনারা দেশের মানুষ, আপনারা জানেন দেশের অবস্থা কী। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্নস্তরের লোক যেমন জীবন দিয়েছে, ডাক্তাররাও তেমন দিয়েছে। এ পর্যন্ত যে নাম আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যায় ৫০ জন ডাক্তারকে শহীদ হতে হয়েছে। ৫০ জন ডাক্তার তৈরি করতে কী লাগে তা আপনারা জানেন। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায়, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও ডাক্তারদের হত্যা করা হয় না। দুই পক্ষে যখন যুদ্ধ হয়, দুই দেশে যখন যুদ্ধ হয়– এতে ডাক্তাররা যুদ্ধবন্দী হয়ে পড়লে তাঁদের হত্যা করা হয় না, এমনকি খারাপ ব্যবহারও করা হয় না। কিন্তু পাকিস্তানি নরপশুরা এতবড় পশু যে, তারা আমাদের ডাক্তারদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। ৫০ জনের তালিকা পাওয়া গেছে। ডাক্তার ইসলামকে আমি বলেছি পি.জি হাসপাতালের দেওয়ালের কাছে পাথরে এই ডাক্তারদের নাম ও ইতিহাস লিখে রাখুন। যাতে প্রত্যেক ডাক্তার দেখে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের দান কতখানি। এর ফলে বোধহয় দেশের জনগণের প্রতি তাঁদের দরদ বাড়বে।

আজ যা এখানে আপনারা স্থাপন করেছেন, আমাদের এবং এই ইনষ্টিটিউটের তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অন্যান্য দেশে আমি এই প্রয়োজনীয়তা দেখেছি। আপনারা যা করেছেন সেজন্য গৌরব বোধ করতে পারে এবং এতে যদি কোনো রকম প্রয়োজন পড়ে সরকারের পক্ষে কোনো সময় অর্থদানে অসুবিধা হবে না। নিশ্চয় সরকার সেদিকে নজর রাখবেন।

কিন্তু পয়সা দিয়ে যে সবকিছু হয় না সেটা আপনারা বুঝেন; পয়সার সাথে সাথে আরেকটা জিনিসের দরকার, সেটা হল মানবতা বোধ। আমার মনে হচ্ছে, আপনারা বেয়াদবি মাফ করবেন,

৬. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৯২

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যেন মানবতা বোধ হারিয়ে ফেলছি। পয়সা কোনো জায়গায় কম দেয়া হচ্ছে না। ভিক্ষা করে হোক, বন্ধুরাষ্ট্রদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে হোক, ব্যাংকের থেকে সাহায্য নিয়ে হোক, গ্রান্ট নিয়ে হোক-পয়সা এনে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় চরিত্র আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কুমিল্লার সভায় বলেছিলাম যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে বেটে খাওয়া যাবে, বাংলাদেশ সোনার বাংলা করতে পারবেন না, যদি সোনার মানুষ গড়তে না পারে। আপনাদের কাছে বলতে গেলে বলতে হয় আমি যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমি যেদিকে চাই সেদিকে 'মানুষ' খুব কম দেখি। মানুষ এত নীচ হয় কী করে! মানুষ মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে পয়সা নেয় কী করে। মানুষ গরিব–দুঃখীর কাছ থেকে কী করে লুট করে, আমি বুঝতে পারি না! এত রক্ষ, ৩০ লক্ষ লোকের জীবন, এত শহীদ, এত মায়ের আর্তনাদ, এত শিশুর আর্তনাদ, এত বাপ-মায়ের ক্রন্দন, দেয়ালে দেয়ালে রক্তের লিখা, রাস্তার রাস্তায় রক্তের স্বাক্ষর- আর সেইখানে বসে সরকারি কর্মচারিরা যদি তাদেরই টাকা পয়সা খায়, তাদের জীবন নিয়ে যদি ছিনিমিনি খেলে, এ দুঃখ বলার জায়গা কোথায় আছে, আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আইন দিয়ে তো এটা করা যায় না। এটা মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের দরকার, মনের পরিবর্তনের দরকার। মানবতা বোধ জাগ্রত হবার দরকার।

আপনারা আমার বেয়াদবি মাফ করবেন। আর মেডিকেল কলেজের ভিতর ঢুকা যায় না দুর্গন্ধে। কেন? পয়সা কি কম দেয়া হয়েছে এ পর্যন্ত? আগে তো আপনাদের উপর ডান্ডা মারা হতো, তখন তো সকল দিক আপনারা পরিষ্কার করতেন। এখন পরিষ্কার থাকে না কেন? তখন যদি কেউ কুমীটোলা থেকে দৌড়ে এসে আপনাদের ধমকী দিত–তখন সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করতেন। এখন করবেন না কেন? কেন এক একটা ওয়ার্ডের আপনারা দায়িত্ব নেন না? এটা কী? আপনারা যদি হাত টিপে ঔষধ দিয়ে আসলেন তাতে তো দেশের রোগীর উন্নতি হল না। সেখানে যে দুর্গন্ধ হয়, যে অপরিচ্ছন্নতা হয়, সেখানে যে সেপটিক দেখা যায়, সেখানে আপনারা কী করে রোগীর উন্নতি করবেন, আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

এছাড়াও আপনাদের কর্তব্য রয়েছে। আপনারা কেন যখন-তখন ছুটি ভোগ করেন। আমি আশা করি ভবিষ্যতে আপনারা নিশ্চয়ই এদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনারা যারা বড় ডাক্তার আছেন, যাঁরা স্পেশালিস্ট আছেন, তাঁরা গ্রামের দিকে কেন যাবেন না? গ্রামে তো শতকরা ৯৫ জন লোক বাস করে। তারাই সম্পদ দিয়ে আপনাদের সবকিছু বজায় রেখেছে। নতুন শহর দেখেন, আপানাদের দোতলায অফিস দেখেন, পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ভবন দেখেন, যেখানেই যান দেখবেন সবকিছু বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের পয়সায় গড়া। তাদের দিকে নজর দিবেন না। শাদা কাপড় চোপড় দেখলেই কেন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেন? আর দুঃখী মানুষ আসলেই কেন তাকে রাস্তায় বাইর করে দেন, বয় বলে চিৎকার করেন? এই মনোভাবের পরিবর্তন কবে আপনাদের হবে! আমি শুধু আপনাদের ডাক্তার সাহেবদের বলছি না। এটা যেন আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে এসে গেছে। এ জাতীয় চরিত্রের প্রতি চরম আঘাতের প্রয়োজন আছে। একবার আমাকে কোনো খবরের কাগজের বা টেলিভিশন কোম্পানির একজন জিজ্ঞাস করেছিল যে, আপনার কোয়ালিফিকেশন কী? আমি হাসতে হাসতে বলেছি–আই লাভ মাই পিপল। What is your disqualification? I

Dhaka University Institutional Repository

love them too much. বোধহয় সেটা অনেকে দুর্বলতা মনে করে নিয়েছিল এবং সেই দুর্বলতার খাতিরে যার যা ইচ্ছা ফ্রি স্টাইলে চালিয়েছে। শৃঙ্খলা ফিরে না আসলে কোনো জাতি বড় হতে পারে না। সততা ফিরে না আসলে কোনো জাতি বড় হতে পারে না। আপনাদের প্রতি অভিশাপ পড়বে। ৩০ লক্ষ লোকের আত্মা আপনাদের অভিশাপ করবে। আপনারা দেখেছেন মুসলিম লীগের বড় বড় লিডাররা যারা বড় বড় বাড়ি করে আরামে ছিল একদিন অভিশাপের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে–আমাদের এই দেশে আমরা যারা আচি তারা যদি চরিত্রের পরিবর্তন না করি, তাহলে এমন দিন আসবে, এমন ঝড় আসবে, যে ঝড়ে আপনারা ভেঙে চুরমান হয়ে যাবেন।

আপনাদের কাছে আমি সেইজন্য আবেদন করব যে, আপনাদের মানবতা বোধ থাকা দরকার্ মনুষত্ব থাকা দরকার, সততা থাকা দরকার–না হলে কোনো জাতি সাড়ে সাতকোটি মানুষকে অপমান করছেন এবং আপনারা অপমান করছেন–যারা মারা গিয়েছে সেই শহীদদের আত্মাকে। তাই আজকে বাংলাদেশের দুঃখী মানুষরা ঔষধ পায় না; আপনারা জানেন, আমিও খবর পাচ্ছি। ঔষধের দোকানে আমরা এখন লোক লাগিয়েছি। ‘কোরেক্স’ ঔষধ খেয়ে ৮ জন বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটা ঔষদের কারখানও বসে গেছে আশেপাশে। পয়সা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়! মানুষকে মানুষ বিষ দিচ্ছে ঔষধের নামে। কোথায গেছে আজ তারা অধপতনে! দুনিয়ার মানুষ যারা আপনাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করছে, যারা আপনাদের পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে, তারা যদি দেখে এই আপনাদের অবস্থা, তাহলে তারা হাসবে কিনা, বলুন তো আমার কাছে!

আপনাদের মনে করতে হবে গভর্নমেন্ট আমার, আমরা সাইনস্টিট না, আমরা এক্সপার্ট না, আমরা মেডিকেল ম্যানও না, আমরা ইঞ্জিনিয়ার না; আমরা জানি যে আমাদের প্রোগ্রাম আমরা করব। দেশের মঙ্গলের জন্য পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে যা যা দরকার, নিশ্চয় আপনারা পাবেন। দেশের জনগণ রক্ত দিতে কোনোদিনও কৃপণতা করেনি। গত আন্দোলনের সময় আমি জেলে যাওয়ার আগে বলেছিলাম রক্তের দরকার, বাংলাদেশের মানুষ লাইন ধরে রক্ত দিয়েছিল। রক্ত আপনারা পাবেন, রক্ত বাংলার মানুষ দেয়। গুলি খেয়েও রক্ত দেয় আবার অন্যকে বাঁচাবার জন্যও দেয়। কিন্তু রক্তের ভালো ব্যবহার হওয়া দরকার এবং সেটা যদি হয় তবে নিশ্চয়ই জানবেন ডাক্তার সাহেবরা-রক্তের অভাব হবে না, পয়সার অভাব হবে না, সরকারি সাহায্যের অভাব হবে না। আমি আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি দুর্বল বলে মাঝে মাঝে এমন উত্তেজিত হয়ে যাই। কারণ আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমাকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাড়ে সাতকোটি লোককে রক্ষা করার জন্য যদি দুই পাঁচশত লোকে কোনো কিছু করতে হয়, সাজা দিতে হয়, নিশ্চয় তা দেয়া হবে। I have my responsibility for the people.

আমি ওই দুঃখী মানুষের নেতা, আমি নেতা হয়েছি, ওরা আমাকে নেতা বানিয়েছে, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের সাথে আমি থাকব। শাদা কাপড় পরা ভদ্রলোকেরা খালি প্রমোশন চায় এছাড়া বিশেষ কোনো কাজ করতে চায় না। এদিকে যদি আপনারা মেহেরবানী করে হুঁশিয়ার হন। আপনাদের কাছে এই আমার অনুরোধ। আমি দেখেছি যে, মেডিকেল কলেজের সামনে দুঃখী,

নেংটা পড়ে আছে, তিন দিন পর্যন্ত পড়ে আছে–তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে না আর বড় গাড়ি করে যখন কেউ হাজির হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেন সাহেব। আপনারা ডাক্তার, আপনাদের মন হতে হবে অনেক উদার। আপনাদের মন হবে সেবার। আপনাদের কাছে বড় ছোট থাকবে না। আপনাদের কাছে থাকবে রোগ, কার রোগ বেশি কার রোগ কম। তাহলেই তো সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মানুষের মনের আপনারা সহযোগিতা পাবেন। বেয়াদবি মাপ করবেন, মানুষ আমার কাছে অভিযোগ করে–হাসপাতালে ভর্তি হতে পানি না বাড়িতে গিয়ে পয়সা না দিলে; পয়সা দিয়ে যদি বাড়িতে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করি সার্টিফিকেট নিয়ে এসে ভর্তি হতে পারি। একটু মেহেরবানী করুন। সাত আট মাস চলে গেছে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েছি, আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, নৌকায় ঘুরেছি, সাইকেলে ঘুরেছি, পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি, আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সমস্যার সাথে জড়িত আছি, আমি সব খবর রাখি।

আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি, আবেদন করছি যে, আপনারা মেহেরবানী করে আপনাদের মতের এবং কথার একটু পরিবর্তন করুন এবং সেবার মনোভাব দিয়ে মানুষকে সেবা করুন। আপনাদেরকে 'ডাক্তার' বলে যে মানুষে দেখে ডাক্তারদের কী সম্মান! যুদ্ধের সময় যখন বাহুতে 'রেডক্রস' বিহ্ন বেঁধে দেওয়া হয় তখন সেই ডাক্তারকে স্পর্শ করা হয় না। আপনাদের সম্মান অত্যন্ত বেশি। এই সম্মানের মর্যাদা আপনাদের রাখতে হবে। আপনাদের মানুষ গালাগালি কেন করবে? মেডিকেল কলেজ কয়েকটা খোলা হয়েছে। পয়সাকড়ি নাই তবু আমরা বলেছি মেডিকেল কলেজ সবগুলো করা হবে। বিদেশে আমাদের অনেক ডাক্তার ও প্রফেসারের সাথে আমার দেখা হয়েছে। আমাকে দেখতে এসেছিলেন তাঁরা। ডাক্তার নূরুল ইসলামের সামনে তাঁদের বলেছি, আপনারা দেশে ফিরে আসুন। দেশেই আপনাদের কাজ আছে। দেশ আপনাদের; আপনাদের দেশ দাবি করতে পারে। কারণ আপনারা যে মেডিকেলে পড়েচেন এবং মেডিকেল কলেজগুলোতে জনগণের টাকা থেকে আপনাদের সাহায্য করা হয়, আর আপনার লেখাপড়া শিখে যখন বিদেশে গিয়ে বড় ডিগ্রি নিয়ে সেখানেই বেশি টাকা উপার্জন করতে চান-সেটা বড় অন্যায়। কারণ আপনারা যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তার পেছনে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এদেশের দুঃখী মানুষের ট্যাক্সের টাকা থেকে। মেডিকেল কলেজে অর্থ খরচ দেয়া হয়; ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য যেমন বৃত্তি দেয়া হয় আপনাদের জন্যও তেমনি দেয়া হয়। যখন আপনারা মেডিকেলে পড়েন তখন সরকার এই সুযোগসুবিধা আপনাদের দেন। এই সরকার বলে কোনো পদার্থ নাই। এটা জনগণ দেয় এবং পাস করার পরে আপনাদের জনগণের কাছে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা প্ল্যান নিয়েছি প্রত্যেক জায়গায়, প্রত্যেক থানায় একটা করে হাসপাতাল হবে। আপাতত ১০টি বেড বেড করে। এ বছরই আমরা তা শেষ করতে চাই। আমাদের ২৫টি বেড করে প্রোগ্রাম রয়েছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর দিকে আমাদের যেতে হবে। যতই উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি করি না কেন, যেদিকেই বেশিদূর যাই না কেন–আমাদের সব সর্বনাশ হয়ে যাবে, যদি না আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করি। তা না হলে আমরা বাঁচতে পারব না। আমাদের সেদিকে চেষ্টা করতে হবে।

আর একটা জিনিস আমি দেখেছি, দেখে আশ্চর্য হয়েছি। আমি নিজে রোগী হয়ে দেখেছি, ঘুরে দেখেছি। আমাদের নার্সিং যেন আমাদের সমাজের জন্য একটা অসম্মানজনক পেশা। আমি বুঝতে

পারি না এ সমাজ কী করে বাঁচবে! একটা মেয়ে দেশের খাতিরে নার্সের কাজ করছে, তার সম্মান হবে না আর ভালো কাপড়চোপড় পরে যারা ঘুরে বেড়াবে তার সম্মান হবে অনেক উচ্চে! চেয়ারখানা তাকেই দেয়া হবে। এজন্যে আজকে নার্সিং শিক্ষায় ও নার্সিং টেনিং দানে আপনাদের যে কাজগুলো আছে একে একটু উচ্চপর্যায়ে নিতে হবে। এরও একটা মান থাকতে হবে। আমি ডাক্তার সাহেবদের সাথে পরামর্শ করেছিলাম যে, আপনারা আমাকে একটা প্ল্যান দেন যাতে গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা এখানে আসতে পারে। কত বেতন দিরে তারা এখানে আসতে পারে। আই.এ পাস মেয়েরা কীবাবে আসতে পারে। ম্যাট্রিক পাস মেয়েরা কীভাবে আসতে পারে। তাদের আসতে হবে সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে এবং শিক্ষার কোর্স হবেত, ট্রেনিং হবে তারপর তাদের চাকরির একটা সিস্টেম থাকে। আমরা ঠাট্টা করে বলি–একটা রোগী পায়খানা করে ফেলেছে। রোগী পায়খানা করে পড়ে আছে, যে পর্যন্ত সুইপার না আসবে আমরা বেডপ্যান সরিয়ে দেব না। ওটা সুইপারেরই কাজ। এই যে মেন্টালিটি–রোগী অসুস্থ, মরে যাচ্ছে, তার পাশে বেডপ্যান পড়ে রয়েছে, আমি কেন হাত দিয়ে সে বেডপ্যান সরিয়ে নিব না? সুইপারদের দরকার কেন? আমি লন্ডনে অনেক সময় দেখেছি, আমাকে চিকিৎসা করত যে নার্স–ঠিক সময় সে এসে বেডপ্যানটা নিয়ে চলে গেল। কেন আমাদের এখানে তা হবে না? আমাকে বুঝিয়ে বলেন? সেবার মনোবৃত্তি না থাকলে কোনো কিছু হবে না। এটা যেন ওয়াটার-টাইট কম্পার্টমেন্ট। ডাক্তার সাহেব যাবেন, হাত দেখবেন, বুক দেখবেন, প্রেসক্রিপশন করবেন, চলে আসবেন, নার্সরা যাবেন ইঞ্জেকশন দিবেন। রোগী পায়নার করে পড়ে থাকবে, সুইপার যখন আসবে তখন পরিষ্কার হবে। যদি সে না থাকে? ওয়ার্ড বয় যখন আসবে! What is ward boy? ওয়ার্ড বয় বা কী? সুইপার বা কী? ডাক্তার বা কী? নার্স বা কী? সবাই সেবক। সবাই বাংলার মানুষ। সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে এবং এ সমস্ত ভেদাভেদ ভুলতে হবে। তা না হলে এদেশের মঙ্গল আসতে পারে না। আপনাদের সবাইকে আমি জানি। আমাদের ডাক্তার যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেই তো বিদেশে ঘুরে এসেছেন। তাঁরা নার্সের কাজ দেখে এসেছেন। দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে কী কী কাজ করে তাঁরা দেখেছেন। ইউ.কে কী করে? ইউ.এস.এ, ইউএস.এস. আর কী করে? জার্মানি কী করে, ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশ কী করে? সে সব দেশের ডাক্তাররা যে হাসপাতালে কাজ করে আপনারা দেখেছেন। আপনাদের পয়সা খরচ করে সেসব দেখিয়ে শিখিয়ে আনা হয়েছে। সেসব কেন এখানে চালু করেন না? এখানে আসলে আপনারা মনে করেন যে, আপনারা বড় ডাক্তার সাহেব হয়ে গেছেন; নার্সরা কিছুই না। কিন্তু ওখানে ডাক্তার নার্সের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সমীহ করে কথা বলে। ইজ্জতের সঙ্গে কথা বলে। ওখানে ঘরটি পরিষ্কার করে দিয়ে যায় যে সে সুইপার, তার সঙ্গেও সমীহ করে কথা বলে। এর মানে ওরা অমানুষ নয়় ওরা ওদেশের সমান নাগরিক। সমান অধিকার আছে ওদের। যে কাজই করুক না কেন সে কাজের জন্য তার সম্মান আছে। সে সমাজের প্রয়োজনে কাজ করে। তার নিজের পেটের তাগিদে যেমন কাজ করে, সমাজের প্রয়োজনেও সেটা করে।

এজন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব, যার যা দায়িত্ব আছে, আপনারা তা পালন করুন। এটা হল না, ওটা হল না, ওটা হল না, -এটা হল না–অনেক কিছু হবে না। যুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

দেশে যে ভাত খেয়ে, কাপড় পরে ঘুমান সেজন্য আল্লাহ পাকের কাছে শোকর করেন। এর বেশি কোনো দেশ আজ পর্যন্ত করতে পেরেছে কিনা আমার জানা নাই। রাশিয়াতে বিপ্লবের পরে এক বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক শীতে মারা গিয়েছিল, বার্মাতে গ্রামে গ্রামে কী ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল! ইন্দোনেশিয়ায় কী অবস্থা হয়েছিল বিপ্লবের পরে। আর যেখানে ৫০ লক্ষ লোক না খেয়ে দুর্ভিক্ষে মরার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে আপনারা আরামে ঘুমান, গাড়িতে চড়েন, রেশনের খাবার পান, মাইনেটা মাসে মাসে পান, আল্লাহর কাছে হাজার শোকর করেন। বাংলাদেশের মানুষের ট্যাক্স দেবার ক্ষমতা নাই তার মধ্যে থেকেও বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যে খাবার এনে যেভাবে হোক দেশকে চালানো যাচ্ছে, এটা আমাদের সকলের সৌভাগ্যে বলতে হবে। আপনাদের সকলের কাছে আমার আবেদন, যদিও সকলের প্রতি তা প্রযোজ্য নয়, আপনাদের একটু পরিবর্তন হওয়া দরকার। মানবিক পরিবর্তন। মানবতা বোধ আপনাদের ভিতর জাগিয়ে তুলতে হবে এবং মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের দেশের চেহারা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ডাক্তার সাহেবেরা, আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনাদের উন্নতি কামনা করে সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আশা করি আপনারা সকলে দেশের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। যেমন আপনারা এখানে করেছেন। আপনাদের কোনোরকমের অসুবিধা হবে না আবার আমি বলছি, আপনারা কাজ চালিয়ে যান। কাজের এখন বিশেষ প্রয়োজন। Ward by donation, পয়সা যাদের আছে তারা যদি ওয়ার্ড করে দেয় আমি ওয়েলকাম করি। তবে আমাদের দেশের লোকদের অনেকটা দোষও আছে। সেজন্য আমি ওয়েলকাম করি তাদের যাদের টাকাপয়সা আছে তারা যদি মেডিকেল কলেজে কিছু দান করে। ধরুন রংপুরে যে মেডিকেল কলেজ করেছি সেকানে যাদের টাকা পয়সা আছে তারা তাতে ওয়ার্ড করে দেয়, বরিশালে যে মেডিকেল কলেজ করেছি সেখানে যাদের টাকা পয়সা আছে সেখানে যদি ময়মনসিংহের লোকেরা ওয়ার্ড করে দেয, রাজশাহীতে ওয়ার্ড করে দে, ঢাকাতে ওর্য়াড করে দেয়–তাহলে আমি আশা করি যে, দেশে তাড়াতাড়ি অনেক উন্নতি হবে। আর যদি এই হয়–যখন দয়ামায়া হবে তখন করে দেবে, আর দয়ামায়া না হলে দিবে না। তাহলে আবেদন–নিবেদন করে আমার লাভ কী বলেন? আমি এইটুকু বলতে পারি যে, যাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে তারা এগিয়ে আসুক দেশ গড়ার সংগ্রামে, তাহলে দেশের সত্যিকারের মুক্তি হবে– এ বিশ্বাস নিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশনে শোক প্রস্তাব এবং খসড়া সংবিধান সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন, তার পূর্ণ বিবরণ। [৭]

জনাব ভারপ্রাপ্ত স্পিকার সাহেব, এই গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আপনি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। আমি এদেশের প্রথম গণপরিষদের প্রথম স্পিকার মরহুম শাহ্ আব্দুল হামিদ সম্পর্কে দু একটি কথা বলতে চাই। শাহ্ আবদুল হামিদ সাহেব এমন একজন নেতা ছিলেন, যিনি স্বদেশকে ভালোবাসতেন এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নাই। আওয়ামী লীগের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে বহুবার তাঁকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সকল অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই সংগ্রামী জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ বুকভরা আশা নিয়ে এই গণপরিষদের সদস্যরা তাঁকে স্কিপার নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই। আমরা আজ শুধু তাঁর মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে পারি। মানুষের মরতে হয় এবং এটাই স্বাভাবিক। তাঁর মূল্যবান জীবন অবসানে এই পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে শোক জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর বিদ্রোহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মরহুম কফিল উদ্দিন চৌধুরী

এ প্রসঙ্গে আমি গণপরিষদ সদস্য মরহুম কফিল উদ্দিন চৌধুরীর কথা স্মরণ করছি। ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে আমরা যখন তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, তখন তিনি আমাদের সাহায্য করেছিরৈন, সহযোগিতা জুগিয়েছিলেন। আমরা যখনই বিপদে পড়তাম, তখনই তিনি আমাদেরকে আশ্রয় দিতেন; আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন জালেম মুসলিম লীগ সরকার বাংলাদেশের মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনে তিনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে, শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এখানে প্রধানমন্তী হয়েছিলেন। সেই মন্ত্রিসভায় তিনি (মরহুম কফিল উদ্দিন চৌধুরী) মন্ত্রী ছিলেন এবং আমিও মন্ত্রী ছিলাম। আলোচ্য মন্ত্রিসভায় আমিই সর্বাপেক্ষা অল্পবয়সের মন্ত্রী ছিলাম এবং মরহুম কফিল উদ্দিন চৌধুরীর সাথে কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন খুবই স্পষ্টবাদী। পাকিস্তানের হানাদারবাহিনী বাংলার মানুষের ওপর যখন অত্যাচার চালাচ্ছিল তখন তিনিও মুজিবনগরে আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন– যদিও

৭. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-১০২

Dhaka University Institutional Repository

এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর heart operation করা হয়েছিল। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হল যে, বাংলার স্বাধীনতা দেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

মরহুম আব্দুল গফুর

আমাদের ছোট বাই আব্দুল গফুর খুলনার সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন এবং নিজে গ্রামে গ্রামে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস, আততায়ীর হাতে তাঁকে আত্মহুতি দিতে হয়েছে। খুলনার লাখ লাখ একর জমি জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে গিযে জনগণকে বলেছিলেন, অর্থের চিন্তা না করে তারা যেন কাজ করতে থাকেন। সে সময় তিনি উপকূলীয় বাঁধের কাজ তদারক করে যখন খুলনা থেকে পাইকগাছা ফিরছিলেন, তখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিয়ে রাজনীতিতে সাফল্য লাভ করা যায় না। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই সত্য; কিন্তু তার কথা চিন্তা করলে শরীর শিউরে ওঠে? তিনি ছিলেন যুবক, তাঁর ছিল ভবিষ্যৎ। আমরা অবশ্য আশা করতে পারতাম যে, তিনি এদেশের কল্যাণের জন্য অনেক চেষ্টা করতে পারতেন, কাজ করতে পারতেন, ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হোক এবং এর সঙ্গে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হোক।

স্পিকার নির্বাচন

অতঃপর ভারপ্রাপ্ত স্পিকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ মরহুম শাহ আব্দুল হামিদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য পরিষদের কাজ ২০ (বিশ) মিনিটের জন্য মুলতবী রাখেন। এরপর পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে স্পিকারকে সম্বোধন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমি আপনাকে এই পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমে আপনি এই পরিষদের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। পরে ভারপ্রাপ্ত স্কিপার হিসাবে কাজ করেছেন। আজ এই পরিষদ আপনাকে সর্বসম্মতিক্রমে স্পিকার নির্বাচিত করায় আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি এবং সদস্যগণ আশা করেন যে, আপনি নিরপেক্ষভাবে এই পরিষদের কাজ পরিচালনা করবেন। আপনার কর্মজীবনের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। বহুদিন থেকে আপনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, জেল-জুলুম থেকে শুরু করে বহু কষ্ট আপনি স্বীকার করেছেন। আপনাকে স্পিকার নির্বাচিত করতে পেরে আমরা সকলেই খুশি হয়েছি। আপনি আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।

ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন

অতঃপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্পিকারকে সম্বোধন করে বলেন, জনাব বায়তুল্লাহ পরিষদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হওয়ায় আমি এ পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। জনাব বায়তুল্লাহ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। একটা ঘটনা (incident) আমার মনে পড়ছে। ১৯৪৮ সালে যখন প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয় এবং গ্রেপ্তার হয়ে আমরা জেলে যাই তখন তিনি (বায়তুল্লাহ) গুরুতরভাবে আহত হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তখন তাঁর অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটাপন্ন। যে কোনো সময়

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুবরণ করতে পারেন। এতে বুঝা যায়, তিনি কত মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। সেদিন থেকেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। এরপর থেকে স্বাধীনতা লাভ করা পর্যন্ত তিনি দেশের জনগণের জন্য আন্দোলন করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত নেতাদের সাথে তিনি কাজ করেছেন। আজ তাঁকে আমরা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত করেছি। পূর্বে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা আশা করব, ডেপুটি স্কিপার হিসাবেও তিনি তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন নিরপেক্ষভাবে এবং গণপরিষদের সম্মানকে রক্ষা করে। আমার ভাই পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, স্পিকার ন্যায় ও সত্যের অনুসারী। এই কথা স্মরণ রেখে তিনি গণপরিষদের কার্য পরিচালনা করবেন, এসম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই।

খসড়া সংবিধান

জনাব স্পিকার সাহেব, গণপরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে আমি দু একটি কথা বলতে চাই।

আমরা যেটা আমাদের খসড়া সংবিধান বিল (Draft Constitution Bill) হিসেবে গ্রহণ করলাম, সেটা বিবেচনার জন্য সদস্য সদস্যদের সময় দেওয়া হবে। প্রথমেই আমি খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রায় ৭২দিন আমাদের এই কমিটির সদস্যরা কাজ করেছেন, চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন। কমিটি পৃথিবীর সমসত্ সংবিধান যথাসম্ভব পর্যালোচনা করে একটি খসড়া আজ এই গণপরিষদে পেশ করতে পেরেছেন। এত অল্পসময়ের মধ্যে একটি খসড়া পেশ করায় আমি তাঁদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছিনে।

জনাব স্পিকার সাহেব, সংবিধান সম্পর্কে বলতে গিয়ে আজ আমার সামনে দুটি জিনিস ভেসে ওঠে। একদিকে দুঃখভারাক্রান্ত মন, অপরদিকে আমার মনে আনন্দ। দুঃখভারাক্রান্ত মন এই জন্য বলি যে, আপনারা জানেন, জনাব স্পিকার সাহেবও জানেন, কারণ আপনি আমার সঙ্গে বিশ বছর রাজনীতি করেছেন। এই দীর্ঘসময়ের ইতিহাস আপনার জানা আছে। বিশ বছর পর্যন্ত এদেশের জনসাধারণ সংবিধানের জন্য সংগ্রাম করেছে। অনেক উত্থান পতন হয়েছে, অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। অনেক রক্তের খেলা হয়েচে এই বাংলার মাটিতে। বাংলার ঘরে ঘরে আজ মাতৃহারা-পুত্রহারার আর্তনাদ। লাখ রাখ বোন আজ বিধবা। কত রক্ত বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছে, সে কথা চিন্তা করলে বক্তৃতা করতে আমি পারি না।

১৯৪৮ সালে এই সংবিধান যখন তথাকথিত পাকিস্তানে পেশ করা হয়, তখন বাংলা ভাসার ওপর আঘাত আসে। বাংলাদেশকে কলোনি করবার ষড়যন্ত্র হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য এদেশের ছাত্রসমাজ এবং যুব সমাজ আন্দোলন করেছিল, রক্ত দিয়েছিল। তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ছাত্রদের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। ১৯৫৪ সালে ৯২(ক) ধারা জারি করে শেরে বাংলা ফজলুল হক সরকারকে খতম করা হয়। আমাকে গ্রেফতার করা হয়, সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং হাজার হাজার ছেলের রক্তে বাংলাদেশের রাজপথ রঞ্জিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৮ সালে যখন আমরা এই স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেছিলাম, বাংলার মানুষের স্বাধিকার দাবি করা হয়েছিল, সেদিন মার্শাল-ল জারি করে হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অনেককে আত্মহুতি দিতে হয়েছিল। ১৯৬২ সালে জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। বাংলার ছাত্রসমাজ তা বুখে দাঁড়ায়। তারপর আন্দোলন হয়–কত রক্ত! সে ইতিহাস আপনি জানেন স্পিকার সাহেব।

১৯৬৬ সালে আমরা বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ দিয়েছিলাম। শোষকগোষ্ঠী তখন ক্ষেপে উঠেছিল। সে আন্দোলন আপনাদের জানা আছে। ১৯৬৬ সালের ২৮মে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আমাদের সহকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। এতে দেশে ঝড় বয়ে যায়। যার পর পৈশাবিক সরকার আমাদের ভাইদের, আমাদের ছেলেদের উপর গুলি চালিয়ে, মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করে।

তারপর শুরু হয় ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হই। পরিণামে শুরু হয় আন্দোলন। কত রক্ত গিয়েছে। শেষ রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষ স্বাধীন হয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত দিয়ে কোনোদিন কোনো দেশ স্বাধীন হয় নাই। কিন্তু বাংলাদেশকে তা দিতে হয়েছে। জানি না, কী পাপ বাংলার মানুষ করেছিল! কেন রক্ত দিতে হয়েছে তাদেরকে? শুধু রক্তই দিতে হয় নাই, ঘরবাড়ির মায়া ছেড়ে, লাখ লাখ নয়, কোটি কোটি লোক বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতের জনসাধারণ, ভারত সরকার যদি বুকে টেনে না নিত, জানি না, বাংলার মানুষের কী অবস্থা হতো! আমাকে গ্রেফতারের পর বর্ডার পর বর্ডার থেকে কিছু অংশ দখল করে নিয়ে মুজিবনগর প্রতিষ্ঠা করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সেখানে প্রভিশন সরকার গঠন করেন এবং সংগ্রাম চালিয়ে যান।

লাখ লাখ মানুষ জীবন দিয়ে, বাংলার সকল মানুষ একতাবদ্ধ ওপর পাশবিক অত্যাচার করে, লাখ লাখ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে লাখ লাখ মানুষকে দেশ হতে বিতাড়িত করে। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ লোককে হত্যা করে। হত্যা করে বৃদ্ধাকে, হত্যা করে মেয়ে, হত্যা করে যুবক– যেখানে যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। আমি জানি না, আপনাদের memory short কিনা, কিন্তু এমন ইতিহাস আমরা পেয়েছি। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। এক ছেলে আমার কর্মী। মিলিটারি তাকে ধরে বলল: জয় বাংলা বলতে পারবি না। সে বলল: জয় বাংলা বলবই। তখন তার একটা হাত কাটে। বলল: জয় বাংলা বলবি? সে বলল: জয় বাংলা। তখন তার বাম হাতটি কেটে দেওয়া হলো, তার দু-খানা হাত কেটে দেওয়া হলেও সে বলল, জয় বাংলা। তার একটা কান কেটে দিল। বলল: বলবি জয় বাংলা? তার অপর কানটি কেটে দিল। বলল: বলবি, জয় বাংলা? ছেলেটি বলল: জয় বাংলা। তার বাম পা কেটে ফেলে দিল। তখন তার জান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাকে বলল: বলবি, জয় বাংলা? সে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করতে করতে বলল: জয় বাংলা।

এদের পাশবিক অত্যাচার পশুর মতো, বর্বরের মতো–যাতে হিটলার লজ্জা পায়, যাতে হালাকু খান লজ্জা পায়, যাতে চেঙ্গিস খান লজ্জা পায়। তারা অত্যাচার করেছে বাংলাদেশের মাটিতে। আজ বাংলাদেমের গণপরিষদের সদস্যরা সেই রক্ত দিয়ে লেখা সংবিধান দিয়েছে। এই সংবিধান ছাড়া কোনো দেশ চলতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। সেখানে সংবিধান দিতে লাগল ১৯৫০ সাল। ২৫ বছরে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার সংবিধান দিতে পারে নাই। তদানীন্তন গণপরিষদের প্রতিনিধিরা যেটা করেছিল, সেটা উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য, বাংলার মানুষকে শোষণ করবার জন্য। কিন্তু পারে নাই। জাগ্রত সমাজ রক্ত দিতে শিখেছে।

২৫ মার্চ প্রথম আমি বলেছিলাম, যে জাতি মরতে শিখেছে, তাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তাই আজ রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। গুদামে খাবার ছিল না, ২৭৮ টি রেলব্রিজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। সমস্ত রাস্তার ব্রিজ, প্রায় ২৭০টার মতো, ধ্বংস করে দিয়েছিল। চাউলের প্রায় গুদামই ধ্বং করে দিয়েছিল। বন্দরগুলোর (port) মধ্যে মাইন বসিয়ে রেখেছিল, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। ব্যাংকের পয়সা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কলকারখানাগুলো বন্ধ ছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবটেরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। গ্রামের স্কুলগুলোর ফার্নিচার জ্বালিয়ে রুটি বানিয়ে খেয়েছিল। ৩৫,০০০টি গ্রাম এই বাংলাদেশে। ৫৪,০০০ হাজার বর্গমাইল এই বাংলাদেশের আয়তন। সাড়ে সাত কোটি লোক বাস করে এই বাংলায়।

তারা গর্ব করে বলে গিয়েছিল যে, বাংলাদেমের রৌক, জয় বাংলা স্বাধীন হবে, কিন্তু এমন ধ্বংস করে দিয়ে যাব, এই দেশের মানুষ আর যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে এবং দুর্ভিক্ষে যেন লাখ লাখ লোক মারা যায়।

আমার সহকর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করেছে, চেষ্টা করেছে। এখনো মানুষ না কেয়ে কষ্ট পায়, একনো কাউকে কাপড় দিতে পারি নাই। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাজার করেছিল বাংলাদেশকে। এখানে এমন কলকারখানা করতে দেয় নাই, যা থেকে মানুষ তাদের নিজেদের জিনিস ভোগ করতে পারেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী সেখানে কারখানা স্থাপন করে এখানে মাল বিক্রি করত। আশি ভাগ জিনিস পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসতো। বিক্রি করে পয়সা নিয়ে যেত। এই অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। জাতিসংঘের প্রতিনিধি বাংলাদেশে এসেছিলেন। আশিজন প্রতিনিধি বাংলাদেশ সার্ভে করেছিলেন। তারা রির্পোট দিয়েছেন গত মহাযুদ্ধে যখন গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া, জার্মানি আক্রমণ করে এবং জার্মানিকে পরাজিত করে, তখন জার্মানিতে যে ধ্বংস হয়েছিল, সেই সমপরিমান ধ্বংস হয়েছে বাংলাদেশে। এটা বাংলাদেশের শেখের কথা নয়, এটা জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের কথা–যাঁরা বাংলাদেশ সার্বে করেছেন। যাঁরা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তাঁরা অবশ্য জানেন না যে, জার্মানির লোক এক বছর, দেড় বছর রুটি খেয়েছিল। যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তাঁরা জানেন না যে, রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে একমাত্র লেনিনগ্রাডে ১২ লাখ লোক শীতে মারা গিয়েছিল। বিপ্লবের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা আনার পরে দেশের যা অবস্থা হয়, তা যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তাঁরা জানেন না। যুগোশ- াভিয়ার কী অবস্থা হয়েছিল, ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলোর কী অবস্থা হয়েছিল, তা তাঁরা জানেন না, বার্মা এবং ইন্দোনেশিয়ার কী অবস্থা হয়েছিল, তা তাঁরা জানেন না। বাংলার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। কারন, বাংলাদেশ যাদের হাতে ছিল, তারা মানুষ নয়, তারা ছিল অমানুষ। তারা ছিল মানুষের চেয়ে অধম–তারা পশু। তারা মানুষকে হত্যা করে। সিংহ, বাঘ

Dhaka University Institutional Repository

যখন মানুষকে হত্যা করে, তখন এক আঘাতে হত্যা করে। কিন্তু পাকিস্তানি পশুর দল আমার এক-একজন কর্মীকে ধরে নিয়ে মাসের পর মাস অত্যাচার করে হত্যা করেছে। দু:খী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে হবে। বাংলার মানুষকে কমপক্ষে কেয়ে বাঁচতে হবে। দুনিয়ার মানুষের কাছে appeal করেছিলাম। তারা এগিয়ে এসেছিল। সাহায্য আমাদের তারা করেছিল। বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আমরা প্রথম লড়াই শুরু করেছিলাম দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। দুনিয়ার মানুষ আমাকে বলেছিল, ৫০ লাখ লোক বাংলাদেশে না খেয়ে মারা যাবে। কতটুকু করতে পেরেছি, জানি না। শুধু এটুকু জানি যে, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। জানি অবস্থা ভয়াবহ, বিরাট ভয়, বিরাট আঘাত, বিরাট ধ্বংস। একটা গাছের ফল হতে ৬ বছর সময় লাগে। বিধ্বস্ত বাংলাকে গড়ে তার মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে কী লাগে, তা যারা গড়ে তারা বুঝে। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। আমি ছিলাম কলোনি। আমাকে সেখানে সাহায্য করেছে। এ কথা যদি আমি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় হবে। যদি ৮ লাখ, ৯ লাখ টন খাদ্য দিয়ে ভারত আমাদের সাহায্য না করত, তাহরে কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না, দুর্ভিক্ষের হাত থেে বাংলাকে রক্ষা করা। অকৃতজ্ঞ হলে চলবে না। বাংলা আর কিছু হতে পারে; কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। ১ কোটি লোককে কাবার দিল, সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

গণতন্ত্র জানি, গণতন্ত্র বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের অর্থ আপনি জানেন স্পিকার সাহেব, দুনিয়া জানে। আর দুনিয়ায় এমন ইতিহাস যদি কেউ দেখাতে পারে এত বড় বিপ্লবের পরে, এত বড় ধ্বংসস্তূপের পরে যেখানে হাজার হাজার, লাখ লাখ লোকের কাছে বন্দুক ছিল, কামান ছিল, মেশিনগান ছিল, যেখানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করবার পরে অনেকের কাছে অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে আমরা বাংলার মানুষকে মোবারকবাদ না দিয়ে পারব না। তারা বলল, বিপ্লবের পরে বাংলাদেমের দ্বিতীয় গণহত্যা হবে। কিন্তু বাংলার মানুষ আমার জেল থেকে ফিরে আসার পরে তারা চেষ্টা করে, সহযোগিতা করে বাংলার মাটিতে গণহত্যা হতে দেয় নাই। এমন কি, যারা আমার বাংলার মানুষকে হত্যা করেছিল, তাদেরকেও হত্যা করতে দেয় নাই। দুঃখের বিষয়, এখন তাদের প্রশংসা না করে আমাদের গালি খেতে হয়। সেটা ভালো। গালি না খেলে চলবে কেমন করে? যা হোক, আসল কথায় ফিরে আসি। এই যে ধ্বংসস্তূপ, তার মধ্যেই শুরু হয় আমাদের দেশ শাসন। সেই যে অস্ত্র, আমি নিশ্চয়ই মোবারকবাদ দিব বাংলার মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের। নিশ্চয়ই মোবারকবাদ দিব বাংলায যারা যুদ্ধ করেছে তাদের এবং সমস্ত মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের। সামরিক বাহিনী বলেন, মুক্তিবাহিনী বলেন, পুলিশ বলেন, আনসার বলেন, যারা সত্যিকারভাবে দেশপ্রেমিক, যারা সত্যিকারে বাংলাকে ভালোবাসে, আমি আবেদন জানিয়েছিলাম তাদের প্রতি অস্ত্রসমর্পন করবার জন্য। প্রায় দেড় লাখ থেকে দু লাখ অস্ত্র তারা আমার কাছে সমর্পন করেছিল। কিন্তু দুষ্কৃতকারী সব জায়গায় আছে, সবদেশেই আছে। যুগে যুগে এটা চলে এসেছে। আমাকে হাসতে হাসতে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন? আমি বলেছিলাম, ৬৫ হাজার গ্রামের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো। অনেকের চেয়ে, অনেক দেশ অপেক্ষা ভালো। যে দেশে এক এক রাত্রে, এক এক শহরে ৬০ থেকে ৮০ জন লোকে গুলি করে হত্যা করা হয়, সে দেশ অপেক্ষা আমার দেশের লোক ভালো। বিপ্লবের পরে দেশে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের এবং

Dhaka University Institutional Repository

আমার জনসাধারণের সহযোগিতায় আইন শৃঙ্খলা অনেকটা ফিরে এসেছে– ভালোভাবেই ফিরে এসেছে। তবু দুষ্কৃতকারী কিছু আছে। তাদের প্রতি জনগণের সহযোগিতা নাই। কাজেই, শেষ পর্যন্ত তাদেরও আত্মসমর্পন করতে হবে। চোর, ডাক্তার, গুন্ডা, বদমায়েশ থাকে। তাতে কিছু যায় আসে না। তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। দেশের মানুষ যখন ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, তখন তারাই সব রুখে দাঁড়াবে। দরকার যদি হয়, সরকার এমন থাবা দিবে, যে থাবায় কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। দুনিয়ার ইতহাসে দেখা যায় না, এ ধরনের অবস্থার মধ্যে মাত্র দশ মাসের মধ্যে কোনো দেশ সংবিদান দিতে পেরেছে। আমি তাই মোবারকবাদ জানাই সংবিধান কমিটির সদস্যদের। মোবারকবাদ জানাই বাংলার জনসাধারণকে, রক্তে লেখা এ সংবিধানকে। যারা আজ বলেন বা চিন্তা করেন, তাদের বোঝা উচিত, এ সংবিদান আলোচনা আজ থেকে শুরু হয় নাই। অনেকে যারা বক্তৃতা করেন, তাদের জন্মের পূর্ব থেকে তা শুরু হয়েছে এবং এর জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। এই সংবিধানের আলোচনা হতে হতে সংবিধান কী ধরনের হবে, সে সম্পর্কে ভোটের মাধ্যমে শতকরা ৯৮ জন লোক তাদের ভোট আওয়ামী লীগকে দিয়েছে। তাই, সংবিধান দেওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগের রয়েছে। দরকার হলে আওয়ামী লীগ আরেকবার ভোটের মাধ্যমে তা প্রমাণ করবে।

খবরের কাগজ থাকলে বক্তৃতা লেখা যায়, ময়দান থাকলে বক্তৃতা দেওয়া যায়; কিন্তু জনসাধারণের কতটা সমর্থন আছে, সেটা পরীক্ষা হয় তখন, যখন জনগণ অধিকার পায় ভোট দেওয়ার। সেইজন্যই আজ দশ মাসের মধ্যে সংবিধান দেশের সমনে পেশ করা যাচ্ছে। সংবিধান মানুষের অধিকার থাকবে, অধিকারের সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকবে। এখানে Free Style Democracy চলতে পারে না। যে সংবিধান পেশ করা হয়েছে, সেটা যতদূর সম্ভব জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে। এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের আদর্শ পরিষ্কার, এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই আদর্শের ভিত্তিতে এদেশ চলবে। জাতীয়বাদ–বাঙালি জাতীয়তাবাদ, এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চলবে বাংলাদেশে। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ বাতাস, বাঙালির রক্ত দিয়ে গড়া বাংলার জাতীয়তাবাদ। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি্ আমরা বিস্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষক শ্রেণি আর কোনোদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। সমাজতন্ত্র না হলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইলের মধ্যে বাঁচতে পারবে না, সেইজন্যই অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক। আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে, মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টান বৌদ্ধ যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বাংলার মানুষ এটা চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে বাংলার মানুষ তাকে প্রত্যাঘাত করবে, এ বিশ্বাস আমি করি। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার সংবিধান তৈরি হয়েছে। এটা জনগণ চায়, জনগণ এটা বিশ্বাস করে। জনগণ এর জন্য সংগ্রাম করেছে, লাখ লাখ লোক এজন্য জীবন দিয়েছে। এই আদর্শের

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতেই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। সোনার মানুষ ছাড়া সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

জনাব স্পিকার সাহেব, খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি যে রির্পোট পেশ করেছেন, সেটা পরিষদের সামনে আছে। সে সম্পর্কে পরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হবে। সকল সদস্য এতে সুযোগ পাবে। আমার মনে হয়, আজকে বোধহয় দুটো Programme আছে–Rules and Procedure এর। সেখানে point by point আলোচনা হবে। কমিটি যে কষ্ট স্বীকার করে এবং পরিশ্রম করে পরিষদে খসড়া পেশ করেছেন, সেটা যদি আলোচনা দ্বারা দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে এর কিছুটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করলে এর ফল ভালো হবে, দেশের মঙ্গল হবে, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তা গ্রহণ করব। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিই সবকিছু চূড়ান্ত করে নাই, দু-একজন যারা নির্দলীয় বা বিরোধী পার্টির সদস্য রয়েছেন, তারা যাই বলুন, আমার কোনো আপত্তি নাই। যদি আপনাদের ভালো সংশোধনী থাকে, নিশ্চয়ই দেশের মঙ্গলের জন্য উদার মন নিয়ে আমরা তা গ্রহণ করব। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্য যারা আছে, তাঁরা এটা দেখুন, পড়ুন। যদি প্রয়োজন হয় সংশোধনী পেশ করবেন, তা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখব। এটা খসড়া সংবিধান। কমিটির সদস্যরা তা প্রণয়নে পরিশ্রম করেছেন। বিশেষ করে, এর জন্য চেয়ারম্যানকে প্রশংসা না করা হলে অন্যায় করা হবে। ড. কামাল হোসেন ও তাঁর সহকর্মীরা পরিশ্রম করেচেন। Rules and Previlege কমিটি রির্পোট পেশ করেছেন। এজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর ফলে সদস্যরা সংবিধান সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ পাবেন। আমি পরিষদের সস্যদের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি। যদি এর কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, তাহলে, নিশ্চয়ই তা করা হবে। তবে, এটা কোনো আইন নয়, এ বছর পেশ করা হল আবার আগামী বছর এর পরিবর্তন করা হবে, এটা হল সংবিধান, এটা হল ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা নির্দেশনামা।

আজ স্বাধীন বাংলার স্বাধীন মাটিতে আমার পতাকা ওড়ে, 'আমার সোনার বাংলা' গান হয়। সোনার বাংলার মুক্ত হাওয়ায় বসে আলোচনা করছি। আজ আমরা পরাধীনতার নাগ পাশ থেকে মুক্তি হয়েছি, এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু থাকতে পারে না! এরই স্বপ্ন দেখেছি অনেকদিন আগে, আমার সহকর্মীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করেছি যে, কবে স্বাধীন বাংলার মাটিতে বসে স্বাধীন বাংলার সংবিধান দিতে পারব। সেই চিন্তা আজ বাস্তব ফল লাভ করেছে। কিন্তু যখন রক্তের কথা মনে পড়ে, তখন যেন অভিভূত হয়ে পড়ি।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে বাংলার মানুষ গর্বিত, আমার দল গর্বিত, পরিষদ সদস্যরা গর্বিত যে, আজ আমরা স্বাধীন বাংলার মাটিতে খসড়া সংবিধান দিতে পেরেছি। আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ সংবিধান মানুষের সামনে পেশ করতে পারব। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আটকে রাখবার জন্য রাজনীতি করে না। ক্ষমতায় যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে আইন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারত। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগ রাজনীতি করেছে এবং সেই মুক্তি আজ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান দেওয়ার পরে দেশের নির্বাচন হবে, তাতে আওয়ামী লীগকে মানুষ ভোট না দেয় দিক, যাঁদের ভোট দিবে, তাঁরাই ক্ষমতায় আসবেন। এতে আপত্তির কিছুই থাকবে না। তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হবে। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি যে সমস্ত সরকারি অফিসার এ কাজে সহায়তা করেছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংবিধান যাঁরা প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের নামে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এটা দুনিয়ার ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়, বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গদি যারা একবার পায়, তারা আর সে গতি ছাড়তে চায় না। তাড়িয়ে না দিয়ে গদি ছাড়ে না। অথচ আমার গণপরিষদ সদস্যরা সংবিধান দিয়ে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁরা আবার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ফিরে আসবেন। তখন তাঁরা আর গণপরিষদে আসবেন না, আসবেন পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে। তাই তাঁদেরকে আপনার পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আওয়ামী লীগ দুনিয়ায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এই নির্বাচন দিয়ে। বাংলার মানুষের জয় হোক, জয় বাংলা। ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

গণপরিষদে ৪-১১-৭২ তারিখে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমনের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ [৮]

জনাব স্পিকার সাহেব,

আজ প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম নজির যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনন্ত্র প্রদান করছে। বোধহয় নয়, সত্যি প্রথম–বাংলাদেমের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে গণপরিষদে এসে তাদের দেশের শাসনতন্ত্র প্রদান করছেন। আজ আমাকে অনেক কিছু স্মরণ করতে হয়, অনেক দিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়, কিন্তু আমি তা করতে চাই না। কেবল এইটুকু বলতে চাই, তদানীন্তন বারতবর্ষ, যাকে আমরা উপমহাদেশ বলতাম– সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে তার হিসাব করলে দেখা যাবে তাতে বাংলাদেমের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই রক্তদান করেছে বেশি। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। বাংলার এমন কোনো জেলা, এমন কোনো মহকুমা ছিল না যেখানে সে আমলে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে সিপাহী বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি তেকেই শুরু হয়েছিল। তারপর বাংলাদেমের জনসাধারণ বহু যুদ্ধ করে ফাঁসি কাষ্ঠে জুলে বারবার সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তারা জেল-যন্ত্রণা ভোগ করেছে বহুবার, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেছে অনেক। কিন্তু দুঃখ, বাঙালির জীবনে সুধ কোনোদিন আসেনি। বাংলাদেশ সম্পর্কে ঠাট্টা করে একবার আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলার উর্বর জমি তোমার দুঃখের কারণ। তাই বোধহয়, শকুনিদের বারবার এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কারণ তারা এদেশের অর্থসম্পদের ওপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল। দুনিয়ার সেই লোভীরা এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের যারা শাসক ছিল, তারা বাংলার অর্থ, বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে অন্যত্র। গৃহহারা সর্বহারা কৃষক মজুর দুঃখী বাঙালি যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেছে, দু'বেলা পেটভরে খেতে পায়নি, তাদেরই সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার বন্দর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, তাদেরই সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে করাচি, ইসলামাবাদ, লাহোর। গড়ে উঠেছে ডান্ডি গ্রেট ব্রিটেন। এই বাংলার সম্পদ ছিল বাঙালির দুঃখের কারণ। সংগ্রামী বাঙালি বারবার এর বিবুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিবুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিতুমীর, যুদ্ধ করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ। তাদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়; কারণ বাঙালি আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। স্মরণ করতে হয় শেরে বাংলা ফজলুর হকের কথা, স্মরণ করতে হয়ে সোহরাওয়ার্দী মরহুমের কথা, আরও স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা। যিনি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হয় সেসব সহকর্মীর আত্মত্যাগের কথা, যারা জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ৯ মাসই হয় নাই; স্বাধীনতা সংগ্রাম শুবু হয়েছে

৮. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১১৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সনের পর থেকে। তারপর ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। একদিনে সে সংগ্রাম চরমপর্যায়ে পৌঁছে নাই। ৯ মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বহুদিন থেকে। ১৯৪৭ সনে উপমহাদেশ ভাগ করে সংখ্যায় মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা সবকিছু হারিয়ে ফেলে। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব, যাকে অনেককে তখন নেতা বলে মানতেন, বাঙালিকে এক শকুনির হাত থেকে আরেক শকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচিতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমনকি জিন্নাহ সাহেব মরার পূর্বে তাঁর সম্পত্তির যে দলিলপত্র করে গিয়েছিলেন সেই দলির অনুসারে ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচি স্কুলকেও তিনি কিছু দান করেছিলেন। কিন্তু বাংলার কোনো মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই। বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুগে মেতে পরের ছেলেকে বড় করে দেখি, এই ছিল আমাদের দূর্ভাগ্য। দুনিয়া কোনো দেশ 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ পাই না এক বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতর খুব বেশি। ইংরেজি ভাষায়, রাশিয়ান বাষায়, ফ্রেঞ্চ ভাষায়, চায়নিজ ভাষায়, ফ্রেঞ্চ ভাষায়, চায়নিজ ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ নাই, একমাত্র বাংলা ভাষা ছাড়া। এই কারণে বাঙালিদের মধ্যে যেমন ত্যাগ ও সাধনা করার শক্তি ছিল, তেমনি পরশ্রীকাতরতার মনোভাবও দেখা গেছে। বাংলাদেশের যে সকল নেতা সংগ্রাম করেছেন আমরা তাঁদেরকে বুঝতে পারি নাই; আমরা বুঝেছি মি. জিন্নাহ বুঝি আমাদের নেতা হয়ে চলে এসেছেন বোম্বাই থেকে। যাহোক, সেই ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সনের করুন ইতিহাস অনেকেই জানেন।

জনাব স্পিকার সাহেব ১৯৪৭ সন থেকে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনি করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমা শক্তিকে এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের একদল লোক ছিল যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে তাদের সঙ্গে বারবার হাত মিলিয়েছে, তারা বারবার চরম আঘাত হেনেছে আমাদের উপর। আঘাত হেনেছ ১৯৪৮ সনে, আঘাত হেনেছে ১৯৫২ সনে, আঘাত হেনেছে ১৯৫৪ সনে। এমনকি ১৯৫৬ সনে শাসনতন্ত্র রচনার সময় যখন বাঙালিরা থেকে 'ওয়াক আউট' করে, তখনো বাঙালিদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক বেঈমানি করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মিলায় মন্ত্রিত্বের লোভে। ১৯৫৮ সনে মার্শাল ল বাংলার উপর আসে বাঙালিকে শোষণ করার জন্য। যখন পশ্চিমারা দেখে বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগ করে, তাদের শক্তি ছিল একটা, সেই শক্তি তাদের সামরিকবাহিনী। ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদ রক্ষা করার জন্য সামরিকবাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকা বেছে নিয়েছিল, সেখান থেকে সামরিকবাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হতো। বাঙালিকে বিদ্রোহ করে, এই হচ্ছে তাদের দোষ। ১৯৪৭ সনের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় ছিল বেশি, বুদ্ধিতে ছিল ভালো, লেখাপড়া ভালো জানত, আক্কেল তাদের প্রখর ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙালিদের ছিল, যার জন্য বারবার তারা মার খেয়ে গেল, যদিও তা পূরণের জন্য আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিল–সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি। সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখন অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে তখনই এসেছে চরম আঘাত। ১৯৫৪ সনে ৯২ ক ধারার বলে শেরে বাংলা ফজলুল হককে ঘরের মধ্যে অন্তরীণ করা হয়, আমিসহ ৫০ জন সহকর্মী যাঁরা তদানীন্তন এম.এল.এ ছিলেন তাঁদেরকে এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস, সেকথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি; যখন মানুষ আমাদের একটু স্থান দিত না, কারো বাড়িতে জায়গা পাওয়া যেত না, আত্মীয়স্বজন ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না। সে যুগে ১৯৪৭ সনে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যাঁরা এদেশে বিরোধীদল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তাঁদের কথা যদি স্মরণ না করি তবে অন্যায় হবে। তাদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আরও স্মরণ করি তাদের কথা, যাদের রক্তে এই ২৫ বৎসর বাংলাদেমের পথ ঘাট, রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে; যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি হয়েছে, যে লক্ষ লক্ষ মা বোন জীবন দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে–তাদের কথা! লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, কত মা আজ পুত্রহারা, কত বোন আজ স্বামীহারা, কত পিতা আজ সন্তানহারা, কত সংসার যে আজ ছারখার হয়ে গেছে তার সীমা নাই। পশ্চিমা শোষকরা শেষপর্যন্ত কত খেলা খেলে গেল। উড়ে এসে এক একজন জুড়ে বসত।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমি গত নির্বাচনের পূর্বে ও পরে বলেছিলাম, যে জাতি একবার রক্ত দিতে শিখেছে সেই জাতিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনো কেউ পদানত করতে পারে না–সে কথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। অনেক দালালি করেছেন প্রগতির নামে; ইয়াহিয়া খানের দালালি, আইয়ুব খানের দালালি করেছেন। আজকের অনেকেরই তখন রাজনৈতিক জীবনের জন্ম হয় নাই, তারাও অনেক সময় আজ সমালোচনা করেন আমাদের। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালোচনা করুন, সত্য কথা বলতে ভয় না পাওয়া সৎ সাহসের কাজ। গত সংগ্রামের সময় ২৫ মার্চ তারিখ আক্রমণ চলে এবং আমার বাড়িতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেফতার করা হয়, সেই সময় আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম–যাও, চলে যাও, যার যার এলাকাতে গিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোল এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও। ২৫ মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর উপর, বাঙালি ই.পি.আর, বাঙালি পুলিশ, বাঙালি রক্ষীবাহিনীর উপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর এবং যারা এদেশের দুঃখী মানুষ তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সারা বাংলাদেশে সেই ২৫ তারিখ রাত থেকে অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগাণ চলে। যখন আমি বুঝতে পারলাম আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে–মনে হল এই বুঝি আমার শেষ, তখন চেষ্টা করলাম, কী করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছে দেওয়া যায় এবং তা আমি পৌঁছে দিয়েছিলাম। সেদিন আমি লাশ দেখেছি, রক্ত দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে, রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাস দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন আগুন আমি দেখেছি। তাদের শুধু বলেছিলাম, তোমরা আমাকে হত্যা কর, আমার মানুষকে প্রাণে মের না। তারা আমার কথা শোনে নাই, তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছ। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারা আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে, এই গণপরিষদের বহু কর্মীকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে, দুনিয়ার ইতিহাসে তা দেখা যায় না। হালাকু খাঁর কাহিনী পড়েছি, চেঙ্গিস খাঁর কাহিনী পড়েছি, হিটলার মু সোলিনির কাহিনী পড়েছি, কিন্তু মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে তা দেখি নাই। তারা দুই বৎসরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা করে তার বুকে 'বল, জয় বাংলা' লেখা এটে গাছের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছে। মানুষ এত জঘন্য পশু না হলে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধার উপর কি পাশবিক অত্যাচার করতে পারে? তারা লক্ষ লক্ষ দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। সে রক্তের স্মৃতি আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতেই হয়।

আওয়ামী লাগ আমার সহকর্মীরা বা আমি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে সব ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার মন্ত্রিত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ বাঙালিরা ভোগ করবে। সেই জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। জনাব স্পিকার সাহেব, বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ অনেক সময় আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমার সহকর্মীরা সবাই তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, এই পরিষদের এমন কোনো সদস্য নেই যার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নাই, আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করা হয় নাই। আজ অনেকে এদের সম্পর্কে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কারণ যে কাজ করে তারই বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলে, যে কাজ করে না তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না। আওয়ামী লাগের এমন অনেক সদস্য আমার কর্মী ভাইবোন আছে যাদের ঘরবাড়ি এমনকি সর্বস্ব চলে গেছে তবু তারা ক্ষমতা চায়নি। সেদিন তারা সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে বুঝতে পারছে না কী করবে, আমি তাদের কাছে নাই। আমি ঘোষণা করে বলে গিয়েছি, সমস্ত জেলায় মহকুমায় একসঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু কর এবং হয়েও ছিল তাই। আমার সহকর্মীরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে স্বাধীন সরকার গঠন করে দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষন করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেন নাই। শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেন নাই। সেই ভাঙাচুরা দল অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে, তারপর পুরোদমে সংগ্রাম করে চলে। নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, সাবেক ই.পি.আর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও সরকারি কর্মচারীদের একাংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম। তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তখনো তারা অন্যান্য জায়গা থেকে অস্ত্র পায়নি; দেশের মধ্যে থেকে অস্ত্র যোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করে। সেইভাবেই একমাত্র, দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা মুক্তবাহিনীর দখলে থাকে। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানি বর্বরবাহিনী ভালো ভালো আধুনিক অস্ত্র পেয়ে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দেয়; কিন্তু পদানত হয়নি বাঙালি। সেজন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যারা রক্ত দিয়েছে, শহীদ

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। আমি আরো স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গুভাইদের কথা যারা আজ পঙ্গু হয়ে বসে আছে। তাদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করেছি, পঙ্গু ভাইদের জন্য ট্রাষ্ট করে দিয়েছি ৪ কোটি টাকা ব্যয় করে, সেখান থেকে তারা পেনশন পাবে সারাজীবন। আমি আরো স্মরণ করি আমার নির্যাতিতা মা বোনদের কথা। দুই লক্ষ নির্যাতিতা মা বোন আজও ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়ে গেছে পাকিস্তানি সেই দস্যুরা যারা ইসলামের নাম নিয়ে চিৎকার করত, মুসলিম বাংলা বলে চিৎকার করতে লজ্জাবোধ করে নাই। সেই দুই লক্ষ মা বোনের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে।

যাক সেসব কথা, আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি অনেক রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছি, এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। কোনো দেশে কোনো যুগে আজ পর্যন্তও এতবড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। স্বাধীনতার পর দেশে যে অবস্থা বিরাজ করছিল জনসাধারণ তা জানে, বৈদেশিক মুদ্রা কয় পাউন্ড ছিল তা সকলের জানা আছে, রাস্তাঘাটের কী অবস্থা ছিল আপনারা সব তা জানেন, চাউলের গুদামে কত চাউল ছিল এসবই আপনাদের জানা আছে। মানুষের ভুললে চলবে না যে, স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশ একটি কলোনি মাত্র ছিল, শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানি মাল এখানে বিক্রি করে তার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো। সবকিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায়, যাবার বেলায় তারা গর্ব করে বলে যায়, বাঙালি যে স্বাধীনতা পেল তা আর কতদিন, দেশকে এমন করে দিয়ে গেলাম যে, লক্ষ লক্ষ লোক না কেয়ে মরবে আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ কোমর সোজা করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক, স্পিকার সাহেব, বিপ্লবের পর ৯ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া, মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কারণ হল আমরা জনগণের ওপর বিশ্বাসী; এই জনগণের উপর আস্থা নিয়েই পাকিস্তানি সামরিকবাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জনগণের ওপর আমার আস্থা রয়েছে। আমি আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালোবাসি। সেইজন্য আজ আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তাঁরা রাতদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত আমরা অনায়াসে শাসনযন্ত্র চালাতে পারতাম, কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোট দিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালোবাসে; কিন্তু তা আমরা চাইনি, চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। তাই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীর একজনও আপত্তি করে নাই যে, আমরা পরিষদ ভাঙব না। এজন্য আমি গর্বিত। যাঁরা এই পরিষদের সদস্য হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা এই গণপরিষদ সদস্য তাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে, ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব। কারো কিছু বলার অধিকার ছিল না, কেননা কনভেনশানের রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করা হয় নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, এটা তার আর একটি প্রমাণ । সে শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং নির্বাচনে যাবে। আজ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খরানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মীরা প্রায় সকলেই বক্তৃতা করেছেন। যিনি একজন বিপক্ষে আছেন এবং দুইজন স্বতন্ত্র দলে আছেন,

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদেরকে এখানে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁরা এখানে আসতে পারলে আরো সুযোগ পাবেন, তাতে আপত্তি নাই, আর যদি না আসতে পারেন তাতেও আমার আপত্তি নাই, জনগণই ঠিক করে দেবে কে এখানে আসবে আর কে আসবে না। নয় মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে, এটা হল আর একটি নতুন দৃষ্টান্ত। আমি আগেই বলেছি শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিহীন নৌকার মতো। তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি জনগণ শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে, তারা খসড়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছেও। কারণ আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এখানে এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই অথবা আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই কিংবা কেউ এসে আমাদের মার্শাল ল জারি করে বসিয়ে দেন নাই। মার্শাল ল জারি আমরাও করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তাঁরা বলতে পারতেন, Emergecy, no democracy, no talk for 3 years-এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করত। কোনো সমালোচনা চলবে না, কোনো কথা বলা চলবে না, কোনো মিছিল হবে না, কোনো পার্টির কাজ চলবে না। কারণ দেশের যে অবস্থা ছিল, তাতে এটা সহজেই করা যেত। সব দেশে, সব যুগে বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ। কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল–আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে–শক্তির উৎস হল জনগণ।

জনাব স্পিকার সাহেব, ৪টা মূল স্তম্ভের ওপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর ওপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেনও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। এই যে ৪টা স্তম্ভের ওপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো, এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকারই হচ্ছে মূল বিধি। মূল ৪টা স্তম্ভ–জনগণ ভোটের মাধ্যমে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নয়, ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ সংগ্রাম। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আমি আর নতুন সংজ্ঞা না-ই বা দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি আমি যে বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি। এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকলের সাথে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হল অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে, তাহলে কোনো জাতি বড় হতে পারে না এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, যারা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু কিন্তু সেকানে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে, তারা একটি জমিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়বাদ নির্ভর করে অনুভূতির ওপর। আজ বাঙালি

Dhaka University Institutional Repository

জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে; এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল যার ওপর ভিত্তি করে, এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙালি, আমার 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদ।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র–সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে, দেখা যায় সেসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের প্রটেকশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিত গণতন্ত্রের অর্থ হলো–আমার দেশে এ গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে তাতে সেসব, বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা নাই। সেজই আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অনেক পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক শিডিউলে রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং নিশ্চয় আমরা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কারখানা, সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হল, শোষকগোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।

তৃতীয়, সোশ্যালিজম্–অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ঐগুলো জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হল না, সমাজতন্ত্র হল না, তাদের আগে বুঝা উচিত সমাজতন্ত্র কী। সমাজন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনো তারাও সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয়–অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেকদিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছা যায় এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ– যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি; শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ এক এক পন্থায় সমাজতেন্ত্রর দিকে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হল শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কী আবহাওয়া কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করেনি, সে অন্যদিকে চলেছে। রাশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোশ- াভিয়া, রুমানিয়া, মিশর অন্যদিকে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান দেখা যাবে, ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার নাসেরের মিষর অন্যদিকে চলেছে। বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনোদিন সমাজতন্ত্র হয় না; তা যারা করেছেন, তাঁরা কোনোদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না– যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের রীতিনীতি, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সবকিছু দেখে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম্ এনেছে তারাও সেগুলো করতে পারে নাই–এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা Process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তারপরে আসল ধর্মনিরপেক্ষেতা

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাতকোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করব না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টনরা তাদের ধর্ম পারন করবে তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হল এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নাম জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈশানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যভিচার–এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব সাড়ে সাতকোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।

কোনো কোনো বন্ধু বলেছেন, শিডিউলে এ জিনিস নাই, ও জিনিস নাই। জনাব স্পিকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাস করলেই দেশের মুক্তি হয় না, আইন পাস করলেই দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না। ভবিষ্যৎ বংশধর, ভর্বিষ্যৎ জনসাধারণ কী করে, কীভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে তারই ওপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের সাফল্য, তার কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন যে, সরকারি কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তাঁরা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তাঁরা কোনো ভিন্ন শ্রেণি নন। ইংরেজ আমলেও তাদের প্রটেকশন দেওয়া হতো, সেই প্রকেটশন আবার পাকিস্তান আমলেও দেওয়া হতো। আমলাতন্ত্রের সেই প্রকেটশন এর ওপর আঘাত করেছি, অন্য জায়গায় আঘাত করিনি। এই শ্রেণি রাখতে চাই না, কারণ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আইনের চোখে সাড়ে সাতকোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজদুর কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা হয়। মজদুর কৃষকদের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তাঁরা পেতে পারেন না। সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন, সেবক। Some people came to me and wanted protection from

Dhaka University Institutional Repository

me. I told them, "My people want protection from you, gentlemen." "আমি তাঁদেরকে তাঁদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি। কেউ কেউ শাসনতন্ত্ররে নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত ৯ মাসে কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আরো বেশি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আজ যে কাজ করবে এবং লোকে তাকে কতটুকু ভালোবাসে তার ওপর নির্ভর করবে তার প্রমোশন। প্রমোশনের ব্যাপারে গরিব, অল্প বেতনভোগী গরিব কর্মচারীদেরও অধিকার থাকেব। গরিব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে। আজও বলছি, ভবিষ্যতে তাদের পাশে থাকব। তারা গরিব আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে। আমরা 'সার্ভিসেস রি ওর্গানাইজেশন কমিটি' গঠন করেছি। সেই কমিটির সদস্যদের বলেছি, ড. কামাল হোসেনও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ১২৫টি স্টেপ বা প্রাদেশিক সরকারের ৩৩টি স্টেপ আমরা রাখব না। এই ১২৫ও ৩৩টি স্টেপের মধ্যে যে কত ফাঁক ছিল যার সুবিধা নিয়ে অনেক প্রমোশন হতো। মাত্র ৭ আসমান–অর্থাৎ ৭টি স্তর এর বেশি স্টেপ সরকারি চাকরিতে থাকবে না। এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক গোপনে গোপনে ফুসফাস করছেন এবং এম.সি.এ দের কাছে যাওয়া আসা শুরু করেছি। আমরা ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খানের তমঘা নিয়ে বেড়াইনি। আমরা চোঙা ফুঁকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খানের সেই প্রটেকশন পাবেন তাহলে ভুল করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিথে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যাঁরা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন, যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের খতম কর, ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, তাঁরাই আবার সভা করে উল্টা প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলে সরকারকে ধ্বংস করার জন্যে অফিসগুলোতে দালালে ভরে গিয়েছে। দালাল আছে সত্য। যাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর পাই তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকমন নেওয়া হয়। তারপর আর এক কথা। কাজ না করে টেবিল চেয়ারে বসে থাকা আজকাল যেন একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed. ঐ CSP, PSP, বাংলাদেশে থাকবে না। সরকারি চাকরিতে ৭টি স্তর পরিষদে আসবেন তাঁরা কমিটির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আইন পাস করবেন তখন সব হবে। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে। স্ক্রুটিনি কমিটি করা হয়েছে, সেটা থাকবে। অল্পসময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে। বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। সেটা বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে, বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা বেতন পাবে, কেউ ২ হাজার টাকা পাবে তা হতে পারে না। সকলের বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সবকিছু পাবে, আরেকজন পাবে না- তা হতে পারে না। বেতন কমিশন সরকারি কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতন ঠিক করে দিবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে।

বিরোধী দলের নাম শুনতে পাই। দেশে এরকম কোনো পার্টি আছে কিনা জানি না। নির্বাচনের আগে এরকম কোনো পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না পেয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে যদি তারা ভোট না পায় সে-দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুন, আমরা বিরোধীদল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায়নি তারা বলে আমরা বিরোধীদল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুক আমরা বিরোধীদল। তা না হলে বলুক, এই-এই আমাদের দাবি।

গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্যে ethics মানতে হয়। খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করতে হলে ethics মানতে হবে। তা না হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রে যে অধিকার তা কেবল চেঁচিয়ে বেড়ালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ঠ পাচ্ছে। ২৪ লক্ষ টন খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। রেলওয়ে ব্রিজ নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই। ৬৫ হাজার গ্রামে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।

যারা বিরোধিতা করছেন তাঁরা মেহেরবানি করে যান না, রিলিফ কমিটি করে চাঁদা তুলে একটা গ্রামের কিছুলোককে যদি কিছু কাওয়াইতে পারেন, পাঁচটা লোককে যদি খাওয়াইতে পারেন তাহলেও বুঝি যে দেশের লোকদের জন্য কিছু করছেন। শুধু খবরের কাগজে নাম উঠাবার জন্য বক্তৃতা করে গণতন্ত্র চাই বললে কি হবে? গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও রয়েছে। সেইজন্য শাসনতন্ত্র রচনা করার সময় আমরা ৪টি স্তম্ভ ঠিক রেখেছি। আমি শাসনতন্ত্রের ওপর clause by clause বলতে চাই না। আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেইজন্য, জনাব স্পিকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি তেমনি সেখানে কর্তব্যের কথাও রয়েছে। জনগণের দাবির মধ্যে আছে ভোটের দাবি। গত বৎসর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ছিল ২১ বৎসর, আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বৎসর করেছি। এটাও জনগণের দাবির মধ্যে একটা। আমরা শাসনতন্ত্র প্রদান করেছি, এর ওপর আইন পাস হবে যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভায়েরা ভুর করেছেন, শাসনতন্ত্রের অর্থ আইন নয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইন হয়। আই যে কোনো সময় পরিবর্তন করা যায়। শাসনতন্ত্র একটা জিনিস যার একটা আদর্শ, নীতি থাকে, সেই শাসনতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে আইন পাস করতে হয়। অনেকে ভুল করেছেন, ভুল করে যাচ্ছেন। বলছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝবার মতো আক্কেল নাই তাই বুঝতে পারেন না। সেই মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ এসেম্বলিতে আইন পাস হবে। এই মৌলিক নীতির বিরোধী কোনো আইন হতে পারবে না। শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী, মেহনতী মানুষকে যেন কেউ exploit করতে পা পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী সেইসব শোষকদের অধিকার খর্ব করা হবে। শোষকদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার দাবিও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই সেজন্য তাদের শোকর করা উচিত। আমরা এমন শাসনব্যবস্থা কায়েম করব যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে। সাধারণভাবে যারা দোষী, যারা

দালালি করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারির কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে জেলে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি। আইনের শাসন আমরা মানি। যারা নিরাপরাধ তারা নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সঙ্গে শত্রুতা করেছে তাদের তারা নাগরিক অধিকার দিতে চায় না্ তাদের নাগরিক অধিকার পাওয়া উচিতও নয়, কারণ প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে তারা পাক মিলিটারিকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের দরে, মিলিটারির কাছে দিয়েছে। নানাভাবে তারা দালালি করেছে। স্পিকার সাহেব, এই এসেম্বলিতে যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন তার আশেপাশে এবং এই এসেম্বলির এমন কোনো দেওয়াল নাই যেখানে আমার ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইন সভায় সেসব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। ধরে ধরে হত্যা করেছে। আপনি দেওয়ালের সেইসব দাগ দেখেছেন কিনা জানি না। এই পরিষদের যাঁরা কর্মচারী আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন এখানকার ঘরে–ঘরে, কামরায়-কামরায়, দেওয়ালে রক্তের দাগ। অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে দেওয়ালের গায়ে ‘জয় বাংলা’ লিখে গিয়েছে। এই এসেম্বলির হলের মধ্যে তারা দালালদের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে। নিরপরাধ যারা আছে তাদের খালাস দেওয়া হবে কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের–যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের আসন খানি করিয়ে আচকান গায় দিয়ে উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, ইয়াহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার দেওয়ারও জনগণ আপত্তি করেছে। জনগণ তাঁদের বাইরে পেলে কেটে ফেলত, তাঁদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি। যাই হোক, আমরা সংবিধানের শিডিউলে যা রেখেছি তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বের শাসনকালের কিছু কিছু আইনকে আমরা প্রটেকশন দিয়েছি। সব দেশেই এটা করা হয় থাকে, তা না হলে লিটিগেশন করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলোর প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতগুলো আইন পাস করতে হলে আইন সভায় দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির প্রযোজন হবে, কতগুলো শুধু মেজরিটিতেই পরিবর্তন করা যাবে। এই প্রকার পার্থক্য না রাখলে অসুবিধা হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবে তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি সেইদিন, যেদিন জল্লাদবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের মিত্রবাহিনীর যুক্ত কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল সেই তারিখে। সেই ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকরী করা হবে। সেইদিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পিকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা স্মরণ রাখতে চাই। আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, আপনি ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ মুলতবী করতে পারেন। ১৪ ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে মূল সংবিদানে দস্তখত করবেন। শাসনতন্ত্র বাংলায় হাতে লেখা হচ্ছে তাতে সদস্যরা আপনার সামনে দস্তখত করবেন। ১৪ ও ১৫ তারিখের পর ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

স্পিকার সাহেব, আপনার কাছে আজ আর একটা কথা ঘোষণা করতে চাই। আমি নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি, সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব, আমি আশা করি তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করছি যে, নির্বাচনের তারিখ স্থির করা হোক ঐ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। সেইদিন, যেদিন বাংলাদেমের সাড়ে সাতকোটি মানুষের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছিলাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই ৭ মার্চ বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হবে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সাহায্য করবে বলে আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে এ ব্যাপারে আবেদন করব।

স্পিকার সাহেব, আপনার ধৈর্য আমি আর নষ্ট করতে চাই না। আপনি গত রাত্রে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন, আমিও কিছু সময় এখানে ছিলাম। আপনাকেসহ পরিষদের সকল কর্মচারীতে তাই ধন্যবাদ জানাই, যারা কষ্টের ভিতর কর্তব্য পালন করেছেন। সেইসঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন। আমি যদি সাংবাদিকদের কিছু না বলি তাহলে মহা অন্যায় হবে, তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে বলি আপনারা যে এত কষ্ট করেছেন, এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন–বসবার জায়গা আপনাদের ভালোভাবে দিতে পারি নাই, এই কষ্টের মধ্যে যে ভালোভাবে পরিষদের কার্যবিবরণীর রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেছেন তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ। আশা করি ভবিষ্যতে আরো কয়েক বৎসর কষ্ট স্বীকার করবেন, কারণ নতুন পরিষদ ভবন না নেওয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমারও নাই। আর দেশবাসী যখন কষ্ট করছে তার কিছু ভাগ আমাদেরও নেওয়া উচিত। জনাব স্পিকার সাহেব, এই কক্ষের পক্ষ থেকে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পিকার সাহেব, আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই, তারপর যারা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে শাসনতন্ত্রের জন্য ২/৩ শিফটে কাজ করতে হয়েছে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই ৩৪ জন সদস্যকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন ১১ এপ্রিল তারিখ থেকে সেই ১১ তারিখে আমরা শাসনতন্ত্র কমিটি গঠন করি তখন দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, দলমত নির্বিশেষে আপনাদের কাছে যে কোনো প্রস্তাব হোক বা কোনো মতামত থাকলে মেহেরবানি করে কমিশনের কাছে পাঠাবেন। যদিও তা দু-একটা কেউ দিয়েছেন, কিন্তু যারা খবরের কাগজে বিবৃতি দেন, মাঠে বক্তৃতা করেন, তাঁরা একখানাও দেন নাই। অন্য মানুষদের কাছ থেকে, অধ্যাপকদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি–সেটা সাহায্য করেছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যারা মানেন না, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' যারা এই ধরনের লোক আছেন তাঁরা কষ্ট করে এক কলমও লিখে পাঠান নাই। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক। কথায় আছে জাত যায় না ধুলে, খাসলত যায় না মলে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের বিপদসমূহের কথা যেসব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি; কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন, সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে আমার দল যে ওয়াদা করেছিল তার এক অংশ পালন করল–কিন্তু জনতার শাসনতন্ত্রে কোনোকিছু লেখা হয় না। তারা এটা গ্রহণ না কররে প্রবর্তন করা

হবে না, ব্যবহার না করলে হবে না। ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ গঠন করতে পারে, তাহলে আমার জীবন স্বার্থক। স্পিকার সাহেব, আজ বিদায় নেওয়া হচ্ছে, সদস্যরা আবার সই করতে আসবেন। যাঁরা ৫ বছরের জন্য এখানে এসেছিলেন তাঁরা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিলেন, যে উদারতা দেখালেন তা বিরল। ভবিষ্যতে যাঁরা এখানে আসবেন তাঁরা যেন তা উপলবিদ্ধ করেন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

জাতীয় দিবস উপলক্ষে ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন প্রদত্ত ভাষণ [৯]

আমার প্রিয় দেশবাসী!

আমি আপনাদের আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামীকাল ষোলই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় দিবস। আরও স্পষ্ট কথা বিজয় দিবস। লাখো শহীদের রক্তমাখা এই দিন। লাখো মা-বোনের অশ্রুভেজা এই দিন। আবার সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বপ্ন ও পরম আকাঙ্ক্ষার এই দিন। এই দিন আমরা পরাধীনতার শিকল ভেঙে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সোনার বাংলার মানুষ বিদেশি শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে বড় পবিত্র, বড় বেশি গৌরব ও আবেগমণ্ডিত। এই দিন আমরা শ্রদ্ধা ও শোকের সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, আবার এইদিন এক যুদ্ধ শেষ আর এক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। উনিশ'শ একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি। এই একই দিনে আমাদের দেশ গড়ার সংগ্রাম শুরু। স্বাধীনতা সংগ্রামের চাইতেও দেশ গড়া বেমি কঠিন। দেশ গড়ার সংগ্রামে আরো বেশি আত্মত্যাগ, আরও বেশি ধৈর্য, আরও বেশি পরিশ্রম দরকার। স্বাধীনতার সংগ্রামে আরো বেশি সময় লাগার কথা কিন্তু আমরা যদি একটু কষ্ট করি, একটু বেশি পরিশ্রম করি, সকলেই সৎপথে থেকে সাধ্যমতো নিজের দায়িত্ব পালন করি এবং সবচাইতে বড় কথা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকি তাহলে আমি বিনাদ্বিধায় বলতে পারি ইনশাল্লাহ্ কয়েকবছরেই আমাদের স্বপ্নের বাংলা আবার সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

আমার সংগ্রামী বন্ধুরা,

আজ আপনাদের কাছে আমি হাজির হয়েছি বাণী দেওয়ার জন্যে নয়, ভাষণ দেয়ার জন্যে নয়, হাজির হয়েছি কথা বলার জন্যে। দু-বছর আগে কী নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম? চারিদিকে অসংখ্য নরকঙ্কাল, শহীদ বুদ্ধিজীবীর লাশ, বীরাঙ্গনা মা-বোনের আর্ত-হাহাকার, অচল কলকারখানা, আইন-আদালত, শূন্য ও বিধ্বস্ত, ব্যাংকে তালা, ট্রেজারি খালি, রেলের চাকা বন্ধ, রাস্তাা ব্রিজ ধ্বংস, বিমান ও জাহাজ একখানাও নেই। যুদ্ধের জন্যে অনেক ক্ষেতে ফসল বোনা সম্ভব হয়নি, পাট ঘরে ওঠেনি, নৌকা, স্টীমার, লঞ্চ, বাস, লরি, ট্রাকের শতকরা সত্তর ভাগ হয় নষ্ট, না হয় অচল। অনেকের হাতে তখন অস্ত্র। তাদের মধ্যে আছে বহু দুষ্কৃতকারী। আমাদের প্রয়োজনীয় সৈন্য ছিল না। পুলিশ ছিল না। জাতীয় সরকারের কাজ চালাবার মতো দক্ষ অফিসারও ছিল না। তখন পাকিস্তানে বন্দী কয়েক লাখ বাঙালি। ভারত থেকে ফিরে আসছে প্রায় এক কোটি বাঙালি উদ্বাস্তু যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদারদের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করেছিল। তখনই দরকার এদের জন্যে রিলিফ, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। ক্ষুধার্ত বাঙালিকে বাঁচানোর জন্যে চাই অবিলম্বে খাদ্য। ঔষধ চাই, কাপড় চাই, চারদিকে এই চাই-চাই আর নাই-নাই এর মধ্যে

৯. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১৩১

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের যাত্রা শুরু। উনিশ'শ একাত্তর থেকে ঊনিশ'শ তিয়াত্তর সময় হিসাবে মাত্র দু-বছর। এই দু-বছরে আমরা কী পেয়েছি আর কী পাই নাই, আজ তারও খতিয়ান এবং আত্মবিশে- ষণের দিন। আমি বড় দাবি করি না। আমরা কোনো ভুল করি নাই বা কোনো কাজে ত্রুটি করি নাই এমন কথা বলি না। শুধু অনুরোধ করব আপনাদের চারপাশে পৃথিবীর আরো অনেক দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমেরিকা পৃথিবীর সবচাইতে ধনী দেশ। এই আমেরিকায়ও স্বাধীনতা লাভের পর দুই-দুইটি গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আজকের অবস্থায় পৌঁছতে আমেরিকার সময় লেগেছে প্রায় একশ বছর। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তুলতে ত্রিশ বৎসর প্রত্যেকটি মানুষকে একটানা কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। সোভিয়েত বিপ্লবের পর প্রথম পাঁচবছরে দুর্ভিক্ষে মারা গেছে অসংখ্য লোক। সমাজতন্ত্রের শত্রু অসংখ্য লোককে প্রাণদ দিতে হয়েছে। নয়া চীন সমাতন্ত্রী বিপ্লবের পঁচিশ বছর পরও এখনো খাদ্যে আত্মনির্ভর হয়নি। শ্রমিকদের অল্প মজুরি এবং বছরে দুই প্রস্থ কাপড় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমাদের প্রতিবেশী মিত্ররাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে এখনো চলছে গরীবি হটাও আন্দোলন।

পৃথিবীর এইসব বড় বড় দেশের পাশাপাশি এই ছোট এবং গরিব বাংলাদেশের কথা বাঙালি হয়ে একবার ভেবে দেখুন। বিপ্লবের পর স্বাধীনতার শত্রু হিসাবে যারা অভিযুক্ত হয়েছিল তাদেরও আমরা হত্যঅ করি না, ক্ষমা করেছি। দুর্ভিক্ষে যাতে মানুষ না মরে তার চেষ্টা করেছি। ভিক্ষা করে হলেও বিদেশ থেকে খাদ্য এনেছি। বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল খালি ছিল। তবু পরনের কাপড়, রোগ ঔষধ আমদানিও চেষ্টা করেছি। এক কোটি উদ্বাস্তুকে ছ-মাসে পুনবার্সনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে যতটা সম্ভব রিলিফ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। সবচাইতে কম সময়ে ভাঙা রাস্তা, রেল-ব্রিজ মেরামত করা হয়েছে। পাকিস্তানিরা যে সারা ব্রিজ ও ভৈরব সেতু ভেঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা খতম করতে চেয়েছিল তা আবার তৈরি করা হয়েছে। আমি জানি না রক্তাক্ত বিপ্লবের পর পৃথিবীর আর কোনো দেশে সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন চালু করা হয়েছে কিনা। আমার জানা মতে হয়নি। বাংলাদেশে তা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিপ্লবের এক বৎসরের মধ্যে সংবিধান তৈরি করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে। ভোট দেওয়ার বয়স একুশের বদলে আঠারো বদলে আঠারো বৎসর করে ভোটাধিকারের সীমা বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব বিমান উড়ছে দেশ-বিদেশের আকাশে, তৈরি হয়েছে নিজস্ব বাণিজ্য জাহাজ বহর। বিডিআর সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত, স্থলবাহিনী মাতৃভূমির উপর যেকোনো হামলা প্রতিরোধে প্রস্তুত। গড়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব নৌ ও বিমানবাহিনী, থানা ও পুলিশ সংগঠনের যে ৭০ ভাগ পাকিস্তানিরা নষ্ট করেছিল, এখন আবার তা গড়ে উঠেছে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সরকার এখন আরো নজর দিতে পারবে। একটা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে আবার গড়ে তোলার ব্যাপারে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আমাদের সাফল্য যেমন আছে, তেমনি আছে ভুলভ্রান্তি। কিন্তু মাত্র দু-বছরে ভুলভ্রান্তির তুলনায় বাংলাদেশের সাফল্য ও অগ্রগতি আপনারা নিজেরা নিজেদের মনে একবার বিবেচনা করে দেখুন এই আমার অনুরোধ এই ভাঙ্গা দেশকে গড়ার কাজে আমি আপনাদের কিছু দিতে পারব না। তবু তিন বছরের দু-বছরই আমাদের চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

কতটা আন্তরিক ছিল আপনারাই তা বিবেচনা করে দেখবেন। বিপ্লবের পর আপনারা যে বিপুল আস্থা ও সমর্থন আমাকে দিয়েছেন তাতে রেজিমেন্টেশনের পথে দেশের মানুষের মুখ বন্ধ করে উন্নতির পন্থা আমি গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম আপনাদের সম্মতি ও নির্দেশ নিয়ে এই দেশের ভাগ্য ফেরাতে, দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে। দেশের সকল ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসা এখন আপনাদের। কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৮০% ভাগ মালিক আপনারা। এখন উৎপাদন বাড়িয়ে সকলে মিলে কাজ করে এ কথাটাই বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে হবে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার পবিত্র আমানত রক্ষার উপযুক্ত। সে তার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রয়োগেও সক্ষম, গণতন্তের অর্থ যা খুশি বলা বা করা নয়। আমাদের দেশের একশ্রেণীর লোক আছেন যারা শুধু অসন্তোষ প্রচার করেন। কিন্তু আত্মসমালোচনা করে না। বাংলাদেশকে আমরা যদি প্রকৃতই একটি শান্তিকামী শোষণমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকের আত্মসমালোচনা আত্মসংম ও আত্মশুদ্ধির মনোভাব গ্রহণ করা দরকার।

প্রিয় বন্ধুরা,

ষোলই ডিসেম্বরের সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যথা, বেদনা আনন্দ গৌরব এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত। এইদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রায় একলাখ পাকিস্তানি শত্রু আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরো শক্তিশালী শত্রু, এই শত্রু হল অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা বেকারী ও দুনীর্তি। এই যুদ্ধের জয় সহজ নয়। অবিরাম এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং একটি সুখী, সুন্দর অভাবমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তবেই হবে আপনাদের সংগ্রাম সফল, আপনাদের শেখ মুজিবের স্বপ্ন ও সাধনার সমাপ্তি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি বছর ছিল ভাঙা দেশটাকে কোনোরকমে খাড়া করার সময়। এই সময় সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন প্রায় এককোটি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ও দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর জন্যে। এই একবছরে আমরা আমাদের বন্ধু-দেশগুলো থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তা আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ সংস্থা এমনকি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলেরও আমরা সদস্য। তাতেই প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আজ বাংলাদেশের পাশে, স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে বড় বড় শিল্প কারখানা জাতীয়করণ হয়েছে। ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা সরকারের মালিকানায় আনা হয়েছে। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা তুলে নেয়া হয়েছে। এটাকে আমরা বলতে পারি শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরনের চেষ্টা। ফলে বাংলাদেশে ধীর গতিতে হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্যাটার্ন বদলাতে চলেছে। একটা কৃষিনির্ভর আধা-সামন্ত সামাজিক অবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার চেষ্টায় আমরা নিযুক্ত রয়েছি। তবু বলব আমরা রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছি। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারিনি। আমাদের এবারের সংগ্রাম-অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম। আমি যে সুখী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি এবং দুঃখ নির্যাতন বরণ করেছি সেই বাংলাদেশ এখনো আমার স্বপ্ন রয়ে গেছে। গরীব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন হাসি না ফুটবে, ততদিন আমার

Dhaka University Institutional Repository

মনে শান্তি নাই। এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশের কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে। তাই আসুন, এইদিনে অভাব দারিদ্র্য রোগ শোক ও জরার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম ঘোষণ করি। সংগ্রাম ঘোষণা করি চোরাচালানি, কালোবাজারি, অসৎ ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে সোনার বাংলা গড়ার কাজ সফল হবে না। আর সোনার বাংলা গড়তে না পারলে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি যে স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সেই স্বাধনীতাও অর্থহীন হয়ে যাবে। স্বাধীনতা লাভের পরেও সমাজ-দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অন্যায় অবিচার ও শোষণের লীলাখেলা দুর্নীতির রাজত্ব তাকে উৎখাত করতেই হবে। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য চিরদিন আপনাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছি। আজও আমি আপনাদের সহযোদ্ধা হিসাবে আপনাদের পাশে আছি। দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

বন্ধুগণ,

স্বাধীনতার প্রথম বৎসরে আমরা অনেক কঠিন কাজ শেষ করার চেষ্টা করেছি। একদিকে ঝড়-বন্যার তা᳴ব, অন্যদিকে জিনিসপত্রের অভাব তবু সরকার পূর্ণোদ্যমে রিলিফ ও টেস্ট রিলিফের কাজ চালিয়েছে। বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের কাজ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্ট ও কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, থানা রাস্তা ব্রিজ হাসপাতাল মেরামত করা হয়েছে। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন আবার গড়ে তোলা হয়েছে। সারাদেশের ছড়িয়ে থাকা অস্ত্র প্রায়ই উদ্ধার করা হয়েছে। মোটামুটি বিচারব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বন্দর ও পোতাশ্রয় থেমে মাইন অপসারণ করা হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলওয়ে, বিমানবন্দর চালু করা হয়েছে। এক বছরেই একটি সংবিধান দেয়া হয়েছে এবং সেই সংবিধানের আওতায় নতুন সাধারণ নির্বাচন করা হয়েছে। এই সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ ছিল বারশত কোটি টাকার উপর।

১৯৭২ এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ এর ১৬ ডিসেম্বর, এই এক বৎসরের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য কম নয়। এই সময়টা আমাদের সংবিধান চালু করার কাল। এই সময় ভৈরব সেতু হওয়ার ফলে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটা বড় অসুবিধা দূর হয়েছে। উপমহাদেশের উত্তেজনা দূর করার জন্য দিল্লি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পাকিস্তানে আটক বাঙালিরা স্বদেশে ফিরতে শুরু করেছেন। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৪ হাজারেরও বেশি বাঙালি দেশে ফিরে এসেছে। আমাদের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ শুরু হলে বাংলাদেশের শুধু অর্থনীতিতে নয় সামাজিক অবস্থাতে একটা বড় পরিবর্তন হবে বলে আশা করি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার মর্যাদার নিজস্ব আসনটি দখল করেছে। অটোয়ার কমনওয়েলথ এবং আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্মানিত সদস্য হিসাবে যোগ দিয়েছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীরূপে আমি যুগোশ-াভিয়া ও জাপান সফর করেছি। সেখানেও দেখেছি বাংলাদেশের জন্য তাদের আন্তরিক ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশকে গ্রহণ করে অধিকাংশ আরব ও আফ্রিকান দেশ তার সার্বভৌমত্বের প্রতি স্বীকৃতি ও

Dhaka University Institutional Repository

সম্মান প্রদর্শন করে। আরব দেশগুলির মধ্যে মিশর, ইরাক, মরক্কো, তিউনিশিয়া, আলজিরিয়া, কুয়েত, ইয়েমেন, লেবানন, সিরিয়া, সুদান ও জর্দান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সম্প্রতি আরব-ইজরাইল যুদ্ধেও বাংলাদেশ আরব দেশগুলির দিকে সংগ্রামী সাহায্যের হাত বাড়ায়ে দিয়েছে। ফলে আরব দেশগুলির জনসাধারণ বাংলাদেশকে প্রকৃত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে। বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সকল দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ শুধু নিজেই মুক্তিসংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে ক্ষান্ত নয়। বিশ্বের যেকোনো নিপীড়িত দেশ ও মুক্তিসংগ্রামীদের পাশে আমরা রয়েছি। দক্ষিণ ভিয়েতনামী বিপ্লবী সরকার ও গিনি বিসাউকে আমরা স্বীকৃতি প্রদান করেছি। বাংলাদেশের রফতানির বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমরা যদি উৎপাদন বাড়াতে পারি, তাহলে বিনাদ্বিধায় এই আশ্বাস আমি দিতে পারি যে, আমাদের আমদানি নির্ভর অর্থনীতির প্যাটার্ন খুব শীঘ্রই পাল্টে যাবে এবং জিনিসপত্রের দাম কমানো সম্ভব হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

মাত্র দুই বছরে আমরা কী করতে পেরেছি না পেরেছি আপনারা বিচার করে দেখবেন। দেশে জিনিসপত্রের অসম্ভব চড়া দামের ফলে আপনাদের যে কষ্ট তা আমি জানি। এই মূল্যবৃদ্ধি শুধু বাংলাদেশেই ঘটেনি সারাবিশ্বে চলেছে এই মূল্যবৃদ্ধির হিড়িক। শ্রমিক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, মিলে-কারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে শিল্প বিপ্লব সফল করে তুলুন। কৃষক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, বাংলাদেশকে খাদ্যে আত্মনির্ভর করে তুলুন। ছাত্র ও যুবশক্তির প্রতি আমার অনুরোধ, নিজেদের প্রকৃত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোল। ব্যবসায়ীদের প্রতি আমার অনুরোধ, অতি মুনাফার লোভ সামলান। ব্যবসাকেও দেশসেবার অঙ্গ করে তুলুন। সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ, দায়িত্ব পালনে আরো মন দিন। প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করুন। শিক্ষক সাংবাদিক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতি আমার আবেদন, দেশ গড়ার সংগ্রামে আপনারাও কিছুটা অংশ নিন।

যারা ধ্বংস করে ধ্বংসাত্মক চেষ্টা চালায় তারা শুধু সরকারের শত্রু নয় দেশ ও জনগণের শত্রু। তারা যে সম্পদহরণ করে ধ্বংস করে তা জনগণের সম্পত্তি। কোনো পুঁজিপতি বা ব্যক্তিমালিকের সম্পত্তি নয়। বিপ্লবের নামে যারা উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারে মাতেন তারা বিপ্লবের মিত্র নন, জনগণেরও বন্ধু নয়। আপনারাও এই গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যারা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসাবে স্বাভাবিক জীবনযাপনে আবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি অন্যের প্ররোচনায় যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন তারা অনুতপ্ত হলে তাদেরও দেশ গড়ার সংগ্রামে অংশ নেবার সুযোগ দেয়া হবে।

বন্ধুগণ, আমরা ইতিহাসের একটি বিরাট সংকটকাল অতিক্রম করেছি। এসময় দরকার ধৈর্য আত্মত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম করার মনোভাব। বাংলাদেশ তিনশত বছর লুণ্ঠিত ও শোষিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এর সমাজ ও অর্থনীতিতে হাজারও সমস্যা। রাতারাতি তা দূর করা যাবে না। সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই। আর সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের ভাবি বংশধরদের এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত উপহার দিতে হবে। আগামীকাল ১৬ই ডিসেম্বর, পবিত্র জাতীয় দিবস। আসুন আমরা সকলে মিলে দেশ গড়ার সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করি।

খোদা হাফেজ, জয়বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা [১০]

আমার ভাই ও বোনেরা!

আজ ২৬ মার্চ ১৯৭৫ সাল। একাত্তুরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী বাংলার মানুষকে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার লাখ লাখ লোককে হত্যা করেছিল। সেদিন রাতে বিডিআর এর ক্যাম্পে পুলিশ ক্যাম্প, আমার বাড়িতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চারিদিকে আক্রমণ চালায় ও নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক শক্তি নিয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম; ৭ মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে আবার আমি ডাক দিয়েছিলাম যে, আর নয়, মোকাবেলা কর। বাংলার মানুষ যে যেখানে আছে, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা কর। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীন করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি সাহায্য চেয়েছিলাম। আমার সামরিকবাহিনীতে যারা বাঙালি ছিল, আমার বিডিআর, আমার পুলিশ, আমার ছাত্র, যুবক ও কৃষকদের আমি আহ্বান করেছিলাম। বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে মোকাবিলা করেছিল। ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছিল, শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। দুনিয়ার জঘন্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানি শোষকশ্রেণী। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত স্বাধীনতার জন্য কোনো দেশ দেয় নাই, যা বাংলার মানুষ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা এমনভাবে পঙ্কিলতা শুরু করল, যা কিছু ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছিল। ভারতে আমার এককোটি লোক আশ্রয় নিয়েছিল; তার জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। আমি তাদের কথা স্মরণ করি খোদার কাছে মাগফেরাত কামনা করি, যারা এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে। আমি তাদের কথা স্মরণ করব যে সকল মুক্তিবাহিনীর ছেলে, যেসব মা-বোনেরা আমার যে কর্মীবাহিনী যারা আত্মাহুতি দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। এদেশ তাদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। আজ আমি স্মরণ করি ভারতীয় সেনাবাহিনীর যারা জীবন দিয়েছিল বাংলার মাটিতে। তাদের কথাও আমি স্মরণ করি।

একটা কথা আপনাদের মনে আছে, তারা যাবার পূর্বে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে ১৬ ডিসেম্বরের আগে, কারফিউ দিয়ে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করব, সম্পদ ধ্বংস করব, বাঙালি স্বাধীনতা পেলেও এই স্বাধীনতা রাখতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা হয়েছে। বাংলার লোক স্বাধীন হয়েছে।

---

১০. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-২০৭

বাংলার পতাকা আজ দুনিয়ায় ওড়ে। বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ আজ জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য, কমনওয়েলথ-এর সদস্য, ইসলামী সামিট (summit)-এর সদস্য। বাংলাদেশ দুনিয়ায় এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না। ভায়েরা, বোনেরা আমার, আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি জীবন দিয়ে হলেও সে-ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমরা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি, আমরা কো-একজিস্টেনসে (co-existence) বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানিরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে, আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাফ করেছি, তাদের আমি বিচার করিনি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এইজন্য যে এশিয়ার দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানিরা আমার সম্পদ এক পয়সাও দিল না, আমার বৈদেশিক মুদ্রার কোনো অংশ আমাকে দিল না। আমার গোল্ড রিজার্ভের কোনো অংশ আমাকে দিল না। একখানা জাহাজও আমাকে দিল না। একখানা প্লেনও আমাকে দিলনা। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ একপয়সাও আমাকে দিল না এবং যাবার বেলায় পোর্ট ধ্বংস করলো, রাস্তা ধ্বংস করলো, রেলওয়ে ধ্বংস করল জাহাজ ডুবিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কারেনসি নোট জ্বালিয়ে বাংলাদেশকে ধবংস করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানিরা মনে করেছিল যে, বাংলাদেশকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে আমরা দেখাতে পারব যে, তোমরা কী করেছ।

ভুট্টো সাহেব বক্তৃতা করেন। আমি তাকে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম, লাহোরে আমাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল বলে। ভুট্টো সাহেব বলেন, বাংলাদেশের অবস্থা কী? ভুট্টো সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ফ্রন্টিয়ারের পাঠানদের অবস্থা কী? ভুট্টো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, বেলুচিস্তানের মানুষের অবস্থা কী? এরোপ্লেন দিয়ে গুলি করে মানুষ হত্যা করছেন। সিন্ধুর মানুষের অবস্থা কি? ঘর সামলান বন্ধু, ঘর সামলান। নিজের কথা চিন্তা করুন, পরের জন্য চিন্তা করবেন না। পরের সম্পদ লুট করে খেয়ে বড় বড় কথা বলা যায়। আমার সম্পদ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। তোমরা আমার কী করেছ? আমি সবার বন্ধুত্ব কামনা করি। পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নাই কিন্তু আমার সম্পদ তাকে দিতে হবে। আমি দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই, কারো সঙ্গে দুশমনি করতে চাই না। সকলের সাথে বন্ধুত্ব করে আমরা শান্তি চাই। আমার মানুষ দুঃখী, আমার মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে আসলাম, তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাঙ্কে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না, শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম। আমাদের গুদামে খাবার ছিল না। গত তিন-চার বছরে না হলেও বিদেশ থেকে ২২ কোটি মণ খাবার বাংলাদেশে আনতে হয়েছে। ২২শ কোটি টাকার মতো বিদেশ থেকে হেল্প আমরা পেয়েছি, সেজন্য যারা আমাদের সাহায্য করছেন সে-সমস্ত বন্ধুরাষ্ট্রকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আর একটি কথা। অনেকে প্রশ্ন করেন আমরা কী করেছি? আমরা যখন ক্ষমতায় আসলাম, দেশের ভার নিলাম তখন দেশের

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তাঘাট যে-অবস্থায় পেলাম তাকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করলাম। সেনাবাহিনী নাই প্রায় ধ্বংস করে গেছে; পুলিশ বাহিনীর রাজারবাগ জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেই খারাপ অবস্থা থেকে ভালো করতে কী করি নাই? আমরা জাতীয় সরকার গঠন করলাম। আমাদের এখানে জাতীয় সরকার ছিল না, আমাদের ডিফেন্স ছিল না, প্লানিং ডিপার্টমেন্ট ছিল না। এখানে কিছুই ছিল না, তার মধ্যে আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে হল। যারা শুধু কথা বলেন তারা বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বলুন, আমরা কী করেছি। এককোটি লোককে ঘরবাড়ি দিয়েছি। রাষ্ট্রের লোককে খাওয়ানোর জন্য বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়েছে। পোর্টগুলোকে অচল থেকে সচল করতে হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২ কোটি মণ খাবার এনে বাংলার গ্রামে গ্রামে দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হয়েছে।

তাই আজ কথা আছে। আমি মানুষকে বললাম, আমার ভাইদের বললাম, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বললাম, তোমাদের অস্ত্র জমা দাও। তারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু একদল লোক আমার জানা আছে যাদের পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল তারা অস্ত্র জমা দেয়নি। তারা এসব অস্ত্র দিয়ে নিরপরাধ লোককে হত্যা করল। এমনকি পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকে হত্যা করল। তবু আমি শাসনতন্ত্র দিয়ে নির্বাচন দিলাম। কিন্তু যদি বাংলার জনগণ নির্বাচনে আমাকেই ভোট দেয় সেজন্য দোষ আমার নয়। ৩১৫ জন সদস্যের ৩০৭ সিট বাংলার মানুষ আমাকে দিলেন। কিন্তু একদল লোক বলে, কেন জনগণ আমাকে ক্ষমতা দিল? কোনোদিন কোনো দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কেউ কাউকে এভাবে অধিকার দেয় না। কিন্তু অধিকার ভোগ করতে হয়ে তার জন্য যে রেস্পনসিবিলিটি আছে সেটা তারা ভুলে গেলেন। আমি বললাম তোমরা অপজিশন সৃষ্টি করো, সৃষ্টি করল। বক্তৃতা করতে আরম্ভ করল। অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করল। দরকার হলে অস্ত্র দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করতে চায়। অস্ত্রের হুমকি দেয়া হল। মানুষ হত্যা থেকে আরম্ভ করে রেললাইন ধ্বংস করে, ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে এমন সৃষ্টি করল যাতে বিদেশি এজেন্টরা যারা দেশের মধ্যে আছে তারা সুযোগ পেয়ে গেল। আমাদের কর্তব্য মানুষকে বাঁচানো। চারদিকে হাহাকার, স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের দাম আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। সমস্ত দুনিয়া থেকে আমাদের কিনতে হয়। খাবার কিনতে হয়, কাপড় কিনতে হয়, ওষুধ কিনতে হয়, তেল কিনতে হয়। আমরা তো কলোনি ছিলাম, দুইশ' বছর ইংরেজদের কলোনি ছিলাম, পঁচিশ বছর পাকিস্তানের কলোনি ছিলাম। জনগণ কষ্ট স্বীকার করে কাজ করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তারা এগুবার দেয় না, কাজ করতে দেয় না। আর একদল বিদেশে সুযোগ পেল। তারা বিদেশ থেকে অর্থ এনে বাংলার মাটিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করল। আজ এদিনে কেন বলছি, একথা? অনেক বলেছি, এত বলার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার চোখের সামনে ভাসে, আমারই মানুষেরই আত্মা আমার চোখের সামনে সে-সমস্ত শহীদ ভাইরা ভাসে যারা ফুলের মতো ঝরে গেল, শহীদ হল। তাদের আত্মার কাছে, রোজ কেয়ামতে কী জবাব দিব 'আমরা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করলাম তোমরা স্বাধীনতা নস্যাৎ করেছ, তোমরা রক্ষা করতে পার নাই।'

Dhaka University Institutional Repository

কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য। কথা হল এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, অফিসে যেয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়, ফ্রি স্টাইল। ফ্যাক্টরিতে যেয়ে কাজ না করে টাকা দাবি করে। সাইন করিয়ে নেয়। যেন দেশে সরকার নাই। স্লোগান হলঃ বঙ্গবন্ধু কঠোর হাও।

বঙ্গবন্ধু কঠোর হবে। কঠোর ছিল, কঠোর আছে। কিন্তু দেখলাম, চেষ্টা করলাম। এত রক্ত, এত ব্যথা দুঃখ, দেখি কী হয় পারি কিনা। আবদার করলাম। আবেদন করলাম, অনুরোধ করলাম, রিকোয়েস্ট করলাম, কামনা করলাম। 'চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী।' ভাইয়েরা, বোনেরা আমার, আজকে যে সিস্টেম করেছি তার আগেও ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর কম ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না ক্ষমতা বন্দুকের নলে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে, 'বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও' বঙ্গবন্ধু একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধামন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীন সমাজ কায়েম করার জন্য।

দুঃখের বিষয়, তারা রাতের অন্ধকারে পাঁচজন পার্লামেন্ট সদস্যকে হত্যা করেছে, তিন-চার হাজারের মতো কর্মীকে হত্যা করেছে। আরেক দল দুর্নীতিবাজ টাকা-টাকা, পয়সা-পয়সা করে পাগল হয়ে গেছে। তবে যেখানে খালি দুর্নীতি ছিল গত দুই মাসের মধ্যে সেখানে ইনশা-আল্লাহ কিছুটা অবস্থা ইম্প্রুভ করেছে। দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আজকে কিছু করা হয়েছে। হাঁ, প্রেসিডেন্সিয়াল ফরম অব গভর্নমেন্ট করেছি। জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন। পার্লামেন্ট থাকবে। পার্লামেন্টের নির্বাচনে একজন দুইজন তিনজনকে নমিনেশন দেয়া হবে। জনগণ বাছবে কে ভালো কে মন্দ। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র, আমরা চাই না শোষকের গণতন্ত্র, এটা পরিষ্কার।

আমি প্রোগ্রাম দিয়েছি। আজকে আমাদের সামনে কাজ কী? আজকে আমাদের সামনে অনেক কাজ। আমি সকলকে অনুরোধ করব। আপনারা মনে কিছু করবেন না, আমার কিছু উচিত কথা কইতে হবে। কারণ আমি কোনোদিন ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। সত্য কথা বলার অভ্যাস আমার আছে। মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার নাই। কিন্তু কিছুটা অপ্রিয় কথা বলব। বন্যা হল। মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেল, হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরে গেল। দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনলাম। ৫,৭০০ (পাঁচ হাজার সাতশ) লঙ্গরখানা খুললাম মানুষকে বাঁচাবার জন্য। সাহায্য নিয়েছি মানুষকে বাঁচাবার জন্য। সাহায্য নিয়েছি মানুষকে বাঁচাবার জন্য। আমি চেয়েছিলাম স্বাধীনতা? কি স্বাধীনতা? আপনাদের মনে আছে, আমার কথার মধ্যে দুইটা কথা ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেটভরে ভাত খেতে না পারে, কাপড় পরতে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তাহলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না। আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব-াকমার্কেটিং করে সে

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারা দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। আমি কেন ডাক দিয়েছি? এই ঘুণধরা ইংরেজ আমলের, পাকিস্তানি আমলের যে শাসনব্যবস্থা তা চলতে পারে না। একে নতুন করে ঢেলে সেজে গড়তে হবে। তাহলে দেশের মঙ্গল আসতে পারে, না হলে আসতে পারে না। আমি তিন বছর দেখেছি। দেখেশুনে আমি আমার স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছি। এবং তাই জনগণকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে শাসনতন্ত্রের মর্মকথা।

আজকে জানি, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি জানি, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। আমার চেয়ে অধিক কে জানতে পারে? বাংলার কোন্ থানায় আমি ঘুরি নাই, বাংলার কোন জায়গায় আমি যাই নাই, বাংলার মানুষকে আমার মতো কে ভালো করে জানে?

আপনারা দুঃখ না পান, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, আপনাদের গায়ে কাপড় নাই, আপনাদের শিক্ষা দিতে পারছি না। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস খাদ্য।

দুর্নীতিবাজদের খতম করুন

একটা কথা বলি আপনাদের কাছে–সরকারি আইন করে কোনোদিন দুর্নীতিবাজদের দমন করা সম্ভব নয় জনগণের সমর্থন ছাড়া। আজকে আমার একমাত্র অনুরোধ আপনাদের কাছে সেটা হল এই-আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে জেহাদ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। আজকে আমি বলব বাংলার জনগণকে এক নম্বর কাজ হবে, দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। কেমন করে করতে হবে। আইন চালাব ক্ষমা করব না। যাকে পাব ছাড়ব না। একটা কাজ আপনাদের করতে হবে। গণআন্দোলন করতে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে নামব। এমন আন্দোলন করতে হবে, যে ঘুষখোর, যে দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চোরাচালান দেয় তাদের সামাজিক বয়কট করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে মিটিং করে দেখতে হবে, কোথায় ঐ চোর, ঐ ব- াকমার্কেটিয়ার, ঐ ঘুষখোর। ভয় নাই, কোনো ভয় নাই, আমি আছি। ইনশাআল্লাহ আপনাদের উপর অত্যাচার করতে দিব না। কিন্তু আপনাদের গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন করতে পারে কে? ছাত্রভাইরা পারে, পারে কে? যুবকরা পারে। পারে কে? বুদ্ধিজীবীরা পারে। পারে কে? জনগণ পারে। আপনারা সংঘবদ্ধ হন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়তে হবে। সে-দুর্গ গড়তে বে দুর্নীতিবাজদের খতম করার জন্য বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করার জন্য। এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এত চোরের চোর, এই চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে তা জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গিয়েছে কিন্তু এই চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে তা জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গিয়েছে কিন্তু এই চোরা তারা নিয়ে গেল বাঁচতাম। এই চোর রেখে গিয়েছে। কিছু দালাল গিয়েছে, চোর গেলে বেঁচে যেতাম।

Dhaka University Institutional Repository

জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করুন

দ্বিতীয় কথা, আপনারা জানেন-আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারব না। দ্বিগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। ভিক্ষা করতে হবে না।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার,

ভিক্ষুক-জাতির ইজ্জত নাই। একটা লোককে আপনারা ভিক্ষা দেন এক টাকা কি আটআনা। তারপর তার দিকে কীভাবে চান, বলেন "ও বেটা ভিক্ষুক, যা বেটা, নিয়ে যা আট আনা পয়সা।"- একটা জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে, আমারে খাবার দাও, আমারে টাকা দাও-সেই জাতির ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি সেই ভিক্ষুক-জাতির নেতা থাকতে চাই না।

আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষকভাইয়ের কাছে যারা সত্যিকার কাজ করে যারা প্যান্ট পরা কাপড় পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই-জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহীদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি, আমাদের অভাব ইনশাআল্লা হবে না। ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হবে না। আমি পাগল হয়ে যাই চিন্তা করে। এ বৎসর ৭৫ সালে আমাকে ছয়কোটি মণ খাবার আনতে হবে। কী করে মানুষকে বাঁচাব? কী করে অন্যান্য জিনিস কিনব? অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য দিচ্ছে বলে বেঁচে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসাবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

ভাইয়েরা আমার,

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ বাড়ে তাহলে ২৫–৩০ বছরে বাংলায় কোনো জমি থাকবে না চাষ করার জন্য। বাংলার মানুষে বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেজন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্লানিং করতে হবে। এটা হল ৩ নম্বর কাজ। এক নম্বর হল–দুর্নীতিবাজ খতম কর, দুই নম্বর হল–কারখানায় ক্ষেতে খামারে প্রোডাকশন বাড়ান, তিন নম্বর হল–পপুলেশন প্লানিং, চার নম্বর হল–জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাকে ভালোবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে সৎপথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবেন, যারা বেদিশী এজেন্ট যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নাই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারে। কারণ তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের দসদ্য হওয়ার। এইজন্য সকলে যে যেখানে আছি একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় দলের ব্রাঞ্চ

ভায়েরা, বোনেরা আমার,

এই জাতীয় দলের আপাতত ৫টা ব্রাঞ্চ হবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই ৫টা অঙ্গদল মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ। আমাকে অনেকে বলে, কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ হলে আমাদের কী হবে। আমি বলি আওয়ামী মানে তো জনগণ, ছাত্র, যুবক, শিক্ষিত সমাজ, সরকারি কর্মচারী সকলে মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

শিক্ষিত সমাজকে আমি অনুরোধ করব, আমরা কতজন শিক্ষিত লোক, আমরা শতকরা ২০ জন শিক্ষিত লোক। তার মধ্যে সত্যিকার অর্থে আমরা শতকরা পাঁচজন শিক্ষিত। শিক্ষিতদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন। আমি যে এই দুর্নীতির কথা বললাম, আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না, আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব-াকমার্কেটিং করে কারা? বিদেশি এজেন্ট হয় কারা? বিদেশে টাকা চালান দেয় কারা? হোর্ড করে কারা? এই আমরা, শতকরা ৫ জন শিক্ষিত। এই আমাদের মধ্যেই ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। আমাদের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে। আত্মশুদ্ধি করতে হবে। দুর্নীতিবাজ এই শতকরা ৫ জনের মধ্যে, এর বাইরে নয়। শিক্ষিত সমাজকে একটা কথা বলব, আপনার চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। একজন কৃষক যখন আসে খালিপায়ে লুঙি পরে, আমরা বলব এই বেটা কোত্থেকে আইছিস? বাইরে বয়, বাইরে বয়। একজন শ্রমিক যদি আসে, বলি, এখানে দাঁড়া। এই রিকশাওয়ালা, ঐভাবে বসিস না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বল। তুচ্ছ করে। এর পরিবর্তন করতে হবে। আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনা দেয় গরিব কৃষক আপনার মাইনা দেয় ঐ গরিব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়। আমরা গাড়ি চড়ি ঐ টাকায় ওদের সম্মান করে কথা বলুন। ইজ্জত করে কথা বলুন, ওরাই মালিক, ওদের দ্বারাই আপনার সংসার চলে। সরকারি কর্মচারিদের বলি, মনে রেখো এটা স্বাধীন দেশ। এটা ব্রিটিশের কলোনি নয় পাকিস্তানের কলোনি নয়। যে লোককে দেখবে তার চেহারাটা তোমার বাবার মতো তোমার ভায়ের মতো, ওরই পরিশ্রমের পয়সা, ওরাই সম্মান বেশি পাবে। কারণ ওরা নিজেই কামাই করে খায়। একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি কিছু মনে করবেন না, আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? ডাক্তারি পাস করায় কে? ইনজিনিয়ারিং পাস করায় কে? সায়েন্স পাস করায় কে? বৈজ্ঞানিক করে কে? অফিসার করে কে? কার টাকায়?

বাংলার দুঃখী জনগণের টাকায়। একজন ডাক্তার হতে সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। একজন ইনজিনিয়ার করতে একলাখ হতে সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। বাংলার জনগণ গরিব। কিন্তু এরাই ইনজিনিয়ার বানাতে টাকা দেয়, মেডিক্যালের টাকা দেয় একটা অংশ। আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, শিক্ষিত ভাইদের যে আপনার লেখাপড়ার খরচ দিয়েছে তা শুধু আপনার সংসার দেখার জন্য নয়, আপনার ছেলেমেয়েদের দেখার জন্য নয়, দিয়েছে তাদের জন্য আপনি কাজ করবেন, তাদের সেবা করবেন বলে। তাদের আপনি কি দিয়েছেন? কী ফেরত দিয়েছেন, কতটুকু দিচ্ছেন। তার টাকায় ইনজিনিয়ার সাহেব, তার টাকায় ডাক্তার সাহেব, তার

Dhaka University Institutional Repository

টাকায় অফিসার সাহেব, তার টাকায় রাজনীতিবিদ সাহেব, তার টাকায় মেম্বার সাহেব, তার টাকায় সব সাহেব। আপনি দিচ্ছেন কী? কী ফেরত দিচ্ছেন? আত্মসমালোচনা করেন, বক্তৃতা করে লাভ নাই। রাতের অন্ধকারে খবরের কাগজের কাগজ ব-্যাকমার্কেটিং করে সকালবেলা বড় বড় কথা লেখার দাম নাই। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মদ খেয়ে অনেষ্টির কথা বলার দাম নাই। আত্মসমালোচনা করুন, আত্মশুদ্ধি করুন, তাহলেই হবেন মানুষ। এই যে কী হয়েছে সমাজের। সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে-আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না। যে জমি নিয়ে যাব তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান-এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ যে বেকার প্রত্যেকটির মানুষ যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়াকর্স প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এইজন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ হবে।

আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গর্ভণমেন্টের হাতে। দ্বিতীয়, থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে রাজনৈতিক কর্মী, সরকারি যেই হয় একজন তার চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী। তার মধ্যে আমাদের কৃষক শ্রমিক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, যুবক প্রতিনিধি থাকবে, কৃষক প্রতিনিধি থাকবে–তারাই থানাকে চালাবে। আর জেলা থাকবে না, সমস্ত মহকুমা জেলা হয়ে যাবে। সেই মহকুমায় একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী একসঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপলস্ রিপ্রেজেনটেশন থাকবে। পার্টি রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। সেখানে তারা সরকার চালাবেন–এইভাবে আমি একটা সিস্টেমের চিন্তা করছি এবং করব বলে ইনশাআল্লা আমি ঠিক করেছি। আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই।

ভাই ও বোনেরা আমার,

আজকে একটা কথা বলি। আমি জানি শ্রমিকভায়েরা, আপনাদের কষ্ট আছে। এত কষ্ট, আমি জানি। তা আমি ভুলতে পারছি না। বিশেষ করে ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের কষ্টের সীমা নাই। কিন্তু কোথা থেকে হবে? টাকা ছাপিয়ে বাড়িয়ে দিলেই তো দেশের মুক্তি হবে না। ইনফ্লেশন হবে। প্রোডাকশন বাড়াতে পারলে তারপরেই আপনাদের উন্নতি হবে, না হলে উন্নতি হবে না। আমি জানি। যেমন আমরা আজকে দেখেছি। কপাল। আমাদের কপাল। আমরা গরিব দেশ তো।

আমাদের কপাল। আমার পাটের দাম নাই। আমার চায়ের দাম নাই। আমরা বেচতে গেলে অল্প পয়সা আমাদের বিক্রি করতে হয়। আর আমি যখন কিনে আনি–যারা বড় বড় দেশ, তারা তাদের জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমরা বাঁচতে পারি না। আমরা এইজন্য বলি, তোমরা মেহেরবানি করে যুদ্ধের মনোভাব বন্ধ কর। আরমামেন্ট রেস বন্ধ কর। তোমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ কর। ওই সম্পদ দুনিয়ার দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যয় কর। তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে। আজকে তোমরা মনে করছ আমরা গরিব–

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।

তোমরা মনে করেছ আমরা গরীব, যে দামই হোক আমাকে বিক্রি করতে হবে। এইদিন থাকবে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেষ্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশা-আল্লাহ্ এদিন থাকবে না। তোমরা আজকে সুযোগ পেয়ে জহাজের ভাড়া বাড়িয়ে দাও। জিনিসের দাম বাড়িয়ে দাও।

আর তাই আমাদের কিনতে হয়। আমরা এখানে না খেয়ে মরি, আমাদের ইনফ্লেশন হয়, আমরা বাঁচতে পারি না। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাই, তোমরা কিছু খয়রাত দিয়ে একটু মিষ্টি হাসো। হাসো, হাসো। দুঃখে পড়েছি, বিক্রিত হয়েছি। তোমাদের কাছে হাত পাততে হবে, হাসো। অনেকে হেসেছে-যুগ যুগ ধরে হেসেছে। হাসো। আরব ভাইয়েরাও গরীব ছিল। আরব ভাইদের সঙ্গে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি। প্যালেস্টাইনের আরব ভাইদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করে বাংরার মানুষ। আরব ভাইদের পিছনে তারা থাকবে প্যালেস্টাইন উদ্ধার করার জন্য। এও আমাদের পলিসি। যেখানে নির্যাতিত দুঃখী মানুষ সেখানে আমরা থাকব।

শ্রমিকভাইয়েরা, আমি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান করছি। আপনাদের প্রতিনিধি ইনডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, লেবার ডিপার্টমেন্টের শ্রমিক প্রতিনিধি বসে একটা প্ল্যান করতে হবে। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কী করে আমরা বাঁচতে পারি তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

ছাত্রভাইয়েরা, আপনারা লেখাপড়ার কাজ শিখেন। আমি খুশি হয়েছি যে, আপনারা নকল-টকল বন্ধ করেছেন একটু। কিন্তু একটা কথা আমি বলব, আমি পেপারে দেখেছি যে এবারে প্রায় এক পার্সেন্ট পাস, দুই পার্সেন্ট পাস, তিন পার্সেন্ট পাস। শিক্ষক সম্প্রদায়ের মর্জি দুই পার্সেন্ট পাস করিয়ে আপনাদের কর্তব্য পালন করলেন। আপনাদের কর্তব্য আছে, ছেলেদের মনুষ করতে হবে। ফেল করানোতে আপনাদের তেমন বাহাদুরি নাই, পাস করালেই বাহাদুরি আছে। আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। খালি ফেল করিয়ে বাহাদুরি নিবেন, তা হয় না। তাদের মানুষ করুন। আমি তো শিক্ষকদের বেতন দিব। আমরা সব আদায় করব। আপনারা লেখাপড়া শিখান, আপনারা তাদের মানুষ করুন। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন, রাজনীতি একটু কম করুন। তাদের একটু মানুষ করার চেষ্টা করুন। একটু সংখ্যা বাড়ান, শুধু ১% ২% ৫% দিয়ে বাহাদুরি দেখিয়ে বলবেন খুব স্ট্রিক্ট হয়েছি। আমি স্ট্রিক্ট চাই নকল করতে দিবেন না। তবে আপনাদের কাছে আবেদন,

মেহেরবানি করে আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। ছেলেদের মানুষ করার চেষ্টা করুন। পাসের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করুন। ওদের মানুষের মতো মানুষ তৈরি করুন। সেটাই ভালো হবে। রাগ করবেন না। আপনারা আবার আমার ওপর রাগ করেন। আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু বলি না। তাদের শুধু সম্মান করি। শুধু এইটুকুই বলি যে, বুদ্ধিটা জনগণের খেদমতে ব্যয় করুন। এর বেশিকিছু বলি না। বাবা, ওঁদের কিছু বলে কি বিপদে পড়ব? আবার কে কী বই লিখে বসবে। খালি সমালোচনা করলে লাভ হবে না।

আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি, গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভ সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই।

আর একটা কথা বলতে চাই, বিচার। বিচার। বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লার মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে সেই মামলা শেষ হইতে লাগে প্রায় ২০ বছর। আমি যদি উকিল হই, আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ঐ মামলার ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিনাল কেস হয়, চার বা তিন বছরের আগে শেষ হয় না।

এই বিচার বিভাগকে নতুন করে এমন করতে হবে যে থানায় ট্রাইব্যুনাল করার চেষ্টা করছি এবং সেখানে মানুষ এক বছর বা দেড় বছরের মধ্যে বিচার পাবে–তার বন্দোবস্ত করছি। আশাকরি সেটা হবে। তাই আমি এ কথা জানতে চাই, আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, একটি কথা। এই যে চারটি প্রোগ্রাম দিলাম, এই যে আমি কো-অপারেটিভ করব, থানা কাউন্সির করব, সাব ডিভিশনাল কাউন্সিল হবে, আর আমি যে আপনাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ ফসল চেয়েছি, জমিতে যে ফসল হয় তার ডবল, কল-কারখানায় কাজ–সরকারি কর্মচারী ভাইরা একটু ইনডিসিপ্লিন এসে গেছে। অফিসে যান, কাজ করেন। আপনাদের কষ্ট আছে, আমি জানি। দুঃখী মানুষ আপনারা। আপনারা কাজ করেন। তাদের পেটে খাবার নাই। তাদের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি আপনাদের পুষতে পারব না। প্রোডাকশন বাড়লে আপনাদেরও এদের সঙ্গে উন্নতি হবে। এই যে কথাগুলি আমি বললাম, আপনারা আমাকে সমর্থন করেন কিনা, আমার উপর আপনাদের আস্থা আছে কিনা, আমাকে দুই হাত তুলে দেখিয়ে দিন।

ভায়েরা, আবার দেখা হবে, কি বলেন? ইনশা-আল্লাহ আবার দেখা হবে। আপনারা বহুদূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন। গ্রামে গ্রামে ফিরে যান। যেয়ে বলবেন, দুর্নীতিবাজদের খতম করতে হবে। ক্ষেতে-খামারে কলে-কারখানায় প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। সরকারি কর্মচারী ভাইরা, আপনারাও কৃষক–শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য হবেন। আপনারা প্রাণ দিয়ে কাজ করুন। ইনশা-আল্লাহ বাংলাদেশ থাকবে। আপনারা স্লোগান দিন আমার সাথে .... জয় বাংলা!

বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি

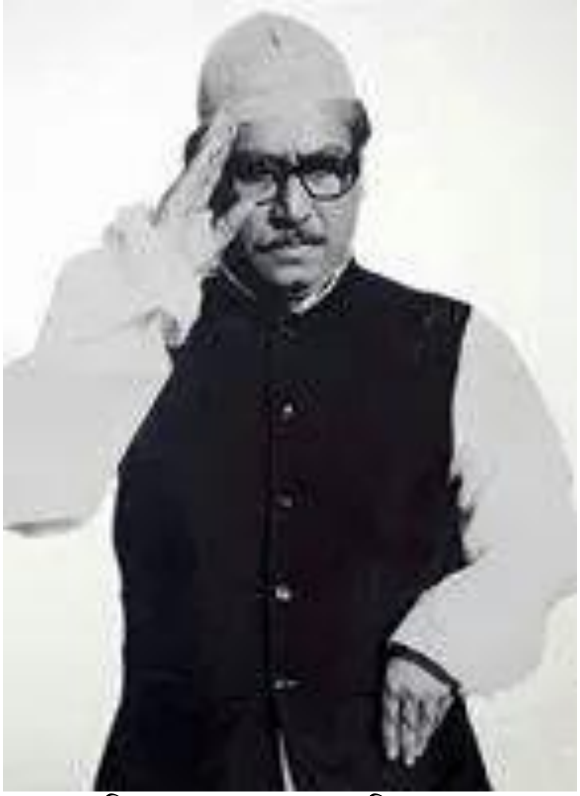

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ধানমন্ডির নিজ বাড়ির ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

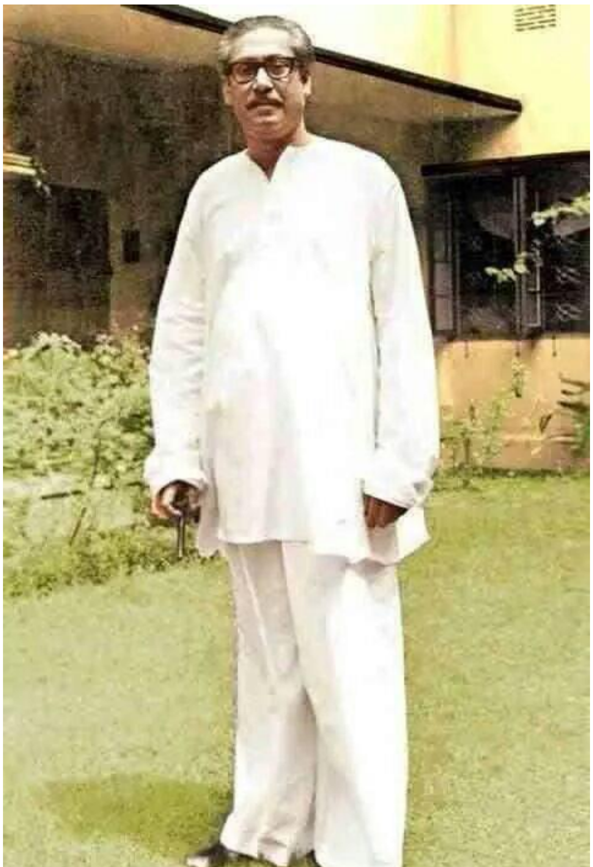

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

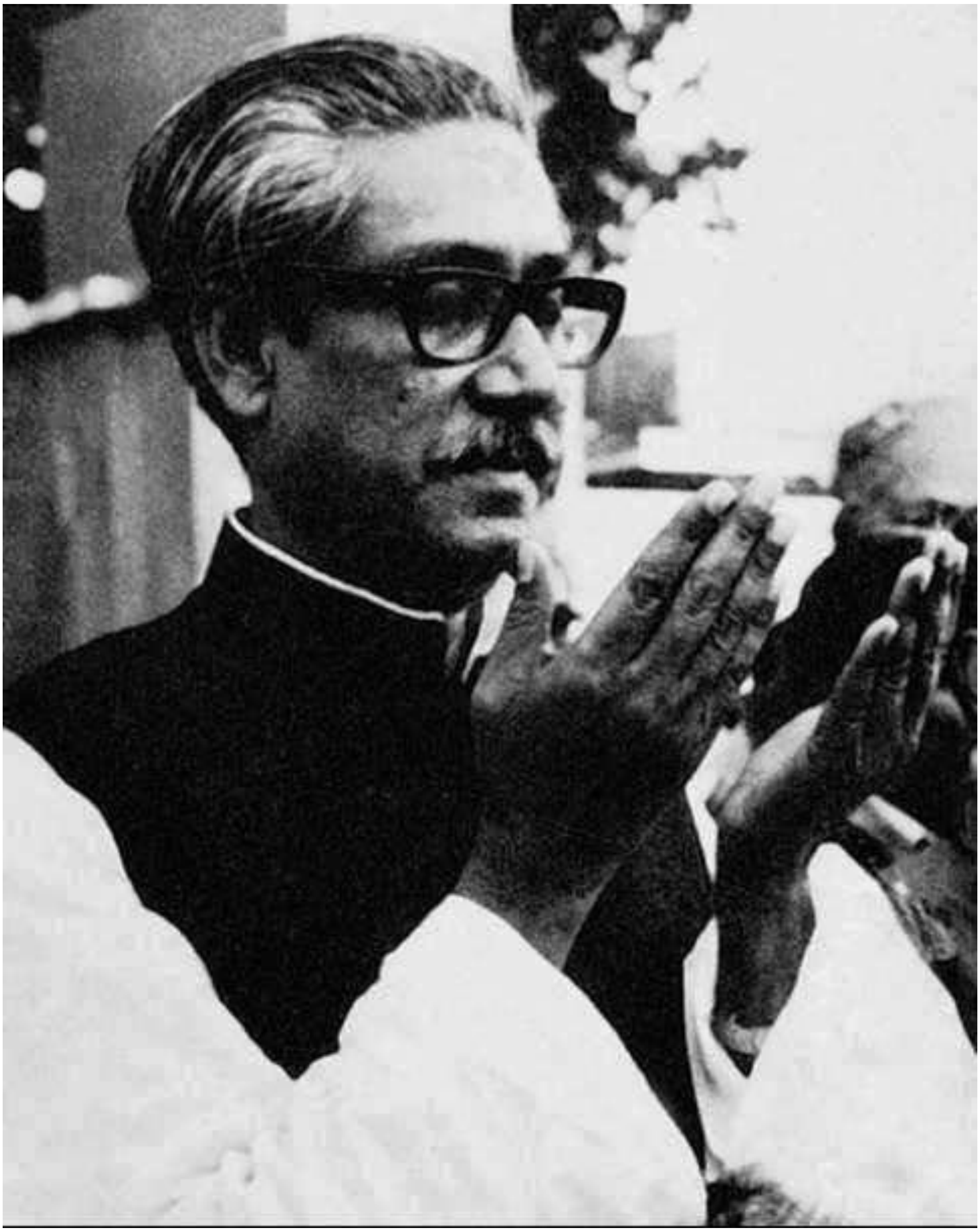

Dhaka University Institutional Repository

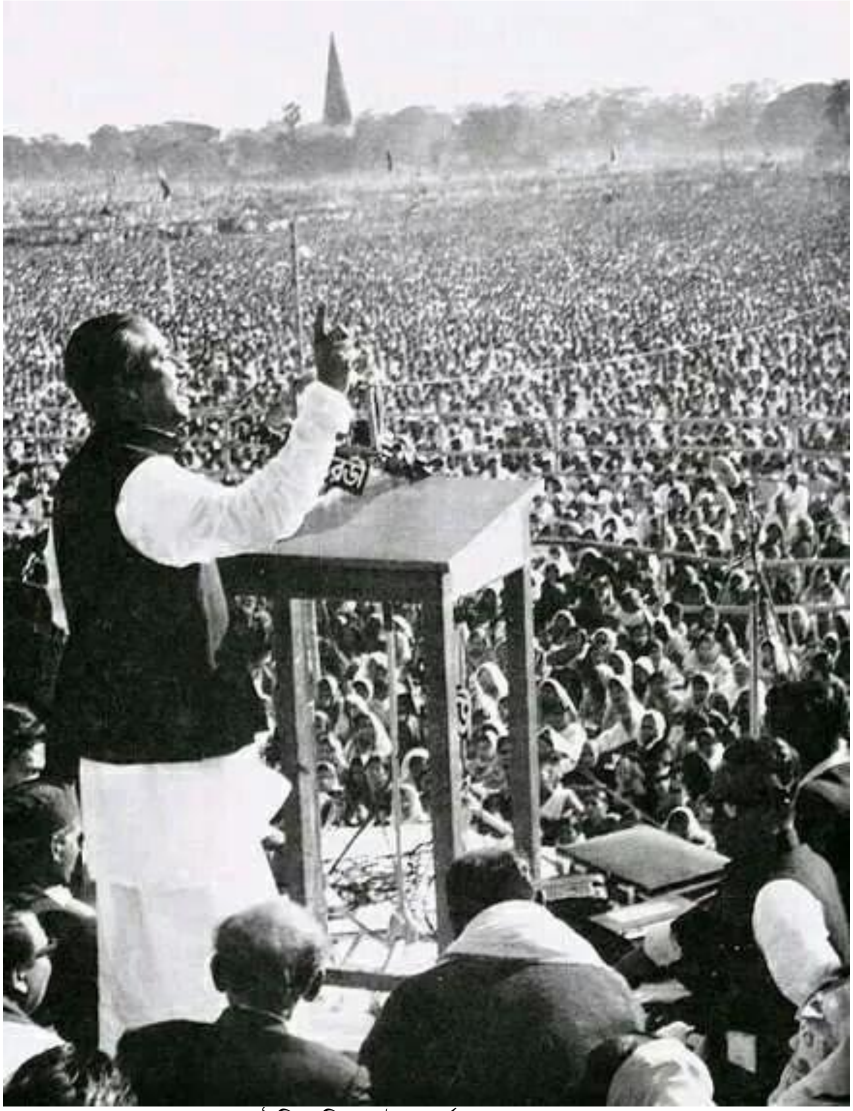

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ১৯৭১

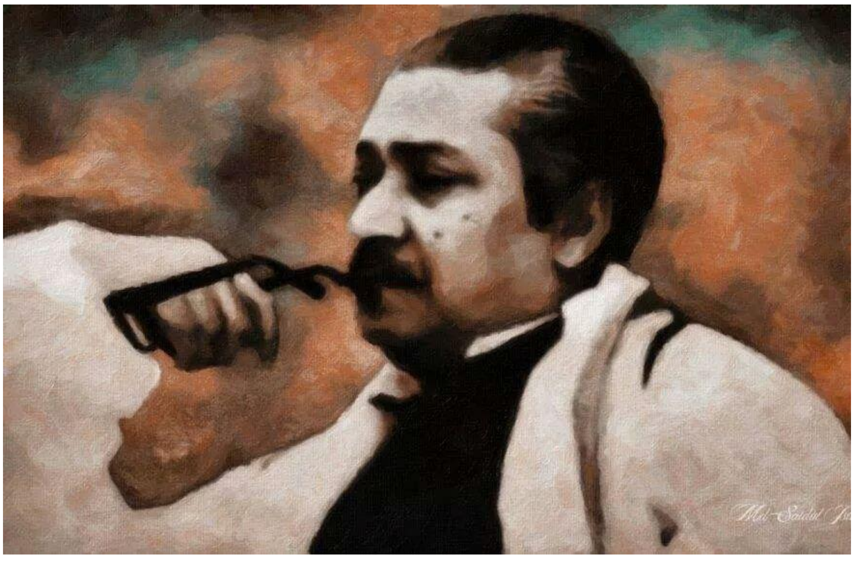

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বক্তৃতারত বঙ্গবন্ধু। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

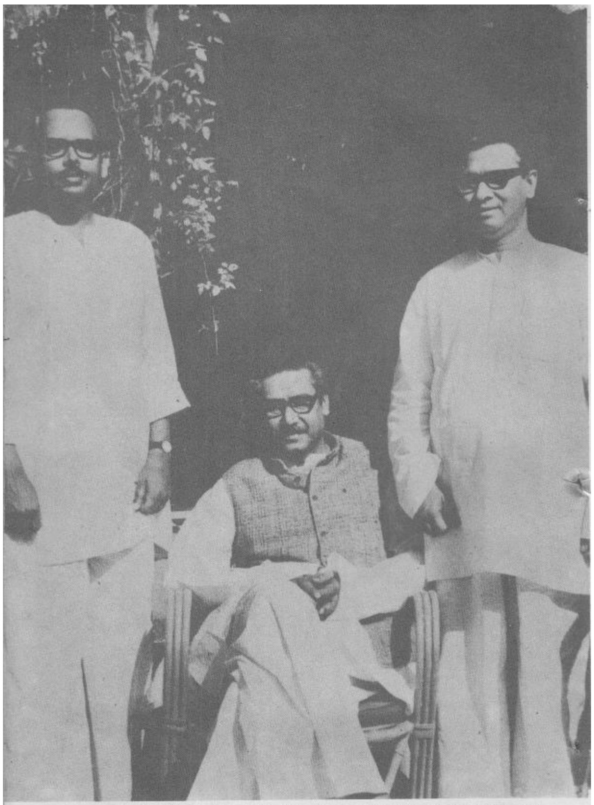

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে লেখক এম আর আখতার মুকুল (১লা জানুয়ারী ১৯৭০)

'বাংলাদেশে মদ খাওয়া ঘোড়দৌড় বন্ধ করছি। রেসকোর্স ময়দানে শ'য়ে শ'য়ে গাছ লাগাইছি। আমি যখন থাকুম না, তখন এতো গাছ কাইট্যা আর ঘোড়ার রেস চালু কোরতে পারবানা'— বঙ্গবন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

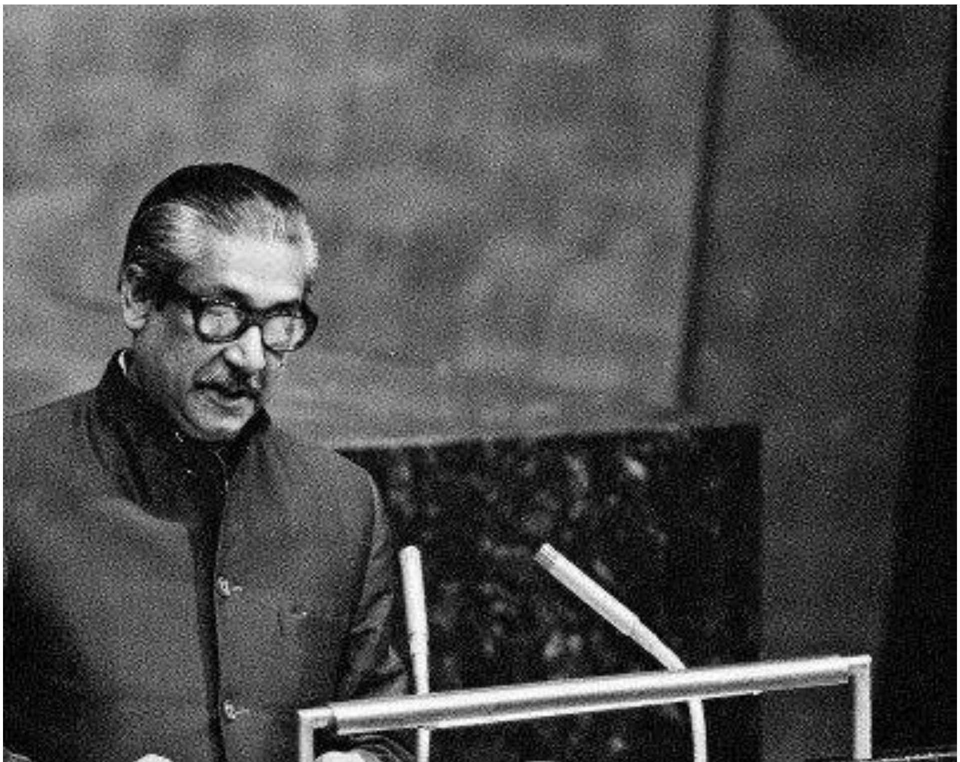

বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ তারিখে বাংলায় ভাষণ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

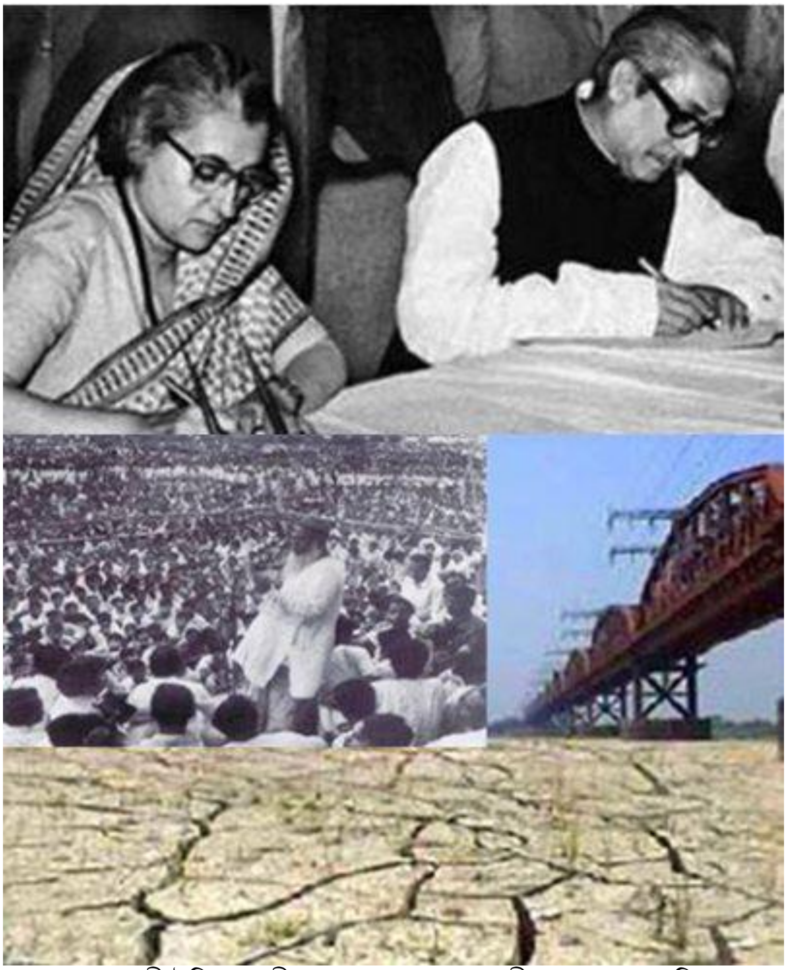

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

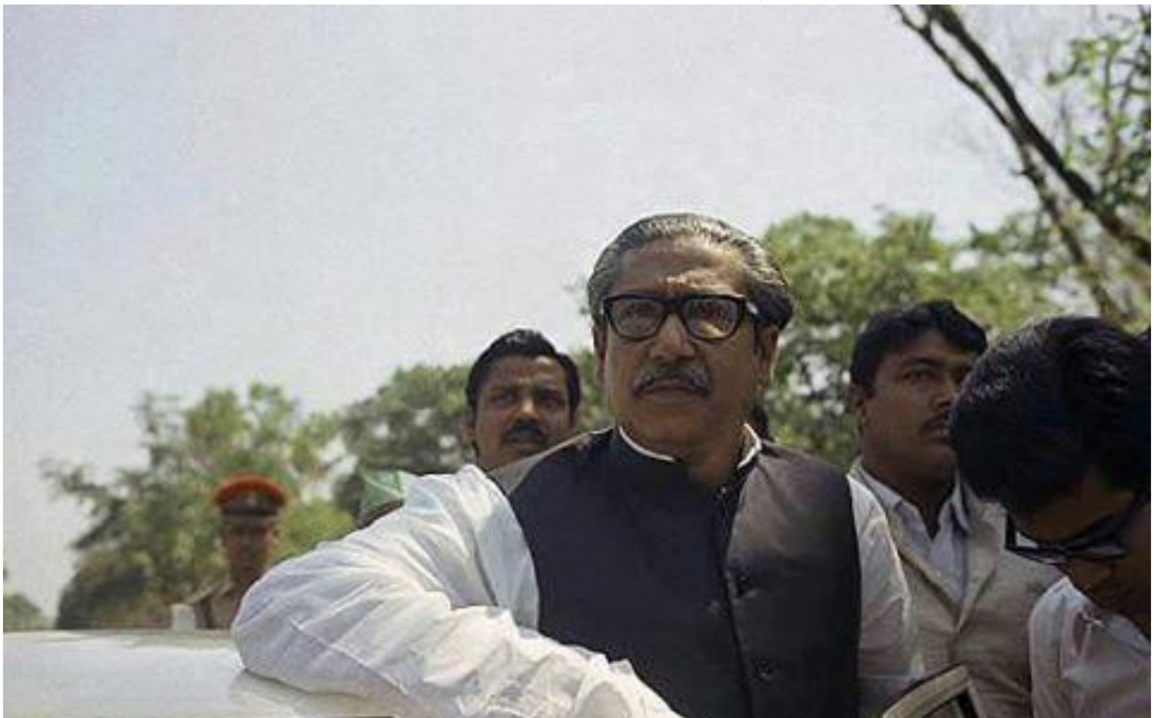

Dhaka University Institutional Repository

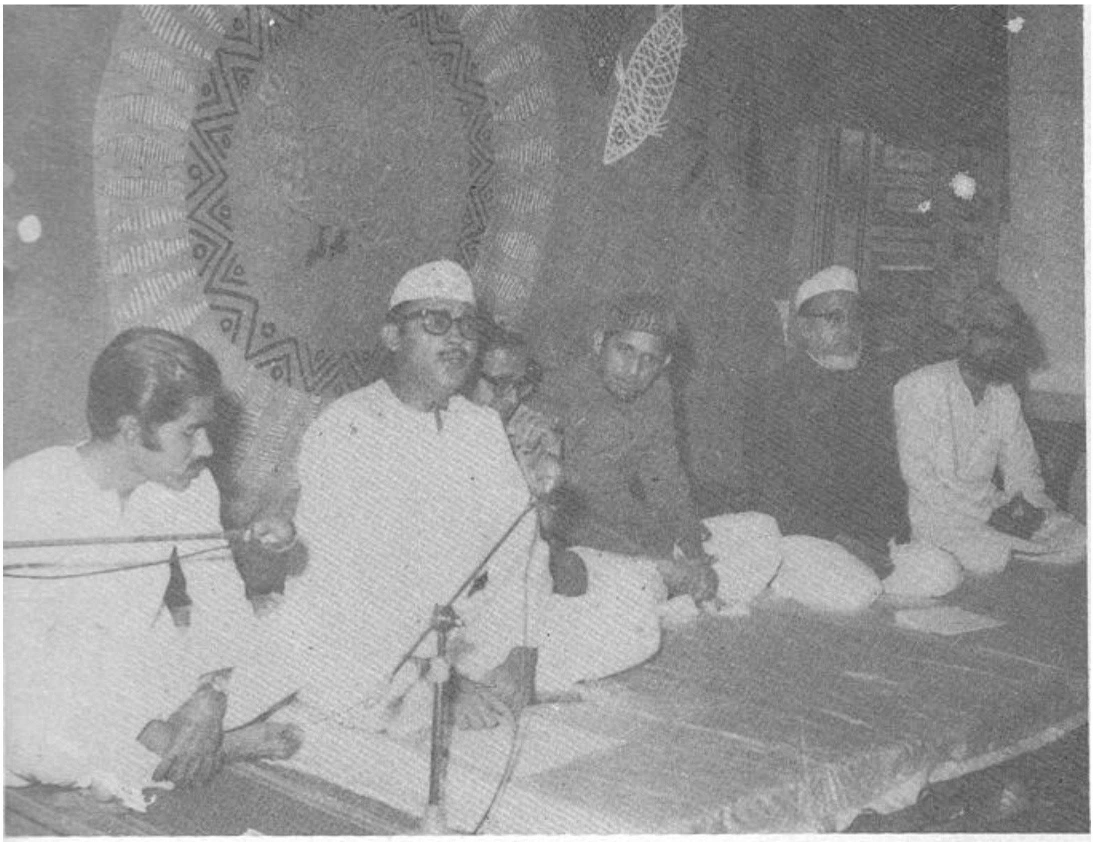

একদিকে ঢাকায় পাকিস্তান কাউন্সিলে নাত-এ-রাসুল (৮-৫-৭১)

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবীতে জহির রায়হানের নেতৃত্বে কোলকাতায় বিক্ষোভ

একটি অনুষ্ঠানে ছোট পুত্র শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু

তিন ছেলের মাঝে বঙ্গবন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা বেকার হোস্টেলে ১৯৪২-৪৭ সালে অবস্থান করেন। তিনি যে কক্ষটিতে বাস করতেন তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংরক্ষণ করেছে

Dhaka University Institutional Repository

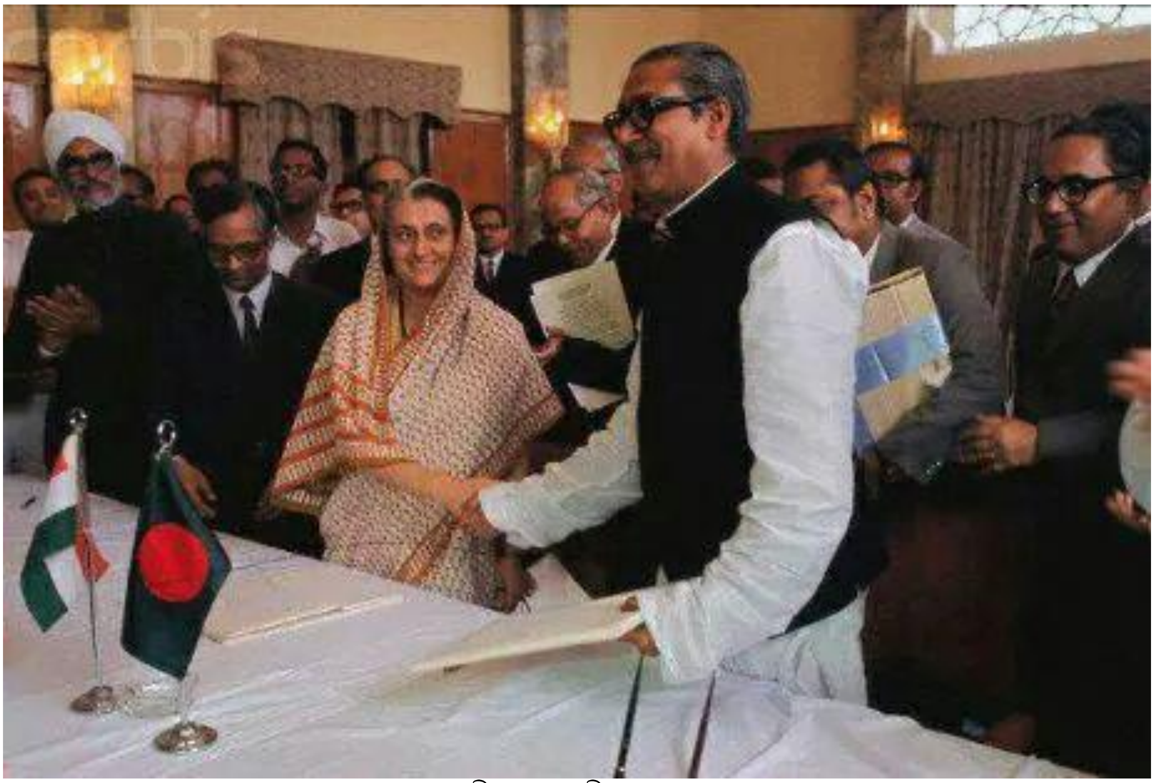

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

হোয়াইট হাউজে বঙ্গবন্ধু ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড

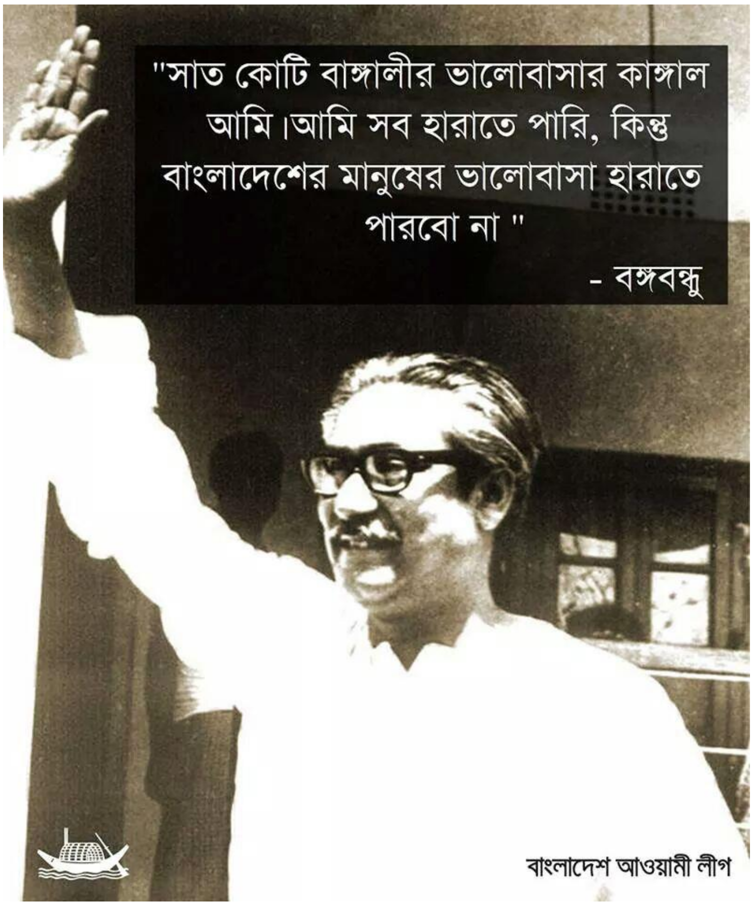

একটি ঐতিহাসিক ছবি

সশস্ত্রবাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে তাঁর কণিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল, পাশে দন্ডায়মান দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, জামাতা ড. এম ওয়াজেদ মিয়া ও বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়।

পাকিস্থানী স্বৈরাচারী জান্তার বিরুদ্ধে ৭১ এর মার্চে ঢাকার রাস্তায় সাধারণ ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

মার্চে ঢাকা আসেন ভুট্টো আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দর সাথে আলোচনা করতে। বঙ্গবন্ধুর কাছে পরাজিত হয়ে ভুট্টো ঘোষণা করেন যে মুজিব ক্ষমতায় গেলে সে সংসদ অধিবেশন বর্জন করবে। যা সংকটকে আরো ঘনীভূত করে।

৭১ এর ২৩ শে মার্চ পাকিস্থান দিবসে বঙ্গবন্ধু তার ধানমন্ডি ৩২ এর বাড়ির বারান্দায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু

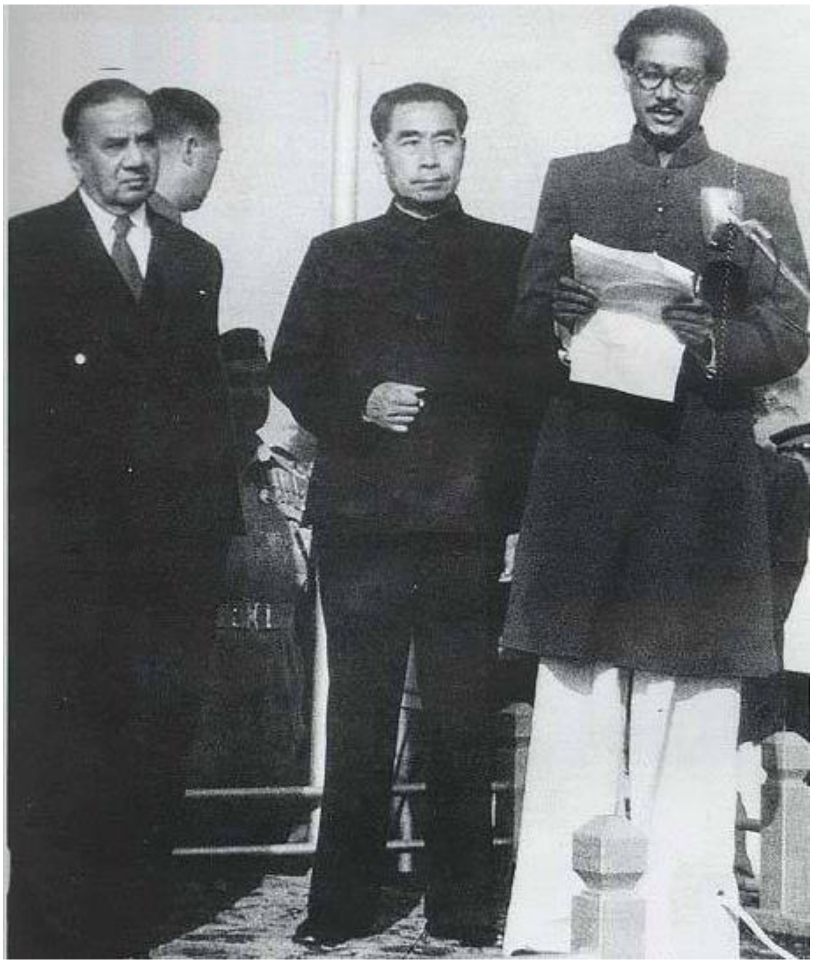

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ভাষানীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালে লন্ডনে ক্লারিজেস হোটেলে ফাইল হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফারুক চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্যা প্লাবিত এলাকা হেলিকপ্টারে পর্যবেক্ষণ করেন। ৮ জুলাই, ১৯৭৪

Dhaka University Institutional Repository

হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট
জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

Dhaka University Institutional Repository

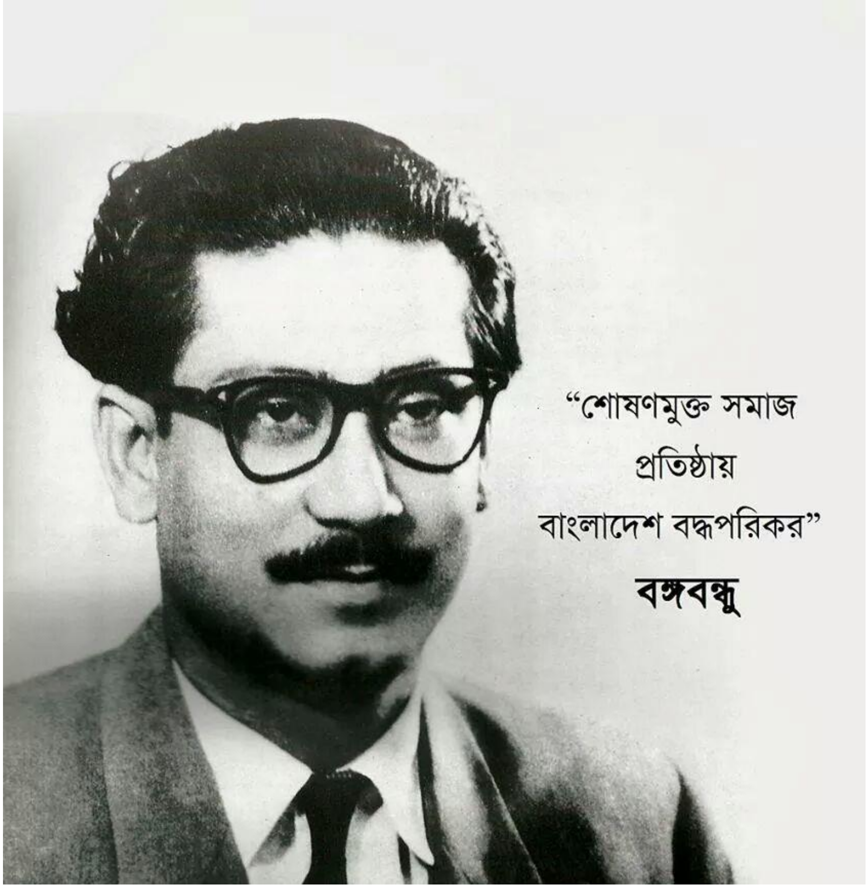

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

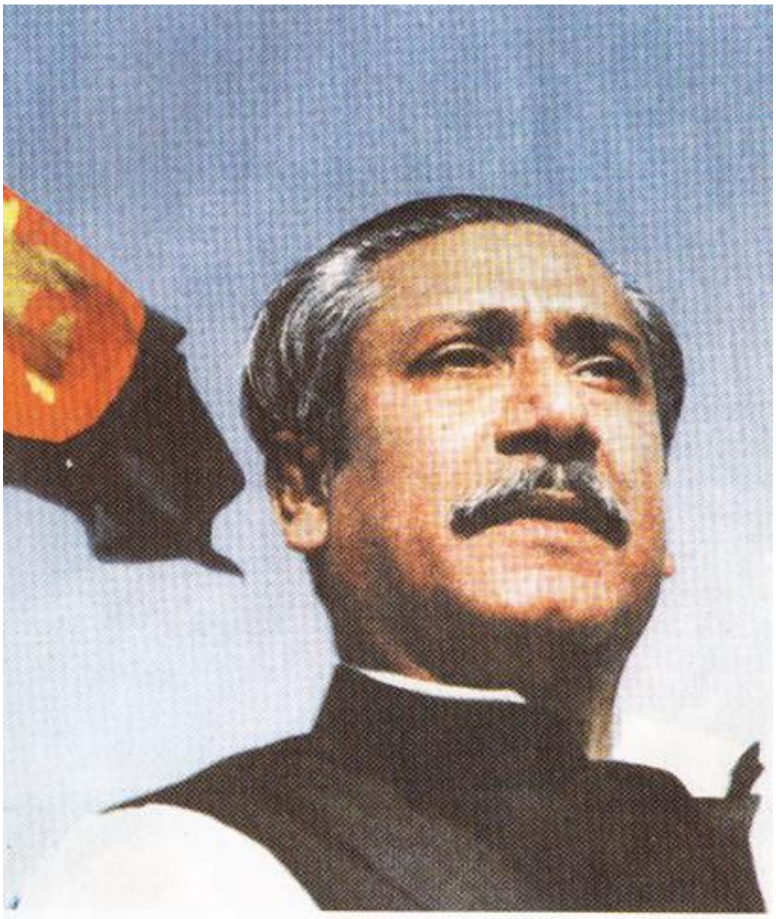

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

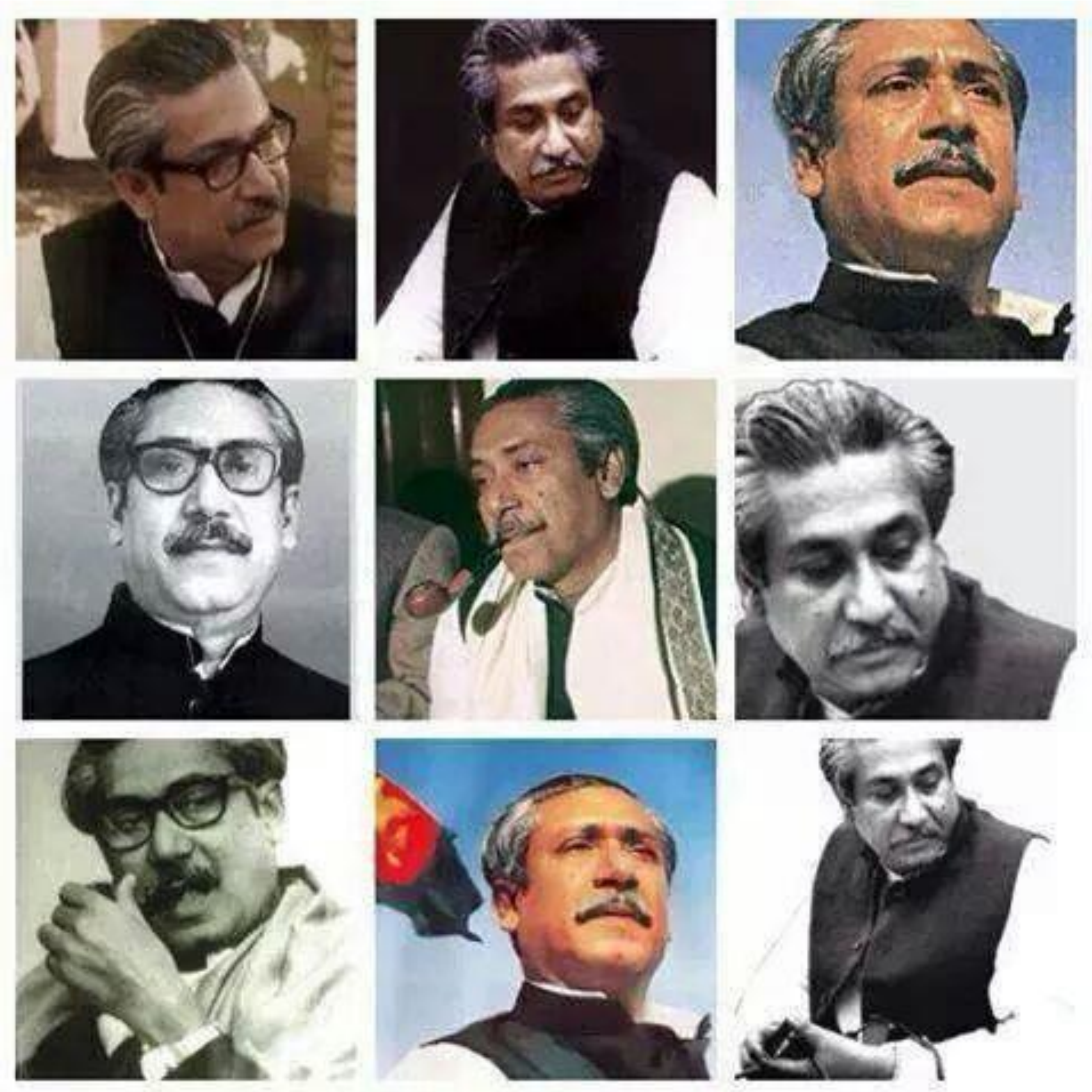

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের আদর নিচ্ছেন শেখ মুজিব

জাতির জনক ও শেখ হাসিনা

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

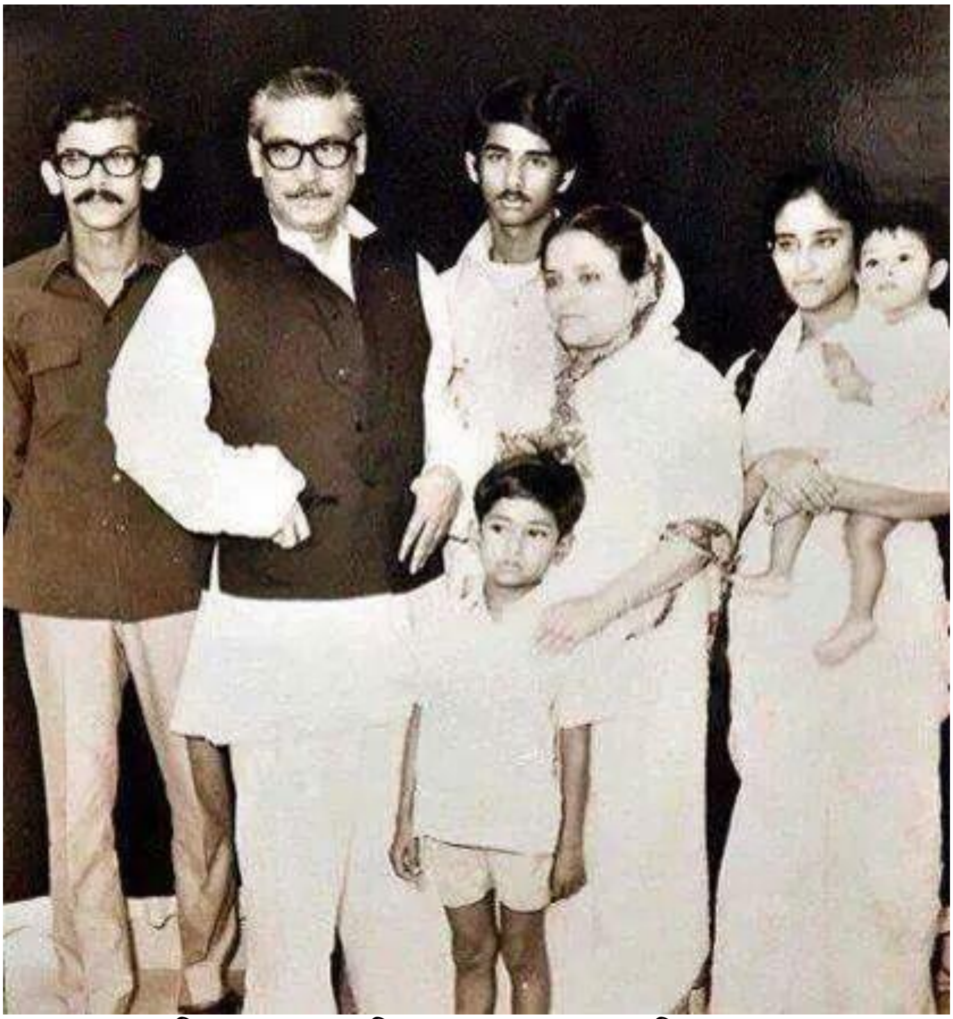

পরিবারের সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর দুই ছেলে ও সহধর্মিনী

বঙ্গবন্ধুর কন্যাদ্বয় – জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধুর ছবির পাশে জননেত্রী শেখ হাসিনা

ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কে অবস্থিত জাতির জনকের ঐতিহাসিক ভবন

Dhaka University Institutional Repository

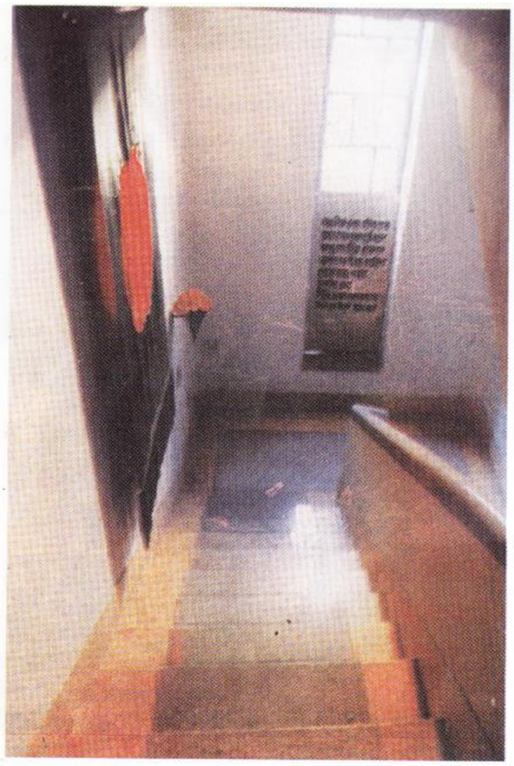

ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর ভবনের এই সিড়িতে ঘাতকদল বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে হত্যা করে

Dhaka University Institutional Repository

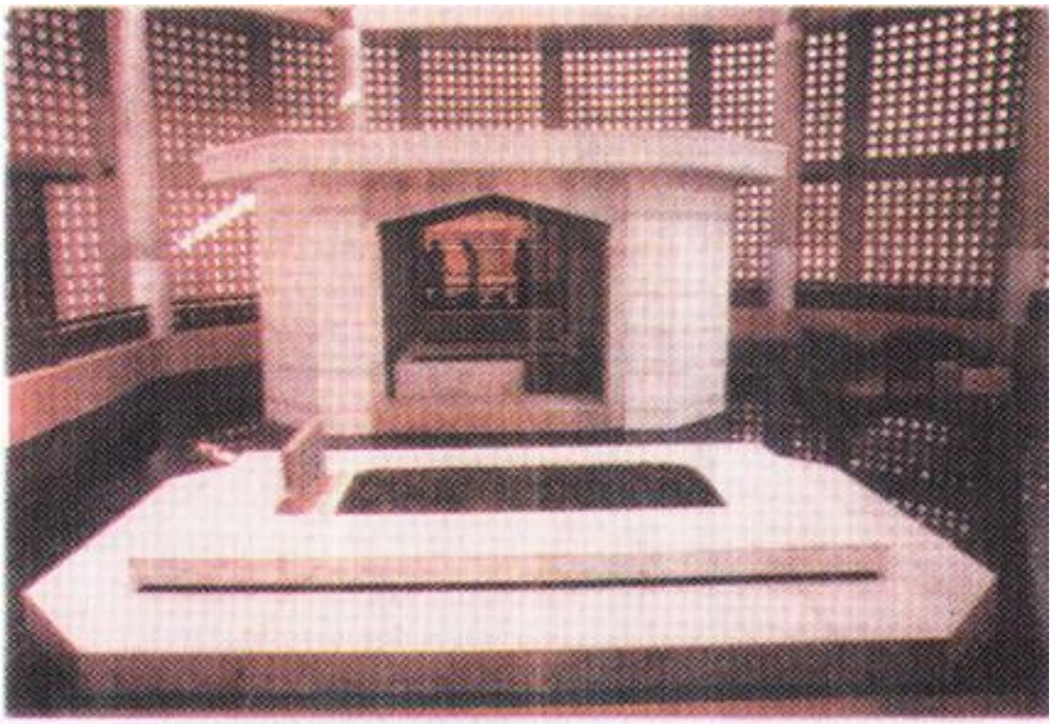

বঙ্গবন্ধুর মাজার টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ, নির্মাণকাল ২০০১

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খুনিদের বুলেটে নিহত বঙ্গবন্ধু ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের পরিবারের সদস্যদের মাজার, ঢাকার বনানী কবরস্থান

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক
বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন, ১৭ মার্চ ১৯৯৭

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Dhaka University Institutional Repository

ভারত সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাস সংলগ্ন সড়কের নামকরণ করেছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরণি', উদ্বোধন করছেন শেখ হাসিনা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

১৯৭৪ : ইরাকে হযরত আলী (রা)-এর মাযারে যিয়ারত করছেন বঙ্গবন্ধু

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১.	আল-কুরআন	:	
২.	আল-কুরআনুল কারীম	:	(সম্পাদনা পরিষদ) ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর' ২০০২
৩.	অলি উদ্দীন মুহাম্মদ (অনু. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (রঃ)	:	*মিশকাতুল মাসাবিহ* (অনু. *মেশ্কাত শরীফ*), ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, ২০০৭
৪.	আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস্-সাজিসতানী	:	*সুনান আবূ দাউদ*, কানপুর : আল্-মাত্বা আল্- মজীদী, ১৩৭৫ হি.
৫.	আবূ 'আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন্নাসায়ী	:	*সুনানুন্নাসায়ী*, কায়রো : মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২ খ্রি.
৬.	আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী	:	*আস্-সুনান লি ইবন মাজা*, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.
৭.	আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা	:	*জামি'উত্ তিরমিযী*, দিল্লী : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রি.
৮.	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী,	:	*সহীহ্ আল-বুখারী*, ১১ খণ্ড, বায়রুত : ইযাহী ইয়াউ তুরাসিল আরাবী, ১৯৮৭
৯.	আবূ-ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত্ তীরমীযী	:	*সুনানুত্ তীরমীযী*, ৪র্থ খণ্ড (অনুবাদ), ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮
১০.	আবু উমর মিনহাজুদ্দীন উসমান বিন সিরাজুদ্দীন আল জুজানী,	:	*তবকাত-ই-নাসিরী*, কলকাতা : দিব্য প্রশাকন, ১৮৬৪
১১.	আবু বকর ইবনুল আরাবী আল-মালিকী	:	*আহকামুল কুরআন*, বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪হি., ২০০৩খ্রি.
১২.	আবু জাফর	:	*রসুল মুহাম্মদ (স.)*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০২
১৩.	আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি,	:	*সহীহু লিল মুসলিম*, ঢাকা : কুতুব খানা রশিদিয়া ১৪০৮ হিজরী বিতাবুল আদাব।
১৪.	আমিনুল ইসলাম,	:	*মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা : বংলা একাডেমী, ১৯৯৫
১৫.	আলাউদ্দীন আলি ইবন মুহাম্মদ আল-বাগদাদী	:	*তাফসীরে খাযেন*, বায়রূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৭, খ.৫
১৬.	ইবন মানযূর,	:	*লিসানুল আরব*, খ. ৫, কায়রো : ১৯৭৮
১৭.	ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী	:	*আস-সহীহ্*, বৈরুতঃ ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৪১৫ হি.

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল	:	*মুসনাদে আহমদ*, খ.১, কায়রো : মাতবা'আ আশ-শারকিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫
১৯. ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল	:	*আল-মুসনাদ*, কায়রো : মাতবা'আ আশ্শারকিল ইসলামিয়া, ১৮৯৫ খ্রি.
২০. ড. ওয়াহাব বিন মুস্তফা আয-যুহাইলী	:	*আল ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু*, খ.৬, দামেষ্ক : দারুল ফিকর, ২০১১
২১. মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (অনু. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ)	:	*মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও তার দ্বীনি দাওয়াত*, ঢাকা : মুহাম্মদী বুক হাউজ, ১৯৯৫
২২. মিনহাজ-ই-সিরাজ (অনু আ.কা.মা জাকারিয়া)	:	*তাবকাত-ই-নাছিবি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩
২৩. মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ	:	*কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : দারুল ইফতা ও গবেষণা পরিষদ, ১৯৮৬
২৪. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী	:	*সহীহ মুসলিম*, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি.
২৫. মুহম্মদ শাহজাহান খান	:	*তাজকিরাতুল আউলিয়া*, ঢাকা : বিসমিল্লাহ বুক ডিপো, ২০০৫
২৬. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী	:	*সহীহুল বুখারী*, দেওবন্দ : আল মাকতাবা আররহীমিয়া/কায়রো, ১৩৪৫হি.
২৭. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী	:	*সহীহুল বুখারী*, দেওবন্দ : আল মাকতাবা, আররহীমিয়া ১৩৪৫হি.
২৮. মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আলবানী	:	*সহীহ সুনানুন নাসাঈ*, খ.২, রিয়াদ : মাকতাবুত তারাবিয়াতুল আরাবী লিদুয়ালিল খালিজ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খ্রিঃ
২৯. মুহাম্মদ ওয়েয যাদাহ আল-খুরাসানী	:	*আল-মুজামুল ফি লুগাতিল কুরআন ওয়া সিররি বালাগাতিহি*, মাশহাদ (ইরান) : মাজমাআতুল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৮
৩০. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী	:	*আল-মু'জামুল মুফাহরাস লিআলফাযিল কুরআনিল কারীম*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাত, লেবানন, ২০০২
৩১. অতুল চন্দ্র রায়	:	*ভারতের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮৭
৩২. অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম	:	*উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব*, ঢাকা : বই বিতান, ১৯৮৫
৩৩. অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম	:	*ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০
৩৪. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ	:	*বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ইসলামী খিদমত*, পিরোজপুর : সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৭

৩৫. অ্যান্থনী মাসকারেণহাস (অনু. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (রনাত্রি)) *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ*, ঢাকা : পপুলার পাবলিশার্স, ২০১১

৩৬. অলি আহাদ : *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪ থেকে ১৯৭৫*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০১২

৩৭. আতিউর রহমান : *বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১

৩৮. আব্দুল মোমিন চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

৩৯. আব্দুল মান্নান তালিব : *বাংলাদেশ ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০

৪০. আব্দুল্লাহ আল মুতি : *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬

৪১. আবদুল মান্নান তালিব : *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭

৪২. আবদুল করিম : *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০

৪৩. আবদুল গাফফার চৌধুরী : *ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা*, ঢাকা : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০০০

৪৪. আবু জাফর : *রসুল মুহাম্মদ স.*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০২

৪৫. আবুল কালাম শামছুদ্দীন : *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা : খোশরোজ পাবলিকেশন্স লি:, ২০০১

৪৬. আব্দুল মোমিন চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

৪৭. আব্দুল্লাহ আল মুতি : *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬

৪৮. আবদুল করিম : *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

৪৯. আবদুল করিম : *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০

৫০. আবুল মনসুর আহমদ : *আমার দেখা রাজনীতি পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাবমহল, ১৯৯৫

৫১. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া : *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭

৫২. আবুল কালাম শামছুদ্দীন : *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা : খোশরোজ পাবলিকেশন্স লি:, ২০০১

৫৩. আব্দুর রহিম : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের পর*, ঢাকা : জাডিক্যাল এশিয়া পাবলিশেনস, ১৯৯৯

৫৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক : *মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৭২

৫৫. আমিনুল ইসলাম : *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা : বংলা একাডেমী, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৫৬.	আলাউদ্দীন আল আজাদ	:	*ফেরারী ডায়েরী*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১২
৫৭.	আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন	:	*স্বাধীনতার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান*, (প্রকাশক মোঃ আব্দুল কাদের, ১৬ কবি জসীম উদ্দীন রোড, উত্তর কামলাপুর), ঢাকা : ১৯৯৬
৫৮.	আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন	:	*'বঙ্গবন্ধু ও ইসলাম'* কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু রূপ প্রকাশক, ১৯৯৭
৫৯.	আশরাফ হোসেন	:	*বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : উত্তরণ, ২০১৪
৬০.	আসকার ইবন শায়খ	:	*মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮
৬১.	ইফাবা	:	*ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি*
৬২.	ইফাবা	:	*ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা নং- ১৯১৭
৬৩.	ইফাবা	:	*ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৭
৬৪.	ইফাবা	:	*ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৯
৬৫.	ইবনে হিশাম (অনু. আকরাম ফারুক)	:	*সিরাত ইবনে হিশাম*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১২
৬৬.	এ.এফ.এম আব্দুল জলিল	:	*পাঁচ হাজার বছরের বাঙালা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭
৬৭.	এনামুল হক	:	*বঙ্গে সুফী প্রভাব*, কলকাতা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ১৯৩৫
৬৮.	এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ	:	*বেঙ্গল আন্ডার দি রুল অব দি আর্লি ইলিয়াস শাহী ডাইন্যাস্টি*, অপ্রকাশিত থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৭
৬৯.	এম রুহুল আমীন	:	*বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯
৭০.	এম. এ ওয়াজেদ মিয়া	:	*বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০
৭১.	এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান	:	*ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ, সৌদী আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ঢাকা : ১৯৯১*
৭২.	কে. আলী	:	*মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা : আলি পাবলিকেশনস, ১৯৮৭
৭৩.	কে. এম রাইছ উদ্দীন খান	:	*বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ১৯৯৬
৭৪.	কামরুদ্দীন আহমেদ	:	*বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ১৩৮২ বাং
৭৫.	কামরুদ্দীন আহমদ	:	*বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্বাস*, ঢাকা : স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ১৯৫৭

৭৬. কামাল উদ্দীন হোসেন : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙ্গালী*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০০৭

৭৭. খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন (অনু.) : *ইবনে বতুতার সফর নামার উর্দু অনুবাদ আজায়েবুল আসফার*, খ.২, দিল্লী : ১৯১৩

৭৮. খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (সম্পা.) : *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ২০০০

৭৯. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোনায়েম সরকার সম্পা. : *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ২০০০

৮০. গাউসী মুহম্মদ : *গুলজার-ই-আবরার*, ১০২২ হি./১৬১৩, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পান্ডুলিপি-২৫৯

৮১. গোলাম মোস্তাফা : *বিশ্বনবী*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৭

৮২. গোলাম হোসাইন সলিম : *রিয়াদুস সালাতিন (অনুদিত)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮

৮৩. গোলাম হুসাইন সলীম (অনু. আকবর উদ্দীন) : *বাঙলাদেশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪

৮৪. চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর : *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, ঢাকা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ২০১২

৮৫. জাওয়াদুল করিম, : *মুজিব ও সমকালীন রাজনীতি*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০

৮৬. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট : *এলবাম জাতির জনক*, ঢাকা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ৩য় প্রকাশ, ১৭ মার্চ, ২০১০

৮৭. *জুলফিকার আহমদ কিসমতি* : *বাংলাদেশে কতিপয় সংগ্রামী আলেম ও পীর মাশায়েখ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে, ১৯৮৮

৮৮. ড. আব্দুল করিম : *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

৮৯. ড. আর.সি. মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, খ.১, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা : জেনারেল, ১৯৯৬

৯০. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও ড. মোঃ রহমত উল্লাহ (সংকলন ও সম্পাদনা) : *বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার-দর্শন*, ঢাকা : জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ২০১৩

৯১. ড. এম এ রহিম : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

৯২. ড. জিল্লুর রহমান খান, : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪

৯৩. ড. নগেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী : *বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য ক্রমবিকাশ প্রথম খণ্ড* কলিকাতা : বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ১৩৪৪ বাং

৯৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ : *‘পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা’*, দৈনিক আজাদ ১২ শ্রাবণ ১৩৫৪ বাং

৯৫. ড. রশীদুল আলম : *সুমলিম দর্শনের ভূমিকা*, বগুড়া ও ঢাকা : সাহিত্য কুটির, ১৯৮৬

৯৬. ডাঃ শাহাদাত (সম্পা.) : *‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’* ঢাকা : ইফাবা, ২০০৯

৯৭. তারাচাঁদ (অনু. এস. মুজিবউল্লাহ) : *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮

৯৮. তারিক আলী : *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ; জান্তা না জনতা* (অনু.), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

৯৯. নীহার রঞ্জন রায় : *বাংঙ্গালীর ইতিহাস*, কলিকাতা : মুক্তধারা, ১৯৪৭

১০০. নীহার রঞ্জন রায় : *বাংঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৪১৬ বাং

১০১. বাউবি : *সিভিক এডুকেশন-২*, গাজীপুর : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২-৬৪

১০২. রঙ্গলাল সেন ও অন্যান্য সম্পাদিত : *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান, ইউপিএল, ২০০৯

১০৩. বাংলাদেশে কতিপয় সংগ্রামী আলেম ও পীর মাশায়েখ : *জুলফিকার আহমদ কিসমতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে, ১৯৮৮

১০৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : *Statistical Year Book-2002*, ঢাকা : পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৩

১০৫. বাংলাদেশ গণপরিষদ : *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা : সরকারী মুদ্রনালয়, ১৯৭২

১০৬. মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (অনু. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ) : *মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও তার দ্বীনি দাওয়াত*, ঢাকা : মুহাম্মদী বুক হাউজ, ২০১০

১০৭. মাযহারুল ইসলাম : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮

১০৮. মাহবুবুর রহমান মোরশেদ : *বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮৬

১০৯. মিজানুর রহমান শেলী (সম্পা.) : *ছোটদের ফজলুল হক*, ঢাকা : সাহিত্য মালা, ১৯৮৪

১১০. মিজানুর রহমান খান : *১৯৭১ আমেরিকার গোপন দলিল*, ঢাকা : *সময় প্রকাশন*, ২০০৮

১১১. মিজান রহমান (সম্পাদনা), : *বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯

১১২. মিজানুর রহমান খান, : *১৯৭১ আমেরিকার গোপন দলিল*, ঢাকা : *সময় প্রকাশন*, ২০০৮

১১৩. মিজানুর রহমান মিজান সম্পা., : *বঙ্গবন্ধু ভাষণ*, ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন, ১৯৮৯

১১৪. মুনতাসীর মামুন, জয়ন্ত কুমার রায় : *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-৯০*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৮

১১৫. মুনায়েম সরকার সম্পাদিত : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯

১১৬. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান : *আত-তারিকুল ইসলামী*, ঢাকা : ১৯৮৮

১১৭. মুহম্মদ মোহর আলী : *হিস্টরি অব দি মুসলিম ইন বেঙ্গল*, খ.১ বি, রিয়াদ : ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৫

১১৮. মুহম্মদ এনামুল হক : *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮

১১৯. মুহাম্মদ রুহুল আমিন : *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)*, পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৬

১২০. মুহাম্মদ নুরুল কাদের : *দুশো ছেষট্টি দিনের স্বাধীনতা*, ঢাকা : মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭

১২১. মেজর কামরুল হাসান ভূইয়া : *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা*, ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৪

১২২. মেহরাব আলী, : *একশ তেইশ হিজরীর শিলালিপি*, দিনাজপুর : যাদুঘর,১৯৯৯, সিরিজ নং-৪

১২৩. মওলানা আবদুল আউয়াল : *বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১

১২৪. মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী : *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৮৬

১২৫. মোঃ জয়নুল আবেদীন : *দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর অবদান*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪

১২৬. মোনায়েম সরকার সম্পা : *বাঙালির কণ্ঠস্বর*, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু পরিষদ

১২৭. মোঃ এমরান জাহান : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮

১২৮. মোহাম্মদ আমীন : *বাংলা সাহিত্যের অ আ ক খ*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনি, ২০০২

১২৯. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ : *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ একটি সমীক্ষা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

১৩০. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান : *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

১৩১. মোনায়েম সরকার (সম্পা) : *বাঙালির কণ্ঠস্বর*, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু পরিষদ, তা.বি.

১৩২. মোহীত উল আলম, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত : *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন ২০১০

১৩৩. মোঃ এমরান জাহান : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮

১৩৪. রফিউদ্দীন আহমেদ সম্পা. : *ইসলাম ইন বাংলাদেশ*, ঢাকা : ১৯৮৩

১৩৫. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেনী : *৭১ এর দশমাস*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭

১৩৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) প্রাচীন যুগ*, ঢাকা : জেনারেল, ১৯৯৬

১৩৭. রিজলে : *দি পিপলস ইন ইন্ডিয়া*, ক্যালকাটা : ১৯৮০

১৩৮. শামসুল হুদা চৌধুরী : *একাত্তরের রণাঙ্গন*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮২

১৩৯. শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : ভূমিকা, ২০১০

১৪০. শেখ মুজিবুর রহমান, : *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২

১৪১. শেখ হাসিনা (সম্পা. পার্থ ঘোষ) : *শেখ মুজিব আমার পিতা*, কলকাতা : সাহির্ত্যম, ১৯৯৯

১৪২. সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৮

১৪৩. সাঈদ উর রহমান : *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৮৩

১৪৪. সাহিদা বেগম : *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলির পত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০

১৪৫. সাঈদ উর রহমান : *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৮৩

১৪৬. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, : *ইসলাম প্রচার ও প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০

১৪৭. সিদ্দিক মালিক, : *নিয়াজী আত্ম-সমর্পনের দলিল*, (অনু. মকসুদুল হক), ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন্স ১৯৮৮

১৪৮. সিমিন হোসেন রিমি : *আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ*, ঢাকা : প্রতিভাস, ২০০১

১৪৯. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ : *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনি, ১৯৯৭

১৫০. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ : *শেখ হাসিনা*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০০

১৫১. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ : *বাংলাদেশ গড়লো যারা*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯০

১৫২. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ : *শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৭

১৫৩. সিরাজুদ্দীন হোসেন : *ইতিহাস কথা কয়*, ঢাকা : ১৯৪৭

১৫৪. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

১৫৫. সুব্রত বড়ুয়া : *আমাদের বাংলাদেশ*, ঢাকা : আহমেদ পাবলিশার্স হাউজ, ১৯৯০

১৫৬. সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.) : *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : নারী*, ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ২০১০

১৫৭. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : *ইসলামি বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫

১৫৮. সৈয়দ বদরুদ্দোজা : *হযরত মোহাম্মদ (স.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩

১৫৯. সৈয়দ সুলায়মান নদভী অনু. হুমায়ুন খাঁন, : *আরব নৌবহর*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২,

১৬০. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ডাঃ শাহাদাত (সম্পা.) : *'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'* ঢাকা : ইফাবা, ২০০৯

১৬১. সৈয়দ আবির : *ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : *জাগৃতি প্রকাশনী*, ২০০৬

১৬২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খণ্ড*, ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২

১৬৩. A. Karim : *Social History of the Muslim in Bengal*, Chittagong : 1985

১৬৪. Abdul Karim : *Social History of Mustims in Bengal*, Chittagong : Baitush Sharaf Islamic Research Institute, 1985

১৬৫. Antony Mascarenhas, : *Bangladesh- A Legacy of Blood*, London : Hodder and Stoughton, 1986

১৬৬. Begum Shaista Suhrawardy Ikramulla : *Huseyn Shahid Suhrawardy*, Oxford University Press, 1991

১৬৭. Begum Shaista Suhrawardy Ikramulla : *Huseyn Shahid Suhrawardy*, London : Oxford University Press, 1991

১৬৮. Dr. M.A Rahim : *Social & Cultural History of Bangal Karachi*, Karachi : Pakistan Historical Society, 1964

১৬৯. Dr. S A Malek : *Steam of Thought*, Dhaka : News and Views Publications, 1997

১৭০. Edited by Ziaur Rahman : *Speeches of Sheik Mujibur Rahman in Pakistan Parliment-1956*, Dhaka :1990

১৭১. Gover B.L and Grover S.A : *New look at Modern India History*, New Delhi : S. Chand and Co. Ltd., 1993

১৭২. Gover B.L and Grover S.A, : *New look at Modern India History*, New Delhi : S. Chand and Co. Ltd., 1993

১৭৩. Habibul Alam Birpratik, : *Brave of Heart*, Dhaka : Academic Press & Publishers Library, 2006

১৭৪. Hasan Zaheer : *The Separation of East Pakistan - The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, Dhaka : The University Press Limited (UPL), 2001

১৭৫. Hasan Zaheer : *The Separation of East Pakistan - The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, Dhaka : The University Press Limited (UPL), 2001

১৭৬. *Hossain Sahid Suharwady-Memoirs* : Edited by Mohammad H.R. Talukder, UPL, Dhaka, 1987

১৭৭. K.N. Dikshit, : *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 55, Delhi : Superintendent Government Printing, 1938

১৭৮. Larry Collins and Domique La Pierre : *Freedom At Midnight*, Dhaka : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1996

১৭৯. Lieutenant General ASM Nasim Bir Bikram, : *Bangladesh Fights for Independence*, Dhaka : Columbia Prokashani, 2002

১৮০. Lt. Gen. A. A. K. Niazi : *The Betryal of East Pakistan*, Karachi : Oxford University Press, 1988

১৮১. Lt. Gen. JFR Jacob : *Surrender at Dacca, Birth of a Nation*, Dhaka : UPL, 1997

১৮২. M.A. Rahim : *The Muslim Society & Politics in Bengal (1757-1947)*, Dacca : University of Dacca, 1978

১৮৩. M.A. Rahim, : *The Muslim Society & Politics in Bengal 1757-1947*, Dacca : University of Dacca, 1978

১৮৪. Md. Enamul Huq Khan : *AK Fazlul Huq and Muslim League in Bengal 1906-1947*, Dhaka : 2002

১৮৫. Mir Shawkat Ali : *The Evidence*, Dhaka : Somoy Prokashon, 2008, Vol-1

১৮৬. Mohammad Ayub Khan : *Friends Not Masters: A Political Autobiography*, London 1967

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭.	Mohammad H.R. Talukder (ed.),	:	*Hossain Sahid Suharwady-Memoirs*, Dhaka : The UPL, 1987
১৮৮.	Moses Moscowity	:	*Human Rights and World Order*, New Yark : Occana publication, inc., Appendix-1
১৮৯.	Planning Commission of India	:	*Social Welfare in India*, 'Planning Commission of India Govt. of India', New Delhi : 1988
১৯০.	Rabindranath Trivedi (Compiled),	:	*International Relations of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1971-73*, V-1, New Delhi : Parama Prokashon, 1999
১৯১.	Robert Payne,	:	*Massacre,* The Mackillan Company, 1973
১৯২.	S.A. Karim,	:	*Sheikh Mujib Triumph and Tragedy,* Dhaka : The University Press Ltd., 2009
১৯৩.	Sankar Ghose	:	'*The Renaissance of Militant Nationalism in India.*' Calcutta : Allied Publishers, 1969
১৯৪.	Sankar Ghose,	:	'*The Renaissance of Militant Nationalism in India.*' Calcutta : Allied Publishers, 1969
১৯৫.	Sayed Amir Ali	:	*The spirit of Islam,* Delhi, Madras, Calcutta : Kessinger Publishing, 2003
১৯৬.	Sayed Amir Ali,	:	*The spirit of Islam,* Delhi, Madras, Calcutta : Kessinger Publishing, 2003
১৯৭.	Siddiq Salik,	:	*Witnes to Surrender,* Dhaka : The University Press Limited, 1997
১৯৮.	Sir H.M. Elliot and Professor John Dowson,	:	*The History of India, as told by its own Historians,* Vol. 1, Kitab Mahal : Allahabad, 1964
১৯৯.	*Social Welfare in India*	:	'Planning Commission of India Govt. of India', New Delhi : 1988
২০০.	Stanley A. Wolpert	:	*Jinnah of Pakistan,* London : Oxford University Press, 2005
২০১.	Stanley A. Wolpert	:	*Jinnah of Pakistan*, London : Oxford University Press, 2005

পত্র-পত্রিকা

১. *দৈনিক আজাদ*, ১ এপ্রিল, ১৯৬৯
২. *দৈনিক আজাদ*, ১ জানুয়ারি, ১৯৬৮
৩. *দৈনিক আজাদ*, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯
৪. *দৈনিক আজাদ*, ১৬ মার্চ, ১৯৪৮
৫. *দৈনিক আজাদ*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
৬. *দৈনিক আজাদ*, ২৫ মার্চ, ১৯৪৮
৭. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮
৮. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ আগস্ট, ১৯৬৯
৯. *দৈনিক আজাদ*, ৩০ জুন, ১৯৬৭
১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
১৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
১৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৫৮, ২৬ সেপ্টেম্বর
১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ মার্চ ১৯৬৬
১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০
১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মার্চ, ১৯৬৯
১৮. *দৈনিক ইত্তেহাদ*, ২৫ মার্চ, ১৯৪৮
১৯. *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৬ মার্চ, ১৯৯২
২০. দৈনিক পূর্ব-দেশ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০
২১. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০
২২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১২ আগস্ট, ১৯৬৭
২৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ নভেম্বর, ১৯৭০
২৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০
২৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮
২৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯
২৭. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭০
২৮. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৬৮
২৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ নভেম্বর, ১৯৬৮
৩০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৬৯
৩১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ জুন, ১৯৬৭
৩২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৫ জুন, ১৯৬৭
৩৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০
৩৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ অক্টোবর, ১৯৭০
৩৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন, ১৯৬৭
৩৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮
৩৭. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ আগস্ট, ১৯৬৭
৩৮. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯
৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ২০ এপ্রিল-১৯৮৬
৪০. *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ১১ জানুয়ারি, ১৯৬৯

৪১. *দৈনিক সংবাদ*, ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮
৪২. *দৈনিক সংবাদ*, ২ জুলাই, ১৯৬৭
৪৩. *দৈনিক সংবাদ*, ২ ডিসেম্বর, ১৯৬৮
৪৪. *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ মার্চ, ১৯৬৯
৪৫. মর্নিং নিউজ ৩১ মার্চ, ১৯৬৯
৪৬. *দৈনিক সংবাদ*, ৪ নভেম্বর, ১৯৬৮
৪৭. *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৮
৪৮. দৈনিক জনকণ্ঠ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
৪৯. ইত্তেফাক, ২২ মার্চ ১৯৭১
৫০. *পাকিস্তান অবজারভার*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
৫১. *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৩ জুন, ১৯৬৭।
৫২. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৮
৫৩. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৯ মার্চ, ১৯৬৯
৫৪. 1st June, *Pakistan Observer*, 1960
৫৫. *Evening Standard*, 12 March, 1971
৫৬. Karachi, Friday, the 3rd February, 1956
৫৭. Karachi, Wednesday, the 28th September, 1955
৫৮. Karachi, Wednesday, The 9th November, 1955, 3.00 p.m.
৫৯. *Newsweek*, 5 April, 1971
৬০. *Newsweek*, 5 April, 1971
৬১. *The Daily Evening Standard*, 12 March, 1971
৬২. *The Daily Star*, 14 December, 2008
৬৩. *The Daily Teligrath*, 10 March, 1971
৬৪. *The Financial Express*, 31 March, 1971
৬৫. The Morning News, 16th March, 1971
৬৬. *The Sunday Times*, 5 March, 1971
৬৭. *The Sunday Times*, 7 March, 1971
৬৮. *The Sunday Times*, 7 March, 1971; *The Daily Telegraph*, 6 March, 1971
৬৯. *The Times of India*, 3 May, 2005
৭০. *The Times*, 16 August, 1975

জার্নাল

১. *প্রোসিডিংস্ অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৮৭০
২. *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, ভল্যুম-২, সিরিয়াল নয়-১৩৮, ১৯৪৮
৩. *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, ভল্যুম-৩৫, পর্ব-২, ১৯২৮
৪. *বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ারস*, দিনাজপুর : ১৯১২
৫. বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট্ গেজেটিয়ারস, হুগলি, ১৯১২
৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা, *Statistical Year Book-2002*
৭. *মহানাগরিক*, মুখপত্র মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পরিষদের ৪র্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৪
৮. *মাসিক অগ্রপথিক*, ১৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০২, ঢাকা : ইফাবা

৯. *মাসিক অগ্রপথিক*, ১৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ঢাকা : ইফাবা, ২০০২
১০. *মর্নিং নিউজ*, ২৮ জুন, ১৯৬৭
১১. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৮৭৮, পর্ব-১, নং-১ পৃ. ৯২-৯৩
১২. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৮৭৩
১৩. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৪
১৪. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৯০৪
১৫. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৯২২
১৬. দি নিউ ইয়র্ক টাইমস, ৯ জানুয়ারি, ১৯৭২
১৭. *দি পিপল*, ঢাকা ২৩ মার্চ ১৯৭১, *মোহাম্মদ হান্নান*

বিশ্বকোষ

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫
২. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭
৩. আবুল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন মুকরিম (ইবন মানযূর), *লিসানুল আরব*, খ. ৫, কায়রো : দারুল মা'আরেফ
৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫
৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫
৬. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭
৭. *The New Encyclopedia Britannicaq*, Founded 1768, 15th edition, printed in U.S.A, Vol. 5

ওয়েব সাইট

১. http://en.wikipedia.org/wiki/ Instrument_ of_Surrender_%281971%29
২. http://www.islamicfoundation.org.bd/ pages /introduction_ifb.html
৩. http://www.oic-oci.org/oicv2/home/
৪. website : http://en.wikipedia.org/wiki/ Instrument_ of_Surrender_%281971%29